তফসীরে
মা'আরেফুল
কোরআন
ষষ্ঠ খণ্ড

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

ষষ্ঠ খণ্ড

[সূরা মারইয়াম, সূরা তোয়া-হা, সূরা আম্বিয়া, সূরা হজ্জ, সূরা আল-মু'মিনুন, সূরা আন-নূর, সূরা আল-ফুরকান, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা আন-নাম্‌ল, সূরা আল-কাসাস, সূরা আল-আনকাবুত ও সূরা রূম]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (ষষ্ঠ খণ্ড)
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪৮

ইফা প্রকাশনা : ৬৯০/৮
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0178-4

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৩

নবম সংস্করণ (রাজস্ব)
মার্চ ২০১২
চৈত্র ১৪১৮
রবিউস সানি ১৪৩৩

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ শিল্পী : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আইউব আলী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৪১২.০০ টাকা মাত্র

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN (6th Vol) : Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Phone : 8181538 March 2012
E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website: www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk. 412.00; US Dollar : 25.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানি কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবত জ্ঞানের সুবিশাল ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্‌সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্‌সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী ছিলেন বিধায় তাঁর বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ ওসমান গণী (ফারূক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম সংস্করণে

অনুবাদকের আরয

রাব্বুল আলামীনের আসীম অনুগ্রহে 'তাফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন'-এর ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হলো। আলহামদুলিল্লাহ্ ! সমগ্র প্রসংশা আল্লাহ্র। তাঁর তওফীকেই অসহায় বান্দার পক্ষে বড় কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। তিনিই সব কাজের নিয়ামক। অবশিষ্ট দুটি খণ্ডের মুদ্রণকার্য দ্রুত সমাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁরই তওফীক ভিক্ষা করি।

দরূদ ও সালাম হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, একমাত্র যার পথ লক্ষ্য করেই কামিয়াবীর মনজিলে-মকসুদে পৌছা সম্ভব।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ 'মা'আরেফুল কোরআন' যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মাওলানা মুফতী মুহম্মদ শফী' সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে-কিরাম, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীষীগণের ব্যাখ্যা-বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের বিজ্ঞান-ভিত্তিক জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে।

এ কারণেই উর্দু ভাষায় রচিত এ তফসীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই সর্বমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যের একাধিক ভাষায় এর অনুবাদও হয়ে গেছে। একই কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তরফ থেকে এই অসাধারণ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব অর্থাৎ অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমার উপর ন্যস্ত করেন। আল্লাহ্র শোকর যে, আট খণ্ডেরই অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং মুদ্রণ কাজ দ্রুত চলছে।

এ বিরাট দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে আমাকে কয়েকজন বিজ্ঞ আলিম সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞ মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, হাফেজ মওলানা আবু আশরাফ ও জনাব শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়।

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সবগুলো খণ্ডেরই অনূদিত পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষা কার্য সমাধা করেছেন ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা প্রখ্যাত আলিম হযরত মওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম, প্রাক্তন সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দিন, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ সুধী ব্যক্তি আন্তরিক আগ্রহ সহকারে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য আমাকে সর্বক্ষণ তাকিদ ও সহযোগিতা করেছেন। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি দ্রুত মুদ্রণের ব্যাপারে মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. ইয়াহইয়া নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করে ছিলেন। আল্লাহ্ পাক এদের সবাইকে যোগ্য প্রতিদান দান করবেন। আমীন!

পাঠকগণের খেদমতে আমরা দোয়াপ্রার্থী, আল্লাহ্ পাক যেন আমাদেরকে অবশিষ্ঠ দুটি খণ্ড দ্রুত প্রকাশ করার তওফীক দান করেন।

বিনীত খাদেম
মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক : মাসিক মদীনা. ঢাকা

জমাদ্দিউল আউয়াল, ১৪০৩ হিঃ

সূচিপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

سُوْرَةُ مَرْيَمَ

সূরা মারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

كٓهٰيٰعٓصٓ (১) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا (২) اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً
خَفِيًّا (৩) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ
بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا (৪) وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ
عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا (৫) يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ
رَبِّ رَضِيًّا (৬) يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا (৭) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ
مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (৮) قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ
مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا (৯) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا
تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (১০) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى
اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا (১১) يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَاٰتَيْنٰهُ
الْحُكْمَ صَبِيًّا (১২) وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۭ وَكَانَ تَقِيًّا (১৩) وَّبَرًّا
بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (১৪) وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ
يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (১৫)

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। (৩) যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা। আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে ; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে ; হে আমার পালনকর্তা ! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল-মনোরথ হইনি। (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। (৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষভাজন। (৭) হে যাকারিয়্যা, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমি যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেন ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন ঃ এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বলল ঃ (১২) হে ইয়াহ্‌ইয়া, দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহিযগার, (১৪) পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৫) তার প্রতি শান্তি— যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ--(এর মর্ম আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন) এটা (অর্থাৎ বর্ণিত কাহিনী) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বৃত্তান্ত তাঁর (প্রিয়) বান্দা (হযরত) যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি, যখন সে তার পালনকর্তাকে নিভৃতে আহবান করেছিল। (তাতে) সে বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার, আমার অস্থি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথার চুলের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে (অর্থাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেছে। এই অবস্থার দাবি এই যে, আমি সন্তান লাভের অনুরোধ না করি ; কিন্তু আপনার কুদরত ও রহমত অসীম) এবং (আমি এই কুদরত ও রহমত লাভে সদাসর্বদাই অভ্যস্ত। সেমতে ইতিপূর্বে কখনও) আপনার কাছে (কোন বস্তু) চাওয়ার ব্যাপারে হে আমার পালনকর্তা বিফল মনোরথ হইনি। (এ কারণে দুষ্কর থেকেও দুষ্কর উদ্দিষ্ট চাওয়ার ব্যাপারেও

কোন দোষ নেই। এই চাওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ এই দেখা দিয়েছে যে,) আমি আমার (মৃত্যুর পর) স্বজনদের (পক্ষ থেকে) ভয় করি (যে, তারা আমার ইচ্ছামত শরীয়ত ও ধর্মের দায়িত্ব পালন করবে না। সন্তান চাওয়ার পক্ষে এটাই বিশেষ একটা কারণ। এতে করে সন্তান ও এমন ধরনের প্রার্থনা করা হলো, যার মাঝে দীনের খিদমত সম্পন্ন করার মত গুণাবলীও থাকে।) এবং (যেহেতু আমার বার্ধক্যের সাথে সাথে) আমার স্ত্রী (ও) বন্ধ্যা ; (যার দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও কখনও সন্তান হয়নি, তাই সন্তান হওয়ার প্রাকৃতিক কারণসমূহও অনুপস্থিত।) অতএব (এমতাবস্থায়) আপনি আমাকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণাদির মাধ্যম ব্যতিরেকেই) এমন একজন উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ পুত্র) দান করুন, যে (আমার বিশেষ জ্ঞানেগুণে) আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং (আমার পিতামহ) ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারের (ঐতিহ্যে তাদের) স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (অর্থাৎ সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানের অধিকারী হবে) এবং (আমলকারী হওয়ার কারণে) তাকে নিজের সন্তোষভাজন (ও প্রিয়) করুন। হে আমার পালনকর্তা (অর্থাৎ সে আলিমও হবে এবং আমেলও হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় বললেন) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে (বিশেষ গুণাবলীতে) আমি কাউকে তার সমগুণসম্পন্ন করিনি(অর্থাৎ তুমি যে ইল্ম ও আমলের দোয়া করছ, তা তো এ পুত্রকে অবশ্যই দেব ; তদুপরি বিশেষ গুণও তাকে দান করব। উদাহরণত আল্লাহ্র ভয়ে বিশেষ পর্যায়ের হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি। এই দোয়া কবূলের মধ্যে সন্তান লাভের বিশেষ কোন অবস্থা হয়নি; তাই তা জানার জন্যে যাকারিয়া (আ) নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং (এদিকে) আমি নিজে তো বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি? (অতএব জানি না আমরা যৌবন লাভ করব, না আমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে, না বর্তমান অবস্তাতেই পুত্র হবে।) ইরশাদ হলো (বর্তমান) অবস্থা এমনিই থাকবে, (এরই মধ্যে সন্তান হবে। হে যাকারিয়া,) তোমার পালনকর্তা বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ (শুধু এটি কেন, আমি তো আরও বড় কাজ করেছি। উদাহরণত) আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ (সৃষ্টির পূর্বে) তুমি কিছুই ছিলে না। (এমনিভাবে প্রাকৃতিক কারণাদিও কিছুই ছিল না। যখন অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে আনা আমার জন্যে সহজ, তখন এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্ব আনয়ন করা কঠিন হবে কেন? আল্লাহ্র এসব উক্তির উদ্দেশ্য ছিল হযরত যাকারিয়ার আশাকে জোরদার করা ; সন্দেহ নিরসনের জন্যে নয়। কেননা, যাকারিয়ার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যখন) যাকারিয়া [(আ)-এর আশা জোরদার হয়ে গেল, তখন তিনি] নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (আপনার ওয়াদায় আমি পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলাম। এখন এই ওয়াদার বাস্তবায়ন নিকটবর্তী হওয়ার অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারেরও) আমাকে একটি নিদর্শন দিন (যাতে আরও অধিক শোকর করি। স্বয়ং বাস্তবায়ন তো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই)। ইরশাদ হলো ঃ তোমার (সে) নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন রাত (ও তিন দিন) কোন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না, অথচ তুমি সুস্থ অবস্থায় থাকবে (কোন অসুখ বিসুখ হবে না। এ কারণেই আল্লাহ্র যিকিরে মুখ খুলতে সক্ষম হবে। সেমতে আল্লাহ্র নির্দেশে

যাকারিয়ার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে বলল ঃ (কারণ সে মুখে কথা বলতে সমর্থ ছিল না) তোমরা সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণা ও পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ হয় নিয়মানুযায়ী ছিল, সর্বদাই তার নবুয়তের কর্তব্য পালনকালে মুখে পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলতেন ; কিন্তু আজ ইঙ্গিতে বলছেন, না হয় নতুন নিয়ামত প্রাপ্তির শোকরানায় নিজেও অধিক পরিমাণে তসবীহ্ আদায় করেছেন এবং অন্যদেরকেও তদ্রুপ তসবীহ্ আদায় করতে বলেছেন। মোটকথা, অতঃপর ইয়াহ্ইয়া (আ) জন্মগ্রহণ করলেন এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলেন। তখন তাকে আদেশ করা হলো হে ইয়াহ্ইয়া, এ কিতাবকে (অর্থাৎ তওরাতকে, কারণ তখন তওরাতই ছিল শরীয়ত। ইনজীল পরে অবতীর্ণ হয়েছে।) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর (অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা সহকারে আমল কর)। আমি তাঁকে শৈশবেই (ধর্মের) জ্ঞানবুদ্ধির এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা (গুণ) এবং (চারিত্রিক) পবিত্রতা দান করেছিলাম। (حكم বলায় জ্ঞান বুদ্ধি এবং حنان ও زكوة বলায় চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।) এবং (অতঃপর বাহ্যিক আমলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,) সে বড়ই পরহিযগার এবং পিতামাতার অনুগত ছিল। (এতে আল্লাহ্র হক এবং বান্দার হক উভয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে সে (মানুষের প্রতি) উদ্ধত (অথবা আল্লাহ্ তা'আলার) নাফরমান ছিল না। (সে আল্লাহ্র কাছে এমন গৌরবান্বিত ও সম্মানিত ছিল যে, তার পক্ষে আল্লাহ্র তরফ থেকে বলা হচ্ছে ঃ) তার প্রতি (আল্লাহ্ তা'আলার) শান্তি (বর্ষিত) হোক যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে (কিয়ামতে) পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা কাহ্ফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা-কাহ্ফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেয়া হয়েছে। —(রূহুল মা'আনী)

كـهـيـعـص এগুলো খণ্ডিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অন্বেষণ করাও সমীচীন নয়।

نِدَآءً خَفِيًّا এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্চস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ان خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى অর্থাৎ অনুচ্চ যিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন যিকিরই শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না)।—(কুরতুবী)

اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اشتعال-এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মুস্তাহাব ঃ এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ তা-ই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তার তফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবূল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলিমগণ বলেন ঃ দোয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত।

مَوَالِىَ এটা مَوْلَى-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই।

পয়গম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না ঃ يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ অধিক সংখ্যক আলিমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমত হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত একটি সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر -

নিশ্চিতই আলিমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। "পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।" —(আহমদ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لانورث ما تركناه صدقة আমাদের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তা সবই সদকা।

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে يَرِثُنِى-এর পর وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে তাতে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব مَوَالِىَ তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার-আইনের পরিপন্থী।

রূহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে ঃ

روى الكينى في الكافى عن ابى البخزى عن ابى عبد الله قال ان سليمان ورث راؤد وان محمدا ﷺ ورث سليمان -

সোলায়মান (আ) দাউদ (আ)-এর ওয়ারিস হন এবং মুহাম্মদ (সা) সোলায়মান (আ)-এর ওয়ারিস হন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হযরত সোলায়মান (আ)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোন সম্ভবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا سَمِيٌّ শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তার পূর্বে 'ইয়াহইয়া' নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহ ছিল। তাই তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণত, চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া (আ) পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ ও মূসা কলীমুল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত। —(মাযহারী)

عِتِيًّا শব্দটি عُتُوٌّ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া। এখানে অস্থির শুষ্কতা বোঝানো হয়েছে। سَوِيًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আ)-এর কোন মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোন রোগবশত ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতে তার জিহবা তিনদিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল। বরং এ অবস্থা মু'জিযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। حَنَانًا-এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা। এটা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾
قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ
رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ
يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ

هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

(১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তাঁর পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ্‌কে প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল ঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্‌-ভীরু হও। (১৯) সে বলল ঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাই। (২০) মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনের এই বিশেষ অংশে অর্থাৎ সূরায় হযরত) মারইয়াম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করুন, [কারণ, এটা যাকারিয়া (আ)-এর উল্লিখিত কাহিনীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এটা তখন ঘটে,] যখন সে পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের একস্থানে (গোসলের জন্য) গেল। অতঃপর তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি (মধ্যস্থলে) পর্দা করে নিলেন,) যাতে এর আড়ালে গোসল করতে পারেন।) অতঃপর (এমতাবস্থায়) আমি আমার ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে প্রেরণ করলাম, তিনি তাঁর সামনে (হাত, পা-সহ আকার-আকৃতিতে একজন পূর্ণ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। (হযরত মারইয়াম তাঁকে মানব মনে করলেন, তাই অস্থির হয়ে) বললেন ঃ আমি তোমা থেকে আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, যদি তুমি (এতটুকুও) আল্লাহ্‌ভীরু হও (তবে এখান থেকে সরে যাবে)। ফেরেশতা বললেন ঃ আমি মানব নই যে, (তুমি আমাকে ভয় করবে) আমি তো তোমার পালনকর্তা প্রেরিত (ফেরেশতা। আমার আগমনের উদ্দেশ্য—) যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করি। (অর্থাৎ তোমার মুখে অথবা বুকের উন্মুক্ত অংশে ফুঁ মারি, যার প্রভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে গর্ভ সঞ্চার হয়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।) তিনি (বিস্ময়ভরে) বললেন ঃ (অস্বীকারের ভঙ্গিতে নয়) আমার পুত্র কিরূপে হবে, অথচ (এর অপরিহার্য শর্তাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষের সাথে সহবাস। এটা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কেননা) কোন মানব আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি (অর্থাৎ আমার বিয়ে হয়নি) এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতা বললেন ঃ (ব্যস, কোন মানবের স্পর্শ ব্যতীত) এমনিতেই (পুত্র) হয়ে যাবে। (আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না ; বরং) তোমার পালনকর্তা বলেছেন ঃ এটা (অর্থাৎ অভ্যস্ত কারণাদি ছাড়াই পুত্র সৃষ্টি করা) আমার পক্ষে সহজ এবং (আরও বলেছেন যে, আমি অপরিহার্য শর্তাবলী ছাড়া) বিশেষভাবে এজন্য সৃষ্টি করব, যাতে আমি এই পুত্রকে মানুষের জন্য (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও (এর মাধ্যমে

মানুষের হিদায়েত পাওয়ার জন্য) তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের উপকরণ করে দেই। এটা পিতাবিহীন (এই পুত্রের জন্মলাভ) একটি স্থিরীকৃত ব্যাপার (যা অবশ্যই ঘটবে)।

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

انْتَبَذَتْ শব্দটি نَبذ **থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা।** انتباذ-**এর অর্থ হলো জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া।** مَكَانًا شَرْقِيًّا **অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন** নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। কেউ বলেন ঃ গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন ঃ অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খ্রিস্টানরা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে রূহ্ বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ স্বয়ং ঈসা (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্য সহজ নয়—ভয়-ভীতি প্রবল হয়ে যায় ; যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গিরিগুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতরে আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশংকা করলেন। তাই বললেন ঃ

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ আমি তোমা থেকে আল্লাহ্ রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল একথা শুনে (আল্লাহ্র কথা শুনে) আল্লাহ্র নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

إِن كُنتَ تَقِيًّا এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন জালিমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে ঃ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেওয়ার জন্য তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য সমীচীন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহ্ভীরুও হও, তবুও আমি তোমা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। —(মাযহারী)

لِأَهَبَ لَكِ এখানে পুত্র সন্তান প্রদানের কাজটি জিবরাঈল নিজের বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মারইয়ামের বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ মারার জন্য

প্রেরণ করেছিলেন। এই ফুঁ দেয়া পুত্র সন্তান প্রদানের উপায় হয়ে যাবে-যদিও প্রকৃতপক্ষে এ দান আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿২২﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ
جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿২৩﴾
فَنَادَىٰهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ
سَرِيًّا ﴿২৪﴾ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا
جَنِيًّا ﴿২৫﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿২৬﴾

(২২) অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন ঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। (২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর জারি করেছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (২৬) এখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও ঃ আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (এই কথাবার্তার পর জিবরাঈল তাঁর বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ মারলেন যদ্দরুন) তিনি গর্ভে পুত্র ধারণ করলেন। অতঃপর (যথাসময়ে মারইয়াম যখন গর্ভ ধারণের লক্ষণাদি অনুভব করলেন তখন) সৎসহ (নিজ গৃহ থেকে) কোন দূরবর্তী স্থানে (বন পাহাড়ে) একান্তে চলে গেলেন। এরপর (যখন প্রসব বেদনা শুরু হলো তখন) প্রসব বেদনার কারণে খেজুর গাছের দিকে আশ্রয় নিলেন (যাতে তার উপর ভর দিয়ে ওঠা-বসা করতে পারেন। এ সময় তার কোন সঙ্গী-সহচর ছিল না। তিনি ছিলেন ব্যথায় অস্থির। এমতাবস্থায় আরাম ও প্রয়োজনের যেসব উপকরণাদি থাকা উচিত ছিল, তাও অনুপস্থিত। তদুপরি সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশংকা। অবশেষে দিশেহারা হয়ে) বলতে লাগলেনঃ

হায় ! আমি যদি এ অবস্থার পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। অতঃপর সে সময়েই আল্লাহ্র নির্দেশে (হযরত) জিবরাঈল (পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সম্মুখে উপস্থিত হলেন না; বরং যে জায়গায় মারইয়াম ছিলেন, সেখান থেকে নিম্ন ভূমিতে আড়ালে অবস্থান করলেন এবং তিনি) তাকে নিম্নস্থান থেকে আওয়ায দিলেন (মারইয়াম তাকে চিনলেন যে, তিনি ফেরেশ্তা, যিনি ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন) যে, তুমি উপকরণাদি না থাকার কারণে অথবা (দুর্নামের ভয়ে) দুঃখ করো না, (কেননা উপকরণাদির ব্যবস্থা এরূপ হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন (যা দেখলে এবং তার পানি পান করলে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা অর্জিত হবে। রূহুল মা'আনীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মারইয়াম তখন পিপাসার্তও ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী প্রসবের পূর্বে বা পরে গরম বস্তুর ব্যবহার প্রসব যন্ত্রণা নিরাময় করে, দূষিত রক্ত দূর করে এবং মনকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখে। পানিতে যদি উত্তাপও থাকে—যেমন কোন কোন নহরের পানি এরূপ হয়ে থাকে, তবে তা মেযাজের আরও অনুকূল হবে। এ ছাড়া খেজুরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) থাকে। খেজুর রক্ত উৎপাদন করে দেহে চর্বি সৃষ্টি করে এবং কোমর ও অস্থির জোড়কে শক্তিশালী করে দেয়। এ কারণে এটা প্রসূতির জন্য সব ঔষধ ও খাদ্য থেকেই উত্তম। গরম হওয়ার কারণে কিছুটা ক্ষতির আশংকা থাকলেও পাকা খেজুরে উত্তাপ কম। যেটুকু থাকে, পানি দ্বারা তা সংশোধিত হয়ে যায়। এ ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হলেই অনিষ্টকারিতা দেখা দিতে পারে। নতুবা কোন বস্তুই অল্প বিস্তর অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত নয়। এছাড়া অভ্যাসবিরুদ্ধ কারামতের আত্মপ্রকাশ যেহেতু আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত, তাই তা আত্মিক প্রফুল্লতার কারণও বটে)। তুমি এই খেজুর গাছের কাণ্ডকে (ধরে) নিজের দিকে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে (এ ফল খাওয়ার মধ্যে আহারের স্বাদ এবং কারামত হিসেবে ফলন্ত হওয়ার কারণে আত্মিক স্বাদ উভয়ই একত্রিত আছে)। এখন (এ ফল) আহার কর, (নহরের পানি) পান কর এবং চক্ষু শীতল কর (অর্থাৎ পুত্রকে দেখার কারণে, পানাহারের কারণে এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আনন্দিত থাক)। এরপর (যখন দুর্নামের আশংকার সময় আসে অর্থাৎ কোন মানুষ যদি এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন এর ব্যবস্থাও এরূপ হয়েছে যে) যদি কোন মানুষকে (আসতে এবং আপত্তি করতে) দেখ তবে (তুমি নিজে কিছু বলবে না ; বরং ইঙ্গিতে তাকে) বলে দেবে ঃ আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে (এমন রোযার মানত করেছি যাতে কথা বলা নিষিদ্ধ। সুতরাং এ কারণে) আজ আমি (সারাদিন) কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (তবে আল্লাহ্র যিকর ও দোয়ায় মশগুল হয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা। ব্যস তুমি এতটুকু জওয়াব দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলাই এই সদ্যজাত শিশুকে স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী পন্থায় কথা বলতে সক্ষম করে দেবেন। ফলে পবিত্রতা ও সতীত্বের অলৌকিক প্রমাণ আত্মপ্রকাশ করবে। মোটকথা সর্বপ্রকার দুঃখের প্রতিকার হয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যু-কামনার বিধান ঃ মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওযর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন ; অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মুকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গুনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে ঃ তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন মানত করেন নি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয় ? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে ঃ ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোযাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালি-গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يتم بعدا حتلام ولاصمات يوم الى الليل অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয় ঃ পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জিযা। মু'জিযায় যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই। বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিযিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।—(রূহুল-মা'আনী)

سَرِيًّا-এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করে দেন অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারি করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতেই বর্তমান আছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও

পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। كُلِي وَاشْــــرَبِي কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে ; বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায়, যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।—(রূহুল-মা'আনী)

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَا أُخْتَ
هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ
قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ
الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

(২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হারুন-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব ? (৩০) সন্তান বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মোটকথা, এ কথায় মারইয়াম সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন।] অতঃপর তিনি তাকে কোলে নিয়ে (সেখান থেকে লোকালয়ের দিকে তিনি চললেন এবং) তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা (যখন দেখল যে, অবিবাহিতা মারইয়ামের কোলে সদ্যজাত শিশু, তখন কুধারণা করে) বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি বড় সর্বনাশা কাজ করেছ। (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ্, অপকর্ম করেছ। এমনিতেও অপকর্ম যে কেউ

করে, তা মন্দ ; কিন্তু তোমার দ্বারা এরূপ হওয়া সর্বনাশের উপর সর্বনাশ। কেননা) হে হারুন-ভগিনী, (তোমার পরিবারে কেউ কোনদিন এরূপ অপকর্ম করেনি। সেমতে) তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না (যে, তার প্রভাবে তুমি এরূপ করবে) এবং তোমার জননী ব্যভিচারিণী ছিল না (যে, তার কারণে তুমি এ কাজে লিপ্ত হবে। এরপর হারুন তোমার জ্ঞাতি ভাই। তার নাম হারুন নবীর নামানুসারে রাখা হয়েছে। সে কত ভাল লোক! মোটকথা, যার গোটা পরিবারই শুদ্ধ-পবিত্র, তার দ্বারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় সর্বনাশের কথা!) অতঃপর মারইয়াম (এসব কথাবার্তা শুনে কোন উত্তর দিলেন না। বরং) শিশুর দিকে ইশারা করে দিলেন (যে, যা কিছু বলবার, তাকেই বল। সে উত্তর দেবে।) তারা (মনে করল যে, মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে ; তাই) বলল ঃ সে মাত্র কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কিরূপে কথা বলব? (কেননা, যে ব্যক্তি নিজে কথাবার্তা বলে, তার সাথেই কথা বলা যায়। সে যখন শিশু, তখন তো সে কথাবার্তাই বলতে সক্ষম নয়। তার সাথে কিরূপে কথা বলব ? ইতোমধ্যে) সন্তান (নিজেই বলে উঠল ঃ আমি আল্লাহ্র (বিশেষ) দাস (আল্লাহ্ নই ; যেমন মূর্খ খ্রিস্টানরা মনে করবে এবং আল্লাহ্র অপ্রিয় নই ; যেমন ইহুদীরা মনে করবে। দাস হওয়ার এবং বিশেষ দাস হওয়ার লক্ষণ এই যে) তিনি আমাকে কিতাব (অর্থাৎ ইঞ্জীল) দিয়েছেন (যদিও ভবিষ্যতে দেবেন ; কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কারণে যেন দিয়ে ফেলেছেন।) এবং তিনি আমাকে নবী করেছেন (অর্থাৎ করবেন) এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (অর্থাৎ মানবজাতি আমা দ্বারা উপকৃত হবে) আমি যেখানেই থাকি না কেন (আমার বরকত পৌঁছতে থাকবে। এ উপকার হচ্ছে ধর্ম প্রচার। কেউ কবূল করুক বা না করুক তিনি উপকার পৌঁছিয়ে দিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি (দুনিয়াতে) জীবিত থাকি। (বলা বাহুল্য, আকাশে যাওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে আদিষ্ট নন। এটা দাস হওয়ার প্রমাণ ; যেমন বিশেষত্বের আরও প্রমাণাদি আছে)এবং আমাকে আমার জননীর অনুগত করেছেন (পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণের কারণে বিশেষ করে জননীর কথা বলেছেন) তিনি আমাকে উদ্ধত হতভাগ্য করেন নি (যে, মানুষের হক ও জননীর হক আদায় করতে অবাধ্য হব কিংবা হক ও আমল বর্জন করে দুর্ভাগ্য ক্রয় করব) এবং আমার প্রতি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) সালাম যে দিন জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন মৃত্যুবরণ করব (এ সময়টি কিয়ামতের নিকটবর্তী আসমান থেকে অবতরণের পর হবে। এবং যেদিন আমি (কিয়ামতে জীবিত হয়ে উত্থিত হব। (আল্লাহ্র সালাম বিশেষ বান্দা হওয়ার প্রমাণ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ—এ বাক্য থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন।—(রূহুল মা'আনী)

شَيْئًا فَرِيًّا আরবী ভাষায় فرى শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فرى বলা হয়। আবূ হাইয়্যান বলেন ঃ প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فرى বলা হয়-ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

يَا أُخْتَ هَارُونَ হযরত মূসা (আ)-এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ হারূন (আ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ তুমি বলে দিলেনা কেন যে, বরকতের জন্য পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। এক, হযরত মারইয়াম হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে--যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে ; যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اخاتميم এবং আরবের লোককে اخاعرب বলে অভিহিত করে। দুই. এখানে হারূন বলে মূসা (আ)-এর সহচর হারূন নবীকে বোঝানো হয়নি ; বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নাম ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ্ ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশি গুনাহ্ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুযুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎ কাজ ও আল্লাহ্ভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা (আ) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শোনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে এ-কথা বলেন ঃ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র দাস। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি ; কিন্তু আমি আল্লাহ্ নই—আল্লাহ্র দাস। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ) তাঁর দুগ্ধ পানের যমানায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর

চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেন নি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী (সা) বলেছেন ঃ আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আ)-এর জন্মই হয়নি—তার খামীর তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সা)-এর জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোন গুনাহের দখল থাকতে পারে না।

أَوْصَانِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ - তাকীদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে وصيت শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা (আ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসীয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ যে, খুব তাকীদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামায ও রোযা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শরীয়তে ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে যাকাতের আদেশ দেওয়ার কি মানে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর যাকাত ফরয—এটা ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ঈসা (আ)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাবপরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাঁকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়—(রূহুল মা'আনী)

مَا دُمْتُ حَيًّا অর্থাৎ নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন—যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যমানা।

بَرًّا بِوَالِدَتِي এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতামাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ

لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن

فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ
الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ
عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

(৩৪) এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুত্র। সত্যকথা, সে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। (৩৫) আল্লাহ্ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা স্থির করেন, তখন একথাই বলেন ঃ 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (৩৬) তিনি আরও বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের জন্য ধ্বংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ যালিমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুত্র (যার উক্তি ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সে আল্লাহ্র দাস ছিল। খ্রিস্টানরা যে তাকে দাসদের তালিকা থেকে বের করে আল্লাহ্র স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, তা সত্য নয়। এমনিভাবে ইহুদীরা যে তাঁকে আল্লাহ্র প্রিয় বলে স্বীকার করে না এবং নানাবিধ অপবাদ আরোপ করে, তাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত)। আমি (সম্পূর্ণ) সত্যকথা বলছি, সে সম্পর্কে (বাহুল্য ও স্বল্পতার আশ্রয় গ্রহণকারী) লোকেরা বিতর্ক করছে। সেমতে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের উক্তি এইমাত্র জানা গেল। (যেহেতু ইহুদীদের উক্তি বাহ্যত ও পয়গম্বরের মর্যাদা হানিকর হওয়ার কারণে স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল, তাই তা খণ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। এর বিপরীতে খ্রিস্টানদের উক্তি বাহ্যত পয়গম্বরের

অতিরিক্ত গুণ প্রমাণ করে। কারণ তাঁরা নবীত্বের সাথে সাথে আল্লাহ্র পুত্রত্ব দাবি করে। তাই পরবর্তী আয়াতে তা খণ্ডন করা হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, এ উক্তির কারণে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদের অস্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে তা স্বয়ং আল্লাহ্র মর্যাদা হানি করে। অথচ) আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তিনি (কাউকে) পুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। তিনি (সম্পূর্ণ) পবিত্র। (কারণ) তিনি যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তাকে এতটুকু বলে দেন, 'হয়ে যা', অমনি তা হয়ে যায়। (এমন পরা কাষ্ঠাশালীর সন্তান হওয়া যুক্তিগতভাবে ত্রুটি।) এবং (আপনি তওহীদ প্রমাণের জন্য লোকদেরকে বলে দিন, যাতে মুশরিকরাও শুনে নেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব (একমাত্র) তাঁরই ইবাদত কর। এটা (অর্থাৎ খাঁটিভাবে আল্লাহ্র ইবাদত তথা তওহীদ অবলম্বন করা) সরল পথ। অতঃপর (তওহীদের এসব যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণ সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) পরস্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ অস্বীকার করে নানা রকম ধর্ম আবিষ্কার করেছে।) সুতরাং কাফিরদের জন্য মহাদিবসের আগমনকালে খুবই দুর্ভোগ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস। এই দিবস এক হাজার বছর দীর্ঘ ও ভয়াবহ হওয়ার কারণে মহাদিবস হবে।) তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা (হিসাব ও প্রতিদানের জন্য) আমার কাছে আগমন করবে। (কেননা কিয়ামতে এসব সত্যাসত্য দৃষ্টির সামনে এসে যাবে এবং সব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।) কিন্তু যালিমরা আজ (দুনিয়াতে কেমন) প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছে। আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন যখন (জান্নাত ও দোযখের) চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া হবে। [হাদীসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকে জান্নাত ও দোযখবাসীদের দেখিয়ে জবাই করে দেওয়া হবে এবং উভয় প্রকার লোকদেরকে অনন্তকাল তদবস্থায় জীবিত থাকার নির্দেশ শুনিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) তখন যে অপরিসীম পরিতাপ হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।] তারা (আজ দুনিয়াতে) অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না (কিন্তু অবশেষে একদিন মরবে)। পৃথিবী ও তার উপরে যারা রয়েছে, তাদের ওয়ারিস (অর্থাৎ সর্বশেষ মালিক) আমিই থেকে যাব এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে (এরপর তাদের কুফর ও শিরকের সাজা ভোগ করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ —হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টানরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করে। (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।—(কুরতুবী)

اَقُـوْلُ قَـوْلَ الْحَقِّ — قَـوْلَ الْحَقِّ —লামের যবরযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপ হলো এরূপ কোন কোন কিরাআতে লামের পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, ঈসা (আ) স্বয়ং قَـوْلُ الْحَقِّ (সত্য উক্তি) যেমন তাকে كلمة الله (আল্লাহ্‌র উক্তি) উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁর জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র উক্তির মাধ্যমে হয়েছে।—(কুরতুবী)

يَوْمَ الْحَسْرَةِ কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত ; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মুআযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবূ ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যেসব মুহূর্তে আল্লাহ্‌র যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে, সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন ঃ এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন ঃ সৎকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরও বেশি সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ
يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ
قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾
يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَبَتِ
اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾
قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾
قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَاَعْتَزِلُكُمْ
وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ

شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ

إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

(৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় সে ছিল সত্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে ; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (৪৬) পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (৪৭) ইবরাহীম বললেন ঃ তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদেরকে ; আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব ; আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। (৪৯) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ) আপনি এই কিতাবে (কোরআনে) ইবরাহীম (আ)-এর কথা বর্ণনা করুন (যাতে তাদের কাছে তওহীদ ও রিসালতের ব্যাপারটি আরও ফুটে ওঠে।) সে (প্রত্যেক কথায় ও কাজে) খুবই সত্যবাদী (ছিল ও) নবী ছিল। (এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তা তখন হয়েছিল) যখন তিনি তাঁর (মুশরিক) পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা, তুমি এমন বস্তুর ইবাদত কর কেন, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না (অর্থাৎ প্রতিমা ; অথচ কোন বস্তু দর্শক, শ্রোতা ও উপকারী হওয়ার পরও যদি 'সদাসর্বদা আছে এবং সদাসর্বদা থাকবে' এরূপ না হয়, তবুও সে ইবাদতের যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় যার মধ্যে এসব গুণও নেই, সে উত্তমরূপে ইবাদতের যোগ্য

হতে পারে না।) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি (অর্থাৎ ওহী ; এতে ভ্রান্তির আশংকা মোটেই নেই। সুতরাং আমি যা কিছু বলছি, তা নিশ্চিতরূপে সত্য। কাজেই) তুমি আমার কথামত চল, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (তা হচ্ছে তওহীদ)। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদত করো না (অর্থাৎ শয়তানকে এবং তার ইবাদতকে তো তুমিও খারাপ মনে কর। প্রতিমা পূজায় শয়তান পূজা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ শয়তানই এ-কাজ করায়। আল্লাহ্‌র বিপরীতেও কারও শিক্ষাকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করাই ইবাদত। কাজেই প্রতিমা পূজার মধ্যে শয়তান পূজা নিহিত রয়েছে।) নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (অতএব সে আনুগত্যের যোগ্য হবে কিরূপে) ? হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি (এবং এই আশংকা নিশ্চিত) যে, তোমাকে দয়াময়ের কোন আযাব স্পর্শ করবে (দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে)। অতঃপর তুমি (আযাবে) শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আনুগত্যে যখন তার সঙ্গী হবে ; তখন সাজায়ও তার সঙ্গী হবে, যদিও দুনিয়াতে শয়তানের কোন আযাব না হয়। শয়তানের এই সঙ্গ ও শাস্তিতে অংশীদার হওয়াকে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি পছন্দ করবে না)।

[ইবরাহীম (আ)-এর এসব উপদেশ শুনে] পিতা বলল ঃ তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হচ্ছ, হে ইবরাহীম? (এবং এজন্য আমাকেও নিষেধ করছ? মনে রেখ) যদি তুমি (দেবদেবীর নিন্দা থেকে এবং আমাকে তাদের ইবাদতে নিষেধ করা থেকে) বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব (কাজেই তুমি এ থেকে বিরত হও) এবং চিরতরে আমা থেকে (অর্থাৎ আমাকে বলা-কওয়া থেকে) দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ (উত্তম) আমার সালাম নাও, (এখন তোমাকে বলা-কওয়া নিরর্থক।) এখন আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার কাছে মাগফিরাতের (এভাবে) দরখাস্ত করব (যে, তিনি তোমাকে হিদায়েত করুন, যাদ্দ্বারা মাগফিরাত অর্জিত হয়) নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (কাজেই তাঁর কাছেই আবেদন করব, যার কবূল করা না করা উভয়টি বিভিন্ন দিক দিয়ে রহমত ও মেহেরবানী) এবং (তুমি এবং তোমার সহধর্মীরা যখন আমার সত্য কথাও মানতে চাও না, তখন তোমাদের মধ্যে অবস্থান করা অনর্থক। তাই) আমি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের থেকে (দৈহিকভাবেও) পৃথক হয়ে যাচ্ছি, (যেমন আন্তরিকভাবে পূর্বেই পৃথক রয়েছি। অর্থাৎ এখানে অবস্থানও করব না) এবং সানন্দে পৃথক হয়ে) আমার পালনকর্তার ইবাদত করব (কেননা, এখানে থাকলে এ কাজেও বাধা সৃষ্টি হবে।) আশা (অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস) করি যে, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না (যেমন মূর্তিপূজারীরা তাদের মিথ্যা উপাস্যের ইবাদত করে বঞ্চিত হয়। মোটকথা, এই কথাবার্তার পর ইবরাহীম তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে চলে গেলেন)। অতঃপর সে যখন তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক (পুত্র) ও ইয়াকুব (পৌত্র) দান করলাম (তারা তাঁর সঙ্গলাভের কল্যাণে মূর্তিপূজারী সমাজের চাইতে বহুগুণে উত্তম ছিল।) এবং আমি (উভয়ের মধ্যে) প্রত্যেককে নবী করেছি এবং তাদের সবাইকে আমি (নানা গুণে গুণান্বিত করে) আমার অনুগ্রহের অংশ

দিয়েছি এবং (ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে) তাদের সুখ্যাতি আরও সমুচ্চ করেছি। (ফলে সবাই সম্মান ও প্রশংসা সহকারে তাদের নাম উচ্চারণ করে। ইসহাকের পূর্বে ইসমাঈল এমনি সব গুণসমূহ প্রদত্ত হয়েছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'সিদ্দীক' কাকে বলে? صِدِّيقًا نَّبِيًّا — صديق শব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিদ্দীক। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও ওঠাবসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরী নয় ; বরং নবী নয়—এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনি-ও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরআন পাক 'সিদ্দীক' (اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ) উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী হতে পারেন না।

বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদব ঃ يٰۤاَبَتِ আরবী অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেযাজের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শির্‌কে শুধু লিপ্তই নয়—এর উদ্যোক্তারূপেও দেখেন। এই কুফর ও শির্‌ক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ত্ব ও ভালবাসা। এ দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يٰۤاَبَتِ শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে 'কাফির' গোমরাহ্ ইত্যাদি বলেন নি: বরং পয়গম্বরসুলভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞানগরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শির্‌কের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুঁশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ্ يٰۤاَبَتِ বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় يَا بُنَيَّ (হে

বৎস,) শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে يَا اِبْرَاهِيْمُ বলে সম্বোধন করল। অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ্ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكَ এখানে "سَلَامٌ" শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। এক. বয়কটের সালাম; অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোরআন পাক আল্লাহ্র প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মুকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোন কাফিরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا تبدء او اليهود والنصارى بالسلام অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কাফির, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহ্বিদগণ মতভেদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও কারও কথা ও কার্য দ্বারা অবৈধতা বোঝা যায়। কুরতুবী আহকামুল কোরআন গ্রন্থে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নখয়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোন কাফির ইহুদী ও খ্রিস্টানের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন কাফিরের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রাসূলে করীম (সা) তাঁর চাচা আবূ তালিবকে বলেছিলেন ঃ وَاللّٰهِ لا ستغفرن لك مالم انه عنه অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইস্তিগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাচার জন্য ইস্তিগফার পরিত্যাগ করেন।

খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইস্তিগফার করব—এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়।

সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ সূরা তওবার مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ এ থেকে জানা যায় যে, এই ইস্তিগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আল্লাহ্র শত্রু প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইস্তিগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলংকিত হতে দেন নি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসংগতার আতংক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবূল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্র জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকুব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هٰرُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِسْمٰعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا

نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ قلے وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ

النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ

وَاِسْرَآءِيْلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ

خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ সিজদা

---

(৫১) এই কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। (৫২) আমি তাঁকে আহবান করলাম তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং গূঢ়তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর ভাই হারূনকে নবীরূপে। (৫৪) এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। (৫৫) তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম। (৫৮) এরাই তারা—নবীগণের মধ্য থেকে যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাঁদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশধর এবং যাঁদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনে) মূসা (আ)-এর কথাও আলোচনা করুন (অর্থাৎ মানুষকে শোনান, নতুবা কিতাবে আলোচনাকারী তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই)। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র বিশিষ্ট (বান্দা) ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন। আমি তাঁকে তূর পর্বতের ডানদিক থেকে আহ্বান করলাম এবং 'আমি তাঁকে গূঢ়তত্ত্ব বলার জন্য নিকটবর্তী করলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে (অর্থাৎ তাঁর অনুরোধে তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁকে নবী করলাম এই কিতাবে ইসমাঈলের কথাও বর্ণনা করুন, নিশ্চয় তিনি ওয়াদা পালনে খুব সাচ্চা ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও

নবী ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের (বিশেষভাবে এবং অন্যান্য বিধিবিধানের সাধারণভাবে) নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। এই কিতাবে ইদরীস (আ)-এর কথা আলোচনা করুন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত সততাপরায়ণ নবী ছিলেন। আমি তাঁকে (গুণগরিমায়) উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিলাম। এরা (সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করা হলো—যাকারিয়া থেকে ইদরীস পর্যন্ত) এমন, যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ (বিশেষ) নিয়ামত নাযিল করেছেন (অর্থাৎ নবুয়ত দান করেছেন। কেননা, নবুয়তের চাইতে বড় নিয়ামত কিছু আর নেই)। এরা সবাই আমাদের বংশধর (ছিলেন) এবং তাদের কেউ কেউ তাদের বংশধর (ছিলেন), যাঁদেরকে আমি নূহ্ (আ)-এর সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম (সেমতে একমাত্র ইদরীস ছিলেন নূহের পিতৃপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই নূহ ও তাঁর সঙ্গীদের বংশধর) এবং (তাদের কেউ কেউ) ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর [ছিলেন। সেমতে হযরত যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও মূসা (আ) তাদের উভয়ের বংশধর। ইসহাক, ইসমাঈল ও ইয়াকুব (আ) ছিলেন শুধু হযরত ইবরাহীমের বংশধর।] তাদের সবাইকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি। (এহেন প্রিয়পাত্র ও বৈশিষ্ট্যশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদের বন্দেগীর অবস্থা ছিল এই যে) যখন তাদের সামনে রহমানের আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন (চূড়ান্ত মুখাপেক্ষিতা, নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে) তারা সিজদারত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় (মাটিতে) লুটিয়ে পড়ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَانَ مُخْلَصًا—আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্য খাঁটি করে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত করে দেয়, তাকে "مُخْلَص" বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন ; যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ—অর্থাৎ আমি পয়গম্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও এই মর্তবা কতক পরিমাণে লাভও করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে গুনাহ্ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তাঁরা আল্লাহ্র হিফাযতে থাকেন।

مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ—এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

الْأَيْمَنِ—তূর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মূসা (আ)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

نَجِيًّا—কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مناجات এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نجى বলা হয়।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ — هبه শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হারূনকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবূল করা হয়। আয়াতে وَهَبْنَا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মূসাকে 'হারূন' দান করেছি। একারণেই হযরত হারূন (আ)-কে هبة الله (আল্লাহ্র দান)-ও বলা হয়। (মাযহারী)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ — বাহ্যত এখানে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি ; বরং মাঝখানে হযরত মূসার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হযরত ইদরীস (আ)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ — ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ্র প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ওয়াদা পালনে সাচ্চা ; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই ; বরং এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হযরত মূসা (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; অথচ এ গুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্র সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই-এর জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন ঃ কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী (সা) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা ঃ ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ العدة دين ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মু'মিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গুনাহ্। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জোরে-জবরে আদায় করা যায়। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত ওয়াজিব-বিচারে ওয়াজিব নয়। —(কুরতুবী)

পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য :

كَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ—হযরত ইসমাঈল (আ)-এর আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া তো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বৈশিষ্ট্য কি ? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন ; যেমন মহানবী (সা)-এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ—অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র করে বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌঁছান এবং খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি ? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হিদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হিদায়েত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ—হযরত ইদরীস (আ) নূহ্ (আ)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আ)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাযিল করেন। (যামাখশারী) হযরত ইদরীস (আ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জিযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহ্‌রে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণত পোশাকের

স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।—(বাহ্‌রে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا—অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ)-কে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন ঃ

هذا من اخبار كعب الاحبار الاسرائيليات وفى بعضه نكارة

অর্থাৎ এটা কা'বে আহ্‌বারের ইসরাইলী রেওয়ায়েত। এর কোন কোনটি অপরিচিত। কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কোরআানের তফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল কোরআন)

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ বয়ানুল কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ঃ রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল। এখন শরীয়তটি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন ইসমাঈল (আ)-এর শরীয়ত ; এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাচীন শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয় ; যেমন ফেরেশ্‌তা রাসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন ঈসা (আ)-এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ বলা হয়েছে অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাইলের অধিকাংশ নবী মূসা (আ)-এর শরীয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক। এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُولًا نَبِيًّا বলা হয়েছে, যেখানে কোন খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয় ; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং وَإِسْرَائِيلَ–এখানে হযরত মূসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল ; যেমন ইহুদীরা হযরত ওযায়রকে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসাকে আল্লাহ্ই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহ্র সামনে সিজদাকারী এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ছিলেন, এ কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়। —(বয়ানুল কোরআন)

কোরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পয়গম্বরদের সুন্নতঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরদের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং ওলীআল্লাহ্দের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরতুবী বলেন ঃ কোরআন পাকে সিজদার যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সিজদায় দোয়া করা আলিমদের মতে মুস্তাহাব। উদাহরণত সূরা সিজদায় এই দোয়া করা উচিত ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ –

সূরা বনী ইসরাইলের সিজদায় এরূপ দোয়া করা উচিত ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْبَاكِيْنَ اِلَيْكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ—আলোচ্য আয়াতের সিজদায় নিম্নরূপ দোয়া করা দরকার ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ اَلْمَهْدِيِّيْنَ السَّاجِدِيْنَ لَكَ الْبَاكِيْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ اٰيَاتِكَ –

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۣالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

(৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তার ওয়াদায় তারা পৌঁছবে। (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্য রুযী থাকবে। (৬৩) এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহিযগারদেরকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তিদের) পর (কতক) এমন অপদার্থ জন্মগ্রহণ করল, যারা নামায বরবাদ করে দিল (বিশ্বাসগতভাবে অর্থাৎ অস্বীকার করল অথবা কার্যত অর্থাৎ নামায আদায় করতে অথবা জরুরী হক ও আদবে ত্রুটি করল) এবং (নফসের অবৈধ) খাহেশের অনুবর্তী হলো (যা জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল করার মত ছিল।) সুতরাং তারা অচিরেই (পরকালে) অনিষ্ট দেখে নেবে (চিরস্থায়ী অনিষ্ট কিংবা অচিরস্থায়ী) কিন্তু যে (কুফর ও গুনাহ্ থেকে) তওবা করেছে, (কুফর থেকে তওবা করার মতলব এই যে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (গুনাহ্ থেকে তওবা করার অর্থ এই যে,) সৎকর্ম করেছে। সুতরাং তারা (অনিষ্ট না দেখেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (প্রতিদান পাওয়ার সময়) তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ প্রত্যেক সৎকর্মের প্রতিদান পাবে অর্থাৎ) চিরকাল বসবাসের জান্নাতে (যাবে), যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। তাঁর ওয়াদাকৃত বিষয়ে অবশ্যই তারা পৌঁছবে। সেখানে (জান্নাতে) তারা কোন অনর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না (কেননা সেখানে অনর্থক কথাবার্তাই হবে না। ফেরেশ্তাদের এবং একে অপরকে) সালাম (করা) ব্যতীত। (বলা বাহুল্য, সালাম দ্বারা অনেক আনন্দ ও সুখ লাভ হয়। অতএব তা অনর্থক নয়) তারা সকাল-সন্ধ্যা খানা পাবে। (এটা হবে নির্দিষ্টভাবে। এমনিতে অন্য সময়ও ইচ্ছা করলে পাবে।) এই জান্নাত (যার উল্লেখ করা

হলো) এমন যে, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ্ভীরু, তাদেরকে এর অধিকারী করব।

(আল্লাহভীরুতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلْفٌ লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরি, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরি এবং উত্তম সন্তান সন্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসময়ে অথবা জমা'আত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় গুনাহ্ ঃ আয়াতে 'নামায নষ্ট করা' বলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদের মতে সময় চলে যাওয়ার পর নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 'নামায নষ্ট করা' বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন ঃ

ان اهم امركم عندى الصلوة فمن ضيعها فهو لماسواها اضيع

আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশি নষ্ট করবে।—(মুয়াত্তা মালিক)

হযরত হুযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ ? লোকটি বলল ঃ চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা বললেন ঃ তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো —মুহাম্মদ (সা)-এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবূ মসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে 'একামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদায়, রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি ওযুতে ত্রুটি করে অথবা নামাযের রুকূ-সিজদায় তড়িঘড়ি করে, ফলে রুকূর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা) নামায নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন ঃ লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাযের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু ওঠাবসা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাযীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, نعوذ بالله من شرور انفسنا الا ماشاء الله

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ — شهوات (কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা) বলেনঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।—(কুরতুবী)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا—আরবী ভাষায় غى শব্দটি رشاد-এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غى বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক নানা রকম আযাবের সমাবেশ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে যে, যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়।—(কুরতুবী)

وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا — لغو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পাক-পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

إِلَّا سَلَامًا।—এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে।—(কুরতুবী)

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا—জান্নাতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাণ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে, যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ—এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার

কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছান্দ্যশীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এ থেকে বোঝা যায় যে, মু'মিনদের আহার দিনে দু'বার হয়—সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্বদা উপস্থিত থাকবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ —(কুরতুবী)

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿৬৪﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ۗ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿৬৫﴾ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ
ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿৬৬﴾ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ
قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿৬৭﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ
حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿৬৮﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى
الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿৬৯﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿৭০﴾ وَاِنْ
مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿৭১﴾ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ
اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿৭২﴾

---

(৬৪) (জিবরাঈল বলল ঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তার এবং আপনার পালনকর্তার বিস্মৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং তারই বন্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তার সমনাম কাউকে জানেন ? (৬৬) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব ? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না।

(৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্র সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। (৭২) অতঃপর আমি পরহিযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শানে নযূল ঃ সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হযরত জিবরাঈলের কাছে আরও বেশি বেশি অবতরণের বাসনা প্রকাশ করলে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার অনুরোধের জওয়াব জিবরাঈলের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। জওয়াব এই যে,) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত (যে কোন সময়) অবতরণ করতে পারি না। তাঁরই মালিকানাধীন যা আমাদের সামনে আছে (স্থান হোক কিংবা কাল, স্থান সম্পর্কিত হোক কিংবা কাল সম্পর্কিত) এবং (এমনিভাবে) যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে আছে। (সামনের স্থান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখমণ্ডলের সামনের স্থান, পশ্চাতের স্থান হচ্ছে তার পিঠের দিক্কার স্থান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হচ্ছে সংশিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং। সামনের কাল হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল, পশ্চাতের কাল হচ্ছে অতীতকাল এবং মধ্যবর্তীকাল হচ্ছে বর্তমানকাল) এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। (সেমতে এসব বিষয় আপনি পূর্ব থেকেই জানেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি সৃষ্টিগতভাবে ও আইনগতভাবে আজ্ঞাধীন। নিজের মতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা যখন ইচ্ছা, তখন কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারি না। প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) তিনি নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। সুতরাং (তিনি যখন এমন অধিপতি ও মালিক, তখন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি তাঁর ইবাদত (ও আনুগত্য) কর এবং (দু'একবার নয় বরং) তাঁর ইবাদতে দৃঢ় থাক। (যদি তাঁর ইবাদত না কর, তবে কি অন্যের ইবাদত করবে ?) তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান ? (অর্থাৎ তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্যও কেউ নেই। সুতরাং তাঁর ইবাদত করাই জরুরী।) (পরকালে অবিশ্বাসী) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব ? (আল্লাহ্ জওয়াব দেন যে,) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে (অনস্তিত্ব থেকে) অস্তিত্বে এনেছি এবং সে (তখন কিছুই ছিল না (এমন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা যখন সহজ, তখন দ্বিতীয়বার জীবিত করা তো আরও বেশি সহজ হবে)। সুতরাং আপনার পালনকর্তার

কসম, আমি তাদেরকে (কিয়ামতে জীবিত করে হাশরের মাঠে) সমবেত করব এবং (তাদের সাথে) শয়তানদেরকেও (যারা দুনিয়াতে তাদের সাথে থেকে তাদেরকে বিভ্রান্ত করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে, قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ (অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে এমতাবস্থায় উপস্থিত করব যে, তারা (ভয়ের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে। অতঃপর (কাফিরদের) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (যেমন ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী) তাদেরকে পৃথক করব, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক অবাধ্য (যাতে তাদেরকে অন্যদের পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেই)। অতঃপর (এই পৃথক করার কাজে কোনরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। কেননা,) আমি (স্বয়ং) তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত আছি, যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকার (অর্থাৎ প্রথমে) যোগ্য। (সুতরাং নিজ জ্ঞান দ্বারা তাদেরকে পৃথক করে প্রথমে তাদেরকে অতঃপর অন্যান্য কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এই ক্রম শুধু প্রথমে প্রবেশ করার বেলায়। এরপর সবাই সমান। জাহান্নামের অস্তিত্ব এমন সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে তা প্রত্যক্ষ করানো হবে। তবে প্রত্যক্ষ করার উপায় ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। কাফিরদেরকে প্রবেশ ও চিরকালীন আযাবের জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে এবং মু'মিনদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম এবং আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে। তারা জাহান্নামকে দেখে যখন জান্নাতে পৌঁছবে, তখন আরও বেশি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হবে।) এবং (কোন কোন পাপীকে অতিক্রমকালে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রকরণ। তাদেরকে ব্যাপক প্রত্যক্ষকরণের সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে,) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তথায় পৌঁছবে না (কেউ প্রবেশের জন্য এবং কেউ অতিক্রমের জন্য)। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা, যা (অবশ্যই) পূর্ণ হবেই। অতঃপর (এই জাহান্নাম অতিক্রম করা থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এতে মু'মিন ও কাফির সব সমান, বরং) আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নেব, যারা আল্লাহ্কে ভয় (করে বিশ্বাস স্থাপন) করত। (হয় প্রথমেই উদ্ধার করব, যেমন কামিল (ম'মিনদেরকে, না হয় কিছুকাল আযাব ভোগ করার পর উদ্ধার করব, যেমন পাপী মু'মিনদেরকে।) এবং জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) সেখানে (চিরকালের জন্য) এমতাবস্থায় ছেড়ে দেব যে, (দুঃখ ও বিষাদের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ — اصطبار শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا — سمى শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ্' তথা উপাস্য বলত ; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ্ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও

নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ্‌র নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কোন সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ্, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এস্থলে শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলীতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ এখানে والشياطين এর واو মع — (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফিরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফিরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফির ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মতলব হবে এই যে, প্রত্যেক কাফির তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না ; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হয়ে যাবে।—(কুরতুবী)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا—হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফির ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতি-বিহ্বল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ — شِيْعَة শব্দের আসল অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোন বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।—(মাযহারী)

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا — অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌঁছবে না, এমন কোন মু'মিন ও কাফির থাকবে না। এখানে পৌঁছার অর্থ প্রবেশ নয়-অতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে مرور (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে মু'মিন ও পরহিযগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবূ সুমাইয়ার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে ; যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মু'মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا বাক্যের অর্থ তাই। এই

বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আয়াতে যে ورود শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে। তাই কোন বৈপরীত্য নেই।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ
قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ط
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ
اهْتَدَوْا هُدًى ط وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾

(৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে ঃ দুই দলের মধ্যে-কোন্‌টি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উত্তম ? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁকজমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন ; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কিয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল। (৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যখন অবিশ্বাসীদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, (যেসব আয়াতে মু'মিনদের সত্যপন্থী হওয়া এবং কাফিরদের মিথ্যাচারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়,) তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলে ঃ (বল, আমাদের) দুই দলের মধ্যে (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে) মর্যাদা কার শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস কার উত্তম ? (অর্থাৎ এটা সুবিদিত যে, পারিবারিক সাজসরঞ্জাম, পরিজন ও পারিষদজনিত প্রাচুর্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ। এ দাবি বাহ্যিকভাবেই অনুধাবন করা যায়। দ্বিতীয় পারিভাষিক দাবি এই যে, দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামত ঐ ব্যক্তি পায়, যে দাতার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয়

হয়। এই দুই দাবি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরাই আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় ও প্রিয় এবং তোমরা আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত ও লাঞ্ছিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর একটি পাল্টা জওয়াব দিচ্ছেন এবং আরও একটি সত্যিকার জওয়াব দিচ্ছেন। প্রথম জওয়াব এই যে, তারা এসব কথা বলে) এবং (দেখে না যে,) আমি তাদের পূর্বে কত দলকে (ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে—যা নিশ্চিত আযাব ছিল) বিনাশ করেছি। তারা সম্পদে ও জাঁকজমকে এদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। [এতে বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় দাবিটি ভ্রান্ত। বরং কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে পার্থিব নিয়ামত অপছন্দনীয় ও অভিশপ্তকেও দেয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হচ্ছে এই যে, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি] বলুনঃ যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, (অর্থাৎ তোমরা) আল্লাহ্ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন (অর্থাৎ পার্থিব নিয়ামতের রহস্য হচ্ছে শিথিলতা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা, যেমন অন্য আয়াতে আছে أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ—এই আবকাশ ক্ষণস্থায়ী)। অবশেষে যে বিষয়ের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে, তা যখন তারা দেখে নেবে—আযাব হোক (দুনিয়াতে) অথবা কিয়ামত হোক (পরকালে), তখন তারা জানতে পারবে যে, কে মর্তবায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে দুর্বল (অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে পারিষদবর্গকে সাহায্যকারী মনে করে এবং গর্ব করে। সেখানে জানতে পারবে যে, তাদের শক্তি কতটুকু। কেননা, সেখানে কারও কোন শক্তি থাকবেই না। একেই أَضْعَفُ বলা হয়েছে।) এবং (মুসলমানদের অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা পথপ্রাপ্তদের পথপ্রাপ্তি (দুনিয়াতে) বৃদ্ধি করেন (অর্থাৎ এটাই আসল সম্পদ। এর সাথে ধন-দৌলত না থাকলেও ক্ষতি নেই।) এবং (পরকালে প্রকাশ পাবে যে,) স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামেও উত্তম। (অতএব তারা সওয়াব হিসেবে বড় বড় নিয়ামত পাবে। তন্মধ্যে গৃহ, বাগবাগিচা সবই থাকবে। এসব সৎ কর্মের পরিণাম হচ্ছে অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব। সুতরাং মুসলমানদেরই শেষ অবস্থা গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে উত্তম হবে। বলা বাহুল্য, শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا—এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফিররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। এক. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং দুই. চাকর—নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের কাছে বেশি ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না ; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত

নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফিল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সুলায়মান (আ), হযরত দাউদ (আ) অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ্‌ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফিরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্ধজনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশি ধন-দৌলত স্তূপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য ? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا

باقيات صالحات-এর তফসীর সম্পর্কে নানাজনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহ্‌ফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে باقيات صالحات বলে যেসব ইবাদত ও সৎকর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বোঝানো হয়েছে। مردا শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মই আসল সম্পদ। সৎকর্মের সওয়াব বিরাট এবং পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

(৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে ঃ আমাকে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে ? (৭৯) এ তো নয় ঠিক সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (৮১) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ) আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে (তন্মধ্যে পুনরুত্থানের নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয ছিল) বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং (ঠাট্টার ছলে) বলে ঃ আমাকে পরকালে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে। (উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তির অবস্থাও আশ্চর্যজনক। অতঃপর খণ্ডন করা হচ্ছে ঃ) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে অথবা সে কি আল্লাহ্র কাছ থেকে (এ বিষয়ে) কোন অঙ্গীকার লাভ করেছে ? (অর্থাৎ এ দাবি সম্পর্কে সে কি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করেছে, যা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের নামান্তর, নাকি পরোক্ষভাবে জানতে পেরেছে ? এ দাবিটি যেহেতু যুক্তিভিত্তিক নয় ; বরং বর্ণনাশ্রয়ী, তাই বর্ণনাশ্রয়ী প্রমাণই অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনাই এর প্রমাণ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ বর্ণনা করেননি। কাজেই দাবিটি সম্পূর্ণ অবান্তর।) কখনই নয় (সে মিথ্যা বলে), সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং (যথাসময়ে এরূপ শাস্তি দেব যে,) তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব (অর্থাৎ সে তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। আমিই সব কিছুর মালিক হব এবং কিয়ামতে আমি তাকে দেব না ; বরং) সে আমার কাছে (ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি ছেড়ে) একাকী আসবে। তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে তাদের জন্য তারা আল্লাহ্র কাছে) সম্মান লাভের কারণ হয়। (যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে— يَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ অতএব এরূপ) কখনই নয় (বরং) তারা তো (কিয়ামতে স্বয়ং) তাদের ইবাদতই অস্বীকার করে বসবে (যেমন সূরা ইউনুসের তৃতীয় রুকূতে বর্ণিত হয়েছে, قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ—) এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (কথায়ও, যেমন বর্ণিত হলো এবং অবস্থায়ও তা'ই হবে। অর্থাৎ সম্মানের পরিবর্তে অপমানের কারণ হয়ে যাবে। এসব উপাস্যের মধ্যে প্রতিমাও থাকবে। সুতরাং তাদের কথা বলা যেমন يَكْفُرُوْنَ শব্দের দ্বারা বোঝা যায়, অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা বলার অনুরূপ অসম্ভব নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا—বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরতের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফিরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল ঃ তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব জওয়াব দিলেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল ঃ ভাল তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব ? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। —(কুরতুবী)

কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফিরের জওয়াবে বলেছে ঃ সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনর্বার জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি থাকবে ? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে ? أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا অথবা সে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? বলা বাহুল্য, এরূপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে ? وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ—(অর্থাৎ সে যে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে।

وَيَأْتِينَا فَرْدًا—কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত। وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا—(অর্থাৎ এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফিররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ্ এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا

نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَّنَسُوقُ

الْمُجْرِمِينَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ

اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

(৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তারাহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহিযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব, (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনি যে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে দুঃখ করেন তখন) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি শয়তানদেরকে কাফিরদের উপর (পরীক্ষার্থে) ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে (কুফর ও পথভ্রষ্টতায়) খুব উৎসাহিত করে। (এমতাবস্থায় যারা স্বেচ্ছায় তাদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়, তাদের জন্য দুঃখ কিসের ?) আপনি তাঁদের জন্য তাড়াহুড়া (করে আযাবের দরখাস্ত) করবেন না। আমি স্বয়ং তাদের (শাস্তিযোগ্য) বিষয়াদি গণনা করছি। (তাদের এই শাস্তি ঐ দিন হবে) যেদিন আমি পরহিযগারদেরকে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে অতিথিরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (তাদের কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। কেননা সেখানে) কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না ; কিন্তু যে, দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেছে। (তারা হচ্ছেন পয়গম্বর ও সৎ কর্মপরায়ণ মনীষীবৃন্দ। আর অনুমতি একমাত্র ঈমানদারদের জন্যই হবে। সুতরাং কাফিররা সুপারিশের পাত্র হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تَؤُزُّهُمْ اَزًّا —আরবী অভিধানে حَضٌّ - فَزٌّ - اَزٌّ - هَزٌّ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। اَزٌّ শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফিরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا —(উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعُدُّ لَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বল্গাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার

এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আরয করলেন ঃ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন ঃ

حياتك انفاس تعد فكلما
مضى نفس منك انتقص به جزء

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। —(কুরতুবী) জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

وكيف يفرح بالدنيا ولذتها
فتى يعد عليه اللفظ والنفس

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে। —(রূহুল মা'আনী)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا যারা বাদশাহ্ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে ঃ তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদের সৎ কর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। —(রূহুল মা'আনী, কুরতুবী)

اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا — ورد-এর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وِرْدًا এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা হলো।

مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا —হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ عهد (অঙ্গীকার) বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন ঃ عهد বলে কোরআনের হিফ্য বোঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে। —(রূহুল মা'আনী)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ
إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدًا ﴿٩٣﴾ لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ
فَرۡدًا ﴿٩٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ
وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ
قَوۡمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم مِّنۡ
أَحَدٍ أَوۡ تَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكۡزَۢا ﴿٩٨﴾

(৮৮) তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহ্র জন্য সন্তান আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। (৯৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহিযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পান ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কাফিররা) বলে ঃ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান (ও) গ্রহণ করে রেখেছেন (সেমতে বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান অল্পসংখ্যক ইহুদী এবং আরবীয় মুশরিকরা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) তোমরা (এ কথা বলে) গুরুতর কাণ্ড করেছ। এর কারণে হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে পড়বে ; কারণ তারা আল্লাহ্র সাথে সন্তানকে সম্বন্ধযুক্ত করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য শোভনীয় নয়। (কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে

যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে গোলাম হয়ে উপস্থিত হয় (এবং) তিনি সবাইকে স্বীয় কুদরত দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং (স্বীয় জ্ঞান দ্বারা) সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। (এ হলো তাদের বর্তমান অবস্থা) এবং কিয়ামতের দিন সবাই তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে। (প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'আলারই মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ হবে। সুতরাং আল্লাহ্র সন্তান থাকলে আল্লাহ্র মতই "সদাসর্বদা বিদ্যমান" গুনে গুণান্বিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বব্যাপী কুদরত ও সর্বব্যাপী জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র সিফাত এবং মুখাপেক্ষিতা ও আনুগত্য হচ্ছে অন্যের সিফাত। এগুলো একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং এই বিপরীত গুণের একত্র সমাবেশ কিরূপে হতে পারে ?)

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তা'আলা(তাদেরকে উল্লিখিত পারলৌকিক নিয়ামত ছাড়া দুনিয়াতে এই নিয়ামত দেবেন যে,) তাদের জন্য (সৃষ্ট জীবের অন্তরে) ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সুতরাং আপনি তাদেরকে এই সুসংবাদ দিন। কেননা) আমি এই কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা আল্লাহ্-ভীরুদেরকে সুসংবাদ দেন এবং তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (সতর্কীকরণের বিষয়াদির মধ্যে জাগতিক শাস্তির একটি বিষয়বস্তু এও যে) আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। (অতএব) আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকে দেখেন, অথবা কারও কোন ক্ষীণতম শব্দও শোনেন ? (এখানে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কাফিররা এই জাগতিক শাস্তিরও যোগ্য। যদিও কোন উপকারিতার কারণে কোন কাফিরের উপর এই শাস্তি পতিত হয়নি ; কিন্তু আশংকার যোগ্য তো অবশ্যই।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ নামের তসবীহ পাঠ করে, যেমন কোরআন বলে ঃ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তন করে না,—এমন কোন বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষত আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্ট বস্তু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। —(রূহুল মা'আনী)

وَعَدَّهُمْ عَدًّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহ্র কাছে গণনাকৃত। এতে কমবেশি হতে পারে না।

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালাবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্ট জীবের মনেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে এ কথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا। (রূহুল মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন।—(কুরতুবী)

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন ঃ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ হে আল্লাহ্, আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا—বোধগম্য নয়—এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكْز বলা হয় ; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ্ তা'আলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

سُوْرَةُ طٰهٰ

সূরা তোয়া-হা

মক্কায় অবতীর্ণ, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকূ

এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম-ও (كما ذكر السخاوى)। কারণ এতে হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ (আ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদে দারেমীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে সূরা তোয়া-হা ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করেন। (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে শোনান), তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন ঃ ঐ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; ঐ বক্ষ পুণ্যবান, যারা এগুলো হিফ্য করবে এবং ঐ মুখ অপরিসীম সৌভাগ্যশালী, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনকারী উমর ইবনুল খাত্তাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। সীরাত গ্রন্থাদিতে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত।

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, উমর ইবনে খাত্তাব একদিন খোলা তরবারি হস্তে মহানবী (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে নুআয়ম ইবনে আবদুল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাচ্ছেন ? উমর ইবনে খাত্তাব বললেন ঃ আমি ঐ পথভ্রষ্ট ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দীন ও মাযহাবের নিন্দা করে তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে এবং তাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলেছে। নুআয়ম বলল ঃ উমর, তুমি মারাত্মক ধোঁকায় পতিত আছ। তুমি কি মনে কর যে, তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবে আর তাঁর গোত্র বনী আবদে-মনাফ তোমাকে পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার জন্য জীবিত ছেড়ে দেবে ? তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, তবে প্রথমে তোমার ভগিনী ও ভগ্নিপতির খবর নাও। তারা মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছে। কথাটি উমরের মনে দাগ কাটল। তিনি সেখান থেকেই ভগ্নিপতির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর গৃহে তখন সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত স্বামী-স্ত্রীকে সহীফায় লিখিত কোরআন পাকের সূরা তোয়া-হা পাঠ করাচ্ছিলেন।

উমর ইবনে খাত্তাবের আগমন টের পেয়ে হযরত খাব্বাব গৃহের এক কক্ষে অথবা কোণে আত্মগোপন করলেন। ভগিনী তাড়াতাড়ি সহীফাটি উরুর নিচে লুকিয়ে ফেললেন।

কিন্তু তাতে কি হয়, উমরের কানে খাব্বাবের এবং তাদের তিলাওয়াতের আওয়াজ পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই পড়া ও পড়ানোর আওয়াজ কিসের ছিল ? ভগিনী (বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে বললেন ঃ) ও কিছু না। কিন্তু উমর ইবনে খাত্তাব আসল কথা ব্যক্ত করে বললেন ঃ আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা উভয়েই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ভগিনী স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টিত হলেন। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁকেও প্রহারের পর প্রহার করে দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন।

ব্যাপার এতদূর গড়াতে দেখে ভগিনী ও ভগ্নিপতি উভয়েই একযোগে বলে উঠলেন ঃ শুনে নাও, আমরা নিশ্চিতই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন তুমি যা করতে পার, কর। ভগিনীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। এ অবস্থা দেখে উমর কিছুটা অনুতপ্ত হলেন এবং বোনকে বললেন ঃ সহীফাটি আমাকে দেখাও যা তোমরা পড়ছিলে ; এতে মুহাম্মদ কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা আমিও দেখি। উমর ইবনে খাত্তাব লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ছিলেন, তাই সহীফা দেখার জন্য চাইলেন। ভগিনী বললেন ঃ আমরা আশংকা করি যে, সহীফাটি তোমার হাতে দিলে তুমি একে নষ্ট করে দেবে অথবা এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর উপাস্য দেবদেবীর কসম খেয়ে বললেন ঃ তোমরা ভয় করো না, আমি সহীফাটি পড়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেব। ভগিনী ফাতিমা এই ভাবগতিক দেখে কিছুটা আশান্বিত হলেন যে, বোধ হয় উমরও মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ ভাই, ব্যাপার এই যে, তুমি অপবিত্র। এই সহীফা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি দেখতেই চাও, তবে গোসল করে নাও। উমর গোসল করলে সহীফা তাঁর হাতে দেওয়া হলো। সহীফায় সূরা তোয়া-হা লিখিত ছিল। প্রথম অংশ পড়েই উমর বললেন ঃ এই কালাম তো খুবই উৎকৃষ্ট ও সম্মানার্হ। খাব্বাব ইবনে আরত গৃহে আত্মগোপনরত অবস্থায় এসব কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। উমরের এ বাক্য শুনেই তিনি সামনে এসে গেলেন এবং বললেন ঃ হে উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ্র রহমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের দোয়ার ফলশ্রুতিতে তোমাকে মনোনীত করেছেন। গতকাল আমি প্রিয় নবী (সা)-কে এরূপ দোয়া করতে শুনেছি ঃ اللهم ايد الاسلام بابى الحكم بن هشام او بعمر بن الخطاب। হে আল্লাহ্, হয় আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবূ জেহেল)-এর মাধ্যমে না হয় উমর ইবনে খাত্তাবের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তি দান করুন। উদ্দেশ্য এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মুসলমান হোক। এতে মুসলমানদের দলে নতুন প্রাণ ও নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাব্বাব বললেন ঃ হে উমর, তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করো না। উমর বললেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে চল। (কুরতুবী)-এর পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

طٰهٰ ﴿١﴾ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ﴿٧﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ﴿٨﴾

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্যে আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্যে, যারা ভয় করে। (৪) এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (৬) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। (৭) যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। (৮) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোয়া-হা (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। আমি আপনার প্রতি কোরআন (পাক) এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্ট করবেন ; বরং এমন ব্যক্তির উপদেশের জন্য (অবতীর্ণ করেছি), যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে। এটা তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন (এবং) তিনি পরম দয়াময়, আরশের উপর (যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ) সমাসীন (ও বিরাজমান) আছেন (যেভাবে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। তিনি এমন যে) তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আছে (অর্থাৎ আকাশের নিচে ও ভূমণ্ডলের উপরে) এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে; (অর্থাৎ ভূগর্ভের সিক্ত মাটি, যাকে ثرى বলা হয়, তার নিচে যা আছে। উদ্দেশ্য এই যে ভূগর্ভের গভীরে যা কিছু আছে। এটা তো হলো আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও আধিপত্য।) আর (জ্ঞানের পরিধি এই যে) যদি তুমি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) চিৎকার করে কথা বল, তবে (তা শোনার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই-ই) তিনি (এমন যে)

গোপনভাবে বলা কথা (বরং) তদপেক্ষাও গোপন কথা (অর্থাৎ যা এখনও মনে মনে আছে) জানেন। (তিনি) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর খুব ভাল ভাল নাম আছে। এগুলো তাঁর গুণগরিমা বোঝায়। সুতরাং কোরআন এমন সর্বগুণে গুণান্বিত সত্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং নিশ্চিত সত্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طٰهٰ এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ يَارَجُلُ (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে উমর থেকে يَاحَبِيْبِىْ (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, طٰهٰ ও يٰسٓ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও বিশিষ্ট আলিমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন: কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الٓمٓ এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো متشابهات অর্থাৎ গোপন ভেদ, যার মর্ম আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। طٰهٰ শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى — لِتَشْقٰٓى শব্দটি شَقَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কোরআন অবতরণের সূচনাভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পা ফুলে যায়। কাফিররা কোন রকমে হিদায়েত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবূল করুক তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে: আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কোরআন অবতীর্ণ করি নি। সারারাত জাগ্রত থাকা এক কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবূল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। —(কুরতুবী- সংক্ষেপিত)

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى—ইবনে কাসীর বলেন: কোরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোন কোন কাফির মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন তো নয়-সাক্ষাৎ বিপদ নাযিল হয়েছে; রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর; হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কোরআন ও কোরআনের মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান মঙ্গলই মঙ্গল এবং সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর ও নির্বোধ। হযরত মুআবিয়ার বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে ধর্মের জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে কাসীর অপর একটি সহীহ্ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলিম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله للعلماء يوم القيامة اذا قعد على كرسيه لقضاء عباده انى لم اجعل علمى وحكمتى فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ماكان منكم ولا ابالى -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্য তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলিমগণকে বলবেন ঃ আমি আমার ইল্ম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গুনাহ্ ও ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরওয়া করি না।'

কিন্তু এখানে সেসব আলিমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বর্ণিত ইল্মের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لِمَنْ يَّخْشٰى শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى — استواء على العرش (আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণের থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারও জানা নেই। এটা متشابهات তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ্র শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى —আর্দ্র ও ভেজা মাটিকে ثَرٰى বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নিচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ثَرٰى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নিচে কি আছে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও আক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে ; কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এর নিচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে ; অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى — মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سر পক্ষান্তরে اخفى বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই

জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ﴿٩﴾ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي
آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا
أَتٰىهَا نُودِيَ يٰمُوسٰى ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ﴿١٣﴾ إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ
لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۙ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ
لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

(৯) আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি ? (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন তখন পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব। (১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন আওয়াজ আসল, হে মূসা, (১২) আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তোয়ায় রয়েছ। (১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক। (১৪) আমিই আল্লাহ্ আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। (১৫) কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই ; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি ? (অর্থাৎ তা শ্রবণযোগ্য; কেননা তাতে তওহীদ ও নবুয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান নিহিত আছে। সেগুলো প্রচার করলে উপকার হবে। বৃত্তান্ত এই ঃ) যখন তিনি (মাদইয়ান থেকে ফেরার পথে এক প্রবল শীতের

রাতে পথ ভুলে তূর পর্বতের উপর) আগুন দেখলেন (বাস্তবে সেটা ছিল আগুনের আকারে নূর), তখন তিনি পরিবারবর্গকে (পরিবার বলতে একমাত্র স্ত্রী ছিল অথবা খাদিম ইত্যাদিও ছিল) বললেন ঃ তোমরা (এখানেই) অবস্থান কর (অর্থাৎ আমার পেছনে পেছনে এসো না। কেননা পরিবারবর্গকে ছেড়ে তিনি চলে যাবেন—এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না।) আমি একটি আগুন দেখেছি। (আমি সেখানে যাচ্ছি) সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন (লাকড়ী ইত্যাদিতে লাগিয়ে) আনতে পারব (যাতে শীতের প্রতিকার হয়) অথবা (সেখানে) আগুনের কাছে পৌঁছে পথের সন্ধান (জানে, এমন ব্যক্তিও) পাব। অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে) আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা, আমি তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল। (কেননা,) তুমি পবিত্র "তোয়া" উপত্যকায় আছ। (এটা সে উপত্যকার নাম)।) আমি তোমাকে (নবী করার জন্য সব মানুষের মধ্য থেকে) মনোনীত করেছি। অতএব (এখন) যা ওহী করা হচ্ছে, তা (মনোযোগ দিয়ে) শুনতে থাক। (তা এই যে) আমি আল্লাহ্। আমা ব্যতীত কোন উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। অতএব আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায পড়। (আরও শুন যে) কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তা (সৃষ্টজগতের কাছে) গোপন রাখতে চাই।— (কিয়ামত আসার কারণ এই যে,) যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। (কিয়ামতের আগমন যখন নিশ্চিত, তখন যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে (অর্থাৎ কিয়ামতের জন্য প্রস্তুত থাকতে) বিরত না রাখে (অর্থাৎ তুমি এরূপ ব্যক্তির প্রভাবাধীন হয়ে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নিবৃত্ত হয়ো না।) তা হলে তুমি (এই নিবৃত্তির কারণে) ধ্বংস হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী (সা)-এর জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ — অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত মূসা (আ)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শুআয়ব (আ)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করবেন। তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতের রেওয়ায়েত

অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শুআয়ব (আ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ এখন আমি জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফিরাউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোঁজ করছিল। এ আশংকার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশংকা বাকি ছিল না। শুআয়ব (আ) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকা ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল ! স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্বা এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোন সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডানদিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ-মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। মূসা (আ) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চকমাকি পাথর ব্যবহার করা হতো। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে ওঠত। মূসা (আ) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবত আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবার বর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর-সঙ্গীও ছিল ; কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। —(বাহ্‌রে মুহীত)

فَلَمَّا أَتَاهَا __অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন; মুসনাদে আহ্‌মদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ) আগুনের কাছে পৌঁছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোন ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না ; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে। মূসা (আ) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হলো না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলা বাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়েবী আওয়াজ হলো। (রূহুল

মা'আনী) মূসা (আ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তোয়া'।

نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ — বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আ) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোন দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে ; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জিযার মতই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়—আল্লাহ্ তা'আলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা। হযরত মূসা (আ) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই আওয়াজ ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই আওয়াজ। এছাড়া মূসা (আ) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসে নি ; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়—হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরীক আছে; এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ্ তা'আলারই।

মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন ঃ রূহুল-মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, মূসা (আ)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বায়েক (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন ? উত্তরে বলা হলো ঃ আমি তোমার উপরে, সামনে পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর মূসা (আ) আরয করলেন ঃ আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশ্‌তার কথা শুনছি ? জওয়াব হলো ঃ আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ এ থেকে জানা যায় যে, মূসা (আ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আতের মধ্যে একদল আলিম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এরজন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মূসা (আ) কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে এ কালাম শোনেন নি এবং শুধু কানেই শোনেন নি, বরং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

সম্ভ্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব ঃ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মূসা (আ)-এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে

জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে মূসা (আ)-এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক—এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন ঃ বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন ঃ اذا كنت فى مثل هذا المكان فاخلع نعليك অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।

জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফিকাহ্বিদদের মতে জায়েয। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামায পড়া প্রমাণিতও রয়েছে ; কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামায পড়া হতো। কারণ এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী। —(কুরতুবী)

اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى—আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন ; যেমন বায়তুল্লাহ্, মসজিদে-আকসা ও মসজিদে-নববী। তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। —(কুরতুবী)

কোরআন শ্রবণের আদব ঃ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কোরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোন অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না। দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদবসহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা বোঝারও তওফীক দান করেন। —(কুরতুবী)

اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ এই কালামে হযরত মূসা (আ)-কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ; অর্থাৎ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى বলে রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِىْ -এর অর্থ শুধু আমার ইবাদত কর–আমা ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। এটা তওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ বলে পরকাল বর্ণনা করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِىْ এই নির্দেশে নামাযের কথাও রয়েছে ; কিন্তু নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামায সমস্ত ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামায ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামায বর্জন কাফিরদের আলামত।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ্র স্মরণ। নামায আদ্যোপান্ত যিকরই যিকর—মুখে অন্তকরণে এবং সর্বাঙ্গে যিকর। তাই নামাযে যিকর তথা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল হওয়া উচিত নয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِىْ শব্দের এক অর্থ এরূপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোন কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাযের কথা ভুলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাজের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামায পড়ে নিতে হবে। اَكَادُ اُخْفِيْهَا অর্থাৎ

কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই ; এমনকি পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও। أَكَادُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে—একথাও প্রকাশ করতাম না।

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ—(যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যায়)। এই বাক্যটি آتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎ কর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়—একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি أَكَادُ أُخْفِيهَا এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফিল না হোক।—(রূহুল-মা'আনী)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا এতে হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তুমি কাফির ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিয়ো না। তা'হলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, নবী ও পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার আশংকা নেই। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ)-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহ্র পয়গম্বরগণকেও যখন এমনভাবে তাকীদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا۟ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِىَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَٰمُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَٰتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾

(১৭) হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি ? (১৮) তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে

ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (১৯) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। (২০) অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২১) আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শনরূপে ; কোন দোষ ছাড়াই। (২৩) এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। (২৪) ফিরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে আরও বললেন ঃ] হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি ? তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি (কোন সময়) এর উপর ভর দেই এবং (কোন সময়) এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য (বৃক্ষের) পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (উদাহরণত কাঁধে রেখে আসবাবপত্র ঝুলিয়ে নেওয়া, এর সাহায্যে ইতর প্রাণীদেরকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি)। আল্লাহ্ বললেন ঃ একে (অর্থাৎ লাঠিকে) মাটিতে নিক্ষেপ কর হে মূসা। অতঃপর তিনি তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা (আল্লাহ্র কুদরতে) একটি সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। [এতে মূসা (আ) ভীত হয়ে পড়লেন]। আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি একে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি (অর্থাৎ ধরতেই) একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (অর্থাৎ এটা আবার লাঠি হয়ে যাবে এবং তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। এ হচ্ছে এক মু'জিযা।) এবং (দ্বিতীয় মু'জিযা এই দেওয়া হচ্ছে যে) তুমি তোমার (ডান) হাত (বাম) বগলে রাখ (এরপর বের কর) সেটা নির্দোষ (অর্থাৎ কোন ধবলকুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই) উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে (আমার কুদরত ও তোমার নবুয়তের) অন্য এক নিদর্শনরূপে। (লাঠি নিক্ষেপ করা ও হাত বগলে দেওয়ার নির্দেশ এজন্য) যাতে আমি আমার (কুদরতের) বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। (অতএব এখন এসব নিদর্শন নিয়ে) ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব সীমালঙ্ঘন করেছে—(খোদায়ী দাবি করে। তুমি তার কাছে তওহীদ প্রচার কর। তোমার নবুয়তে সন্দেহ করলে এসব মু'জিযা দেখিয়ে দাও)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى তোমার হাতে ওটা কি ? —আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মূসা (আ)-কে এরূপ জিজ্ঞেস করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানীতে সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও আল্লাহ্র কালাম শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জিযা প্রদর্শন

করা হলো। নতুবা মূসা (আ)-এর মনে এরূপ ধারণার সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَالَ هِيَ عَصَايَ মূসা (আ)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি ? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মূসা (আ) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরও তিনটি বিষয় আরয করেছেন। এক এই লাঠি আমার, দুই. আমি একে অনেক কাজে লাগাই ; প্রথমত এর উপর ভর দেই ; দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং তিন. এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে ইশ্‌ক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশ্‌ক ও মহব্বতের দাবি এই যে, প্রেমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ —অর্থাৎ আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেইসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি।—(রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

তফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েয।

মাসআলা ঃ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গম্বরগণের সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরও এই সুন্নাত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে।—(কুরতুবী)

فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ হযরত মূসা (আ)-এর হাতের লাঠি আল্লাহ্‌র নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে, كَأَنَّهَا جَانٌّ আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَانٌ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। এসব আয়াতের পারস্পারিক বিরোধ নিরসন এভাবে সম্ভবপর যে, সাপটি শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল ; কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু মূসা (আ)-এর এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে একে جَانٌ অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে, كَأَنَّهَا শব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ, এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে جَانٌّ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। —(মাযহারী)

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ — جَنَاحٌ আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নিচে হাত রেখে যখন বের করবে তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে تَخْرُجْ بَيْضَاءَ এর এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ—স্বীয় রাসূলকে দু'টি বিরাট মু'জিযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য চলে যাও।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

---

(২৫) মূসা বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৬) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন— (৩০) আমার ভাই হারূনকে। (৩১) তাঁর মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন (৩২) এবং তাঁকে আমার কাজে অংশীদার করুন (৩৩) যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। (৩৪) এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মূসা (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে পয়গম্বর করে ফিরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করা হচ্ছে, তখন এই গুরুদায়িত্বের কঠিন কর্তব্যাদি সহজ করার জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন এবং] বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ (মনোবল আরও বেশি) প্রশস্ত করে দিন (যাতে প্রচারকার্যে হীনমন্যতা অথবা বিরোধিতায় সংকোচবোধ না করি) এবং আমার (এই প্রচারের) কাজ সহজ করে দিন, (যাতে প্রচারের উপকরণাদি সংগৃহীত এবং বাধাবিপত্তি দূর হয়ে যায়) এবং আমার জিহবা থেকে (তোতলামির) জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন সহকারী নিযুক্ত করুন অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে। তাঁর মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাঁকে আমার (এই প্রচারের) কাজে শরীক করুন (অর্থাৎ তাঁকেও পয়গম্বর করে প্রচারকার্যের

আদেশ করুন, যাতে আমরা উভয়েই প্রচার কাজ পরিচালনা করতে পারি এবং আমার অন্তর শক্তিশালী হয়।) যাতে আমরা উভয়েই (প্রচার ও দাওয়াতের সময়) বেশি পরিমাণে (শিরক ও দোষত্রুটি থেকে) আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং আপনার (গুণাবলীর) প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করতে পারি। (কারণ, প্রচারক দু'জন হয়ে গেলে প্রত্যেকের বর্ণনা অপরের সমর্থনে পর্যাপ্ত হয়ে যাবে)। নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে (এবং আমাদের অবস্থা) সম্যক অবলোকন করছেন। (এ অবস্থাদৃষ্টে আমাদের একে অপরের সাহায্যকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আপনার খুব জানা রয়েছে)। আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তোমার (প্রত্যেকটি) প্রার্থনা (যা رَبِّ اشْرَحْ لِيْ থেকে বর্ণিত হয়েছে) মঞ্জুর করা হলো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্র কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই দ্বারস্থ হলেন। কারণ, তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া رَبِّ اشْرَحْ لِيْ অর্থাৎ আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যে, নবুয়তের জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ (অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন।) এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ্ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্র কাছে এভাবে দোয়া করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِنَافِيْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ -

(অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ)।

তৃতীয় দোয়া وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ -(অর্থাৎ আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ) দুগ্ধ পান করার যমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফিরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফিরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন

শিশু মূসা (আ) ফিরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফিরাউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফিরাউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেন ঃ রাজাধিরাজ ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল ও মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফিরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্য আছিয়া একটি বাসনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অপর একটি বাসনে মণিমুক্তা এনে মূসা (আ)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফিরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে, কিন্তু এখানে সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহ্‌র ভাবী রাসূল ছিলেন, যাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মূসা (আ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন; কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বাসনে রেখে দিলেন এবং মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহবা পুড়ে গেল। এতে ফিরাউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আ)-এর এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয় ; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই মূসা (আ)-এর জিহবায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে একেই عُقْدَة বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই মূসা (আ) দোয়া করেন। —(মাযহারী, কুরতুবী)

প্রথমোক্ত দোয়া দুটি সকল কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে ; কারণ রিসালত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ)-এর সব দোয়া কবূল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্‌বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং মূসা (আ) হযরত হারুন (আ)-কে রিসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا অর্থাৎ হারুন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামির প্রভাব কিছুটা বাকি ছিল। এছাড়া ফিরাউন হযরত মূসা (আ)-এর চরিত্রে যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَكَادُ يُبِينُ —অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যক্ত করতে পারে না। কোন কোন আলিম এর উত্তরে বলেন ঃ হযরত মূসা (আ) স্বয়ং তাঁর দোয়ায় জিহবার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বাকি থাকলে তা দোয়া কবূল হওয়ার পরিপন্থী নয়।

চতুর্থ দোয়া وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي অর্থাৎ আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উজির করুন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রিসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক

রাখে। হযরত মূসা (আ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজির তার বাদশাহ্র বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আ)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোন সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ; পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজ কালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্র প্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা, দুষ্কর্ম ও আযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাঁকে সাহায্য করেন।—(নাসায়ী)

এই দোয়ায় হযরত মূসা (আ) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে مِّنْ اَهْلِیْ কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। কেননা, পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মিল-মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায় ; তবে তার মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চাইতে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোন শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোন সৎকর্মপরায়ণ আত্মীয়কে কোন উচ্চপদ দান করা দোষের কথা নয় ; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর খুলাফায়ে রাশিদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছেন, যাঁরা নবী-পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

মূসা (আ) তার দোয়ায় প্রথমে তো অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, সে আমার ভাই হারূন–যাতে রিসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আ) হযরত মূসা (আ) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। মূসা (আ) যখন এই দোয়া করেন তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মূসা (আ)-কে যখন মিসরে ফিরাউনের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হারূন

(আ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। —(কুরতুবী)

وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ হযরত মূসা (আ) হারূন (আ)-কে নিজের উজির করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু বরকতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুয়ত ও রিসালতে শরীক করতেও চাইলেন। কোন নবী ও রাসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্য পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসালতে অংশীদার করে দিন। পরিশেষে বলেছেন ঃ

সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিক্‌র ও ইবাদতেও সাহায্যকারী হয় ঃ كَیْ نُسَبِّحَكَ كَثِیْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِیْرًا অর্থাৎ হযরত হারূনকে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার যিক্‌র ও পবিত্রতা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তসবীহ্ ও যিকর মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তসবীহ্ ও যিকরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহ্‌ভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহ্‌ভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহ্‌ভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকরে মশগুল থাকতে চায়, তার উপযুক্ত পরিবেশও তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হলো। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবূল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে। قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُؤْلَكَ یٰمُوْسٰى অর্থাৎ হে মূসা, তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হলো।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَیْكَ مَرَّةً اُخْرٰىٓ ﴿٣٧﴾ اِذْ اَوْحَیْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا یُوْحٰىٓ ﴿٣٨﴾
اَنِ اقْذِفِیْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِیْهِ فِى الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ
یَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ۬ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى
عَیْنِىْٓ ﴿٣٩﴾ اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ یَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ
اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۬ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّیْنٰكَ مِنَ
الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۬ ۫ فَلَبِثْتَ سِنِیْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْیَنَ ۬ ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى

قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ﴿٤١﴾ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ﴿٤٢﴾ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

(৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাতাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে (৩৯) যে, তুমি তাঁকে (মূসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাঁকে তীরে ঠেলে দেবে। তাঁকে আমার শত্রু ও তাঁর শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাঁকে লালন-পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই ; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে ; হে মূসা! অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। (৪৪) অতঃপর তোমরা তাঁকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তো আরও একবার (অনুরোধ ছাড়াই) তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, যখন আমি তোমার মাতাকে সেই ইলহাম করেছিলাম, যা (গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে) ইলহাম দ্বারা বলার (যোগ্য) ছিল। (তা) এই যে, মূসাকে (জল্লাদদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তাকে (সিন্দুকসহ) দরিয়ায় (যার একটি শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত গিয়েছিল) ভাসিয়ে দাও। এরপর দরিয়া তাকে (সিন্দুকসহ) তীরে নিয়ে আসবে। (অবশেষে) তাকে এমন এক ব্যক্তি ধরবে, যে (কাফির হওয়ার কারণে) আমার শত্রু এবং তারও শত্রু (হয় তো উপস্থিত কালেই ; কারণ সে সব পুত্র সন্তানকে হত্যা করত অথবা ভবিষ্যতে তার বিশেষ শত্রু হবে।) এবং (যখন সিন্দুক ধরা হলো এবং তোমাকে তা থেকে বের করা হলো, তখন) আমি তোমার (মুখমণ্ডলের) উপর নিজের পক্ষ থেকে মায়ামমতার চিহ্ন ফুটিয়ে তুললাম (যাতে তোমাকে যে-ই দেখে, সে-ই আদর করে) এবং যাতে তুমি আমার (বিশেষ) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হও। (এটা তখনকার কথা,)

যখন তোমার ভগিনী (তোমার খোঁজে ফিরাউনের গৃহে) হেঁটে আসল, অতঃপর (তোমাকে দেখে অপরিচিতা হয়ে) বলল : (যখন তুমি কোন ধাত্রীর দুধ পান করছিলে না) আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলে দেব, যে তাকে (উত্তমরূপে) লালন-পালন করবে? (সেমতে তারা যেহেতু এমন ব্যক্তি তালাশ করছিল তাই তার কথা মঞ্জুর করল। এবং তোমার ভগিনী তোমার মাতাকে ডেকে আনল।) অতঃপর (এই কৌশলে) আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে আবার পৌঁছিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তার কোন দুঃখ না থাকে (যেমন বিচ্ছেদের কারণে সে কিছুকাল দুঃখিতা ছিল।) এবং বড় হওয়ার পর আরও একটি অনুগ্রহ করেছি যে,) তুমি ভুলক্রমে এক (কিবতী) ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে (সূরা কাসাসে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হত্যার পর তুমি চিন্তিত হয়েছিলে—শাস্তির ভয়েও এবং প্রতিশোধের ভয়েও) অতঃপর আমি তোমাকে এই চিন্তা থেকে মুক্তি দেই (ক্ষমা প্রার্থনার তওফীক দিয়ে শাস্তির ভয় থেকে এবং মিসর থেকে মাদইয়ানে পৌঁছিয়ে প্রতিশোধের ভয় থেকে মুক্তি দেই) এবং (মাদইয়ান পৌঁছা পর্যন্ত) আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি (এবং সেগুলোতে উত্তীর্ণ করেছি। সূরা কাসাসে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা যেমন অনুগ্রহ, তেমনি পরীক্ষায় ফেলাও অনুগ্রহ ; কারণ, এটা উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট নৈপুণ্য লাভের কারণ। সুতরাং তা স্বতন্ত্র অনুগ্রহ)।

অতঃপর তুমি (মাদইয়ান পৌঁছলে এবং) কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করলে। হে মূসা, অতঃপর বিশেষ এক সময়ে) যা আমার জ্ঞানে তোমার নবুয়ত ও প্রত্যক্ষ কথাবার্তার জন্যে অবধারিত ছিল, এখানে (এসেছ এবং এখানে আসার পর) আমি তোমাকে নিজের (নবী করার) জন্য মনোনীত করেছি। (অতএব এখন) তুমি ও তোমার ভাই উভয়েই আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ দু'টি মূল মু'জিযা—লাঠি ও শ্বেতশুভ্র হাত, প্রত্যেকটিতে অলৌকিকতার বহু প্রকাশ রয়েছে—) নিয়ে (যে স্থানের জন্য আদেশ হয়ে সেখানে) যাও এবং আমার স্মরণে (নির্জনে অথবা প্রচার ক্ষেত্রে) শৈথিল্য করো না। (এখানে যাওয়ার স্থান বলা হচ্ছে যে) উভয়েই ফিরাউনের কাছে যাও। সে খুব উদ্ধত হয়েছে। অতঃপর (তার কাছে গিয়ে) নম্র কথা বল। হয়ত সে (সাগ্রহে) উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহ্র শাস্তিকে) ভয় করবে (এবং এ কারণে মেনে নেবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, হযরত মূসা (আ)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুয়ত ও রিসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশংকার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে أُخْرَىٰ শব্দের

মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং أُخْـرَىٰ শব্দটি কোন সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোন অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল-মা'আনী) মূসা (আ)-এর এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে বর্ণিত হবে।

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ অর্থাৎ যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফিরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাইলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। আমি তাকে হিফাযতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বলা বাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা এবং তাঁর হিফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী রাসূল নয়—এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি ? وحى শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে—অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়—নবী, রাসূল, সাধারণ সৃষ্ট জীব বরং জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

(أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ আয়াতেও আভিধানিক অর্থে 'ওহী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মূসা-জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন, মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয় ; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারও অন্তরে কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহ্‌গণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবূ হাইয়্যান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতে নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই জনসংস্কারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা ; যারা না মানে, তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুয়তের ওহী শেষনবী মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন বুযুর্গের উক্তিতে একেই 'ওহী-তশরীয়ী' ও 'গায়র-তশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে-আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরোপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমার পুস্তক "খতমে-নবুয়তে" বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা-জননীর নাম ঃ রূহুল-মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তাঁর নাম "লাহইয়ানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী" লিখিত রয়েছে। কেউ তাঁর নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ আমরা এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা।

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ এখানে يم শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যত নীলনদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ মূসা (আ)-এর মাতাকে দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি ; বরং খবর দেয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলিমদের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোন সৃষ্টবস্তু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয় ; বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্তু আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত হতে পারে। সাধক রূমী চমৎকার বলেছেন ঃ

خاك وباد وآب وآتش بنده اند
بامن وتومرده باحق زنده اند

(মৃত্তিকা বাতাস পানি ও অগ্নি আল্লাহ্‌র বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত ; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত।)

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু ; অর্থাৎ ফিরাউন। ফিরাউন যে আল্লাহ্‌র দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু মূসা (আ)-এর দুশমন হওয়ার

ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তখন ফিরাউন মূসা (আ)-এর দুশমন ছিল না ; বরং তাঁর লালন-পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে মূসা (আ)-এর শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফিরাউনের শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফিরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও মূসা (আ)-এর শত্রু ছিল। সে স্ত্রী আছিয়ার মন রক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাকে হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে বানচাল হয়ে যায়।—(রূহুল মা'আনী, মাযহারী)

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي এখানে محبة ধাতু শব্দটি-আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত সে-ই আদর করতে বাধ্য হতো। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي — صنعت শব্দ বলে এখানে উত্তম লালন-পালন বোঝানো হয়েছে। আরবে صنعت فرسى বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। عَلَىٰ عَيْنِي বলে على حفظى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, মূসা (আ)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে হবে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফিরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে।—(মাযহারী)

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ। মূসা (আ)-এর ভগিনী সিন্দুকের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا অর্থাৎ আমি বারবার তোমাকে পরীক্ষা করেছি—(ইবনে আব্বাস)। অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি—(যাহ্হাক)। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। তা এই ঃ

মূসা (আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী ঃ নাসায়ীর তফসীর অধ্যায় 'হাদীসুল ফুতুন' নামে ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইবনে কাসীরেও তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস এই রেওয়ায়েতটিকে মরফূ' অর্থাৎ বিরতিহীন বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর নিজেও তা সমর্থন করেছেন ঃ وصدق ذلك عندى অর্থাৎ এ হাদীসটির মরফূ' হওয়া আমার মতে ঠিক। অতঃপর তিনি একটি প্রমাণও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এরপর একথাও লিখেছেন যে, ইবনে-জারীর এবং ইবনে আ'বী হাতেমও তাঁদের তফসীর গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু একে মওকুফ অর্থাৎ ইবনে-আব্বাসের নিজের বর্ণনা বলেছেন। মরফূ' হাদীসের বাক্য এতে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, ইবনে আব্বাস এই রেওয়ায়েতটি কা'বে-আহবারের কাছ থেকে লাভ করেছেন ঃ যেমন অনেক জায়গায় এরূপ হয়েছে। কিন্তু হাদীসের সমালোচক ইবনে-কাসীর এবং হাদীসের ইমাম নাসায়ী

একে 'মরফূ' স্বীকার করেন। যারা মরফূ' স্বীকার করেন না, তারাও এর বিষয়বস্তু অস্বীকার করেন না। অধিকাংশ বিষয়বস্তু স্বয়ং কোরআনের আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তাই আগাগোড়া হাদীসের অনুবাদ লেখা হচ্ছে। এতে মূসা (আ)-এর বিস্তারিত ঘটনার সাথে সাথে অনেক শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুও জানা যাবে।

হাদীসুল ফুতুন ঃ ইমাম নাসায়ীর সনদে কাসেম ইবনে আবূ আইয়ূবের বর্ণনা ঃ আমাকে সাঈদ ইবনে জুবায়র জানিয়েছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে মূসা (আ) সম্পর্কে কোরআনের وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলাম যে, এখানে فتون বলে কি বোঝানো হয়েছে? ইবনে আব্বাস বললেন ঃ এই ঘটনা অতিদীর্ঘ। প্রত্যুষে আমার কাছে এস--বলে দেব। পরদিন খুব ভোরেই আমি তাঁর কাছে হাজির হলাম, যাতে গতকালের ওয়াদা পুরা করিয়ে নেই। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ শোন, একদিন ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবলি করল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে পয়গম্বর ও বাদশাহ্ পয়দা করবেন। একথা শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, হ্যাঁ, বনী ইসরাইল অপেক্ষা করছে যে, তাদের মধ্যে কোন নবী ও রাসূল জন্মগ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। পূর্বে তাদের ধারণা ছিল যে, সে নবী হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ)। তাঁর ইন্তেকালের পর তারা বলতে শুরু করেছে যে, ইউসুফ (আ) ওয়াদাকৃত পয়গম্বর নন। (অন্য কোন নবী ও রাসূলের মাধ্যমে এই ওয়াদা পূর্ণ হবে।) ফিরাউন এ কথা শুনে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল যে, বনী ইসরাইল তো এখন তার গোলাম। যদি তাদের মধ্যে কোন নবী ও রাসূল পয়দা হয়, তবে বনী ইসরাইলকে অবশ্যই মুক্ত করবে। তাই সে সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? সভাসদরা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, ইসরাইল বংশে কোন ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। সেমতে এ কাজে বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করা হলো। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছুরি থাকত। তারা বনী ইসরাইলের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে ছেলে সন্তান দৃষ্টিগোচর হলেই তাকে হত্যা করে ফেলত।

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই কর্মপদ্ধতি অব্যাহত থাকার পর তাদের চৈতন্যোদয় হলো। তারা দেখল যে, দেশের যাবতীয় মেহনত-মজুরি ও শ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম তো বনী-ইসরাইলই আনজাম দেয়। এভাবে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকলে তাদের বৃদ্ধদের মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে বনী-ইসরাইলের মধ্যে কোন পুরুষও অবশিষ্ট থাকবে না, যে দেশের কাজকর্ম আনজাম দেবে। ফলে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম আমাদেরই সম্পন্ন করতে হবে। তাই পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, প্রথম বছর যেসব ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং দ্বিতীয় বছর যারা জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। ছেড়ে দেয়া ও হত্যা করার ধারা এই নিয়মেই চলবে। এভাবে বনী ইসরাইলের মধ্যে কিছুসংখ্যক যুবকও থাকবে, যারা বৃদ্ধদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাদের সংখ্যা এত বেশিও হবে না,

যা ফিরাউনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সেমতে এ আইনই রাজ্যময় জারি করে দেয়া হলো। এ দিকে আল্লাহ্‌র কুদরত এভাবে প্রকাশ পেল যে, মূসা-জননীর গর্ভে এক সন্তান তখনই জন্মগ্রহণ করল যখন সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার বছর ছিল। এ সন্তান ছিল হযরত হারূন (আ)। ফিরাউনী আইনের দৃষ্টিতে তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা ছিল না। এর পরবর্তী পুত্রসন্তান হত্যার বছরে হযরত মূসা (আ)-এর মাতার গর্ভসঞ্চার হলে তিনি দুঃখ বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণ, এই সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে হত্যা করতে হবে। হযরত ইবনে-আব্বাস এ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে বলেন ঃ হে ইবনে-জুবায়র, فتون অর্থাৎ পরীক্ষার এ হচ্ছে প্রথম পর্ব। মূসা (আ) তখনও দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর হত্যার পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা-জননীকে ইলহামী ইশারার মাধ্যমে এরূপ সান্ত্বনা দিলেন ঃ

لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ অর্থাৎ তুমি ভয় ও দুঃখ করো না। আমি তার হিফাযত করব এবং কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তাকে আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেব। যখন মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাতাকে আদেশ দিলেন, বাচ্চাকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। মূসা-জননী এ আদেশ পালন করলেন। তিনি যখন সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, তখন শয়তান তাঁর মনে এরূপ কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করল যে, তুমি এ কি করলে? যদি বাচ্চা তোমার কাছে থেকে নিহতও হতো, তবে তুমি নিজ হাতে তার কাফন-দাফন করে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে। এখন তো তাকে সামুদ্রিক জন্তুরা খেয়ে ফেলবে। মূসা-জননী এই দুঃখ ও বিষাদে মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় দরিয়ার ঢেউ সিন্দুকটিকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে ফিরাউনের বাঁদী-দাসীরা গোসল করতে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখে তা কুড়িয়ে আনল এবং খোলার ইচ্ছা করল। তখন তাদের একজন বললঃ যদি এতে টাকাকড়ি থাকে এবং আমরা খুলে ফেলি, তবে ফিরাউন-পত্নী সন্দেহ করবে যে, আমরা কিছু টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেছি। এরপর আমরা যাই বলি না কেন, সে বিশ্বাস করবে না। তাই সবাই একমত হলো যে, সিন্দুকটি যেমন আছে, তেমনিই ফিরাউন-পত্নীর সামনে পেশ করা হবে।

ফিরাউন-পত্নী সিন্দুক খুলেই তাতে একটি নবজাত শিশুকে দেখতে পেলেন। দেখা মাত্রই শিশুর প্রতি তাঁর মনে গভীর মায়ামমতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, যা ইতিপূর্বে কোন শিশুর প্রতি হয়নি। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي উক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। অপরদিকে মূসা-জননী শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত ওয়াদা ভুলে গেলেন এবং কোরআনের ভাষায় তাঁর অবস্থা দাঁড়াল فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا অর্থাৎ মূসা-জননীর অন্তর যাবতীয় আনন্দ ও কল্পনা থেকে শূন্য হয়ে গেল। পুত্রের চিন্তা ছাড়া তাঁর অন্তরে আর কোন কিছুই ছিল না। এদিকে পুত্রসন্তানের হত্যাকার্যে আদিষ্ট সিপাহীরা যখন জানতে পারল যে, ফিরাউনের গৃহে একটি ছেলে-সন্তান আগমন করেছে,

তখন তারা ছুরি নিয়ে ফিরাউন পত্নীর কাছে উপস্থিত হলো এবং দাবি করল যে, ছেলেটিকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব।

এ পর্যন্ত পৌঁছে হযরত ইবনে-আব্বাস ইবনে জুবায়রকে আবার বললেন ঃ হে ইবনে জুবায়র, এটা হযরত মূসা (আ)-এর পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব।

ফিরাউন-পত্নী সিপাহীদেরকে বললেন ঃ একটু থাম। একটিমাত্র ছেলের কারণে তো বনী ইসরাইলের শক্তি বেড়ে যাবে না। আমি ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। দেখি, তিনি ছেলেটির প্রাণভিক্ষা দেন কিনা! ফিরাউন তাকে ক্ষমা করলে উত্তম, নতুবা তোমাদের কাজে আমি বাধা দেব না ; ছেলেটিকে তোমাদের হাতেই তুলে দেব। একথা বলে তিনি ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ এই শিশুটি আমার ও তোমার চোখের মণি। ফিরাউন বলল ঃ হ্যাঁ, তোমার চোখের মণি হওয়া তো বোঝাই যায় ; কিন্তু আমি এরূপ মণির প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর ইবনে-আব্বাস বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, যদি ফিরাউন তখন নিজের চোখের মণি হওয়া স্বীকার করে নিত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও হিদায়েত করতেন, যেমন তার পত্নী আছিয়াকে হিদায়েত করেছেন।

মোটকথা, স্ত্রীর কথায় ফিরাউন শিশুকে হত্যার কবল থেকে মুক্ত করে দিল। এখন ফিরাউন-পত্নী তাকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশের মহিলাদেরকে ডাকল। সবাই এ কাজ আনজাম দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিশুটি কারও স্তন পান করল না। وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ এখন ফিরাউন পত্নী মহাভাবনায় পড়লেন যে, যদি শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ না করে, তবে জীবিত থাকবে কিরূপে? তিনি শিশুটিকে বাঁদীদের হাতে দিয়ে বললেন ঃ একে বাজারে এবং জনসমাবেশে নিয়ে যাও। সম্ভবত, সে কোন মহিলার দুধ কবূল করবে।

এদিকে মূসা-জননী পাগলপারা হয়ে নিজ কন্যাকে বললেন ঃ বাইরে গিয়ে তার একটু খোঁজ নাও এবং লোকদের কাছে জিজ্ঞেস কর যে ঐ সিন্দুক ও নবজাত শিশুর কি দশা হয়েছে, সে জীবিত আছে, না সামুদ্রিক জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে ? মূসা (আ)-এর হিফাযত ও কয়েকদিন পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা গর্ভাবস্থায় তাঁর সাথে করেছিলেন, তখন পর্যন্ত সেই ওয়াদা তাঁর স্মরণে ছিল না। হযরত মূসার ভগিনী বাইরে গিয়ে আল্লাহ্র কুদরতের এই লীলা দেখতে পেলেন যে, ফিরাউনের বাঁদীরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে ধাত্রীর খোঁজে ঘোরাফেরা করছে। সে যখন জানতে পারল যে, শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ করছে না এবং এজন্য বাঁদীরা খুব উদ্বিগ্ন, তখন তাদেরকে বলল ঃ আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব যেখানে আশা করা যায় যে, সে তাদের দুধ গ্রহণ করবে এবং তারাও একে শুভেচ্ছা ও আদর-যত্ন সহকারে লালন-পালন করবে। একথা শুনে বাঁদীরা তাকে পাকড়াও করল। তাদের সন্দেহ হলো যে, বোধ হয় এই মহিলাই শিশুটির জননী অথবা কোন নিকট-আত্মীয়া। ফলে সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারছে যে, ঐ পরিবার তার হিতাকাঙ্ক্ষী। তখন ভগিনীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

এখানে পৌঁছে ইবনে আব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন ঃ এটা ছিল পরীক্ষার তৃতীয় পর্ব।

তখন মূসা-ভগিনী নতুন কথা উদ্ভাবন করে বলল ঃ ঐ পরিবারটি শিশুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলায় আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা রাজদরবারে পৌঁছতে পারবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হবে—এই আশায় তারা শিশুটির আদর-যত্নে ও শুভেচ্ছায় কোন ত্রুটি করবে না। এই ব্যাখ্যা শুনে বাঁদীরা তাকে ছেড়ে দিল। সে গৃহে ফিরে মাতাকে আদ্যোপান্ত ঘটনার সংবাদ দিল। মাতা তাকে নিয়ে বাঁদীরা যেখানে সমবেত ছিল, সেখানে পৌঁছলেন। বাঁদীদের কথায় তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ তাঁর স্তনের সাথে একাত্ম হয়ে দুধ পান করতে লাগলেন এবং পেট ভরে দুধ পান করলেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া গেছে এই সংবাদ শুনে ফিরাউন-পত্নী মূসা-জননীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন দেখলেন এবং বুঝলেন যে, ফিরাউন-পত্নী তাঁর তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তখন তিনি আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে গেলেন। ফিরাউন-পত্নী বললেন ঃ তুমি এখানে থেকেই শিশুকে দুধ পান করাবে। কেননা, অপরিসীম মহব্বতের কারণে তাকে আমি আমার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারব না। মূসা-জননী বললেন ঃ আমি তো নিজের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারি না। কারণ আমার কোলে একটি শিশু আছে। আমি তাকে দুধ পান করাই। তাকে আমি কিরূপে ছেড়ে দিতে পারি ? হ্যাঁ, আপনি যদি সম্মত হয়ে শিশুকে আমার হাতে সমর্পণ করেন এবং আমি নিজ বাড়িতে তাঁকে দুধ পান করাতে পারি তবে অঙ্গীকার করছি যে, এই শিশুর হিফাযত ও দেখাশোনায় বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করব না। বলা বাহুল্য, তখন মূসা-জননীর মনে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদাও জেগে উঠেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, কয়েকদিন বিচ্ছেদের পর আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। তাই তিনি নিজের কথায় অটল রইলেন। অবশেষে ফিরাউন-পত্নী বাধ্য হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। মূসা-জননী সেদিনই মূসা (আ)-কে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর লালন-পালন করলেন।

মূসা (আ) যখন একটু শক্ত-সমর্থ হয়ে গেলেন, তখন ফিরাউন-পত্নী তাঁর মাতাকে খবর পাঠাল যে, শিশুকে এনে আমাকে দেখিয়ে যাও। আমি তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেছি। ফিরাউন-পত্নী দরবারের লোকদেরকে আদেশ দিল যে, আমার আদরের শিশু আজ আমার গৃহে আসছে। তোমাদেরকে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাঁকে উপযুক্ত উপঢৌকন দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা কি করছ, আমি নিজে তা তদারক করব। এই আদেশ জারির ফলে মূসা (আ) যখন মাতার সাথে গৃহ থেকে বের হলেন, তখন থেকেই তাঁর উপর হাদীয়া ও উপঢৌকনের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। অবশেষে তিনি যখন ফিরাউন-পত্নীর কাছে পৌঁছলেন, তিনি তখন স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে মূল্যবান উপঢৌকন পৃথকভাবে পেশ করলেন। ফিরাউন-পত্নী তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত উপঢৌকন মূসা-জননীকে দান করে দিলেন। অতঃপর ফিরাউন-

পত্নী বললেন ঃ এখন আমি ছেলেকে নিয়ে ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। সে-ও তাকে পুরস্কার ও উপঢৌকন দান করবে। সেমতে তাকে ফিরাউনের কাছে উপস্থিত করা হলে সে তাকে আদর করে কোলে তুলে নিল। মূসা (আ) ফিরাউনের দাঁড়ি ধরে নিচের দিকে হেচকা টান দিলে তখন সভাসদরা সুযোগ পেয়ে ফিরাউনকে বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন নবী পয়দা হবে এবং আপনার দেশ ও সম্পত্তির মালিক হবে। আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনাকে ধরাশায়ী করবে। সেই ওয়াদা কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি ?

ফিরাউন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তৎক্ষণাৎ সন্তান হত্যাকারী সিপাহীদেরকে ডেকে পাঠাল, যাতে তাকে হত্যা করা হয়।

ইবনে-আব্বাস এখানে পৌঁছে পুনরায় ইবনে জুবায়রকে বললেন ঃ এটা পরীক্ষার চতুর্থ পর্ব। মৃত্যু আবার মূসা (আ)-এর মস্তকের উপর ছায়াপাত করল।

এই পরিস্থিতি দেখে ফিরাউন-পত্নী বলল ঃ তুমি তো এই বাচ্চা আমাকে দিয়ে ফেলেছ। এখন এ কি হচ্ছে? ফিরাউন বলল ঃ তুমি দেখ না, ছেলেটি কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করছে যে, সে আমাকে ধরাশায়ী করে দেবে, আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। ফিরাউন-পত্নী বলল ঃ এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে নাও। এতে বাস্তব সত্য ফুটে উঠবে এবং বোঝা যাবে যে, ছেলেটি একাজ বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত করেছে, না জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি আনা হোক এবং তার সামনে পেশ করা হোক। যদি সে মোতির দিকে হাত বাড়ায় এবং অঙ্গার থেকে আত্মরক্ষা করে, তবে বুঝতে হবে যে, তার কাজকর্ম জ্ঞানপ্রসূত ও ইচ্ছাকৃত। পক্ষান্তরে যদি সে মোতির পরিবর্তে অঙ্গারের দিকে হাত বাড়ায়, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে এ কাজটি জ্ঞানের অধীনে করেনি। কেননা, কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি আগুন হাতে নিতে পারে না। ফিরাউন এই প্রস্তাব মেনে নিল। দু'টি অঙ্গার এবং দুটি মোতি মূসা (আ)-এর সামনে পেশ করা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে অঙ্গার তুলে নিলেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূসা (আ) মোতির দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দেন। ব্যাপার দেখে ফিরাউন কালবিলম্ব না করে অঙ্গার তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, যাতে তার হাত পুড়ে না যায়। এবার ফিরাউন-পত্নী সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন ঃ ঘটনার আসল স্বরূপ দেখলে তো ! এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কৃপায় মূসা (আ) প্রাণে বেঁচে গেলেন। কারণ, ভবিষ্যতে তাঁকে যে অনেক মহৎ কাজ করতে হবে। মূসা (আ) এমনিভাবে ফিরাউনের রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রমে ও রাজকীয় ভরণ-পোষণে মাতার কাছে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন।

তাঁর রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রম দেখে ফিরাউন বংশীয় লোকদের মধ্যে বনী ইসরাইলের প্রতি যুলুম, নির্যাতন, অপমান ও অবজ্ঞা করার সাহস রইল না, যা ইতিপূর্বে তাদের পক্ষ থেকে বনী ইসরাইলের উপর অহরহ চলত। একদিন মূসা (আ) শহরের এক পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় দু'ব্যক্তিকে বিবদমান দেখতে পেলেন। তাদের একজন ছিল ফিরাউন

বংশীয় অপর ব্যক্তি ইসরাইল বংশীয়। ইসরাইল বংশীয় ব্যক্তি মূসা (আ)-কে দেখে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। ফিরাউন বংশীয় লোকটির ধৃষ্টতা দেখে মূসা (আ) নিরতিশয় রাগান্বিত হলেন। কারণ রাজদরবারে মূসা (আ)-এর অসাধারণ সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর সামনে ইসরাইলীকে বলপূর্বক ধরে রেখেছিল। সে আরও জানত যে, মূসা (আ) ইসরাইলীদের হিফাযত করেন। সাধারণভাবে সবাই একথা জানত যে, ইসরাইলীদের সাথে তাঁর পক্ষপাতমূলক সম্পর্ক শুধু দুধ পান করার কারণেই। অবশ্য এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাঁর মাতার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ধাত্রীমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন ইসরাইলী।

মোটকথা, মূসা (আ) রাগান্বিত হয়ে ফিরাউন বংশীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন। ঘুষির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে অকুস্থলেই প্রাণত্যাগ করল। ঘটনাক্রমে সেখানে মূসা (আ) ও বিবদমান দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তি তো নিহতই হলো। ইসরাইলী নিজের লোক ছিল, তাই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না।

যখন ফিরাউন বংশীয় লোকটি মূসা (আ)-এর হাতে মারা গেল, তখন তিনি বললেনঃ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ এ-কাজটি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন : رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি—আমার হাতে ভুলক্রমে ফিরাউন বংশীয় লোকটি নিহত হয়েছে। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করলেন। কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ ঘটনার পর মূসা (আ) ভীতচকিত হয়ে এ ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন যে, ফিরাউন বংশীয় লোকদের উপর এ হত্যাকাণ্ডের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং ফিরাউনের দরবার পর্যন্ত বিষয়টি পৌঁছল কি না। জানা গেল যে, ঘটনার যে প্রতিবেদন ফিরাউনের কাছে পৌঁছেছে, তা এই : জনৈক ইসরাইলী ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাই ইসরাইলীদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে মোটেই অবকাশ না দেওয়া হোক। ফিরাউন উত্তরে বলল : হত্যাকারীকে সনাক্ত করে প্রমাণসহ উপস্থিত কর। কারণ বাদশাহ্ যদিও তোমাদের আপন লোক ; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিনিময়ে হত্যা করা তার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। কাজেই হত্যাকারীকে তালাশ কর এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ কর। আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে তোমাদের প্রতিশোধ হত্যার আকারে গ্রহণ করব। একথা শুনে ফিরাউন বংশীয়রা হত্যাকারীর সন্ধানে অলিতে-গলিতে ও বাজারে চক্কর দিতে লাগল ; কিন্তু হত্যাকারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

হঠাৎ একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। পরের দিন মূসা (আ) গৃহ থেকে বের হয়ে সেই ইসরাইলীকে অন্য একজন ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তির সাথে লড়াইরত দেখতে পেলেন।

ইসরাইলী আবার তাঁকে দেখামাত্রই সাহায্যের জন্য ডাক দিল। কিন্তু মূসা (আ) বিগত ঘটনার জন্যই অনুতপ্ত ছিলেন। এক্ষণে সেই ইসরাইলীকেই আবার লড়াইরত দেখে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মূলত ইসরাইলীই অপরাধী এবং কলহপ্রিয়। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ) ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তিকে বাধা দিতে চাইলেন এবং ইসরাইলীকেও সতর্ক করে বললেন ঃ তুই গতকল্যও ঝগড়া করেছিলি, আজও তাই করছিস। কাজেই তুই-ই অপরাধী। ইসরাইলী মূসা (আ)-কে গতকালের ন্যায় রাগান্বিত দেখে এবং একথা শুনে সন্দেহ করল যে, সে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তখন সে কালবিলম্ব না করে বলে ফেলল ঃ হে মূসা, তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে।

এসব কথাবার্তার পর উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু ফিরাউন বংশীয় লোকটি হত্যাকারী অন্বেষণকারীদেরকে খবর দিল যে, স্বয়ং ইসরাইলী মূসা (আ)-কে বলেছে যে, গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে। সংবাদটি তৎক্ষণাৎ রাজদরবারে পৌঁছানো হলো। ফিরাউন একদল সিপাহী মূসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করল। সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল যে, মূসা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না। তাই তারা ধীরে-সুস্থে শহরের মহাসড়ক ধরে তাঁর খোঁজে বের হলো। এদিকে শহরের দূরবর্তী অংশে বসবাসকারী মূসা (আ)-এর জনৈক অনুসারী এ সংবাদ জানতে পারল যে, ফিরাউনের সিপাহী মূসা (আ)-এর খোঁজে বের হয়ে পড়েছে। সে একটি ছোট গলির পথে অগ্রসর হয়ে মূসা (আ)-কে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিল।

এখানে পৌঁছে ইবনে আব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন ঃ হে ইবনে জুবায়র, এটা হচ্ছে পরীক্ষার পঞ্চম পর্ব। মৃত্যু মাথার উপর ছায়াপাত করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে এ থেকেও উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সংবাদ শুনে মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি আজ পর্যন্ত রাজকীয় বিলাসিতায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কষ্ট ও পরিশ্রমের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না। মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছেন বটে ; কিন্তু পথঘাট অজানা। একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্র উপর ভরসা ছিল যে, عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

মাদইয়ানের নিকটে পৌঁছে মূসা (আ) শহরের বাইরে একটি কূপের ধারে একটি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। তারা কূপে জন্তুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি আরও দেখলেন যে, দু'জন কিশোরী তাদের মেষপালকে আগলিয়ে পৃথক এক জায়গায় দণ্ডায়মান রয়েছে। মূসা (আ) কিশোরীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা পৃথক জায়গায় দণ্ডায়মান কেন ? তারা বললঃ এত লোকের ভিড়ভাড় ঠেলে কূপের ধারে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আমরা অপেক্ষা করছি, যখন লোকেরা চলে যাবে, তখন যে পানিটুকু অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমরা মেষপালকে পান করাব।

মূসা (আ) তাদের আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেই কূপ থেকে পানি তুলতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রচুর শক্তিসামর্থ্য দান করেছিলেন। তিনি দ্রুত তাদের মেষপালকে

তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়ে দিলেন। কিশোরীদ্বয় তাদের মেষপাল নিয়ে গৃহে পৌছল এবং মূসা (আ) একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেনঃ "رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ" অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি সে নিয়ামতের প্রত্যাশী, যা আপনি আমার প্রতি নাযিল করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, আহার ও বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিশোরীদ্বয় যখন দৈনন্দিন সময়ের পূর্বেই মেষপালকে পানি পান করিয়ে গৃহে পৌছল, তখন তাদের পিতা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেনঃ আজ তো মনে হয় নতুন কোন ব্যাপার হয়েছে। কিশোরীদ্বয় মূসা (আ)-এর পানি তোলা এবং পান করানোর কাহিনী পিতাকে বলে দিল। পিতা তাদের একজনকে আদেশ দিলেনঃ যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহ করেছে, তাঁকে এখানে ডেকে আন। কিশোরী তাঁকে ডেকে আনল। পিতা মূসা (আ)-এর বৃত্তান্ত জেনে বললেনঃ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ এখন যাবতীয় ভয়ভীতি মন থেকে মুছে ফেলুন। আপনি যালিমদের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন। আমরা ফিরাউনের রাজত্বে বাস করি না। আমাদের উপর তার কোন জোরও চলতে পারে না।

তখন কিশোরীদ্বয়ের একজন তার পিতাকে বললঃ يٰاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ অর্থাৎ আব্বাজান, আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা শক্ত সুঠামদেহী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি চাকরীর জন্য অধিক উপযুক্ত। কন্যার মুখে একথা শুনে পিতা আত্মসম্মানে কিছুটা আঘাত অনুভব করলেন যে, আমার মেয়ে কিরূপে জানতে পারল যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তাই তিনি প্রশ্ন করলেনঃ তুমি কিরূপে অনুমান করলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত? কন্যা বললঃ তাঁর শক্তি তখনই প্রত্যক্ষ করেছি, যখন সে কূপ থেকে পানি তুলে সব রাখালের পূর্বে নিজের কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্য কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি। বিশ্বস্ততার বিষয়টি এভাবে জানতে পেরেছি যে, যখন আমি তাকে ডেকে আনতে গেলাম, তখন প্রথম নজরে সে আমাকে একজন নারী দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নিচু করে ফেলল। অতঃপর যতক্ষণ আমি আপনার পয়গাম তার গোচরীভূত করিনি, ততক্ষণ সে দৃষ্টি উপরে তুলেনি। এরপর সে আমাকে বললঃ আপনি আমার পিছে পিছে চলুন ; কিন্তু পেছনে থেকেই গৃহের পথ বলে দেবেন। একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তিই এরূপ কাজ করতে পারে। পিতা কন্যার এই বিজ্ঞজনোচিত কথায় আনন্দিত হলেন, তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং নিজেও তার শক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। তখন কিশোরীদের পিতা [যিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হযরত শুআয়ব (আ)] মূসা (আ)-কে বললেনঃ আমি আমার এক কন্যাকে এই শর্তে আপনার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই যে, আপনি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকরী করবেন। যদি আপনি স্বেচ্ছায় দশ বছর পূর্ণ করে দেন, তবে তা আরও উত্তম হবে ; কিন্তু আমি এই শর্ত আপনার প্রতি আরোপ করতে চাই না—যাতে আপনার কষ্ট বেশি না হয়। আপনি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন কি? হযরত মূসা (আ) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। ফলে আট বছরের চাকরী অনুযায়ী জরুরী হয়ে গেল, অবশিষ্ট দু'বছরের ওয়াদা তাঁর ইচ্ছাধীন রয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর মূসা (আ)-কে দিয়ে এই ওয়াদাও পূর্ণ করিয়ে দেন এবং তিনি চাকরীর দশ বছরই পূর্ণ করেন।

সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ একবার জনৈক খ্রিস্টান আলিমের সাথে আমার দেখা হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার জানা আছে কি, মূসা (আ) উভয় মেয়াদের মধ্য থেকে কোনটি পূর্ণ করেছিলেন? আমি—বললাম ঃ আমার জানা নেই। কারণ তখন পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের এই হাদীস আমার জানা ছিল না। অতঃপর আমি হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি বললেন ঃ আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা তো চুক্তি অনুযায়ী জরুরীই ছিল। সাথে সাথে একথাও জানা দরকার যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তাঁর রাসূল ইচ্ছাধীন ওয়াদাও পূর্ণ করুক। তাই তিনি দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর আমি খ্রিস্টান আলিমের সাথে দেখা করে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ আপনি যার কাছ থেকে এ তথ্য অবগত হয়েছেন, তিনি কি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং সবার সেরা।

দশ বছর চাকরীর মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন মূসা (আ) স্ত্রীকে সাথে নিয়ে শুআয়ব (আ)-এর দেশ মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হলেন, তখন কনকনে শীত, গভীর অন্ধকার, অজ্ঞাত রাস্তা এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি তূর পর্বতের উপর আগুন দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন, বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখার পর লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মু'জিযা এবং রিসালত ও নবুয়তের পদ লাভ করলেন। এর পূর্ণ কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমি রাজদরবারের পলাতক আসামী সাব্যস্ত হয়েছি। কিবতীকে খুন করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে পাল্টা হত্যার আদেশ জারি হয়েছে। এক্ষণে ফিরাউনের কাছেই রিসালতের দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়া জিহ্বার দিক দিয়েও আমি তোতলা। এসব চিন্তাভাবনা করে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন-নিবেদন করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁর ভাই হারূনকে রিসালতে অংশীদার করে তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, মিসর শহরের বাইরে এসে মূসা (আ)-কে অভ্যর্থনা জানাও। অতঃপর মূসা (আ) সেখানে পৌঁছলেন। হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। উভয় ভ্রাতা নির্দেশ অনুযায়ী ফিরাউনকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তার দরবারে পৌঁছলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা দরবারে হাযির হওয়ার সুযোগ পেলেন না। তাঁরা প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর অনেক পর্দা ডিঙ্গিয়ে হাযির হওয়ার অনুমতি পেলেন। উভয়েই ফিরাউনকে বললেন ঃ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ। অর্থাৎ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে দূত ও বার্তাবাহী। ফিরাউন জিজ্ঞেস করল ঃ فَمَنْ رَّبُّكُمَا তোমাদের পালনকর্তা কে? মূসা ও হারূন (আ) কোরআনে উল্লিখিত উত্তর দিলেনঃ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى এরপর ফিরাউন বলল ঃ তাহলে তোমরা কি চাও? সাথে সাথে সে নিহত কিবতীর কথা উল্লেখ করে মূসা (আ)-কে অপরাধী সাব্যস্ত করল এবং নিজ গৃহে মূসা (আ)-কে লালন-পালন করার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করল। মূসা (আ) উভয় কথার যে জওয়াব দিয়েছেন, তা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ত্রুটি স্বীকার করে অজ্ঞতার ওযর পেশ করলেন এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াবে বললেন ঃ তুমি সমগ্র বনী ইসরাইলকে দাসে পরিণত করে রেখেছ। তাদের উপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছ। এরই ফলশ্রুতিতে ভাগ্যলিপির খেলায় আমাকে তোমার গৃহে পৌঁছানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার যা ইচ্ছা ছিল, পূর্ণ হয়েছে। এতে তোমার কোন অনুগ্রহ নেই। অতঃপর তিনি ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তি দিতে সম্মত আছ ? ফিরাউন অস্বীকার করে বলল ঃ তোমার কাছে রাসূল হওয়ার কোন আলামত থাকলে দেখাও। মূসা (আ) তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। অমনি তা অজগর সাপ হয়ে মুখ খুলে ফিরাউনের দিকে ধাবিত হলো। ফিরাউন ভীত হয়ে সিংহাসনের নিচে আত্মগোপন করল এবং সাপটিকে বিরত রাখার জন্য মূসা (আ)-এর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। মূসা (আ) তাকে ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেই হাত ঝলমল করতে লাগল। ফিরাউনের সামনে এটা ছিল দ্বিতীয় মু'জিযা। এরপর হাত পুনরায় বগলে রাখতেই তা পূর্বাবস্থায় ফিরে এল।

ফিরাউন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল যে, ব্যাপার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমাদের করণীয় কি ? সভাসদরা সম্মিলিতভাবে বলল ঃ চিন্তার কোন কারণ নেই। তারা উভয়েই জাদুকর। জাদুর সাহায্যে তারা আপনাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চায় এবং আপনার সর্বোত্তম ধর্ম (তাদের মতে ফিরাউনের পূজা) মিটিয়ে দিতে চায়। আপনি তাদের কোন দাবির কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। কারণ আপনার রাজ্যে বড় বড় জাদুকর রয়েছে। তাদেরকে আহ্বান করুন। তারা তাদের জাদু দ্বারা তাদের জাদুকে নস্যাৎ করে দেবে।

ফিরাউন রাজ্যময় হুকুম জারি করে দিল যে, যারা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী তাদের সবাইকে রাজদরবারে হাযির হতে হবে। সারা দেশের জাদুকররা সমবেত হলে তারা ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করল ঃ যে জাদুকরের সাথে আপনি আমাদের মুকাবিলা করতে চান, সে কি করে ? ফিরাউন বলল ঃ সে তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে দেয়। জাদুকররা অত্যন্ত নিরুদ্বেগের স্বরে বলল ঃ এটা কিছুই নয়। লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করার যে জাদু, তা পুরোপুরি আমাদের করায়ত্ত। আমাদের জাদুর মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কিন্তু প্রথমে মীমাংসা হওয়া দরকার যে, আমরা জয়ী হলে আপনি আমাদেরকে কি পুরস্কার দেবেন।

ফিরাউন বলল ঃ জয়ী হলে তোমরা আমার পরিবারের সদস্য এবং বিশেষ নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে।

তখন জাদুকররা মুকাবিলার সময় ও স্থান মূসা (আ)-এর সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল। তাদের ঈদের দিন দ্বিপ্রহরের সময় নির্ধারিত হলো। ইবনে-জুবায়ের বলেন ঃ হযরত ইবনে-আব্বাস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের يوم الزينة (ঈদের দিন) ছিল আশুরা অর্থাৎ মুহাররমের দশ তারিখ। এই দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরাউন ও তার জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। যখন সবাই একটি বিস্তৃত মাঠে

মুকাবিলা দেখার জন্য সমবেত হয়ে গেল, তখন ফিরাউনের লোকেরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল ঃ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ অর্থাৎ এখানে আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে জাদুকররা অর্থাৎ মূসা ও হারূন বিজয়ী হলে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। তাদের এই কথাবার্তা পয়গম্বরদ্বয়ের প্রতি বিদ্রূপের ছলে ছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের জাদুকরের বিরুদ্ধে মূসা ও হারূন (আ) জয়লাভ করতে পারবেন না।

মুকাবিলার ময়দান জমজমাট হয়ে গেল। জাদুকররা মূসা (আ)-কে বলল ঃ প্রথমে আপনি কিছু নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ জাদু প্রদর্শন করবেন), না আমরা নিক্ষেপ করে সূচনা করব? মূসা (আ) বললেন ঃ তোমরাই সূচনা কর এবং তোমাদের জাদু প্রদর্শন কর। তারা بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ (অর্থাৎ ফিরাউনের আনুকূল্যে আমরা অবশ্যই জয়ী হব।) বলে কিছু সংখ্যক লাঠি ও রশি মাটিতে নিক্ষেপ করল। লাঠি ও রশিগুলো দৃশ্যত সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে মূসা (আ) কিছুটা ভয় পেলেন। فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى মূসা (আ) মনে মনে ভীত হলেন।

একজন মানুষ হিসেবে এই ভয় স্বভাবগতও হতে পারে। পয়গম্বরগণও এরূপ স্বভাবগত ভয় থেকে মুক্ত নন। এছাড়া ভয়ের কারণ এরূপও হতে পারে যে, এখন ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর সাপ হয়ে গেল। সাপটির মুখ খোলা ছিল। সাপটি জাদুকরদের নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রশির সাপগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই গলধঃকরণ করে ফেলল।

ফিরাউনের জাদুকররা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই দৃশ্য দেখে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, মূসা (আ)-এর অজগরটি জাদুর ফলশ্রুতি নয় ; বরং আল্লাহ্র দান। সেমতে জাদুকররা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করল যে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং মূসা (আ)-এর আনীত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমরা বিগত ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস থেকে তওবা করছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কোমর ভেঙ্গে দিলেন। তারা যেসব জাল বিস্তার করেছিল, সবই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ তারা সেখানে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে মাঠ ত্যাগ করল।

যে সময় এই মুকাবিলা হচ্ছিল, তখন ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ছিন্নবাস পরিহিতা হয়ে আল্লাহ্র দরবারে মূসা (আ)-এর সাহায্যের জন্য দোয়া করছিলেন। ফিরাউন বংশীয়রা মনে করছিল যে, তিনি ফিরাউনের চিন্তায় ছিন্নবাস পরিধান করেছেন, তার জন্য দোয়া করছেন। অথচ তাঁর সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা মূসা (আ)-এর জন্য নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁরই বিজয় প্রার্থনা করছিলেন।

এ ঘটনার পর মূসা (আ) যখনই কোন মু'জিযা প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহ্র প্রমাণ চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করত, তখনই ফিরাউন ওয়াদা করত ঃ এখন আমি বনী ইসরাঈলকে আপনার কর্তৃত্বে সমর্পণ করব। কিন্তু যখন মূসা (আ)-এর দোয়ার ফলে আযাবের আশঙ্কা

টলে যেত, তখনই সে তার ওয়াদা ভুলে যেত। সে বলত ঃ আপনার পালনকর্তা আরও কোন নিদর্শন দেখাতে পারেন কি ? দিন এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন-গোষ্ঠির উপর ঝড়ঝঞ্ঝা, পঙ্গপাল, পরিধেয় বস্ত্রে উকুন, পাত্র ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি আযাব চাপিয়ে দিলেন। কোরআন পাকে এগুলোকে "বিস্তারিত নিদর্শনাবলী" শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। ফিরাউনের অবস্থা ছিল এই যে, যখনই কোন আযাব আসত এবং তা দূর করতে সে অক্ষম হতো, তখনই মূসা (আ)-এর কাছে ফরিয়াদ করে বলত ঃ কোন রকমে আযাবটি দূরীভূত করে দিন। আমি ওয়াদা করছি, বনী ইসলাইলকে মুক্ত করে দেব। অতঃপর আযাব দূরীভূত হলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন ঃ বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ কর। মূসা (আ) সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে শহর ত্যাগ করলেন। প্রত্যুষে ফিরাউন টের পেয়ে গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। এদিকে মূসা (আ) ও বনী ইসরাইলের গমন পথে যে নদী অবস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আদেশ দিলেন ঃ যখন মূসা (আ) তোকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে, তখন তোর মধ্যে বারটি রাস্তা হয়ে যাওয়া উচিত। বনী ইসলাইলের বারটি গোত্র এগুলো দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পার হয়ে যাবে। তারা পার হয়ে গেলে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সমেত নদীর বারটি পথ আবার একাকার হয়ে মিশে যাবে।

মূসা (আ) দরিয়ার নিকটে পৌছে দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত হানার কথাটি বেমালুম ভুলে গেলেন। বনী ইসরাইল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগল ঃ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ। অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে যাব। কারণ পেছন দিক থেকে ফিরাউনী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন তাদের নজরে পড়ছিল। তাদের সামনে দরিয়া বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এহেন সংকট মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা মূসা (আ)-এর মনে পড়ল যে, দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তাতে বারটি রাস্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি তৎক্ষণাৎ লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। এ সময়টি এমনি সংকটময় ছিল যে, বনী ইসরাইলের পশ্চাৎবর্তী অংশকে ফিরাউনী সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল প্রায় ধরেই ফেলেছিল। হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযায় দরিয়া পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ) বনী ইসরাইলসহ এসব রাস্তা দিয়ে দরিয়া পার হয়ে গেলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউনী বাহিনী এসব রাস্তা দেখে গোটা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী হাঁকিয়ে দিল। তারা সবাই যখন দরিয়ার মধ্যে ধাবমান ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহ্র নির্দেশে দরিয়ার বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গেল। দরিয়ার অপর পারে পৌছে মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা বলল ঃ আমাদের আশঙ্কা হয় যে ফিরাউন বোধ হয় এদের সাথে সলিল সমাধি লাভ করেনি এবং সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তখন মূসা (আ) দোয়া করলেন যে, ফিরাউনের নিপাত আমাদের সামনে জাহির করা হোক। সে মতে আল্লাহ্র অপার শক্তি ফিরাউনের মৃতদেহকে দরিয়ার বাইরে নিক্ষেপ করল। ফলে বনী ইসরাইলীদের সবাই তার মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

এরপর বনী ইসরাইল সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল। তারা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমার ইবাদত ও পূজায় লিপ্ত ছিল। এ দৃশ্য দেখে বনী ইসরাইল মূসা (আ)-কে বলতে লাগল ঃ يَامُوْسٰى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ؕ اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ مُتَبَّرٌ مَّاهُمْ فِيْهِ — হে মূসা, আমাদের জন্যও মাবুদ তৈরি করে দাও, যেমন তারা অনেক মাবুদ করে নিয়েছে। মূসা (আ) বললেন ঃ তোমরা এসব কি মূর্খতার কথাবার্তা বলছ? এরা যে প্রতিমার ইবাদত করছে, তাদের ইবাদত নিষ্ফল হবে। মূসা (আ) আরও বললেন ঃ তোমরা পালনকর্তার এতসব মু'জিযা ও অনুগ্রহ দেখার পরও তোমাদের মূর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বদলায়নি? এরপর মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তিনি বললেন ঃ তোমরা সবাই এখানে অবস্থান কর। আমি পালনকর্তার কাছে যাচ্ছি। ত্রিশদিন পর প্রত্যাবর্তন করব। আমার অনুপস্থিতিতে হারূন (আ) আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। তোমরা প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য করবে।

মূসা (আ) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তূর পর্বতে গমন করলেন এবং আল্লাহ্র ইঙ্গিতে উপর্যুপরি ত্রিশ দিবারাত্রির রোযা রাখলেন, যাতে এরপর আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ত্রিশ দিবারাত্র উপর্যুপরি রোযার কারণে স্বভাবত তাঁর মুখে এক প্রকার গন্ধ দেখা দেয়। ফলে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এই গন্ধ নিয়ে আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপ অনুচিত। তিনি পাহাড়ী ঘাস দ্বারা মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করলেন। এরপর আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো ঃ মূসা, তুমি ইফতার করলে কেন ? [আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল যে, মূসা (আ) কোন কিছু পানাহার করেন নি, শুধু ঘাস দ্বারা মুখ পরিষ্কার করেছেন ; কিন্তু পয়গম্বরসুলভ বিশেষ মর্যাদার কারণে একেই ইফতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।] মূসা (আ) এই সত্য উপলব্ধি করে আরয করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি মনে করলাম যে, আপনার সাথে আলাপরত হওয়ার পূর্বে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে দেই। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তুমি কি জান না যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক প্রিয়? এখন তুমি ফিরে যাও এবং আরও দশদিন রোযা রাখ। এরপর আমার কাছে এস। মূসা (আ) তাই করলেন।

এদিকে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইল যখন দেখল যে, ত্রিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও মূসা (আ) ফিরে এলেন না, তখন তারা চিন্তিত হলো। এদিকে হারূন (আ) মূসা (আ)-এর চলে যাওয়ার পর বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন এবং বলেন যে, মিসরে অবস্থানকালে তোমরা ফিরাউনী সম্প্রদায়ের অনেক আসবাবপত্র ধার করেছিলে অথবা তারা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। সেগুলো তোমরা সাথে নিয়ে এসেছ। তোমাদেরও অনেক আসবাবপত্র ফিরাউনীদের কাছে ধার অথবা গচ্ছিত আছে। এখন তোমরা মনে করছ যে, তাদের আসবাবপত্র তোমাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে তোমরা হস্তগত করে রেখেছ। কিন্তু তাদের ধার অথবা আমানতের জিনিস তোমরা ব্যবহার করবে—আমি এটা হালাল মনে করি না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এগুলো ফেরত

দেবারও কোন উপায় নেই। তাই একটি গর্ত খনন করে সমস্ত অলংকার ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী তাতে ফেলে দাও। বনী ইসরাইল এই আদেশ পালন করল। হারূন (আ) সব আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে সব পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। অতঃপর হারূন (আ) বললেন ঃ এখন এগুলো আমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।

বনী ইসরাইলের সাথে গাভী পূজারী সম্প্রদায়ের সামেরী নামক জনৈক ব্যক্তিও ছিল। সে বনী ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু মিসর ত্যাগ করার সময় সে-ও মূসা (আ) ও বনী ইসরাইলের সাথে চলে এসেছিল। ঘটনাক্রমে সে জিবরাঈল (আ)-এর একটি বিশেষ অলৌকিক প্রভাব দেখতে পেল (অর্থাৎ যেখানেই তিনি পা রাখেন, সেখানেই জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়। জিবরাঈলের পা পড়েছে, এমন এক জায়গা থেকে সে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে আসার পথে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে তার দেখা হলো। হারূন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতে বোধ হয় কোন ফিরাউনী অলংকার রয়েছে। তাই বললেন ঃ সবার মত তুমিও একে গর্তে ফেলে দাও। সামেরী বলল ঃ এটা তো সেই রাসূলের পদচিহ্নের মাটি, যিনি আপনাদেরকে দরিয়া পার করিয়েছেন। আমি একে কিছুতেই গর্তে ফেলব না ; তবে এই শর্তে ফেলব যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করবেন। হারূন (আ) দোয়ার ওয়াদা করলেন। সে ঐ মাটি গর্তে ফেলে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী হারূন (আ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্, সামেরীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। দোয়া শেষ হতেই সামেরী বলল ঃ আমার উদ্দেশ্য এই যে, গর্তে যেসব সোনা, রূপা, লোহা, পিতল ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলো একটি গো-বৎসতে পরিণত হোক। হারূন (আ)-এর দোয়া কবূল হয়ে গিয়েছিল। ফলে গর্তের সমস্ত অলঙ্কার, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি একটি গো-বৎসের আকার ধারণ করল। তাতে কোন আত্মা ছিল না ; কিন্তু গাভীর মত শব্দ করত। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এটা কোন জীবিত আওয়াজ ছিল না। বরং তার পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যেত। এর ফলে আওয়াজ শোনা যেত।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাইল কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল সামেরীকে জিজ্ঞেস করল : এটা কি ? সে বলল : এটাই তো তোমাদের খোদা। কিন্তু মূসা (আ) পথ ভুলে এই খোদার কাছে না গিয়ে অন্য দিকে চলে গেছেন। একদল বলল : মূসা (আ) যে পর্যন্ত আসল সত্য বর্ণনা না করেন, সে পর্যন্ত আমরা সামেরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। যদি বাস্তবে এটাই আমাদের খোদা হয়, তবে তার বিরোধিতা করে আমরা পাপী হব না। আর যদি এটা খোদা না হয়, তবে আমরা মূসা (আ)-এর কথাই মেনে চলব।

অন্য একদল বলল : এগুলো সব শয়তানী ধোঁকা। এই গো-বৎস আমাদের পালনকর্তা হতে পারে না। আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অপর একদলের কাছে সামেরীর উক্তি চমৎকার বলে মনে হলো। তারা সামেরীকে সত্য বিশ্বাস করে গো-বৎসকে খোদা হিসেবে মেনে নিল।

এই মহা অনর্থ দেখে হারূন (আ) বললেন :

يَاقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِىْ

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহ্। তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল। বনী ইসরাইল বলল : বলুন তো দেখি মূসা (আ)-এর কি হলো, তিনি আমাদের কাছে ত্রিশ দিনের ওয়াদা করে গিয়েছিলেন ; এখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হচ্ছে তবুও তাঁর দেখা নেই। কোন কোন নির্বোধ বলল : মূসা (আ) পালনকর্তাকে হারিয়ে বোধ হয় তাঁর খোঁজে ঘোরাফেরা করছেন।

এদিকে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর মূসা (আ) বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এই অনর্থের সংবাদ দিলেন, যাতে সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا মূসা (আ) সেখান থেকে ক্রোধান্বিত ও পরিতপ্ত অবস্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কোরআন পাকে পাঠ করেছ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗ اِلَيْهِ অর্থাৎ মূসা (আ) ক্রুদ্ধ হয়ে তার ভাই হারূনের মাথার চুল ধরে টান দিলেন এবং সাথে করে আনা তওরাতের ফলকগুলো হাত থেকে রেখে দিলেন। এরপর রাগ স্তিমিত হলে ভাইয়ের সত্যিকার ওযর জেনে তাকে ক্ষমা করলেন আর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি এ কাণ্ড করলে কেন? সে উত্তর দিল ঃ

قَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ আমি রাসূল জিবরাঈলের পদচিহ্নের মাটি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি বুঝেছিলাম যে, এই মাটি যে বস্তুর মধ্যেই রাখা হবে, তাতেই জীবনের চিহ্ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম।

فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ অর্থাৎ আমি এই মাটি অলঙ্কার ইত্যাদির স্তূপে রেখে দিলাম। আমার মন আমার সামনে এ কাজটি পছন্দনীয় আকারে উপস্থিত করেছিল।

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا -

অর্থাৎ মূসা (আ) সামেরীকে বললেন : যাও, এখন তোমার শাস্তি এই যে, তুমি সারা জীবন একথা বলে বেড়াবে : আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। নতুবা সে-ও আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। তোমার জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার খেলাফ হবে না। তুমি যে উপাস্যের আরাধনা করেছ, তার পরিণাম দেখ, আমি একে আগুনে ভস্ম করব। অতঃপর এর ভস্ম দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব। সে খোদা হলে তার সাথে এরূপ ব্যবহারের শক্তি আমাদের হতো না।

তখন বনী ইসরাইল স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলো যে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল। ফলে যে দলটি হযরত হারূন (আ)-এর মতাবলম্বী ছিল, তাদের প্রতি সবারই ঈর্ষা হতে

লাগল (অর্থাৎ যারা মনে করত যে, গো-বৎস আমাদের খোদা হতে পারে না)। বনী ইসরাইল এই মহাপাপ বুঝতে পেরে মূসা (আ)-কে বলল : আপনার পালনকর্তার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পাপমোচনের জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

মূসা (আ) এ কাজের জন্যে বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে সৎকর্মপরায়ণ সত্তরজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তারা সজ্ঞানে গো-বৎস পূজা থেকেও বিরত ছিল। তিনি খুব যাচাই-বাছাই করে তাদেরকে মনোনীত করলেন। এই সত্তরজন মনোনীত সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মূসা (আ) তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের তওবা কবূল করার বিষয়ে আবেদন পেশ করতে পারেন। মূসা (আ) তূর পর্বতে পৌঁছলে ভূপৃষ্ঠে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হলো। এতে তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে এবং স্বীয় কওম বনী ইসরাইলের সামনে খুবই লজ্জিত হলেন। তাই আরয করলেন ঃ

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, যদি আপনি তাদেরকে ধ্বংসই করতে চাইলেন, তো এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ধ্বংস করে দিতেন এবং আমাকেও তাদের সাথে ধ্বংস করে দিতেন। আপনি কি আমাদের সবাইকে এ কারণে ধ্বংস করবেন যে, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক পাপ করেছে ? প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল এই যে, মূসা (আ)-এর সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই সত্ত্বেও এমন কিছু লোক কৌশলে এই প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্বে গো-বৎসের পূজা করেছিল এবং তাদের অন্তরে গো-বৎসের মাহাত্ম্য বিরাজমান ছিল।

মূসা (আ)-এর এই দোয়া ও ফরিয়াদের জওয়াবে ইরশাদ হলো :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন : আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি অচিরেই আমার রহমতের পরওয়ানা তাদের জন্যে লিখে দেব, যারা আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করে, যাকাত আদায় করে, আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা সে নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তওরাত ও ইন্জীল গ্রন্থে লিখিত দেখে।

একথা শুনে মূসা (আ) আরয করলেন ঃ পরওয়ারদিগার, আমি আপনার কাছে আমার সম্প্রদায়ের তওবা সম্পর্কে আরয করেছিলাম। আপনি জওয়াবে আমার কওমসহ অন্য কওমকে রহমত দান করার কথা বলেছেন। আপনি আমার জন্য আরও পিছিয়ে আমাকেও সে নিরক্ষর পয়গম্বরের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন ? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বনী ইসরাইলের তওবা কবূল হওয়ার একটি পদ্ধতি বলে দেওয়া হলো। তা এই যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার পিতা, পুত্র ইত্যাদি স্বজনের মধ্যে যার সাক্ষাৎ পাবে,

তাকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করবে। যেস্থানে গো-বৎসের পূজা হয়েছে, সেখানেই এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে।

প্রতিনিধিদলের যেসব সদস্যের অবস্থা মূসা (আ)-এর জানা ছিল না। এবং তাদেরকে নির্দোষ মনে করে প্রতিনিধিদলে শামিল করা হয়েছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে গোবৎস-পূজার আগ্রহ ছিল, এ সময় তারাও মনে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নিল। তারা এই কঠোর আদেশ পালন করল, যা তাদের তওবা কবূল হওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনকে হত্যা। এই আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি—সবার পাপ মার্জনা করে দিলেন। এরপর মূসা (আ) তওরাতের যেসব ফলক রাগান্বিত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে নিলেন এবং বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে পবিত্র ভূমি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এমন এক শহরে উপনীত হলেন, যা 'জাব্বারীন' অর্থাৎ প্রবল প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের আকার-আকৃতি ও দৈহিক গড়ন ভয়াবহ ছিল। তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন, শক্তি ও শান-শওকতের লোমহর্ষক কাহিনী বনী ইসরাইলের শ্রুতিগোচর হলো। মূসা (আ)-এর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই শহরে প্রবেশ করবেন ; কিন্তু এই প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে বনী ইসরাইল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল ঃ হে মূসা, এই শহরে ভয়ানক প্রতাপশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় বাস করে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। যতক্ষণ তারা এই শহরে বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা শহরে প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, তারা যদি ত্যাগ করে কোথাও চলে যায়, তবে আমরা শহরে প্রবেশ করতে পারি।

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ—আলোচ্য রেওয়ায়েতের একজন রাবী ইয়াযিদ ইবনে হারূনকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের কিরাআত এভাবেই করেছেন কি ? ইয়াযিদ বললেন : হ্যাঁ, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন। আয়াতে رَجُلَانِ (দুই ব্যক্তি) বলে প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। তারা শহর থেকে এসে মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বনী ইসরাইলকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখে তারা বলল : আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। তোমরা তাদের দৈহিক গড়ন, বিশাল বপু ও সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাচ্ছ। প্রকৃত সত্য এই যে, তাদের মধ্যে মনোবল বলতে মোটেই নেই। তারা মুকাবিলায় হীনবল। তোমরা শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হলেই দেখবে যে, তারা অস্ত্র সংবরণ করে নিয়েছে। ফলে তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।

কেউ কেউ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ—আয়াতের তফসীর এরূপ করেছেন যে, এই দুই ব্যক্তি মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের ছিল।

قَالُوْا يَا مُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّادَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ –

অর্থাৎ বনী ইসরাইল এ দুই ব্যক্তির উপদেশ শোনার পরও মূসা (আ)-কে কর্কশ ভাষায় অশোভন ভঙ্গিতে জওয়াব দিল ঃ হে মূসা, আমরা তো এই শহরে ততক্ষণ পর্যন্ত

কিছুতেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ এই শক্তিশালী কওম এখানে থাকবে। যদি আপনি তাদের মুকাবিলাই করতে চান, তবে আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে তাদের সাথে লড়াই করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।

মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত নিয়ামত সত্ত্বেও প্রতি পদক্ষেপে তাদের অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি। কিন্তু এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাদের এই অনর্থক জওয়াব শুনে তিনি নিরতিশয় মনক্ষুণ্ন এবং দুঃখিত হলেন এবং তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে 'ফাসেক' (পাপাচারী) শব্দ ব্যবহার করলেন। সাজা হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও তাদেরকে ফাসেক নাম দেওয়া হলো এবং পবিত্র ভূমি থেকে চল্লিশ বছরের জন্য বঞ্চিত করে দেওয়া হলো। এছাড়া তাদেরকে উন্মুক্ত প্রান্তরে এমনভাবে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো যে, অস্থির হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা কেবল চলতেই থাকত। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল হযরত মূসা (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তাঁর বরকতে এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তির দিনগুলোতেও আল্লাহ্ তা'আলার অনেক নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। তারা তীহ্ প্রান্তরে যেদিকেই যেত, মেঘমালা তাদের মাথার উপর ছায়া দান করত। তাদের আহারের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল হতো। তাদের পোশাক অলৌকিকভাবে ময়লাযুক্ত হতো না এবং ছিন্ন হতো না। তাদেরকে একটি চৌকোণ পাথর দান করে মূসা (আ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন তাদের পানির প্রয়োজন হয়, তখন এই পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে। আঘাত করার সাথে সাথে পাথর বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। পাথরের প্রত্যেক দিক থেকে তিনটি করে ঝরনা প্রবাহিত হতো। বনী ইসরাইলের বারটি গোত্রের মধ্যে ঝরনাগুলো নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। তারা যখনই এক জায়গা থেকে সফর করে অন্য জায়গায় তাঁবু ফেলত, তখন পাথরটিকেও সেখানে বিদ্যমান দেখতে পেত।—(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে এটা সঠিক। কেননা মুআবিয়া (রা) ইবনে আব্বাসকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনে হাদীসে বর্ণিত এই বিষয়বস্তু অস্বীকার করলেন যে, কিবতীর হত্যাকারীর সন্ধান ঐ দ্বিতীয় কিবতী বলে দিয়েছিল, যার সাথে ইসরাইলী ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন লড়াইরত ছিল। কারণ এই যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্বিতীয় কিবতী কিছুই জানত না। এমতাবস্থায় সে এর খবর কিরূপে দিতে পারে। এ খবর তো একমাত্র ঝগড়াকারী ইসরাইলী ব্যক্তিই জানত।

মুআবিয়া (রা) হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে ইবনে আব্বাস (রা) রাগান্বিত হলেন এবং মুআবিয়ার হাত ধরে তাকে সা'দ ইবনে মালেক যুহরীর কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বললেন ঃ হে আবূ ইসহাক, তোমার স্মরণ আছে কি, যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূসা (আ)-এর হাতে নিহত কিবতীর হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন এই গোপন ভেদ ফাঁসকারী ও হত্যাকারীর সন্ধানদাতা ইসরাইলী ছিল, না দ্বিতীয় কিবতী? সা'দ ইবনে মালেক বললেন ঃ দ্বিতীয় কিবতীই ঘটনা ফাঁস করেছিল।

কেননা সে ইসরাইলীর মুখে এ কথা শুনেছিল যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড মূসা (আ) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। সেই ফিরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌছে দিয়েছিল। ইমাম নাসায়ী এই বিস্তারিত হাদীসটি 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে তফসীর অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

এই হাদীসটি ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁর তফসীর গ্রন্থে ইয়াযিদ ইবনে হারূনের সনদ দ্বারাই উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষ্য নয় ; বরং ইবনে আব্বাসের নিজের কথা। তিনি একে কা'ব আহ্বারের ঐ সব ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেগুলো উদ্ধৃত করা ও বর্ণনা করা বৈধ রাখা হয়েছে। তবে এতে কোথাও কোথাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাক্যাবলীও সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে আদ্যোপান্ত হাদীস ও তার উপর গবেষণা ও সত্যায়ন লিপিবদ্ধ করার পর বলেন ঃ আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়খ আবুল হাজ্জাজ মিযসী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের ন্যায় হাদীসটিকে মওকূফ অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের ভাষ্য বলতেন।

উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় : কোরআন পাক মূসা (আ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ শামিল হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে; তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ফিরাউনের বোকাসুলভ চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ঃ ফিরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে, তখন সে ইসরাইলী ছেলে সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে দিল। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলেমেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হতো, সেই বছর মূসা (আ)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার ছিল ; কিন্তু নির্বোধ ফিরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মূসা (আ)-কে ভূমিষ্ঠ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যাতে মূসা (আ) স্বয়ং এই আল্লাহ্দ্রোহী জালিমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফিরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে তাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করল। সারা দেশের ইসরাইলী ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর মূসা (আ) স্বয়ং ফিরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিড়ি অতিক্রম করছিলেন।

در بہ بند ودشمن اندرخانہ بود
حیلۂ فرعون زیں افسانہ بود

(দরজা বন্ধ করে দিল, অথচ শত্রু ভিতরেই রয়ে গেল। ফিরাউনের পরিকল্পনা এই কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি।)

মূসা-জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত এবং ফিরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ : মূসা (আ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ কবূল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শত্রু ফিরাউনের গৃহে এরপরও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে হতো। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মূসা (আ)-ও কোন কাফির মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে তাঁর পয়গম্বরকে কাফির মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন ; মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফিরাউনের পরিবার তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইল এবং উপঢৌকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হলো। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মূসা-জননী ফিরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফিরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হলো না। فتبارك الله احسن الخالقين

শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রমুখদের জন্যে একটি সুসংবাদ : এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মূসা (আ)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকেই দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। (ইবনে কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিস্ত্রী মসজিদ, খানকাহ্, মাদ্রাসা অথবা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণকাজ সৎ কাজে নিয়োজিত হবে, এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে—এজন্য এ কাজকে সে অন্য কাজের ওপর অগ্রাধিকার দেয় তবে সে মূসা জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে।

আল্লাহ্র বিশেষ বান্দারা প্রেমাস্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্ত হন, তাদেরকে যে-ই দেখে, সে-ই মহব্বত করে ঃ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى—আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাস্পদসুলভ সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন, পর, শত্রু, মিত্র সবাই মহব্বত করতে থাকে। পয়গম্বরদের স্তর অনেক উর্ধ্বে, অনেক ওলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

মূসা (আ)-এর হাতে ফিরাউনী কাফিরের হত্যাকে 'ভুলক্রমে হত্যা' কেন সাব্যস্ত করা হলো : মূসা (আ) জনৈক ইসরাইলী মুসলমানকে ফিরাউনী কাফিরের সাথে লড়াইরত দেখে ফিরাউনীকে ঘুষি মারলেন ; ফলে সে প্রাণত্যাগ করল। মূসা (আ) নিজেও এ কাজকে 'শয়তানের কাজ' আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন এই দেখা দেয় যে, ফিরাউনী ব্যক্তি কাফির হরবী ছিল। তার সাথে মূসা (আ)-এর কোন শান্তিচুক্তি ছিল না এবং তাকে যিম্মী কাফিরদের তালিকাভুক্তও করা যেত না, যাদের জানমাল ও সম্মানের হিফাযত করা মুসলমানদের

দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ছিল একান্তই হরবী কাফির। ইসলামী শরীয়তের আইনে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা গুনাহ্ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ ও ভুল কি কারণে সাব্যস্ত করা হলো ?

বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। আমি যখন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর নির্দেশে 'আহ্কামুল কোরআন' গ্রন্থের রচনায় ব্যস্ত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করায় তিনি উত্তরে বললেন : এ কথা ঠিক যে, এই ফিরাউনী কাফিরের সাথে সারাসরি ও প্রকাশ্য কোন শান্তি-চুক্তি অথবা যিম্মী হওয়ার চুক্তি ছিল না ; কিন্তু তখন মূসা (আ)-এরও রাজত্ব ছিল না এবং সেই ফিরাউনীরও ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফিরাউনের রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত চুক্তি। ফিরাউনীকে হত্যার ফলে এই কার্যগত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে 'ভুলক্রমে হত্যা' সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়-ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা (আ)-এর নবুয়তের পবিত্রতার পরিপন্থী নয়।

এ কারণেই মাওলানা থানভী (র) অবিভক্ত ভারতে কোন মুসলমানের পক্ষে কোন হিন্দুর আনমালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন না। কেননা মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সম্প্রদায়ই ইংরেজদের রাজত্বে বাস করত।

অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল ও পরকালে উপকারী : হযরত মূসা (আ) মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তারা অক্ষমতার কারণে তাদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। মহিলাদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মূসা (আ) একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার কাছেও পছন্দনীয় কাজ ছিল। তাই তিনি তাদের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে বিরাট। দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকেই প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শুআয়ব (আ)-এর সেবা ও তাঁর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হতো, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্বরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন।

দুই পয়গম্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক : এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা : মূসা (আ) শুআয়ব (আ)-এর গৃহে অতিথি হয়ে ফিরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিন্ত হলে শুআয়ব (আ) কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে আল্লাহ্র অনেক হিকমত এবং মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিদায়েত নিহিত আছে।

প্রথমত শুআয়ব (আ) আল্লাহ্র নবী ও রাসূল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসাফিরকে চাকরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই দুষ্কর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবত পয়গম্বরসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ কথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সৎসাহসী মূসা (আ) এ ধরনের আতিথ্য কবূল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে

বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে লেনদেনের পথ বেছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিয়ে তার গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাপ।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে রিসালত ও নবুয়ত দ্বারা ভূষিত করতে চাইতেন। এর জন্য যদিও কোনরূপ সাধনা ও কর্ম শর্ত নয় এবং কোন সাধনা ও কর্ম দ্বারা তা অর্জনও করা যায় না, কিন্তু আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরদেরকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথে পরিচালনা করেন। কেননা এটা মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। মূসা (আ)-এর জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাঁকজমকের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। শুআয়ব (আ)-এর সাথে শ্রম ও মজুরীর এই চুক্তিতে তাঁর চারিত্রিক লালন-পালনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল। সাধক শিরাজী তাই বলেন :

شبان وادی ایمن گهے رسد بمراد
که چند سال بجاں خدمت شعیب کند

তৃতীয়ত মূসা (আ)-এর কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গম্বরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণত পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বারবার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন ব্যাঘ্রের খোরাকে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামত পরিচালনা করার জন্য যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ক্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। পয়গম্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রূপ হয়ে থাকে। এতে পয়গম্বরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভ্যাসের পথই তাদেরকে অবলম্বন করতে হয়।

কাউকে কোন পদ ও চাকরী দান করার চমৎকার মাপকাঠি : এই কাহিনীতে শুআয়ব (আ)-এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাকে চাকর রাখা হোক। এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সে বলেছে যে, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই সর্বোত্তম চাকর হতে পারে। 'শক্তিশালী' বলে এখানে অর্পিত কাজের শক্তি ও যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে এবং 'বিশ্বস্ত' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তার সাবেক জীবনের অবস্থা তার সততা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেয়। আজকাল বিভিন্ন চাকরী এবং সরকারী ও বেসরকারী পদের জন্য প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মধ্যে যেসব গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তা সবই উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। বরং প্রচলিত বাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত শর্তাবলীর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়াদি সাধারণত পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয় না। কেননা সততা ও বিশ্বস্ততা আজকাল কোথাও বিবেচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় না; শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ডিগ্রীকেই মাপকাঠি ধরা হয়। আজকাল সরকারী ও বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হয়, তার অধিকাংশই এই সততা বিষয়ক মূলনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই ফল। শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা গুণ না থাকে, তবে সে কারচুপি ও ঘুষখোরীর এমন অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সিদ্ধহস্ত হয়, যা আইনের আওতায় পড়ে না। এ দোষটিই আজ বিশ্বের অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকেজো বরং ক্ষতিকর করে রেখেছে। এ কারণেই ইসলামী ব্যবস্থায় এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার সুফল বহু শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

জাদুকর ও পয়গম্বরদের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঃ ফিরাউন সমবেত জাদুকরদেরকে দেশ ও জাতির বিপদাশংকা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে ? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি আরম্ভ করে দিয়েছে।

এর বিপরীতে আল্লাহ্-প্রেরিত পয়গম্বরগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন : وَلَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ—অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্বগণের প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী বায়তুল মাল থেকে আলিম, মুফতী ও ওয়ায়েযদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তারা শিক্ষাদান, ওয়ায ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফিকাহ্‌বিদদের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলা বাহুল্য বিনিময় গ্রহণের ফলে তাদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ফিরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ : ফিরাউনী জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যত সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল ? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ—(জাদুর কারণে এগুলো ইতস্তত ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায় নি; বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে নজরবন্দী করে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ মনে হচ্ছিল।

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফিরউনী জাদুকরদের জাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার মত শক্তিশালী ছিল না।

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত নিন্দনীয় নয় ঃ ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এতে আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বনবী (সা) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে

একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেওয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মূসা (আ) যে বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্য অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্ প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্রসমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে। وَاللهُ اَعْلَمُ

সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা ঃ মূসা (আ) এক মাসের জন্য তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তূর পর্বতে ইবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হারূন (আ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত।

মুসলমানদের দলে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিরাটতম মন্দকে সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় ঃ মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলের মধ্যে গোবৎস পূজা অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হারূন (আ) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মূসা (আ)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন নি। এতে মূসা (আ) ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাইল শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ ـ

—অর্থাৎ আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিস্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি; কারণ তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন কর নি।

মূসা (আ)-ও তাঁর অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন নি, বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাময়িকভাবে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দুরস্ত হবে। وَاللهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ

মূসা (আ)-এর কাহিনীর উপরোল্লিখিত হিদায়েতসমূহের শেষে মূসা ও হারূন (আ)-কে একটি বিশেষ নিদর্শন সহকারে ফিরাউনকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই : فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি : এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙক্ষার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

ফিরাউন খোদায়ী-দাবিদার অত্যাচারী বাদশাহ্ ছিল এবং আপন সত্তার হিফাযতের জন্য বনী ইসরাইলের হাজারো ছেলে-সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল। তার কাছেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ পয়গম্বরদ্বয়কে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই জানতেন যে, ফিরাউন তার অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত হবে না ; কিন্তু যে নীতির মাধ্যমে মানবজাতি চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহ্‌ভীতির দিকে ফিরে আসে, পয়গম্বরগণকে সেই নীতির অনুসারী করা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফিরাউন হিদায়েত লাভ করুক বা না করুক ; কিন্তু নীতি এমন হওয়া চাই, যা হিদায়েত ও সংস্কারের উপায় হতে পারে।

আজকাল অনেক আলিম নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও দোষারোপকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছে। তাদের এ বিষয়ে বিশদ চিন্তাভাবনা করা উচিত।

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾

(৪৫) তাঁরা বলল : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের প্রতি যুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। (৪৬) আল্লাহ্ বললেন : তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। (৪৭) অতএব তোমরা

তাঁর কাছে যাও এবং বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তাঁর প্রতি শান্তি। (৪৮) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাঁর উপর আযাব পড়বে। (৪৯) সে বলল ঃ তবে হে মূসা, তোমাদের পালনকর্তা কে ? (৫০) মূসা বললেন ঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাঁর যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন মূসা ও হারূন এই নির্দেশ পেলেন, তখন) উভয়ে আরয করলেন : হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা প্রচারের জন্য হাযির আছি ; কিন্তু) আমরা আশংকা করি যে, (কোথাও) সে আমাদের প্রতি (প্রচারের পূর্বেই) যুলুম না করে বসে (ফলে প্রচারই না হয়) অথবা (ঠিক প্রচারের সময় কুফরে) মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন না করতে থাকে (যেন সার্তসতেরো কথা বলে প্রচারিত বক্তব্য নিজেও না শোনে এবং অন্যকেও শুনতে না দেয় ; যাতে তা প্রচার না করার অনুরূপ হয়ে যায়।) ইরশাদ হলো ঃ (এ বিষয়ে) ভয় করো না, (কেননা) আমি তোমাদের সাথে আছি—সব শুনি এবং দেখি। (আমি তোমাদের হিফাযত করব এবং তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেব। ফলে তোমরা পূর্ণরূপে প্রচার করতে পারবে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا অতএব তোমরা (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তার কাছে যাও এবং (তাকে) বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল (তিনি আমাদেরকে নবী করে প্রেরণ করেছেন)। অতএব (তুমি আমাদের আনুগত্য কর। তওহীদ মেনে নিয়ে বিশ্বাস সংশোধন কর এবং যুলুম থেকে বিরত হয়ে চরিত্র সংশোধন কর এবং) বনী ইসরাইলকে (যাদের প্রতি তুমি অন্যায় যুলুম কর—যুলুমের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে) আমাদের সাথে যেতে দাও (তারা যেখানে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা থাকবে) এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা (শুধু শুধুই নবুয়ত দাবি করি না ; বরং আমরা) তোমার কাছে তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (নবুয়তের) নিদর্শন (অর্থাৎ মু'জিযাও) নিয়ে আগমন করেছি। (সত্যায়ন ও সত্য গ্রহণের সুফল এই সামগ্রিক নীতি দ্বারা জানা যাবে যে,) যে (সরল) পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি (খোদায়ী আযাব থেকে) শান্তি। (এবং মিথ্যারোপ ও সত্য প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, (আল্লাহ্র) আযাব ঐ ব্যক্তির উপর পতিত হবে, যে (সত্যকে) মিথ্যারোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। (মোটকথা, এই পূর্ণ বিষয়বস্তু তাকে গিয়ে বল। সেমতে তাঁরা ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং তাকে সব শুনিয়ে দিলেন।) সে বলল ঃ তবে হে মূসা (বল তো শুনি) তোমাদের পালনকর্তা কে (তোমরা যার প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করছ ? জওয়াবে) মূসা (আ) বললেন ঃ আমাদের (বরং সবার) পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর (তাদের মধ্যে যারা প্রাণী ছিল, তাদেরকে তাদের

উপকারিতা ও উপযোগিতার প্রতি) পথ প্রদর্শন করেছেন। (তাই প্রত্যেক জন্তু তার উপযুক্ত খাদ্য, যুগল, বাসস্থান ইত্যাদি খুঁজে নেয়। সুতরাং তিনিই আমাদেরও পালনকর্তা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মূসা (আ) কেন ভয় পেলেন ? اِنَّنَا نَخَافُ —মূসা ও হারূন (আ) এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় اَنْ يَّفْرُطَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফিরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। দ্বিতীয় ভয় اَنْ يَّطْغٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মূসা (আ)-কে নবুয়ত ও রিসালত দান করা হলে তিনি হারূন (আ)-কে তাঁর সাথে শরীক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কবূল করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলে দেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا -

অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى –এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি ? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জিযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশংকা এই যে, ফিরাউন কথা শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়।

দ্বিতীয়ত, ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গম্বরের সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং মূসা (আ) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ لَا تَخَفْ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ — فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا এবং فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষনবী (সা) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক

সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহ্‌যাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাকীদ অনুযায়ী যে স্বভাবজাত ভয় পয়গম্বরদের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى—আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্ধির বাইরে।

মূসা (আ) ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাইলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান ঃ এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরগণ যেমন মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উম্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কোরআন পাকে মূসা (আ)-এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে সে তাঁর কাজে নিয়োজিত হয়েছে ঃ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা, বাতাস ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ করতে হবে। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশ্‌গুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ডও পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি, মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপৃত আছে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হাঁ, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনও অগ্নিও পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনও পানি অগ্নির কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নূহের জন্য করেছিল। اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا (তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল)। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিল ?

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল ? এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্ট জীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকেও কারও শিক্ষা ব্যতীত প্রাপ্ত হয়।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্ট জীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং এর বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল জিন ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়। বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন সওয়াব অথবা আযাবের অধিকারী হয়।

أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ—আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। মূসা (আ) ফিরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না। ফিরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং মূসা (আ)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্যিকার জওয়াব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা মূসা (আ)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রতিমা পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে ? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর উত্তরে মূসা (আ) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গোমরাহ্ ও জাহান্নামী। তখন ফিরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফিরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গম্বর মূসা (আ) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফিরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ (٥١) قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ
رَبِّي وَلَا يَنسَى (٥٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ
فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ
شَتَّىٰ (٥٣) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (٥٤) مِنْهَا
خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٥) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا
كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٦) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ (٥٧) فَلَنَأْ

لَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ

مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

(৫১) ফিরাউন বলল ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি ? (৫২) মূসা বলল ঃ তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না। (৫৩) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় এ থেকেই উত্থিত করব। (৫৬) আমি ফিরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল ঃ হে মূসা তুমি কি জাদুর জোরে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য আগমন করেছ ? (৫৮) অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব! সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে। (৫৯) মূসা বলল ঃ তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ফিরাউন أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ আয়াতের বক্তব্যে সন্দেহ করল এবং) বলল ঃ আচ্ছা তা হলে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি ? (তারা তো পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত। তাদের উপর কোন আযাব নাযিল হয়েছে ?) মূসা (আ) বললেন ঃ (আমি এরূপ দাবি করিনি যে, সেই প্রতিশ্রুত আযাব দুনিয়াতেই আসবে। বরং তা কোন সময় দুনিয়াতেও আসে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। সেমতে) তাদের (কুকর্মের) খবর আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে (অবশ্য তার জন্য আমলনামার প্রয়োজন নেই; কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে আমলনামাই রাখা হয়েছে। মোটকথা, তাদের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে এবং) আমার পালনকর্তা (এমন জ্ঞানী যে,) ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। [সুতরাং তাদের ক্রিয়াকর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান তাঁর আছে। কিন্তু তিনি আযাবের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সময় এলেই তাদের উপর আযাব জারি করা হবে। অতএব দুনিয়াতে আযাব না এলে জরুরী নয় যে, কুফর ও শিরক আযাবের কারণ নয়। এ পর্যন্ত মূসা (আ)-এর বক্তব্য পেশ করা হলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পালনকর্তার কিছু বিবরণ দান করছেন। যার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মূসা

(আ)-এর এই বাক্যে ছিল ঃ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى الخ لَايَضِلُّ رَبِّىْ الخ ـــ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ الخ তাই ইরশাদ হচ্ছে যে,] তিনি (পালনকর্তা) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা (সদৃশ) করেছেন, (তোমরা এর উপর আরাম কর) এবং এতে তোমাদের (চলার) জন্য পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা (পানি) দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছি যে,) নিজেরা (ও) খাও এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদেরকে (ও) চরাও। (উল্লিখিত) এসব বস্তুর মধ্যে বিবেকবানদের (বোঝার) জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (উদ্ভিদকে যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন করি, তেমনিভাবে) আমি তোমাদেরকে এ মাটি থেকেই (প্রথমে) সৃজন করেছি (আদম মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে সবার দূরবর্তী উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।) এতেই আমি তোমাদেরকে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে দেব (মৃত ব্যক্তি যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, দেরীতে হলেও পরিণামে মাটির সাথে মিশে যাবে।) এবং (কিয়ামতের দিন) পুনর্বার এ থেকেই আমি তোমাদেরকে বের করব।

আমি ফিরাউনকে আমার (ঐ) সব নিদর্শন দেখিয়েছি, [যা মূসা (আ)-কে দান করা হয়েছিল] অতঃপর সে মিথ্যাই আরোপ করেছে এবং অস্বীকারই করেছে। সে বলল ঃ হে মূসা, তুমি আমাদের কাছে (এ দাবি নিয়ে) এজন্যে এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে জাদুর জোরে বহিষ্কার করে দেবে। (এবং নিজে জনগণকে মুগ্ধ ও অনুগত করে সরদার হয়ে যাবে)। অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর ; যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না। কোন সমতল ময়দানে (যাতে সবাই দেখে নেয়)। মূসা (আ) বললেন ঃ তোমাদের (মুকাবিলার) ওয়াদার দিন (তোমাদের) মেলার দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হয়ে যাবে। (বলা বাহুল্য, মেলার স্থান সমতল ভূমিই হয়ে থাকে। এতেই مكان سوى এর শর্তটিও পূর্ণ হয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتَابٍ لَايَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى—ফিরাউন অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মূসা (আ) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ, ও জাহান্নামী, তবে ফিরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করে। এ কথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও মূসা (আ)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। মূসা (আ) এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফিরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে 'সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেনি।' তিনি বললেন ঃ তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى — أَزْوَاجٌ শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَتَّى শব্দটি شَتِيت এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতাগুল্ম, ফলফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। فتبارك الله احسن الخالقين—তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ অর্থাৎ এতে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্যে। نُهَى শব্দটি نُهْيَةٌ-এর বহুবচন। বিবেককে نهية (নিষেধকারক) বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে ঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ — مِنْهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে; অথচ এক আদম (আ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। আদম (আ)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে 'তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি' বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আ)। তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন ঃ সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারও কারও মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বোঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ্র জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবু নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাযকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন :

هذا حديث غريب من حديث عون لم نكتبه الا من حديث عاصم بن نبيل وهو احد الثقات الاعلام من اهل الصدرة -

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন ঃ যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই

মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন : مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ—(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন : আমি, আবূ বকর ও উমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন : হাদীসটি গরীব। ইবনে জওযী একে মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (রহ) বলেন : এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়। —(মাযহারী)

مَكَانًا سُوًى—ফিরাউন মূসা (আ) ও জাদুকরদের মুকাবিলার জন্য নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফিরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী-ইসরাইলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত—যাতে কোন পক্ষকেই বেশি দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। মূসা (আ) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى —অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সাজসজ্জার দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য—ঈদ অথবা কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্ দিন ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন : ফিরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো। কেউ কেউ বলেন : এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন : এটা শনিবার ছিল যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারও মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য : হযরত মূসা (আ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে ওঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

জাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান ঃ এই বিষয়বস্তু বিস্তারিত বর্ণনাসহ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডের সূরা বাক্বারায় হারূত ও মারূতের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব সেখানে দেখে নেয়া উচিত।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ
مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ
ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ
وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾
قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا
صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا
قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۭ اِنَّهٗ
لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ
خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۡ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا
وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا
فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۭ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّآ اٰمَنَّا
بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرٌ

وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا

وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ

الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

(৬০) অতঃপর ফিরাউন প্রস্থান করল এবং তাঁর সব কলাকৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত হলো। (৬১) মূসা (আ) তাদেরকে বললেন ঃ দুর্ভাগ্য তোমাদের ; তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সেই বিফলমনোরথ হয়েছে। (৬২) অতঃপর তাঁরা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তাঁরা বলল ঃ এই দুইজন নিশ্চিতই জাদুকর, তাঁরা তাদের জাদুর দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা রহিত করতে চায়। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। (৬৫) তাঁরা বলল ঃ হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। (৬৬) মূসা বললেন ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললাম ঃ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তাঁরা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তাঁরা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কলাকৌশল। জাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (৭০) অতঃপর জাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তাঁরা বলল ঃ আমরা হারূন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (৭১) ফিরাউন বলল ঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই ? তোমরা কি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী। (৭২) জাদুকররা বলল ঃ আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তাঁর উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। (৭৩) আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি—যাতে তিনি আমাদের

পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। (৭৪) নিশ্চয় যে তাঁর পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তাঁর জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা। (৭৬) বসবাসের এমন পুষ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তাঁরা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (একথা শুনে) ফিরাউন (দরবার থেকে স্বস্থানে) প্রস্থান করল এবং তার কলাকৌশলের (অর্থাৎ জাদুর) উপকরণাদি জমা করতে লাগল ও (সবাইকে নিয়ে নির্ধারিত ময়দানে) উপস্থিত হলো। (তখন) মূসা (আ) তাদেরকে (অর্থাৎ উপস্থিত জাদুকরদেরকে) বললেন ঃ ওহে হতভাগারা, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো না (অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব অথবা একত্ববাদ অস্বীকার করো না কিংবা তাঁর প্রকাশকৃত মু'জিযাসমূহকে জাদু বলে দিও না।) তাহলে তিনি তোমাদেরকে কোন প্রকার আযাব দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে (পরিণামে) বিফল মনোরথ হয়। অতঃপর জাদুকররা (একথা শুনে তাঁদের উভয়ের সম্পর্কে) পরস্পর বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (অবশেষে সবাই একমত হয়ে) বলল ঃ নিশ্চিতই তারা দুইজন জাদুকর। তাদের মতলব এই যে, তারা তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবে এবং তোমাদের উত্তম (ধর্মীয়) জীবন-ব্যবস্থাও রহিত করে দেবে। অতএব তোমরা সম্মিলিতভাবে নিজেদের কলাকৌশল সুসংহত কর এবং সারিবদ্ধ হয়ে (মোকাবিলায়) আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম। (অতঃপর) তারা মূসা (আ)-কে বলল ঃ হে মূসা, (বল) তুমি (তোমার লাঠি) প্রথমে নিক্ষেপ করবে, না আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করব ? মূসা (অত্যন্ত বেপরওয়া হয়ে) বললেন ঃ না, প্রথমে তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সেমতে তারা তাদের দড়ি ও লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করল এবং নজরবন্দী করে দিল)। হঠাৎ তাদের দড়ি ও লাঠিসমূহ নজরবন্দীর কারণে মূসা (আ)-এর কল্পনায় এমন মনে হলো, যেন (সেগুলো সাপের মত) ছুটোছুটি করছে। অতঃপর মূসা (আ) মনে মনে কিছুটা ভীত হলেন। [তিনি আশংকা করলেন যে, এসব দড়ি ও লাঠিও যখন দৃশ্যত সাপ হয়ে গেছে এবং আমার লাঠি নিক্ষেপ করলে তা-ও বড়জোর সাপ হয়ে যাবে, তখন দর্শকরা তো উভয় বস্তুকেই একই মনে করবে। এতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে হবে ? এই ভীতি স্বভাবের তাগিদে ছিল। নতুবা মূসা (আ) পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন এর যাবতীয় উত্থান-পতনের ব্যবস্থাও তিনিই করবেন এবং তাঁর রাসূলের প্রতি পর্যাপ্ত সাহায্য করবেন। মানসিক কল্পনার স্তরে অবস্থিত এই স্বাভাবিক ভয় কামালিয়তের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, এই ভয় দেখা দেওয়ায় তাঁকে] আমি বললাম ঃ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (বিজয় এভাবে হবে যে) তোমার ডান হাতে যা আছে, তা তুমি নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ লাঠি), তারা যা কিছু (অভিনয়) করেছে এটা (অর্থাৎ এই লাঠি) সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে,

কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হও। فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا —সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মুকাবিলা করল।

জাদুকররা তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে মূসা (আ)-কে বলল ঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মূসা (আ) জওয়াবে বললেন ঃ بَلْ اَلْقُوْا —অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। মূসা (আ)-এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। জাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। মূসা (আ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে মূসা (আ)-এর সামনে তাদের জাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই তিনি তাঁর মু'জিযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা মূসা (আ)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগল।

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى —এ থেকে জানা যায় যে, ফিরাউনী জাদুকরদের জাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে ; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এরূপই হয়ে থাকে।

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى —অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে মূসা (আ)-এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হলো ; কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন—প্রকাশ হতে দেন নি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না ; বরং তিনি আশংকা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى এতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, জাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। এভাবে মূসা (আ)-এর উপরোক্ত আশংকা দূর করে দেওয়া হয়েছে।

وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ —মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে মূসা (আ)-এর লাঠি বুঝানো হয়েছে ; কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর কোন মূল্য নেই। এজন্য

পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। মূসা (আ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

জাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ঃ মূসা (আ)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ-কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জিযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ্র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল ঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা, ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তোলেনি, যতক্ষণ আল্লাহ্র কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোযখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়।—(রূহুল মা'আনী)

قَالَ اٰمَنۡتُمۡ لَهٗ قَبۡلَ اَنۡ اٰذَنَ لَكُمۡ —আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফিরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগলঃ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে ? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোন কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জিযা দেখার পর কারও অনুমতির আবশ্যকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল ঃ এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ।

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيۡدِيَكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ مِّنۡ خِلَافٍ —এখন ফিরাউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফিরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফিরাউন এ পন্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে। وَلَاُصَلِّبَنَّكُمۡ فِىۡ جُذُوۡعِ النَّخۡلِ অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

قَالُوۡا لَنۡ نُّؤۡثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الۡبَيِّنٰتِ وَالَّذِىۡ فَطَرَنَا জাদুকররা ফিরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বললঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মু'জিযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরামা বলেন ঃ জাদুকররা যখন সিজদায় গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল ঃ এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না।—(কুরতুবী) এবং জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমীনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। فَاقۡضِ مَاۤ اَنۡتَ قَاضٍ —এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে

সাজা দেবার ইচ্ছা, দাও। إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا —অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্‌র অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ —জাদুকররা এখন ফিরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মুকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মুকাবিলার জন্য দর কষাকষিও ফিরাউনের সাথে করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফিরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরূপে শুদ্ধ হবে ? এর এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জিযার মুকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফিরাউন তাদেরকে মুকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও বর্ণনা করা হয় যে, ফিরাউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। —(রূহুল মা'আনী)

ফিরাউন-পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া মুকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূন (আ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হলো, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন ঃ আমিও মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্নীর সংবাদ শুনে ফিরাউন আদেশ দিল ঃ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

ফিরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঃ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا থেকে ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ—এসব বাক্যও প্রকৃত সত্য যা খাঁটি ইসলামী বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আ)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে ওলীত্বের ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত

হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়র বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফির জাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ্‌র ওলী ও শহীদ হয়ে গেল।-(ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

---

(৭৭) আমি মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ও করো না। (৭৮) অতঃপর ফিরাউন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) ফিরাউন তাঁর সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সৎ পথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মান্না' ও সালওয়া' নাযিল করেছি। (৮১) বলেছি ঃ আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়। (৮২) আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তাঁর প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (যখন ফিরাউন এরপরও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং কিছুকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাপার ও ঘটনা ঘটল, তখন) আমি মূসা (আ)-এর কাছে ওহী নাযিল করলাম যে, আমার (এই) বান্দাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে মিসর থেকে) রাত্রিযোগে (বাইরে) নিয়ে যাও (এবং দূরে চলে যাও—যাতে ফিরাউনের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে তারা মুক্তি পায়)। অতঃপর (পথিমধ্যে যে সমুদ্র পড়বে) তাদের জন্য সমুদ্রে (লাঠি মেরে) শুষ্ক পথ নির্মাণ কর (অর্থাৎ লাঠি মারতেই শুষ্ক পথ হয়ে যাবে)। পেছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা করো না (কেননা, পশ্চাদ্ধাবন করলেও পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সফল হবে না।) এবং অন্য কোন প্রকার (উদাহরণত ডুবে যাওয়ার) ভয়ও করো না। [বরং নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে পার হয়ে যাবে। নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ) তাদেরকে রাত্রিযোগে বের করে নিয়ে গেলেন। সকালে মিসরে খবর ছড়িয়ে পড়ল।] অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (এদিকে আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী বনী ইসরাইল সমুদ্র পার হয়ে গেল। সামুদ্রিক পথগুলো তখনও তদবস্থায়ই ছিল, যেমন অন্য এক আয়াতে আছে وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ফিরাউনীরা ব্যস্ততার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে এসব পথে নেমে পড়ল। যখন সবাই মাঝখানে এসে গেল) তখন (চতুর্দিক থেকে) সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি জমা হয়ে) তাদেরকে যেভাবে ঢেকে নেওয়ার ছিল, ঢেকে নিল (এবং সবাই সলিলসমাধি লাভ করল)। ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে এবং সৎ পথ দেখায়নি (যা সে দাবি করত وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ —ভ্রান্তপথ এজন্য যে, ইহকালেরও ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ সবাই ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও ক্ষতি হয়েছে। কেননা, তারা জাহান্নামী হয়েছে ; যেমন আয়াতে আছে اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ। ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধারের পর বনী ইসরাইলকে আরও অনেক নিয়ামত দান করা হয় ; উদাহরণত তওরাত এবং মান্না ও সালওয়া দান করা। এসব নিয়ামত দিয়ে আমি বনী ইসরাইলকে বললাম ঃ) হে বনী ইসরাইল, (দেখ,) আমি (কি কি নিয়ামত দিয়েছি) তোমাদেরকে তোমাদের (এত বড়) শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের কাছে (অর্থাৎ তোমাদের পয়গম্বরের কাছে তোমাদের উপকারার্থে) তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে আসার (অর্থাৎ যেখানে আসার পর তওরাত দানের) ওয়াদা করেছি এবং (তীহ উপত্যকায়) আমি তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি (এবং অনুমতি দিয়েছি যে) আমার দেওয়া উত্তম (হালাল হওয়ার কারণে শরীয়তদৃষ্টে উত্তম এবং সুস্বাদু হওয়ার কারণে স্বভাবগতভাবেও উত্তম) বস্তুসমূহ খাও এবং এতে (অর্থাৎ খাওয়ার মধ্যে) সীমালংঘন করো না। [উদাহরণত অবৈধভাবে উপার্জন করো না (দুররে) অথবা খেয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ো না।] তাহলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে। যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে, সে সম্পূর্ণ নেস্তনাবুদ হয়ে যায়। (পক্ষান্তরে এটাও স্মর্তব্য যে) যে (কুফর ও গুনাহ্ থেকে) তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, অতঃপর (এ পথে) কায়েম (ও) থাকে (অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম অব্যাহত রাখে) আমি এরূপ লোকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীলও। (আমি

এই বিষয়বস্তু বনী ইসরাইলকে বলেছিলাম। কেননা, নিয়ামত স্মরণ করানো, কৃতজ্ঞতার আদেশ, গুনাহে নিষেধ, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শনও ধর্মীয় নিয়ামত বিশেষ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى —যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জিযা ও জাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং মূসা ও হারূন (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাইল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। তাই মূসা (আ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসুল-ফুতূনে' উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা (আ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে ঃ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল।—(কুরতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাইলের কিছু অবস্থা ঃ তাদের সংখ্যা ও ফিরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ঃ তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আ) রাত্রির সূচনাভাগে বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী ইসরাইল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাইলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহ্র কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর আমলে বনী ইসরাইল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফিরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে

সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্যসাগর দেখে বনী ইসরাইল ঘাবড়ে গেল এবং মূসা (আ)-কে বলল : اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আ) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল ! কিন্তু ফিরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল : এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ বাক্যের সারমর্ম তাই। —(রূহুল-মা'আনী)

وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী ইসরাইলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে মূসা (আ)-কে তওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাইল স্বয়ং তাঁর বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাইল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ্ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও মূসা (আ)-এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশায়ও নানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এসব নিয়ামতেরই অন্যতম যা তাদের আহারের জন্য দেওয়া হতো।

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ
وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٤﴾ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ
مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ
غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ

عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُّمْ أَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا
أَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ
لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰذَا إِلٰهُكُمْ وَإِلٰهُ مُوسٰى فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا
يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

(৮৩) হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন ? (৮৪) তিনি বললেন ঃ এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (৮৫) বললেন ঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৮৬) অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি ? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে ? (৮৭) তারা বলল ঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের উপর ফিরাউনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরি করে বের করল একটা গো-বৎস—একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল ঃ এটা তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, অতঃপর মূসা ভুলে গেছে। (৮৯) তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[আল্লাহ্ তা'আলা যখন তওরাত দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন মূসা (আ)-কে তূর পর্বতে আসার আদেশ দিলেন এবং সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যককেও সাথে আনার আদেশ দিলেন।—(ফতহুল-মান্নান) মূসা (আ) আগ্রহের আতিশয্যে সবার আগে একা চলে গেলেন এবং অন্যরা স্বস্থানে রয়ে গেল ; তূর পর্বতে যাওয়ার ইচ্ছাই করল না। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ] হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়ের পূর্বে তোমার দ্রুত আসার কারণ কি সংঘটিত হলো ? তিনি (নিজ ধারণা অনুযায়ী) বললেন ঃ এই তো

তারা আমার পেছনে আসছে। আমি (সবার আগে) আপনার কাছে (অর্থাৎ যেখানে আপনি বাক্যালাপের ওয়াদা করেছেন) তাড়াতাড়ি এসে গেছি, যাতে আপনি (অধিক) সন্তুষ্ট হন। (কেননা, আদেশ পালনে ত্বরা করা অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।) তিনি বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায়কে তো আমি তোমার (চলে আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তাদেরকে সামেরী পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে (فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا–বলে এ কথা পরে বর্ণনা করা হয়েছে। فَتَنَّا বলে আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজটিকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। কারণ প্রত্যেক কাজের স্রষ্টা তিনিই। নতুবা এ কাজটি আসলে সামেরীর, যা اَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে।) মোটকথা, মূসা (আ) (মেয়াদ শেষ হওয়ার পর) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম (ও সত্য) ওয়াদা দেননি (যে, আমি তোমাদেরকে একটি বিধি-বিধানের গ্রন্থ দেব, এই গ্রন্থের জন্য তোমাদের অপেক্ষা করা জরুরী ছিল) তবে কি তোমাদের উপর দিয়ে (নির্দিষ্ট মেয়াদের চাইতে অনেক) বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল (যে, তা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছ, তাই নিজেরাই একটি ইবাদত উদ্ভাবন করে নিয়েছ) ? না (নিরাশ না হওয়া সত্ত্বেও) তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, এ জন্য তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা [অর্থাৎ আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা কোন নতুন কাজ করব না এবং আপনার প্রতিনিধি হারূন (আ)-এর আনুগত্য করব] ভঙ্গ করলে ? তারা বলল ঃ আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি ; (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেউ জোর-জবরে তাদের দ্বারা একাজ করিয়ে নিয়েছে ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মুক্ত মনে প্রথমে যে অভিমত অবলম্বন করেছিলাম, তার বিপরীতে সামেরীর কাজ আমাদের জন্য সন্দেহের কারণ হয়ে গেছে। ফলে আমরা পূর্ববর্তী অভিমত অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন করিনি ; বরং অভিমত বদলে গেছে ; যদিও আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছি। সেমতে পরে বলা হচ্ছে) কিন্তু আমাদের উপর (কিবতী) সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা (সামেরীর কথায় অগ্নিকুণ্ডে) নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এরপর সামেরীও এমনিভাবে (তার অলঙ্কার) নিক্ষেপ করেছে। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাহিনীর এভাবে উপসংহার টেনেছেন,) অতঃপর সে (সামেরী) তাদের জন্য তৈরি করে বের করে আনল একটি গো-বৎস একটি অবয়ব (গুণাবলী থেকে মুক্ত), যাতে একটি (অর্থহীন) শব্দ ছিল। (এর সম্পর্কে বোকা) লোকেরা বললঃ এটা তোমাদের এবং মূসারও মাবুদ (এর ইবাদত কর) মূসা তো ভুলে গেছে (ফলে আল্লাহ্র তালাশে তূর পর্বতে চলে গেছে। আল্লাহ্ তাদের এই বোকামি প্রসূত দৃষ্টতার জওয়াবে বলেন ঃ তারা কি দেখে না যে, এটা (পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে) তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারে না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। (এমন অকর্মন্য বস্তু খোদা হবে কিরূপে ? সত্য মাবুদ পয়গম্বরদের মাধ্যমে বাক্যালাপ অবশ্যই-করেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যখন মূসা (আ) ও বনী ইসরাইল ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাইল বলতে লাগল ঃ তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ্ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোন আল্লাহ্ বানিয়ে দাও। মূসা (আ) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জওয়াবে বললেন ঃ তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল।

اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হলো। মূসা (আ) বনী ইসরাইলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে মূসা (আ)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌঁছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোযা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারূন (আ)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী ইসরাঈল হারূন (আ)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মূসা (আ) দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মূসা (আ)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

মূসা (আ) তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسٰى হে মূসা ! তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে।

ত্বরা করা সম্পর্কে মূসা (আ)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য ঃ মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তূর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাইল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য। (ইবনে-কাসীর) রূহুল মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে ঃ এই প্রশ্নের কারণ ছিল মূসা (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই ত্বরা করার জন্য হুঁশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ত্রুটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। 'ইনতিসাফ'

গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মূসা (আ)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত; যেমন লূত (আ)-এর ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মু'মিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাক। وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াবে মূসা (আ) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেনঃ আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি ; কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাইলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল ? ঃ কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ফিরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে মূসা (আ)-এর প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মূসা (আ) যখন বনী ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সেও সাথে রওয়ানা হয়। কারও মতে সে বনী ইসরাইলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ এই পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনরূপে মিসরে পৌঁছে সে বনী ইসরাইলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। (কুরতুবী) কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে ঃ সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পূজা করত। সে মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এই ঃ সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফিরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাইলী ছেলে-সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফিরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্রহত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে শিশুর হিফাযত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাইলকে পথভ্রষ্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই এ ক'টি ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

اذا المرء لم يخلق سعيد اتحيرت
عقول مربية وخاب المؤمل
فموسى الذى رباه جبريل كافر
وموسى الذى رباه فرعون مؤمن

কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মূসাকে জিবরাঈল লালন-পালন করেছেন, সে তো কাফির হয়ে গেল এবং যে মূসাকে অভিশপ্ত ফিরাউন লালন-পালন করেছে, সে আল্লাহ্র রাসূল হয়ে গেল।

اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا হযরত মূসা (আ) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাইলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলা বাহুল্য, তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাইলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ --অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোন দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ।

اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ—অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই ; এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গযব ডেকে আনছ।

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا — ملك শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হই নি ; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য, তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করে নি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে ঃ

وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ — اوزار শব্দটি وزر এর বহুবচন। অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وزر এবং পাপরাশিকে اوزار বলা হয়। زينت শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফিরাউনের কওমকে বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাইল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে اوزار তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরৎ দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরৎ দেওয়া হয় নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। 'হাদীসুল ফুতূন' নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিলঃ এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফিরদের মাল মুসলমানদের জন্য কখন হালাল ? ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফির মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফিরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্য হালাল নয়; কিন্তু যেসব কাফির ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী নয় এবং যাদের সাথে কোন চুক্তিও হয়নি—ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় যাদেরকে 'কাফির হরবী' বলা হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হারূন (আ) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফির হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল; কিন্তু তা গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ মালের) মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব-কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাফিরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েয ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয নয়। বরং গনীমতের মাল একত্র করে কোন টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানী আগুন (বজ্র ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবূল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনীমতের মালকে আসমানী আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জিহাদ কবূল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হতো। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে করীম (সা)-এর শরীয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাইলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে اوزار (পাপরাশি) শব্দ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারূন (আ)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ কিন্তু ফিকাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সুরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফির হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনীমতের মাল হয় না; বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জোরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। একারণেই সুরখসী গ্রন্থে مغالبه بالمحاربه অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফির হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনীমতের মাল নয়; বরং একে مال فيئ অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ মাল বলা হয়। এরূপ মাল হালাল হওয়ার জন্য কাফিরদের সম্মতি ও অনুমতি শর্ত; যেমন কোন ইসলামী রাষ্ট্র কাফিরদের উপর কর ধার্য করে দেয় এবং আরা তা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও কোন জিহাদ ও যুদ্ধ নেই; কিন্তু সম্মতিক্রমে প্রদত্ত এই মালও অনায়াসলব্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালাল।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে কোন জিহাদ ও যুদ্ধ হয় নি এবং অনায়াসলব্ধ মালও নয়; কারণ এগুলো তাদের কাজ

থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাইলের মালিকানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামী শরীয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের কাফিরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাঁকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করত এবং তাঁকে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে সম্বোধন করত। রাসূলে করীম (সা) তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সযত্ন তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই মালকে গনীমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেন নি। এরূপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশ্নই উঠত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فَقَذَفْنَاهَا অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ হাদীসে ফুতূনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হারূন (আ) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌছল এবং হারূন (আ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমিও নিক্ষেপ করব ? হারূন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারূন (আ)-কে বলল ঃ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব–নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারূন (আ)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলঙ্কারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাঈল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারূন (আ)-এর দোয়ার বরকতে হোক—অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারূন (আ)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাইলকে অলঙ্কারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল,

অতঃপর এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়েএকটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছিল কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরোক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। (এসব রেওয়ায়েত কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোন প্রমাণ নেই।

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ—অর্থাৎ সামেরী এসব অলংকার দ্বারা একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরী করে দিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। جسد (অবয়ব) শব্দ দৃষ্টে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল—তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হতো। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ—অর্থাৎ আওয়াজকারী গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল ঃ এটাই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলের অবস্থা ওযর বর্ণিত হলো। মূসা (আ)-এর ক্রোধ দেখে তারা ওযর পেশ করেছিল। এরপর ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا—বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে আল্লাহ্র কি সম্পর্ক ? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোন জওয়াব দিতে পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ্ মেনে নেওয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি ?

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰرُونُ مِن قَبْلُ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ﴿٩٠﴾ قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَٰكِفِينَ
حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالَ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ
ضَلُّوٓا۟ ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ
بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ
إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ﴿٩٤﴾

(৯০) হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন ঃ হে আমার কওম, তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (৯১) তারা বলল ঃ মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা সর্বদা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে বসে থাকব। (৯২) মূসা বললেন ঃ হে হারূন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল (৯৩) আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ ? (৯৪) তিনি বললেন ঃ হে আমার জননী-তনয়, আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো না ; আমি আশংকা করলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা স্মরণে রাখ নি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদেরকে হারূন [(আ) মূসা (আ)-এর ফিরে আসার] পূর্বেই বলেছিলেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা এর (অর্থাৎ গো-বৎসের) কারণে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছ (অর্থাৎ এর পূজা কোনরূপেই দুরস্ত হতে পারে না। এটা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা)। এবং তোমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহ্ (—এ গোবৎস নয়)। অতএব তোমরা (ধর্মের ব্যাপারে) আমার পথে চল এবং (এ সম্পর্কে) আমার আদেশ মেনে চল (অর্থাৎ আমার কথা ও কাজের অনুসরণ কর) তারা উত্তর দিল ঃ আমরা তো যে পর্যন্ত মূসা (আ) ফিরে না আসেন, এরই (পূজার) সাথে সর্বদা অবিচল হয়ে বসে থাকব। [মোটকথা, তারা হারূন (আ)-এর উপদেশ কানে তুলল না। অবশেষে মূসা (আ) ফিরে এলেন এবং প্রথমে কওমকে সম্বোধন করলেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এরপর হারূন (আ)-কে সম্বোধন করে] বললেন ঃ হে হারূন, যখন তুমি দেখলে যে, তারা (সম্পূর্ণ) পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন আমার কাছে চলে আসতে তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল ? (অর্থাৎ তখন আমার কাছে তোমার চলে আসা উচিত ছিল, যাতে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করত যে, তুমি তাদের কাজকে অপছন্দ কর। এছাড়া এমন বিদ্রোহীদের সাথে যত বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা যায়, ততই ভাল)। তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ ? (আমি বলেছিলাম যে, لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ।—নবম পারায় উল্লিখিত এ বাক্যের অর্থ এই যে, তুমি দুষ্কৃতিকারীদের অনুসরণ করো না। দুষ্কৃতিকারীদের সাথে সম্পর্ক না রাখা এবং পৃথক হয়ে যাওয়াও এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত)। হারূন (আ) বললেন ঃ হে আমার জননী-তনয় (অর্থাৎ আমার ভাই), তুমি আমার শ্মশ্রু এবং মাথার চুল ধরো না (এবং আমার ওযর শুনে নাও। তোমার কাছে চলে না আসার কারণ ছিল এই যে) আমি আশংকা করলাম যে, (আমি তোমার কাছে রওয়ানা হলে আমার সাথে তারাও রওয়ানা হবে, যারা গো-বৎস পূজায় শরীক হয় নি। ফলে বনী ইসরাঈল দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কারণ গো-বৎস পূজার নিন্দাকারীরা আমার সাথে থাকবে এবং অন্যরা এর পূজারই অবিচল হয়ে থাকবে। এমতাবস্থায়) তুমি বলবে ঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ (এটা কোন কোন ক্ষেত্রে সহ-অবস্থানের চাইতে অধিক ক্ষতিকর হয়। কেননা দুষ্কৃতিকারীরা খালি মাঠ পেয়ে নিঃসংকোচে দুষ্কৃতি

বাড়িয়ে যেতে থাকে।) এবং তুমি (আমার) আদেশকে মর্যাদা দাও নি। (আমি তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ এমতাবস্থায় তুমি আমাকে অভিযুক্ত করতে যে, আমি তো তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম ; কিন্তু তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অনর্থ খাড়া করেছ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী ইসরাইলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হারূন (আ) মূসা (আ)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন ; কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হারূন (আ)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বার হাজার বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) অবশিষ্ট দুই দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল স্বীকার করল, মূসা (আ) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ)ও ফিরে এসে গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যে ভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে হারূন (আ) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন ; কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

মূসা (আ) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাইলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হারূন (আ)-কে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শ্মশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন ঃ তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাইল প্রকাশ্যে গোমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন ?

مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا اَلَّا تَتَّبِعَنِ এখানে অনুসরণের এক অর্থ তো তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মূসা (আ)-এর কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থও করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মুকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারূন (আ)-এর বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান মূসা (আ)-এর মতে ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। হারূন (আ) এই কাঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মূসা (আ)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননীতনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারূন (আ) এরূপ ওযর বর্ণনা করলেন ঃ আমি আশংকা করলাম যে, তোমরা ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে

তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় اخلفنى فى قومى واصلح। বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। (কারণ এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে)। কোরআন পাকের অন্যত্র হারূন (আ)-এর ওযরের মধ্যে এ কথাও রয়েছে ঃ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي। অর্থাৎ বনী ইসরাইল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা অন্যদের মুকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথী নগণ্য সংখ্যক ছিল। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওযরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রষ্টতার সাথী ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার বনী ইসরাইলই আমার সাথে থাকত ; অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওযর শুনে মূসা (আ) হারূন (আ)-কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্গাতা সামেরীর খবর নিলেন। কোরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়গম্বরদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক ঃ এ ঘটনায় মূসা (আ)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হারূন (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ-অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে মূসা (আ)-এর কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপরপক্ষে হারূন (আ)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল এই যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাইল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, মূসা (আ) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতা এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকে এ উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী জ্ঞান করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তাভাবনার পাত্র। কোন এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গুনাহ্গার অথবা নাফরমান বলা যায় না। মূসা (আ) কর্তৃক হারূন (আ)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতি- ক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা

জানার পূর্বে তিনি হারুন (আ)-কে প্রকাশ্য ভুলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওযর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾
قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ
مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ لَنُحَرِّقَنَّهٗ
ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

(৯৫) মূসা বললেন ঃ হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি ? (৯৬) সে বলল ঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নিচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল। (৯৭) মূসা বললেন ঃ দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি ঃ 'আমাকে স্পর্শ করো না' এবং তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা একে জ্বালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। (৯৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। সব বিষয় তার জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[অতঃপর মূসা (আ) সামেরীর দিকে মুখ করলেন এবং] বললেন ঃ তোমার কি ব্যাপার হে সামেরী ? (তুমি এ কাণ্ড করলে কেন?) সে বলল ঃ এমন বস্তু আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় নি। (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল ঘোড়ায় চড়ে যেদিন সাগরপারে অবতরণ করেন—সম্ভবত মু'মনদের সাহায্য ও কাফিরদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসে থাকবেন ; তারীখে তাবারীতে বর্ণিত আছে, জিবরাঈল মূসা (আ)-এর কাছে এই নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন যে, আপনি তূর পর্বতে গমন করুন—সেদিন সামেরী তাঁকে দেখেছিল।) অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির (সওয়ারীর) পায়ের নিচ থেকে এক মুঠি (মাটি) নিয়ে নিলাম (এবং আমার মনে আপনা-আপনি একথা জাগ্রত হলো যে, এতে জীবনের প্রভাব থেকে থাকবে এবং যে জিনিসের উপর নিক্ষেপ করা হবে, তা সজীব হয়ে

যাবে।) সুতরাং আমি এই মুষ্ঠি (এই গো-বৎসের অবয়বে) নিক্ষেপ করলাম। আমার মনে তাই ভাল লেগেছে এবং পছন্দনীয় ঠেকেছে। মূসা বললেন ঃ ব্যস, তোর এই (পার্থিব) জীবনে এই শাস্তি (নির্ধারিত) আছে যে, তুই বলবি ঃ আমাকে স্পর্শ করো না এবং তোর জন্য (এটা শাস্তি ছাড়াও) আরও একটি ওয়াদা (আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের) আছে, যা টলবে না (অর্থাৎ পরকালে ভিন্ন আযাব হবে)। তুই তোর মাবুদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার ইবাদতে তুই অটল ছিলি ; (দেখ) আমরা একে জ্বালিয়ে দেব, এরপর একে (অর্থাৎ এর ভস্মকে) সাগরে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেব, যাতে এর নাম-নিশানা না থাকে। তোমাদের প্রকৃত মাবুদ তো কেবল আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ (অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি) এখানে জিবরাঈল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন মূসা (আ)-এর মু'জিযায় ভূমধ্যসাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাইল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর মূসা (আ)-কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্য জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং জিবরাঈলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে জিবরাঈল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌঁছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না। —(বায়ানুল কোরআন)

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ রাসূল বলে এখানে আল্লাহ্র প্রেরিত জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে ঃ القى فى روعه انه لا يلقيها على شيى فيقول كن كذا الاكان অর্থাৎ সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নের এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে। (কামালায়ন) তফসীর রূহুল মা'আনীতে এ তফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজকালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। فجزاه الله خير الجزاء (বয়ানুল কোরআন)।

এরপর বনী ইসরাইলের স্তূপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভিতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্‌র কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাম্বা রব করতে লাগল। হাদীসে ফুতূনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হারূন (আ)-কে বলেছিল ঃ আমি মুঠির ভিতরের বস্তু নিক্ষেপ করব ; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হরূন (আ) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হারূন (আ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌঁছে সে মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাইলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ—হযরত মূসা (আ) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাঁকে বয়কট করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবনে এভাবেই বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাইলীর জন্য মূসা (আ)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তার সত্তার আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না ; যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মূসা (আ)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত। —(মা'আলিম) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত ঃ لَا مِسَاسَ অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক ঃ রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মূসা (আ) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন ; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। —(বয়ানুল কোরআন)

لَنُحَرِّقَنَّهٗ (অর্থাৎ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে ? কেননা স্বর্ণ-রৌপ্য গলিত ধাতু—দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে ওঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংসসম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং

স্বর্ণ-রৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘষে ঘষে কণা কণা করে দেওয়া (দুররে মনসূর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো। (রূহুল মা'আনী) অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবান্তর নয়। —(বয়ানুল কোরআন)

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿৯৯﴾

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿১০০﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿১০১﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ

زُرْقًا ﴿১০২﴾ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿১০৩﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا

يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿১০৪﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ

الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿১০৫﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿১০৬﴾ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا

وَّلَآ اَمْتًا ﴿১০৭﴾ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ

لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿১০৮﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ

اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿১০৯﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿১১০﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ

حَمَلَ ظُلْمًا ﴿১১১﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا

هَضْمًا ﴿১১২﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿১১৩﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا

تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿১১৪﴾

(৯৯) এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। (১০০) যে এ থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য মন্দ হবে। (১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। (১০৩) তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। (১০৪) তারা কি বলে, তা আমি ভালোভাবে জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। (১০৫) তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব আপনি বলুন ঃ আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (১০৭) তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (১০৮) সেই দিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহ্‌র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। (১১০) তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। (১১১) সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখ মণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে যুলুমের বোঝা বহন করবে। (১১২) যে, ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে যুলুম ও ক্ষতির আশংকা করবে না। (১১৩) এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্‌ভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়। (১১৪) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআনে গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা তোয়া-হায় আসলে তওহীদ, রিসালত ও পরকালের মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা পরম্পরার মধ্যে পয়গম্বরদের ঘটনাবলী এবং মূসা (আ)-এর কাহিনী বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতও সপ্রমাণ করা হয়েছে। সেই রিসালতে মুহাম্মদী সপ্রমাণের অংশ বিশেষ আলোচ্য আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে যে, একজন উম্মী নবীর মুখে এ ঘটনা ও কাহিনী ব্যক্ত হওয়া রিসালত, নবুয়ত ও ওহীর প্রমাণ। কোরআনই এসবের উৎস। কোরআনের স্বরূপ প্রসঙ্গে পরকালেরও কিছু বিবরণ এসে গেছে।)

[আমি যেমন মূসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করেছি] এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদও আপনার কাছে বর্ণনা করি (যাতে নবুয়তের প্রমাণাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি নিজের কাছ থেকে আপনাকে একটি নসীহতনামা দান করেছি; (অর্থাৎ কোরআন এতে উপরোক্ত সংবাদাদি আছে । অলৌকিকতার কারণে এই কোরআন নিজেও স্বতন্ত্রদৃষ্টিতে নবুয়তের প্রমাণ। এই নসীহতনামাটি এমন যে) যে এ থেকে (অর্থাৎ এর

বিষয়বস্তু মেনে নেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন (আযাবের) ভারী বোঝা বহন করবে। তারা তাতে (অর্থাৎ আযাবে চিরকাল থাকবে এবং এই বোঝা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য মন্দ বোঝা হবে। যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে (ফলে মৃতরা জীবিত হয়ে যাবে এবং আমি সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফির)-দেরকে (কিয়ামতের মাঠে) নীল-চক্ষু অবস্থায় (বিশ্রীরূপে) সমবেত করব (নীলাভ হওয়া চোখের শূন্যতার রঙ। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে) পরস্পরে চুপিসারে কথা বলবে (এবং একে অপরকে বলবে) তোমরা (কবরে) মাত্র দশদিন অবস্থান করেছ। (উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মনে করতাম মরার পর পুনরায় জীবিত হব না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। জীবিত না হওয়া তো দূরের কথা, দেরীতে জীবিত হওয়াও তো হলো না। আমরা এত দ্রুত জীবিত হয়ে গেছি যে, মনে হয় মাত্র দশদিন অবস্থান করেছি। কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য, আতঙ্ক ও পেরেশানীই এরূপ মনে হওয়ার কারণ। এর সামনে কবরে অবস্থানের সময় খুবই কম মনে হবে। আল্লাহ্ বলেন) যে (সময়) সম্পর্কে তারা বলাবলি করে, তা আমি ভালভাবে জানি (যে, তা কতটুকু) যখন তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সঠিক সে বলবেঃ না, তোমরা মাত্র একদিন (কবরে) অবস্থান করেছ। (তাকে সঠিক বলার কারণ এই যে, এই দিবসের দৈর্ঘ্য ও আতঙ্কের দিক দিয়ে একথাই সত্যের অধিক নিকটবর্তী। সে ভয়াবহতার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করেছে। কাজেই তার অভিমত প্রথমোক্ত ব্যক্তির চাইতে উত্তম। এর কথা সম্পূর্ণ নির্ভুল—এটা বলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা আসল সময়সীমার দিকে দিয়ে বর্ণিত উভয় পরিমাণই ভুল এবং বক্তাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।) এবং [হে নবী (সা) কিয়ামতের অবস্থা শুনে] তারা (অর্থাৎ কেউ কেউ) আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে (যে, কিয়ামতে এদের কি অবস্থা হবে)। অতএব আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা এগুলোকে (চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) সমূলে উড়িয়ে দেবেন অতঃপর পৃথিবীকে সমতল মাঠ করে দেবেন, যাতে তুমি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) অসমতা ও (পাহাড় টিলা ইত্যাদির) উচ্চতা দেখবে না। সেই দিন সবাই (আল্লাহ্‌র) আহ্বানকারীর (অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁকরত ফেরেশতার) অনুসরণ করবে (অর্থাৎ সে শিঙ্গার আওয়াজ দ্বারা সবাইকে কবর থেকে আহ্বান করবে। তখন সবাই বের হয়ে পড়বে)। তার সামনে (কারও) কোন বক্রতা থাকবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন পয়গম্বরদের সামনে বক্র হয়ে থাকত—বিশ্বাস স্থাপন করত না, কিয়ামতে ফেরেশতার সামনে কবর থেকে জীবিত বের হবে না, তারা এমন বক্রতা করতে পারবে না।) এবং (আতঙ্কের আতিশয্যে) আল্লাহ্‌র সামনে সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে। অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি হাশরের মাঠের দিকে চুপে চুপে চলার পদশব্দ ব্যতীত অন্য কিছু (আওয়াজ) শুনবে না। (হয় এ কারণে যে, তখন তারা কথাই বলবে না ; তবে উপরে বর্ণিত يَتَخَافَتُونَ থেকে বোঝা যায় যে, অন্য জায়গায় তারা আস্তে আস্তে কথা বলবে। না হয় এ কারণে যে, তারা খুবই ক্ষীণস্বরে কথা বলবে, যা একটু দূর থেকেও শোনা যাবে না।) সেদিন (কারও) সুপারিশ (কারও) উপকারে আসবে না ; কিন্তু (পয়গম্বর ও নেক লোকদের সুপারিশ) এমন ব্যক্তির (উপকারে আসবে) যার জন্য (সুপারিশ করার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা (সুপারিশকারীদেরকে) অনুমতি দেবেন এবং যার জন্য (সুপারিশকারীর) কথা পছন্দ করবেন। (অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি। সুপারিশকারীদেরকে মু'মিনের জন্য সুপারিশ

করার অনুমতি দেবেন এবং এ সম্পর্কে সুপারিশকারীর কথা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হবে। কাফিরদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। সুতরাং উপকারে না আসার কারণ হবে সুপারিশ না করা। এ আয়াতে আপত্তিকারী কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সুপারিশ থেকেও বঞ্চিত থাকবে।) তিনি (আল্লাহ্) জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞাত বিষয়কে) এদের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নেই, যা সৃষ্টজীব জানে এবং আল্লাহ্ তা'আলা জানেন না ; কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন এবং সৃষ্টজীব জানে না। সুতরাং যেসব অবস্থার কারণে সৃষ্টজীব সুপারিশের যোগ্য ও আযোগ্য হয়, সেগুলোও তিনি জানেন। অতএব যোগ্য লোকদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি সুপারিশকারীদেরকে দেওয়া হবে এবং অযোগ্য লোকদের জন্য এ ক্ষমতা দেওয়া হবে না।) এবং (সেদিন) সব মুখমণ্ডল সেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ীর সামনে অবনমিত হবে (এবং সব অহঙ্কারী ও অবিশ্বাসীর অহঙ্কার ও অবিশ্বাস খতম হয়ে যাবে) এবং (এ ব্যাপারে সবার অবস্থা একইরূপ হবে। অতঃপর তাদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হবে যে) সে ব্যক্তি (সর্বতোভাবে) ব্যর্থ হবে, যে জুলুম (অর্থাৎ শিরক) নিয়ে আসবে আর যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করেছে, সে (পূর্ণ সওয়াব পাবে) কোন অবিচার ও ক্ষতির আশংকা করবে না যেমন আমলনামায় কোন গুনাহ্ বেশি লিখে দেওয়া অথবা কোন সৎকর্ম লিপিবদ্ধ না করা। এ কথা বলে পূর্ণ সওয়াব বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এর বিপরীতে কাফিরদের যে সওয়াব হবে না—একথা বলা উদ্দেশ্য। কারণ সওয়াব প্রাপ্য হওয়ার মত কোন কাজ তাদের নেই। তবে যুলুম ও অবিচার কাফিরদের সাথেও করা হবে না। তবে তাদের সৎকর্মসমূহ হিসেবে লিপিবদ্ধ না করা কোন যুলুম নয়। বরং তাদের কাজ ঈমানের শর্তমুক্ত হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। আমি (যেমন উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি) এমনিভাবে একে (এ সবকিছুকে) আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাযিল করেছি। (যার ভাষা সুস্পষ্ট)। আমি এতে (কিয়ামত ও আযাবের) সতর্কবানী নানাভাবে বর্ণনা করেছি (ফলে, এর অর্থ ফুটে উঠেছে ; উদ্দেশ্য এই যে, আমি সমগ্র কোরআনের বিষয়বস্তু পরিষ্কার বর্ণনা করেছি) যাতে তারা (শ্রোতারা এর মাধ্যমে পুরোপুরি) ভয় পায় (এবং অনতিবিলম্বে বিশ্বাস স্থাপন করে অথবা সম্পর্ণ ভয় না পেলেও এই কোরআন দ্বারা তাদের কিছুটা বোধোদয় হয়। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিক্রিয়া না হলে অল্পই হোক। এমনিভাবে কয়েকবার অল্প অল্প একত্রিত হয়ে পরিমাণে যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তা পরে কোন সময় মুসলমান হয়ে যায়) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান (যিনি এমন উপকারী কালাম নাযিল করেছেন।) আর (উপরোল্লিখিত সৎকর্ম করা ও উপদেশ মেনে নেওয়া যেমন কোরআন প্রচারের একটি জরুরী হক, যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, তেমনিভাবে কোরআন অবতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় আদবের প্রতি যত্নবান হওয়াও আপনার দায়িত্ব। তন্মধ্যে একটি এই যে, আপনার প্রতি এর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন (পাঠে) তৎপর হবেন না। (কারণ এতে আপনার কষ্ট হয়। জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা এবং পাঠ করা একই সাথে করতে হয়। অতএব এরূপ করবেন না এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাও করবেন না। মুখস্থ করানো আমার

কাজ। এবং আপনি (মুখস্থ হওয়ার জন্য আমার কাছে) এই দোয়া করুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (এর মধ্যে অর্জিত জ্ঞান স্মরণ থাকার, যে জ্ঞান অর্জিত হয়নি তা অর্জিত হওয়ার, যে জ্ঞান অর্জিত হওয়ার নয় তা অর্জিত না হওয়াকেই উত্তম ও উপযোগী মনে করার এবং সব জ্ঞানে সুবুদ্ধির দোয়া শামিল রয়েছে। অতএব لَا تَعْجَلْ এর পর এর বর্ণনা খুবই সমীচীন হয়েছে। মোটকথা এই যে, মুখস্থ করার উপায়াদির মধ্য থেকে ত্বরা পাঠ করার উপায় বর্জন করুন এবং দোয়া করার উপায় অবলম্বন করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذِكْرًا বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহন করবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে ; যথা কোরআন তিলাওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় গুনাহ্। কিয়ামতের দিন এই গুনাহ্ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও গুনাহ্কে কিয়ামতের দিন ভারী বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করল ঃ صور (ছুর) কি ? তিনি বললেন ঃ শিং। এতে ফুঁৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, صور শিং এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুঁৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ সহীহ্ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারম্ভিককালে যখন জিবরাঈল কোন আয়াত নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হতো—আয়াতকে জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামতের لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত্ব নয়—এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই জিবরাঈলের সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহবা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরূপ

দোয়া করে যাবেন رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا —হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কোরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্মরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কোরআন বোঝার তওফীকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ
هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ
أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ
إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا
يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا
مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ
عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا
يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿١٢٧﴾

(১১৫) আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (১১৬) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম : হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু,

সুতরাং সে যেন বের করে না দেয়। তোমাদেরকে জান্নাত থেকে ; তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। (১১৮) তোমাকে এই দেয়া হলো যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। (১১৯) এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল ঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা ? (১২১) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। (১২২) এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। (১২৩) তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়েই এখান থেকে একসঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। (১২৪) এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। (১২৫) সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন ? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। (১২৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। (১২৭) এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি ইতিপূর্বে (অর্থাৎ অনেকদিন আগে) আদম (আ)-কে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম (একটু পরেই তা বর্ণিত হবে)। অতঃপর তার পক্ষ থেকে গাফিলতি (ও অসাবধানতা) হয়ে গিয়েছিল এবং আমি (এই নির্দেশ পালনে) তার মধ্যে দৃঢ়তা (ও অবিচলতা পাইনি। (এর বিবরণ জানতে হলে) স্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাগণকে বললাম ঃ তোমরা আদমের সামনে (অভিবাদনের) সিজদা কর। তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে অস্বীকার করল। অতঃপর আমি (আদমকে) বললাম ঃ হে আদম, (স্মরণ রাখ,) এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর (এ কারণে) শত্রু (যে, তোমাদের ব্যাপারে বিতাড়িত হয়েছে)। সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয় (অর্থাৎ তার কথায় এমন কোন কাজ করো না, যার কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হও।) তাহলে তোমরা (জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে) কষ্টে পতিত হবে। (তোমার স্ত্রীও কষ্টে পড়বে ; কিন্তু বেশির ভাগ কষ্ট তোমাকেই ভোগ করতে হবে আর) এখানে জান্নাতে তো তোমাদেরকে এই (আরাম) দেওয়া হলো যে, তুমি কখনও ক্ষুধার্ত হবে না (যদ্দরুন কষ্ট হবে অথবা তা উপার্জনে বিলম্ব ও পেরেশানী হবে।) এবং উলঙ্গ হবে না (যে কাপড় পাবে না কিংবা প্রয়োজনের সময় থেকে বিলম্বে পাবে) এবং তোমরা পিপাসিতও হবে না (যে, পানি

পাবে না কিংবা দেরীতে পাওয়ার কারণে কষ্ট হবে) এবং রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না। (কেননা জান্নাতে, রোদ্র নেই এবং গৃহও সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল। কিন্তু জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে গেলে এ সমস্ত বিপদাপদের সম্মুখীন হবে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুব হুঁশিয়ার ও সজাগ থাকবে।) অতঃপর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল ঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনের (বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) বৃক্ষের কথা বলে দেব) এটা আহার করলে চিরকাল প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকবে) এবং এমন রাজত্বের কথা, যাতে কখনও দুর্বলতা আসবে না? অতঃপর (তার কুমন্ত্রণায় পড়ে) উভয়েই (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল আহার করল, তখন (অর্থাৎ আহার করতেই) তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা (দেহ আবৃত করার জন্য) উভয়েই (বৃক্ষের) পত্র (দেহে) জড়াতে লাগল। আদম তাঁর পালনকর্তার অবাধ্য হলো, ফলে সে (জান্নাতে চিরকাল বাসবাসের লক্ষ্য অর্জনে) ভ্রান্তিতে নিপতিত হলো। এরপর (যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল, তখন) তার পালনকর্তা তাকে (আরও অধিক) মনোনীত করলেন, তার প্রতি (মেহেরবানীর) দৃষ্টি দিলেন এবং সৎপথে সর্বদা কায়েম রাখলেন। (ফলে এমন ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হয়নি। নিষিদ্ধ বৃক্ষ আহার করার পর) আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তোমরা উভয়েই জান্নাত থেকে নেমে যাও (এবং দুনিয়াতে তোমাদের সন্তান-সন্ততি) একে অপরের শত্রু হবে। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়েত (অর্থাৎ রাসূল অথবা কিতাব) আসে, তখন যে আমার হিদায়েত অনুসরণ করবে, সে (দুনিয়াতে) পথভ্রষ্ট হবে না এবং (পরকালে) কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার উপদেশের প্রতি বিমুখ হবে, তার জন্য (কিয়ামতের পূর্বে এবং কবরে) সংকীর্ণ জীবন হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় (কবর থেকে) উত্থিত করব। সে (বিস্মিত হয়ে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো (দুনিয়াতে) চক্ষুষ্মান ছিলাম। (আমি এমন কি অপরাধ করলাম ?) আল্লাহ্ বললেন ঃ (তোমার যেমন শাস্তি হয়েছে) এমনিভাবে (তোমা দ্বারা কাজ হয়েছে এই যে, তোমার কাছে পয়গম্বর ও উলামায়ে দীনের মাধ্যমে) আমার নির্দেশাবলী এসেছিল, তখন তুমি এগুলোর প্রতি খেয়াল করনি। এমনিভাবে আজ তোমার প্রতি খেয়াল করা হবে না। (এই শাস্তি যেমন কর্মের সাথে সম্বন্ধ রেখে দেয়া হয়েছে) এমনিভাবে আমি (প্রত্যেক) সে ব্যক্তিকে (কর্মের অনুরূপ) শাস্তি দেব, যে (আনুগত্যের) সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। বাস্তবিকই পরকালের আযাব কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী। (এর শেষ নেই। অতএব এই আযাব থেকে আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করা প্রয়োজন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ এখান থেকে হযরত আদম (আ)-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহ্ফে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে কাহিনীর সম্পর্ক তফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে, আপনার নবুয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুঁশিয়ার করার জন্য আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মূসা (আ)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আ)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের পিতামাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রিসালত ও নবুয়তের উচ্চমর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا এখানে عَهِدْنَا শব্দটি اَمَرْنَا অথবা وصينا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।—(বাহ্রে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে আদম (আ)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোন অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরও বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আ) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে نسيان ও عزم লক্ষণীয় نسيان শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া, অনবধান হওয়া এবং عزم-এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা। এই শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে এ কথা জেনে নেয়া জরুরী যে, আদম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার প্রভাবশালী পয়গম্বরদের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গম্বর গুনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, আদম (আ) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ رفع عن امتى الخطا والنسيان অর্থাৎ আমার উম্মতের গুনাহ্ ভুলবশত মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কোরআন পাক বলে ঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেন না; কিন্তু এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা

এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভুল থেকে বাঁচতে পারে। পয়গম্বরগণ আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না ? অনেক সময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজকেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র) এ কথাটিই এভাবে বলেছেন حسنات الابرار سيئات المقربين অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অনেক সৎকর্মকে নৈকট্যশীলদের জন্য গুনাহ্ গণ্য করা হয়।

আদম (আ)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গম্বরদের কাছ থেকে গুনাহ্ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কতক আলিমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল, যা গুনাহ্ নয়। কিন্তু আদম (আ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্য গুনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عصيان (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত عزم শব্দ ব্যবহৃত করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আ)-এর মধ্যে عزم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল তাকে বিচ্যুত করে দেয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল ঃ আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সিজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে (অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাকারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী বর্ণনা হয়েছে। তিনি আদমকে বললেন ঃ দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের (অর্থাৎ আদম ও হাওয়ার) শত্রু। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত

থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تشقى শব্দটি شقاوة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ-এক পারলৌকিক কষ্ট অপরটি হলো ইহলৌকিক কষ্ট অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গম্বর দূরের কথা, কোন সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র)-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ هوان ياكل من كسد يديه অর্থাৎ এখানে شقاوت এর অর্থ হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা। --(কুরতুবী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভ বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ; অর্থাৎ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমনসব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানব-জীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন-জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে فتشقى শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন জিবরাঈল জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন ঃ যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও আদম (আ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আ) রুটি তৈরি করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নিচে গড়িয়ে গেল। আদম (আ) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন জিবরাঈল বললেন ঃ হে আদম, আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিযিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব ঃ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন করে বলেছেন ঃ عَدُوٌّلَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে فَتَشْقٰى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরীক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী فَتَشْقَيَا বলা হতো। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। এ কারণেই فَتَشْقٰى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে

অবতরণের পর জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা আদম (আ)-কেই করতে হবে। কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে ঃ কুরতুবী বলেন এ আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—আহার, পানীয় বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ—অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরও জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারও ভরণ-পোষণ শরীয়ত কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে; যেমন পিতামাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারক হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকাহ্গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে।

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। "জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না" —এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদই পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ভোগ করতে হবে না। বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ থেকে وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আ) ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গুনাহ্। আল্লাহ্র নবী ও রাসূল হয়ে তিনি এই গুনাহ্ কিরূপে করলেন ? অথচ সাধারণ আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গুনাহ্ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাকারার তফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে আদম (আ) সম্পর্কে প্রথমে عَصٰى ও পরে غَوٰى বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আ)-এর এই কর্ম গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ্র নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তাঁর সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। غَوٰى শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং দুই. পথভ্রষ্ট অথবা

গাফিল হওয়া। কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ আদম (আ) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

পয়গম্বরদের সম্পর্কে একটি জরুরী নির্দেশ তাদের সম্মানের হিফাযত ঃ কাজী আবূ বকর ইবনে আরাবী আহ্‌কামুল কোরআন গ্রন্থে عَصٰى ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তার ভাষায় এই—

لا يجوز لاحدنا اليوم ان يخبر بذلك عن ادم الا اذا ذكرناه فى اثناء قَوْله تعالى عنه او قول نبية فاما ان يبتدى ذلك من قبل نفسه فليس بجائزلنا فى ابائنا الادين الينا المماثلين لنا فكيف فى ابينا الاقوم الاعظم الاكرم النبى المقدم الذى عذره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفرله -

আজ আমাদের কারও জন্য আদম (আ)-কে অবাধ্য বলা জায়েয নয়, তবে কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ্ যার তওবা কবূল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্য কোন অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েয নয়।

এ কারণেই কুশায়রী আবূ নছর বলেন ঃ কোরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে আদম (আ)-কে গুনাহ্গার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েয নয়। কোরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। তাই কোরআনী আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েয ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই।—(কুরতুবী)

اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا। অর্থাৎ জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়েই। এই সম্বোধন আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ-এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌঁছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরীক করা অবান্তর ; তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে তাদের সন্তান-সন্ততির পারস্পরিক শত্রুতা। বলা বাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতামাতার জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ এখানে যিকর-এর অর্থ কোরআনও হতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَسُوْلًا বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কোরআন অথবা রাসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ কোরআনের তিলাওয়াত ও বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; তার পরিণাম এই ঃ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى অর্থাৎ তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আযাব কিয়ামতে হবে।

কাফির ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফির ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর সম্মুখীন হন ; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ পয়গম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালামুসীবত সবচাইতে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণত কাফির ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারে, দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই যে, এখানে দুনিয়ার আযাব বলে কবরের আযাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا-এর তফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগৎ বোঝানো হয়েছে। —(মাযহারী)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে।—(মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থসম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশংকা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয় ; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿۱۲۸﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا

وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ

لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ

نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ

بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ

اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

(১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করল না ? নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। (১৩০) সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশে ও দিবাভাগে, সম্ভবত তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিণাম শুভ। (১৩৩) এরা বলে ঃ সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন ? তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে

আছে ? (১৩৪) যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন ? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম। (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে চেয়ে থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ অভিযোগকারীগণ যারা মুখ ফেরানো থেকে বিরত হচ্ছে না, তবে এদের কি এ থেকেও হিদায়েত হলো না যে, আমি এদের পূর্বে অনেক মানব সম্প্রদায়কে (এই মুখ ফেরানোর কারণেই আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। তাদের (কিছু সংখ্যকের) বাসভূমিতে এরাও বিচরণ করে (কেননা, মক্কাবাসীদের সিরিয়া যাওয়ার পথে কোন কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের বাসভূমি পড়ত)। এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ে) তো বুদ্ধিমানদের (বোঝার) জন্য (মুখ ফেরানোর অশুভ পরিণতির পর্যাপ্ত) প্রমাণাদি রয়েছে। (এদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে এরা মনে করে যে, এদের ধর্ম নিন্দনীয় নয়। এর স্বরূপ এই যে) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি কথা পূর্ব থেকে বলা না হয়ে থাকলে (তা এই যে, কোন কোন উপকারিতার কারণে তাদেরকে সময় দেয়া হবে) এবং (আযাবের জন্য) একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে (এবং সেই সময়কাল হচ্ছে কিয়ামতের দিন। তাদের কুফর ও মুখ ফেরানোর কারণে) আযাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। (মোটকথা এই যে, কুফর তো আযাবই চায় ; কিন্তু একটি অন্তরায়ের কারণে আযাবে বিরতি হচ্ছে। কাজেই তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে তারা যে নিজেদেরকে সত্যপন্থী মনে করে, এটা ভুল। এখানে সময় দেয়া হচ্ছে ছেড়ে দেয়া হয়নি।) সুতরাং (আযাব যখন নিশ্চিত, তখন) আপনি তাদের (কুফর মিশ্রিত) কথাবার্তায় সবর করুন (এবং "আল্লাহর ব্যাপারে শত্রুতা" এই নীতির কারণে তাদের প্রতি যে ক্রোধ হয়, তা এবং আযাবের বিলম্বের কারণে মনে যে অস্থিরতা হয়, তা বর্জন করুন) এবং আপনার পালনকর্তার প্রশংসা (ও গুণ) সহকারে (তাঁর) পবিত্রতা পাঠ করুন—(এতে নামাযও এসে গেছে।) সূর্যোদয়ের পূর্বে (যেমন ফজরের নামায), সূর্যাস্তের পূর্বে (যেমন যোহর ও আসরের নামায) এবং রাত্রিকালেও পাঠ করুন (যেমন মাগরিব ও এশার নামায) এবং দিনের শুরুতে ও শেষে (পবিত্রতা পাঠ করার জন্য গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলা হচ্ছে। ফলে গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে ফজর ও মাগরিবের উল্লেখও পুনরায় হয়ে গেল।) যাতে আপনি (সওয়াব পাওয়ার কারণে) সন্তুষ্ট হন। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সত্যিকার মা'বুদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন—মানুষের চিন্তা করবেন না।) আপনি ঐ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি) যা আমি কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে (উদাহরণত ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদেরকে) পরীক্ষা করার জন্য (নিছক) পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ দিয়ে রেখেছি। (উদ্দেশ্য অন্যদেরকে শোনানো যে, নিষ্পাপ নবীর জন্যও যখন এটা নিষিদ্ধ, অথচ তাঁর মধ্যে পাপের সম্ভাবনাও নেই, তখন যারা নিষ্পাপ নয় তাদের জন্য এ বিষয়ে যত্নবান

হওয়া কিরূপে জরুরী হবে না। পরীক্ষা এই যে, কে অনুগ্রহ স্বীকার করে এবং কে অবাধ্যতা করে) আপনার পালনকর্তার দান (যা পরকালে পাওয়া যাবে) অনেক গুণে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী (কখনও ক্ষয় হবে না। সারকথা এই যে, তাদের মুখ ফেরানোর প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং তাদের বিলাস-ব্যসনের প্রতিও দৃষ্টি দেবেন না। সবগুলোর পরিণাম আযাব।) আপনি আপনার পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ পরিবারের লোকদেরকে অথবা মু'মিনদেরকে)-ও নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এতে অবিচল থাকুন। (অর্থাৎ এ বিষয়টি হচ্ছে অধিক মনোযোগদানের যোগ্য) আমি আপনার দ্বারা (এমনিভাবে অন্যদের দ্বারা) এমন জীবিকা (উপার্জন করাতে) চাই না যা জরুরী ইবাদতের পথে বাধা হয়ে যায়। (জীবিকা তো আপনাকে এবং এমনিভাবে অন্যদেরকে) আমি দেব। (অর্থাৎ আসল উদ্দেশ্য উপার্জন নয়—ধর্ম ও ইবাদত। উপার্জনের তখনই অনুমতি অথবা আদেশ আছে, যখন তা জরুরী ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে) আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিণাম শুভ। (তাই আমি لَا تَمُدَّنَّ এবং وَأْمُرْ أَهْلَكَ ইত্যাদি নির্দেশ দেই। এবং অভিযোগকারীদের কিছু অবস্থা ও উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের আরও একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।) তারা (হঠকারিতাবশত) বলে ঃ রাসূল আমাদের কাছে (নবুয়তের) কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন ? (উত্তর এই যে) তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু পৌঁছে নি ? (এতে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কোরআন দ্বারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কাছে কি কোরআন পৌঁছে নি, পূর্ব থেকেই যার খ্যাতি রয়েছে ? এটাই নবুয়তের পর্যাপ্ত দলীল।) যদি আমি তাদেরকে কোরআন আসার পূর্বে (কুফরের কারণে) কোন আপদ দ্বারা ধ্বংস করতাম) এবং এরপর কিয়ামতের দিন আসল শাস্তি দিতাম) তবে তারা (ওযর পেশ করে) বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল (দুনিয়াতে) কেন প্রেরণ করেন নি? তাহলে আমরা (এখানে নিজেরা) হেয় এবং (অপরের দৃষ্টিতে) অপমানিত হওয়ার পূর্বেই আপনার বিধানাবলী মেনে চলতাম। (সুতরাং এখন এই ওযরেরও অবকাশ রইল না। তারা যদি বলে যে, এই আযাব কবে হবে, তবে) বলুন ঃ আমরা সবাই প্রতীক্ষা করছি, অতএব (কিছুদিন) আরও প্রতীক্ষা করে নাও। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা (ও) জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে (মঞ্জিলে) মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে (অর্থাৎ এই ফয়সালা সত্বরই মৃত্যুর পর অথবা হাশরের পর প্রকাশ হয়ে পড়বে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ — يهد ক্রিয়াপদের فاعل-এর ضمير — هدى শব্দের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং هدى দ্বারা কোরআন অথবা রাসূল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি মক্কাবাসীদেরকে এই হিদায়েত দেন নি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেন নি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্‌র আযাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে فاعل-এর ضمير আল্লাহ্‌র দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে হিদায়েত দেন নি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এক. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, বরং সবর করবেন। দুই. আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল হওয়া ঃ এ জগতে ছোট-বড়, ভালমন্দ কোন মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে ; যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সম্মুখে গালিগালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। এক. সবর ; অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। দুই. আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ্র সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে ; তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكَ تَرْضٰى অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ্র নাম নেয়ার অথবা ইবাদত করার তওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ্র প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ্র স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سَبِّحْ بِحَمْدِ শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাযের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণত 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বলে ফজরের নামায, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' বলে যোহর ও আসরের নামায এবং مِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ বলে রাত্রিকালীন সব নামায মাগরিব, এশা, তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর اَطْرَافَ النَّهَارِ বলে এর আরও তাকীদ করা হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, বরং মু'মিনের জন্য আশংকার বস্তু ঃ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে উম্মতকে পথপ্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফির ও পাপাচারীদের বিলাসবৈভব, ধনাঢ্যতা ও জাঁকজমক সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত, তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কেন ? হযরত উমর ফারূক (রা)-এর মত মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে করীম (সা) তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হযরত উমর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত উমর কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, পারস্য ও রোম সম্রাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আপনি সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে আল্লাহ্র মনোনীত ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, এ কেমন কথা!

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে খাত্তাব-তনয়, তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত রয়েছ? এদের ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোন অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আযাবই আযাব। মু'মিনদের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) পার্থিব সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম-আয়েশের সামগ্রী যোগাড় করার পূর্ণ ক্ষমতাই তাঁর ছিল। কোন সময় পরিশ্রম ও চেষ্টাচরিত্র ছাড়া ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং নিজে আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম আবূ সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ان اخوف ما اخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশংকা করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের **বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয় ; বরং ভয় ও আশংকার বিষয়। এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর বিধানাবলী থেকে গাফিল হয়ে যেতে পার।**

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাযের আদেশ ও তার রহস্য ঃ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। এক. পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ এবং দুই. নিজেও নামায অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামায পুরোপুরী অব্যাহত রাখার জন্যও আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাযী হওয়া আবশ্যক। কেননা, পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই اهل শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যহ ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রা)-এর গৃহে গমন করে الصلوة الصلوة (নামায পড়, নামায পড়) বলতেন।—(কুরতুবী)

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। হযরত উমর ফারূক (রা) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন।—(কুরতুবী)

যে ব্যক্তি নামায ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্ তার রিযিকের ব্যাপার সহজ করে দেন ঃ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিযিক নিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন। বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা, রিযিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশির মধ্যে মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে ; কিন্তু বীজের ভিতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোন হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হিফাযত ও আল্লাহ্ সৃজিত ফলফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন। তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

يقول الله تعالى يا ابن ادم تفرغ لعبادتى املاء صدرك غنى واسد فقرك وان لم تفعل ملاءت صدرك شغلا ولم اسد فقرك -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কর্মব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং

তোমার অভাব মোচন করব না (অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভলালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবগ্রস্তই থাকবে)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি ঃ

من جعل هموم همًا واحدهم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اى اودية هلك -

যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ্ তা'আলা তার সংসারের চিন্তাসমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার চিন্তায় বহুমুখী কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে দেয়, সে এসব চিন্তার যে কোন জটিলতায় ধ্বংস হয়ে যাক, সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এতটুকুও পরওয়া করেন না। (ইবনে কাসীর)

بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ অর্থাৎ তওরাত, ইনজীল ও ইবরাহিমী সহিফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোন কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ্র কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্র কাছে কোন্টি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল।

اللّهم اهدنا لما اختلف فيه الى الحق باذنك ولاحول ولا قوة الا بك ولا ملجاء ولا منجاء منك الا اليك -

আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি ১৪ যিলহজ্জ ১৩৯০ হিজরী রোজ বৃহস্পতি বার দুপুর বেলায় আমাকে সূরা তোয়া-হা সমাপ্ত করার তওফীক প্রদান করেছেন। মহিমময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাকে কোরআনের অবশিষ্ট অংশেরও তফসীর সম্পন্ন করার তওফীক প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সকল প্রকার সাহায্যের জন্য স্মরণকেই এবং তারই উপর একান্তে নির্ভরশীল থাকি।

سُوْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ

সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১২ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (١)

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٢) لَاهِيَةً

قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ

السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ (٣) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٤) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (٥) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۖ

أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (٦) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا

أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ

الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (٨) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (٩) لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠)

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী ; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন

উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে। (৩) তাদের অন্তর থাকে খেলায় মত্ত। যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে, 'সে তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ ; এমতাবস্থায় দেখে-শুনে তোমরা তার জাদুর কবলে কেন পড় ?' (৪) পয়গম্বর বললেন : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কথাই আমার পালনকর্তা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৫) এছাড়া তারা আরও বলে : অলীক স্বপ্ন ; না—সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ। (৬) তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি ; এখন এরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে ? (৭) আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান, তবে যারা স্মরণ রাখে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (৮) আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে দিলাম এবং ধ্বংস করে দিলাম সীমালংঘনকারীদেরকে। (১০) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি ; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এসব (অবিশ্বাসী) মানুষের হিসাবের সময় তাদের নিকটে এসে গেছে অর্থাৎ কিয়ামত ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে) এবং তারা (এখনও) অমনোযোগিতায় (ই পড়ে) আছে (এবং তা বিশ্বাস করা থেকেও তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। (তাদের গাফিলতি এতদূর গড়িয়েছে যে) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন (তাদের অবস্থানুযায়ী) উপদেশ আসে, (সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে) তারা তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর গোড়া থেকেই এদিকে) মনোযোগী হয় না। অর্থাৎ জালিম (ও কাফির)-রা (পরস্পরে) গোপনে গোপনে [পরামর্শ করে (মুসলমানদের ভয়ে নয় ; কারণ মক্কার কাফিররা দুর্বল ছিল না ; বরং ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করে একে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য) সে [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)] নিছক তোমাদের মত একজন (মামুলি) মানুষ (অর্থাৎ নবী নয়। সে যে চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর কালাম শোনায়, তাকে অলৌকিক মনে করো না এবং এ অলৌকিকতার কারণে তাকে নবী বলে ধারণা করো না। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে জাদুমিশ্রিত কালাম।) অতএব (এতদসত্ত্বেও) তোমরা কি জাদুর কথা শোনার জন্য (তার কাছে) যাবে, অথচ তোমরা (এ বিষয়টি খুব) জান (বোঝ) ? পয়গম্বর (জওয়াব আদেশ পেলেন এবং তিনি আদেশ অনুযায়ী জওয়াবে) বললেন : আমার পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কথা (প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য) ভালোভাবে জানেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। (অতএব তোমাদের এসব কুফুরী কথাবার্তাও জানেন এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। তারা সত্য কালামকে শুধু জাদু বলেই ক্ষান্ত হয় নি ;) বরং তারা আরও বলে, (এই কোরআন) অলীক কল্পনা

(বাস্তবে চিত্তাকর্ষকও নয়) বরং (তদুপরি) সে (অর্থাৎ পয়গম্বর) একে (ইচ্ছাকৃতভাবে মন থেকে) উদ্ভাবন করেছে (স্বপ্নের কল্পনায় তো মানুষ কিছুটা অক্ষম, ক্ষমার্হ ও সংশয়ে পতিতও হতে পারে। এই মিথ্যা উদ্ভাবন শুধু কোরআনেই সীমিত নয়) বরং সে একজন কবি। (তার সব কথাবার্তা এমনি রকম মনগড়া ও কাল্পনিক হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, সে রাসূল নয় ; অথচ রাসূল হওয়ার জোর দাবি করে।) অতএব সে কোন (বড়) নিদর্শন আনুক ; যেমন পূর্ববর্তীদেরকে রাসূল করা হয়েছিল (এবং তারা বড় বড় মু'জিযা জাহির করেছিলেন। তখন আমরা তাকে রাসূল বলে মেনে নেব এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। তাদের একথা বলাও একটি বাহানা ছিল। তারা তো পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও মানত না। আল্লাহ্ তা'আলা জওয়াবে বলেন ঃ) তাদের পূর্বে যেসব জনপদবাসিগণকে আমি ধ্বংস করেছি (তাদের ফরমায়েশী মু'জিযা জাহির হওয়া সত্ত্বেও) তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, এখন তারা কি (এসব মু'জিযা জাহির হলে পরে) বিশ্বাস স্থাপন করবে ? (এমতাবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন না করলে আযাব এসে যাবে। তাই আমি এসব মু'জিযা জাহির করি না এবং কোরআনরূপী মু'জিযাই যথেষ্ট। রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহ এই যে, রাসূল মানুষ হওয়া উচিত নয়। এর জওয়াব এই যে) আপনার পূর্বে আমি কেবল মানুষকেই পয়গম্বর করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম। অতএব (হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়) তোমরা যদি না জান, তবে কিতাবীদেরকে জিজ্ঞেস কর। (কেননা তারা যদিও কাফির, কিন্তু মুতাওয়াত্তির সংবাদে বর্ণনাকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। এছাড়া তোমরা তাদেরকে মিত্র মনে কর। কাজেই তোমাদের কাছে তাদের সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত।) আর (এমনিভাবে রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহের অপর পিঠ ছিল এই যে, রাসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই যে) আমি রাসূলদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না (অর্থাৎ ফেরেশতা করি নি) এবং [তারা যে আপনার ওফাতের অপেক্ষায় আনন্দ উল্লাস করছে যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন نَتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ [মায়ালেম], এই ওফাতও নবুয়তের পরিপন্থী নয়। কেননা] তাঁরা (অতীত পয়গম্বরগণও) চিরস্থায়ী ছিলেন না। (সুতরাং আপনারও ওফাত হয়ে গেলে নবুয়তের মধ্যে কি অভিযোগ আসতে পারে? মোটকথা, পূর্ববর্তী রাসূলগণ যেমন ছিলেন, আপনিও তেমন। তারা যেমন আপনাকে মিথ্যারোপ করে, তেমনি তাদেরকেও তখনকার কাফিররা মিথ্যারোপ করেছে।) অতঃপর আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলাম (যে, মিথ্যারোপকারীদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করব এবং তোমাদেরকে ও মু'মিনদেরকে রক্ষা করব, আমি) তা পূর্ণ করলাম অর্থাৎ তাদেরকে এবং যাদেরকে (রক্ষা করার) ইচ্ছা ছিল, (আযাব থেকে) রক্ষা করলাম এবং (আযাব দ্বারা) সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। (অতএব এদের সতর্ক হওয়া উচিত। হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, এই মিথ্যারোপের পর তোমাদের ওপর ইহকালে ও পরকালে আযাব আসা বিচিত্র নয় ; কেননা) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি ; এতে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) উপদেশ রয়েছে। (এমন উপদেশ প্রচার সত্ত্বেও) তোমরা কি বোঝ না (এবং মেনে চল না) ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আম্বিয়ার ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সূরা কাহ্ফ, মারইয়াম, তোয়া-হা ও আম্বিয়া এই চারটি সূরা প্রথম ভাগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হিফাযত করি।—(কুরতুবী)

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ। অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, এই উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

من مات فقد قامت قيامته যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশংকার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সব গাফিলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা, একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গুনাহের ভিত্তি।

مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ যারা পরকাল ও কবরের আযাব থেকে গাফিল এবং তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ-তামাশা করতে থাকে।

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ তারা পরস্পরে আস্তে আস্তে কানাকানি করে বলে ঃ এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রাসূল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতই মানুষ—কোন ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ্র যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন কাফিরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা একে জাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে, এটা জাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ—যেসব স্বপ্নে মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে اَحْلَامٍ বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ 'অলীক কল্পনা' করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কোরআনকে জাদু বলেছে; এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ—অর্থাৎ সে বাস্তবিকই নবী ও রাসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ মু'জিযাসমূহ প্রদর্শন করুক। জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষিত মু'জিযাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করে নি। প্রার্থিত মু'জিযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহ্‌র আইন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে আযাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফিরদেরকে প্রার্থিত মু'জিযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। অতঃপর اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ বাক্যে এ দিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি চাওয়া মু'জিযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মু'জিযা প্রদর্শন করা হয় না।

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ এখানে اَهْلَ الذِّكْرِ (যাদের স্মরণ আছে) বলে তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব আলিম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ মানুষ ছিলেন—না ফেরেশতা ছিলেন, এ কথা যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে তওরাত ও ইঞ্জীলের আলিমদের কাছ থেকে জেনে নাও। কেননা, তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে اَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদী ও খ্রিস্টান অর্থ নিলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই ঐ ব্যাপারের সাক্ষ্যদাতা। তফসীরের সার সংক্ষেপে এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মাস'আলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান জানে না, এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব হচ্ছে আলিমদের অনুসরণ করা। তারা আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস করে তদনুযায়ী আমল করবে।

কোরআন আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তু ঃ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ কিতাব অর্থ কোরআন এবং যিকর অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবীতে অবতীর্ণ কোরআন তোমাদের জন্য একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আরবদেরকে কোরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্ব্যাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের স্থানগত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং শুধু কোরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কোরআন না হলে আজ সম্ভবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ
مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾

(১১) আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। (১২) অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের কথা টের পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল। (১৩) পলায়ন করো না এবং ফিরে এস, যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে ; সম্ভবত কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। (১৪) তারা বলল ঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (১৫) তাদের এই আর্তনাদ সব সময় ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি অনেক জনপদ, যেগুলোর অধিবাসীরা যালিম (অর্থাৎ কাফির) ছিল, ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পর অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর যখন যালিমরা আমার আযাব আসতে দেখল, তখন জনপদ থেকে পলায়ন করতে লাগল (যাতে আযাবের কবল থেকে বেঁচে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ) পলায়ন করো না এবং নিজেদের বিলাস সামগ্রী ও বাসগৃহে ফিরে চল। সম্ভবত কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে (যে, তোমাদের কি হয়েছিল ? উদ্দেশ্য হলো, ইঙ্গিতে তাদের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধৃষ্টতার জন্যে হুঁশিয়ার করা যে, যে সামগ্রী ও বাসগৃহ নিয়ে তোমরা গর্ব করতে এখন সেই সামগ্রীও নেই, বাসগৃহও নেই এবং কোন সহানুভূতিশীল মিত্রের নাম-নিশানাও নেই।) তারা (আযাব নাযিল হওয়ার সময়) বলল ঃ হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই যালিম ছিলাম। তাদের এই আর্তনাদ অবিচ্ছিন্ন ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে এমন (নেস্তনাবুদ) করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য অথবা নির্বাপিত অগ্নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোন কোন তফসীরবিদদের মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে হাযুরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মূসা ইবনে মিশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শু'আয়ব বলা হয়েছে। শুআয়ব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী

শুআয়ব (আ) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহ্র রাসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জনৈক কাফির বাদশাহ্ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমন ফিলিস্তীনে বনী ইসরাইল বিপথগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল থাকবে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ
لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ۖ إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمِ اتَّخَذُوا
آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْأَلُ
عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۗ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ
مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ

مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ

خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ

نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

(১৬) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) আমি যদি ক্রীড়া-উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হতো। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি ; অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ, তার জন্যে তোমাদের দুর্ভোগ। (১৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা তাঁরই। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। (২০) তারা রাতদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না। (২১) তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি উপাস্য গ্রহণ করেছে যে, তারা তাদেরকে জীবিত করবে ? (২২) যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র। (২৩) তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (২৪) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে ? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না ; অতএব তারা টালবাহানা করে। (২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারা বলল ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তার জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয় ; বরং তারা তো তার সম্মানিত বান্দা (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তার আদেশেই কাজ করে। (২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি যালিমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি যে অদ্বিতীয়, আমার সৃষ্ট বস্তুই তার প্রমাণ। কেননা) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (বরং এগুলোর মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে, তন্মধ্যে বড় রহস্য হচ্ছে আল্লাহ্র তওহীদের প্রমাণ।) যদি ক্রীড়া

উপকরণ সৃষ্টি করাই আমার লক্ষ্য হতো, (যার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য উপকার উদ্দিষ্ট থাকে না—শুধু চিত্তবিনোদনই লক্ষ্য থাকে) তবে বিশেষভাবে আমার কাছে যা আছে, তাকেই আমি তা করতাম (উদাহরণত আমার পূর্ণত্বের গুণাবলীর প্রত্যক্ষকরণ) যদি আমাকে করতে হতো। (কেননা ক্রীড়াকারীর অবস্থার সাথে ক্রীড়ার মিল থাকা আবশ্যক। কোথায় সৃষ্টির স্রষ্টার সত্তা এবং কোথায় নিত্য সৃষ্ট বস্তু। তবে গুণাবলী অনিত্য এবং সত্তার জন্যে অপরিহার্য হওয়ার কারণে সত্তার সাথে মিল রাখে। যখন যুক্তিগত প্রমাণ ও সকল ধর্মাবলম্বীদের ঐকমত্যে গুণাবলীও ক্রীড়া হতে পারে না, তখন নিত্য সৃষ্ট বস্তু যে হতে পারবে না—এতে কারও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আমি ক্রীড়াচ্ছলেও অনর্থক সৃষ্টি করিনি।) বরং (সত্যকে প্রমাণ ও মিথ্যাকে বাতিল করার জন্যে সৃষ্টি করেছি,) আমি সত্যকে (যার প্রমাণ সৃষ্ট বস্তু) মিথ্যার উপর (এভাবে প্রবল করি, যেমন মনে কর যে, আমি একে তার উপর) নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ করে (অর্থাৎ মিথ্যাকে পরাভূত করে দেয়) সুতরাং তা (অর্থাৎ মিথ্যা পরাভূত হয়ে) তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু থেকে অর্জিত তওহীদের প্রমাণাদি শিরকের সম্পূর্ণ মুণ্ডপাত করে দেয় এবং বিপরীত দিকের সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। তোমরা যে এসব শক্তিশালী প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শিরক কর,) তোমাদের জন্য দুর্ভোগ, তোমরা (সত্যের বিরুদ্ধে) যা মনগড়া কথা বলছ তার কারণে। (আল্লাহ্ তা'আলার শান এই যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা রয়েছে, তারা তাঁর (মালিকানাধীন) আর (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্র কাছে (খুব প্রিয় ও নৈকট্যশীল) রয়েছে (তাদের ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তারা তাঁর ইবাদতে লজ্জাবোধ করে না এবং ক্লান্ত হয় না। (বরং) রাতদিন (আল্লাহ্র) পবিত্রতা বর্ণনা করে, (কোন সময়) বিরত হয় না। (তাদের যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ সৃষ্ট জীব কোন কাতারে ? সুতরাং ইবাদতের যোগ্য তিনিই। অন্য কেউ যখন এরূপ নয়, তখন তাঁর শরীক বিশ্বাস করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতা। তওহীদের এসব প্রমাণ সত্ত্বেও) তারা কি বিশেষত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে পৃথিবীর বস্তুসমূহের মধ্য থেকে (যা আরও নিকৃষ্টতর ও নিম্নস্তরের ; যথা পাথর ও ধাতব মূর্তি) যা কাউকে জীবিত করবে ? অর্থাৎ যে বস্তু প্রমাণও দিতে পারে না। এরূপ অক্ষম কিরূপে উপাস্য হওয়ার যোগ্য হবে ? নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য হতো তবে উভয়ই (কবে) ধ্বংস হয়ে যেত। (কেননা, স্বভাবতই উভয়ের সংকল্প ও কাজে বিরোধ হতো এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ হতো। এমতাবস্থায় ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু বাস্তবে ধ্বংস হয়নি। তাই একাধিক উপাস্যও হতে পারে না।) অতএব (এ থেকে প্রমাণিত হলো যে,) তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র। (নাউযুবিল্লাহ্, তারা বলে, তাঁর অন্যান্য শরীকও রয়েছে। অথচ তাঁর এমন মাহাত্ম্য যে,) তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তাঁকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না এবং অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করতে পারেন। সুতরাং মাহাত্ম্যে তাঁর কেউ শরীক নেই। এমতাবস্থায় উপাস্যতায় কেউ কিরূপে শরীক হবে ? এরপর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে আলোচনা করা হচ্ছে,) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে ? (তাদেরকে) বলুন ঃ (এ দাবির উপর) তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। (এ পর্যন্ত প্রশ্ন ও যুক্তিগত প্রমাণের

মাধ্যমে শিরক বাতিল করা হয়েছে। অতঃপর ইতিহাসগত প্রমাণের মাধ্যমে বাতিল করা হচ্ছে :) এটা আমার সঙ্গীদের কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) এবং আমার পূর্ববর্তীদের কিতাবে (অর্থাৎ তওরাত, ইঞ্জীল ও যবূরে) বিদ্যমান রয়েছে। (এগুলো যে সত্য ও ঐশী গ্রন্থ, তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত। অন্যগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হলেও কোরআনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এসব কিতাবের যে বিষয়বস্তু কোরআনের অনুরূপ হবে, তা নিশ্চিতই বিশুদ্ধ হবে। তওহীদে বিশ্বাসী হয়ে যাওয়াই উল্লিখিত প্রমাণাদির দাবি ছিল, কিন্তু এরপরও তারা বিশ্বাসী হয়নি।) বরং তাদের অধিকাংশই সত্য বিষয়ে বিশ্বাস করে না। অতএব (এ কারণে) তারা (তা কবূল করতে) বিমুখ হচ্ছে। (তওহীদ কোন নতুন বিষয় নয় যে, তার প্রতি পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে ; বরং একটি প্রাচীন পন্থা। সেমতে) আপনার পূর্বে আমি এমন কোন পয়গম্বর পাঠাইনি, যাকে এরূপ ওহী প্রেরণ করিনি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। তারা (অর্থাৎ কতক মুশরিক) বলে : (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) সন্তান (রূপে) গ্রহণ করেছেন। (তওবা, তওবা) তিনি (এ থেকে) পবিত্র।তারা (ফেরেশতারা তাঁর সন্তান নয়) বরং (তাঁর) সম্মানিত বান্দা। (এ থেকেই নির্বোধদের ধাঁ ধাঁ লেগেছে। তাদের দাসত্ব, গোলামী ও শিষ্টাচার এরূপ যে,) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না (বরং আদেশের অপেক্ষায় থাকে) এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। (বিপরীত করতে পারে না। কেননা, তারা জানে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতের অবস্থাদি (ভালভাবে) জানেন। কাজেই তাঁর যে আদেশ হবে এবং যখন হবে, রহস্য অনুযায়ী হবে। তাই তারা কার্যত বিরোধিতা করে না এবং কথা বলায় আগে বাড়ে না। তাদের শিষ্টাচার এরূপ যে,) যার জন্যে সুপারিশ করার ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলার আছে, তারা সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ করতে পারে না। তারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে। (এ হচ্ছে তাদের দাসত্ব ও গোলামীর বর্ণনা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রবলত্ব ও প্রভুত্ব বর্ণিত হচ্ছে যদিও উভয়ের সারমর্ম কাছাকাছি। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে বলে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি যালিমদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহ্র পূর্ণ আধিপত্য আছে, যেমন অন্যান্য সৃষ্ট জীবের উপর আছে এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্র সন্তান কিরূপে হতে পারে) ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ অর্থাৎ আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্ট বস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন

দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও বোঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেছি ?

لَاعِبِيْنَ শব্দটি لعب ধাতু থেকে উদ্ভূত। বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে لعب বলা হয়। —(রাগীব) যে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে لهو বলা হয়। ইসলাম বিরোধীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্টি জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব সাক্ষী। কবি বলেন ঃ

هر گیاهے که از زمین روید
وحده لا شریك له گوید

অর্থাৎ ঃ মাটি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস 'ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু' বলে থাকে। لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতেই হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল ? এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবী ভাষায় لَوْ শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لَوْ শব্দ বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা ঊর্ধ্বজগৎ ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না। এ কাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং-তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়—আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য তো অনেক ঊর্ধ্বে।

لهو শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরোক্ত তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ لهو শব্দটি কোন সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও ওযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ — قذف শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يدمغ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زَاهِقٌ এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ

আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিও এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ ফেরেশতা), তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। এক. কারও ইবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। দুই. ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা ; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদতে এ দু'টি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাতদিন তসবীহ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করে না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস বলেন ঃ আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম ঃ তসবীহ্ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই ? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তসবীহ্ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়। ? কা'ব বললেন ঃ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি ? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। —(কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত)

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ এতে মুশরিকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এক. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্ট জীবকেই উপাস্য করেছে। এটা তো ঊর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্ট জীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হেয়। দুই. যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। সৃষ্ট জীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরী।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই

আল্লাহ্ থাকলে উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ্ চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ্ চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ্ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় আল্লাহ্ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়েই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে আল্লাহ্ হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ আয়াতেও এ দিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ্ হতে পারে না। আল্লাহ্ তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নন, যাকে জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ্ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞেস করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহ্র পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ এর এক অর্থ তফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, ذكر من معى বলে কোরআন এবং ذكر من قبلى বলে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত শিক্ষা দেয়া হয়েছে? তওরাত ও ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ করে। বাহ্রে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যেও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কিসসা-কাহিনী জীবিত আছে।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ্র সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ্র সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না

বাক্যের অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয় ; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

(৩০) কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না ? (৩১) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি ; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা কি জানে না যে, আকাশ ও পৃথিবী (পূর্বে) বন্ধ ছিল (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি হতো না এবং মৃত্তিকা থেকে ফসল উৎপন্ন হতো না। একেই 'বন্ধ' বলা হয়েছে ; যেমন আজও কোন স্থানে অথবা কোনকালে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা থেকে ফসল না হলে সে স্থানে অথবা সেকালের দিক দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে বন্ধ বলা হয়।) অতঃপর আমি উভয়কে (স্বীয় কুদরতে) খুলে দিলাম। (ফলে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা থেকে বৃক্ষ গজানো শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টি দ্বারা শুধু বৃক্ষই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ; বরং আমি (বৃষ্টির) পানি থেকে প্রত্যেক প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বে পানির প্রভাব অনস্বীকার্য প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে; যেমন অন্য আয়াতে আছে وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ তারা কি এরপরও (অর্থাৎ এসব কথা শুনেও) বিশ্বাস স্থাপন করে না। আমি

(স্বীয় কুদরতে) পৃথিবীতে পাহাড় এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে হেলতে না থাকে এবং আমি তাতে (পৃথিবীতে) প্রশস্ত পথ করেছি, যাতে তারা (এগুলোর মাধ্যমে) গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। আমি (স্বীয় কুদরতে) আকাশকে (পৃথিবীর বিপরীতে তার উপরে) এক ছাদ (সদৃশ) করেছি, যা (সর্বপ্রকারে) সুরক্ষিত (অর্থাৎ পতন, ভেঙ্গে যাওয়া এবং শয়তানের সেখানেই পৌঁছে আকাশের কথা শোনা থেকে সুরক্ষিত। কিন্তু আকাশের এই সুরক্ষিত হওয়া চিরস্থায়ী নয়—নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।) অথচ তারা (আকাশস্থিত) নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (অর্থাৎ এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে না।) তিনি এমন (সক্ষম) যে, তিনি রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন (এগুলোই আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে (এভাবে বিচরণ করে যেন) সাঁতার কাটছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا এখানে رويت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا — رتق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া এবং فتق এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি رتق ও فتق কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে 'বন্ধ হওয়া' ও 'খুলে দেয়ার' অর্থ কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ তফসীরবিদগণ যে উক্তি গ্রহণ করেছেন, তা-ই তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে; অর্থাৎ বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে দেবে। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌঁছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত رَتْقًا ও فَتَقْنَا বলে কি বোঝানো হয়েছে ? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ তরুলতা ইত্যাদি অংকুরিত হতো না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর নিয়ে হযরত ইবনে উমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে উমর তফসীর শুনে বললেন ঃ এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের

বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি رتق ও فتق এর নির্ভুল তফসীর করেছেন।

রূহুল মা'আনীতে ইবনে আব্বাসের এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনযির, আবূ নু'আয়ম ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ বলেছেন।

ইবনে আতিয়্যা আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন ঃ এই তফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞান ও তওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ বলা হয়েছে, এর সাথে উপরোক্ত তফসীরের দিক দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও এই তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরতুবী একে ইকরামার উক্তিও সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় ; অর্থাৎ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ তাবারীও এই তফসীর গ্রহণ করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয় ; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। বলা বাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাসীর ইমাম আহ্মদের সনদ দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলাম ; "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।" জওয়াবে তিনি বললেন ঃ "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।" এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ "আমাকে এমন কাজ বলে দিন, যা করে আমি জান্নাতে পৌঁছে যাই। তিনি বললেন ঃ

افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام -

অর্থাৎ ব্যাপক হারে সালাম কর (যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়), আহার করাও (হাদীসে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফির ফাসিক প্রত্যেককে আহার করালেও সওয়াব পাওয়া যাবে।) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামায পড়। এরূপ করলে তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ আরবী ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে।

পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীরে কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তফসীর বয়ানুল কোরআনে সূরা নমলের তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-ও এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা করেছেন।

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فلك বলা হয়। এ কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فلكة المغزل বলা হয়। (রূহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও فلك বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয় নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ
الْخَالِدُونَ ﴿৩৪﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿৩৫﴾ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ
إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۚ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ
كَافِرُونَ ﴿৩৬﴾ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿৩৭﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿৩৮﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿৩৯﴾ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿৪০﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (৪১) قُلْ
مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ط بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم
مُّعْرِضُونَ (৪২) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ط لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ (৪৩) بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ
حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا
مِنْ أَطْرَافِهَا ط أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (৪৪) قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ز وَلَا يَسْمَعُ
الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ (৪৫) وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ
رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (৪৬) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ
لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (৪৭)

(৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে ? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬) কাফিররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে ? এবং তারাই তো 'রহমান'-এর আলোচনায় অস্বীকার করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ, আমি সত্বরই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। অতএব আমাকে শীঘ্র করতে বলো না। (৩৮) এবং তারা বলে ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে ? (৩৯) যদি কাফিররা ঐ সময়টি জানত, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না ! (৪০) বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা

হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে। (৪২) বলুন ঃ 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হিফাযত করবে রাতে ও দিনে ? বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (৪৩) তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেবদেবী আছে, যারা তাদেরকে রক্ষা করবে ? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার মুকাবিলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (৪৪) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে ? (৪৫) বলুন ঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি ; কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না। (৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম'। (৪৭) আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি যুলুম হবে না। যদি কোন কর্ম তিলের দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিররা আপনার ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উল্লাস করে। কারণ, তারা বলত نَتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ আপনার এ ওফাতও নবুয়তের পরিপন্থী নয়। কেননা,) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। (আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ সুতরাং আপনার পূর্বে যেমন পয়গম্বরদের মৃত্যু হয়েছে এবং এতে তাদের নবুয়তে কোন আঁচ লাগেনি, তেমনি আপনার ওফাতের কারণেও আপনার নবুয়তে কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না। সারকথা এই যে, নবুয়ত ও ওফাত উভয়ই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে।) অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কি তারা চিরজীবী হয়ে থাকবে ? (শেষে তারাও মরবে। কাজেই আনন্দিত হওয়ার কি যুক্তি আছে ? উদ্দেশ্য এই যে, আপনার ওফাতের কারণে তাদের আনন্দ যদি নবুয়ত বাতিল হবার উদ্দেশ্যে হয়, তবে مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ আয়াতটি এর জওয়াব। পক্ষান্তরে যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ ও শত্রুতাবশত হয়, তবে اَفَاۡئِنْ مِّتَّ আয়াতটি-এর জওয়াব। মোটকথা, আপনার ওফাতের অপেক্ষায় থাকা সর্বাবস্থায় অনর্থক। মৃত্যু তো এমন যে) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। (আমি যে তোমাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জীবন দিয়েছি, এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে) আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি। ('মন্দ' বলে মেযাজবিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ দারিদ্র্য ইত্যাদি এবং 'ভাল' বলে মেযাজের অনুকূল বিষয় যেমন স্বাস্থ্য, ধনাঢ্যতা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এই অবস্থাগুলোই মানবজীবনে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এসব অবস্থায় কেউ ঈমান ও ইবাদতে কায়েম থাকে এবং কেউ কুফর ও গুনাহে লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা কি কি কর্ম কর, তা দেখার জন্যই জীবন দান করেছি।) আর (এই জীবন শেষ হলে পর) আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাই হলো প্রতিদান দিবস। জীবন তো সাময়িক ব্যাপার। এর জন্যই তাদের গর্বের শেষ নেই এবং তারা পয়গম্বরের ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উল্লাস করে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈমানের দৌলত উপার্জন করা তাদের দ্বারা হলো না যা তাদের উপকারে আসত। তা না করে তারা স্বীয় আমলনামা তমসাচ্ছন্ন এবং পরকালের মনযিল দুর্গম করে চলেছে।) আর (এ অবিশ্বাসীদের অবস্থা এই যে) সেই কাফিররা যখন আপনাকে দেখে, তখন শুধু আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করে (এবং পরস্পরে বলে) ঃ এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবতাদের (মন্দ) আলোচনা করে। (সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে তো দেবতাদেরকে অস্বীকার করারও অভিযোগ রয়েছে) এবং তারা (স্বয়ং) দয়াময় আল্লাহ্র আলোচনা অস্বীকার করে। (সুতরাং অভিযোগের বিষয় তো প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যক্রমই। কাজেই তাদের উচিত ছিল নিজেদের অবস্থার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। তারা যখন কুফরের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু শোনে ঃ যেমন পূর্বে لَيْنَا। تُرْجَعُوْنَ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মিথ্যারোপ করার কারণে বলতে থাকে, শাস্তিটি তাড়াতাড়ি আসে না কেন ? এই ত্বরা-প্রবণতা সাধারণত মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যও বটে, যেন) মানুষ ত্বরা-প্রবণই সৃজিত হয়েছে। (অর্থাৎ ত্বরা ও দ্রুততা যেন মানুষের গঠন-উপাদানের অংশ বিশেষ। এ কারণেই তারা দ্রুত আযাব কামনা করে এবং বিলম্বকে আযাব না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। কিন্তু হে কাফির সম্প্রদায়, এটা তোমাদের ভুল। কেননা, আযাবের সময় নির্দিষ্ট আছে। একটু সবর কর) আমি সত্বরই (আযাব আসার পর) তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ শাস্তি) দেখাব। অতএব আমাকে ত্বরা করতে বলো না। (কারণ, সময়ের পূর্বে আযাব আসে না এবং সময় হলে তা পিছু হটে না।) তারা (যখন নির্ধারিত সময়ে আযাব আসার কথা শোনে, তখন রাসূল ও মুসলমানদেরকে) বলে ঃ এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে ? যদি তোমরা (আযাবের সংবাদে) সত্যবাদী হও, (তবে দেরী কিসের ? শীঘ্র আযাব আনা হয় না কেন ? প্রকৃতপক্ষে এই মহাবিপদ সম্পর্কে তারা অবগত নয় বিধায় এমন নির্ভাবনার কথাবার্তা বলছে) হায়, কাফিররা যদি ঐ সময়টি জানত, যখন (তাদেরকে চতুর্দিক থেকে দোযখের অগ্নি বেষ্টন করবে এবং) তারা সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কেউ তাদের সাহায্যও করবে না (অর্থাৎ এই বিপদ সম্পর্কে অবগত হলে এমন কথা বলত না। তারা যে দুনিয়াতেই জাহান্নামের আযাব চাইছে তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী জাহান্নামের আযাব আসা জরুরী নয়।) বরং সে অগ্নি তাদের উপর অতর্কিতভাবে আসবে অতঃপর তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা ফেরাতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (যদি তারা বলে যে, এই আযাব পরকালে প্রতিশ্রুতি হওয়ার কারণে যখন দুনিয়াতে হয় না, তখন দুনিয়াতে এর কিছুটা নমুনা তো দেখাও, তবে তর্কক্ষেত্রে যদিও নমুনা দেখানো জরুরী নয়, কিন্তু এমনিতেই নমুনার সন্ধানও দেয়া হচ্ছে। তা এই যে,) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর ঠাট্টাকারীদের উপর ঐ আযাব পতিত হলো, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত (যে, আযাব কোথায় ? সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে, কুফর আযাবের কারণ। দুনিয়াতে না

হলেও পরকালে আযাব হবে। তাদেরকে আরও) বলুন ঃ কে তোমাদেরকে রাতে ও দিনে দয়াময় আল্লাহ্ থেকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব থেকে) হিফাযত করবে ? (এই বিষয়বস্তুর কারণে তওহীদ মেনে নেওয়া জরুরী ছিল, কিন্তু তারা এখনও তওহীদ মানে নি।) বরং তারা (এখন পূর্ববৎ) তাদের (প্রকৃত) পালনকর্তার স্মরণ (অর্থাৎ তওহীদ মেনে নেয়া) থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (হ্যাঁ, আমি مَنْ يَكْلَؤُكُمْ এর ব্যাখ্যার জন্য পরিষ্কার জিজ্ঞেস করি যে,) আমি ব্যতীত তাদের কি এমন দেবতা আছে, যারা (উল্লিখিত আযাব থেকে) তাদেরকে রক্ষা করবে ? (তারা তাদের কি হিফাযত করবে, তারা তো এমন অক্ষম ও অপারক যে) তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করার শক্তি রাখে না। (যেমন কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে দিতে শুরু করলেও তারা তা প্রতিরোধ করতে পারে না। কোরআন বলে وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ। সুতরাং তাদের দেবতা তাদের হিফাযত করতে পারে না) এবং আমার মুকাবিলায় তাদের কোন সঙ্গীও হবে না।) (তারা যে এসব উজ্জ্বল প্রমাণ সত্ত্বেও সত্যকে কবূল করে না, এর কারণ দাবি অথবা প্রমাণের ত্রুটি নয়); বরং (আসল কারণ এই যে) আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে (দুনিয়ায়) অনেক ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমন কি তাদের উপর (এ অবস্থায়) দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছিল। (তারা পুরুষানুক্রমে বিলাসিতায় মত্ত ছিল এবং খেয়েদেয়ে তর্জন-গর্জন করছিল। উদ্দেশ্য এই যে, তারাই গাফিল ছিল; কিন্তু শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও এতটুকু গাফিলতি উচিত নয়। এখানে একটি হুঁশিয়ারির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। তা এই যে) তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) দেশকে (ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে) চতুর্দিক থেকে অনবরত সংকুচিত করে আনছি। এরপরও কি তারা (আশা রাখে যে, রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে) জয়ী হবে ? (কেননা অভ্যস্ত ইঙ্গিত এবং আল্লাহর প্রমাণাদি এ বিষয়ে একমত যে, তারা বিজিত ও ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হবে—যে পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয় এবং ইসলামের সাহায্য বর্জন না করে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও যদি তারা মূর্খতা ও হঠকারিতাবশত আযাবেরই ফরমায়েশ করে, তবে) আপনি বলে দিন ঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি (আযাব আসা আমার সাধ্যের বাইরে। দাওয়াতের এই তরীকা ও হুঁশিয়ারি যদিও যথেষ্ট ; কিন্তু) এই বধিরদের যখন (সত্যের দিকে ডাকার জন্য আযাব দ্বারা) সতর্ক করা হয় তখন তারা ডাক শোনেই না। (এবং চিন্তাভাবনাই করে না বরং সেই আযাবই কামনা করে। তাদের সাহসিকতার অবস্থা এই যে) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও যদি তাদেরকে স্পর্শ করে তবে (সব বাহাদুরী নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং) বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ ! আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (ব্যস, এতটুকু সাহস নিয়েই আযাব চাওয়া হয়। তাদের এই দুষ্টুমির পরিপ্রেক্ষিতে তো দুনিয়াতেই ফয়সালা করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি অনেক রহস্যের কারণে প্রতিশ্রুত শাস্তি দুনিয়াতে দিতে চাই না; বরং পরকালে দেওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি। সেখানে) কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব (এবং সবার আমল ওযন করব)। সুতরাং কারও

উপর বিন্দুমাত্রও যুলুম হবে না, (যুলুম না হওয়ার ফলে) যদি (কারও কোন) কর্ম তিলের দানা পরিমাণও হয়, তবে আমি তা (সেখানে) উপস্থিত করব (এবং তাও ওযন করব) এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। (আমার ওযন ও হিসাব গ্রহণের পর কারও হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন থাকবে না। বরং এর ভিত্তিতেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। সুতরাং সেখানে তাদের দুষ্টুমিরও উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শাস্তি প্রদান করা হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফির ও মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আ) অথবা ওযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দ্রুত কামনা করত ; যেমন কোন কোন আয়াতে আছে نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ (আমরা তার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে ? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তার ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসূল নয়, রাসূল হলে মৃত্যু হতো না ; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত স্বীকার কর, তারা কি মৃত্যুবরণ করেন নি ? তাদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুয়তের ও রিসালতে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায় ? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে ?

اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست
کہ زندگانیٔ مانیز جاودانی نیست

(শত্রু মারা গেলে খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, আমাদের জীবনও অমর নয়।)

মৃত্যু কি ? : এরপর বলা হয়েছে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نفس বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন : ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত। —(রূহুল মা'আনী) আলিমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি

গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।—(রূহুল মা'আনী)

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ শব্দ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহ্ ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোন কোন আল্লাহ্ওয়ালা সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে از محبت تلخہا شیرین شوند (ভালবাসার কারণে তিক্তও মিষ্ট হয়ে যায়।) কবি বলেন ঃ

غم چه استادة توبرد رما
اندر ايار مابراد رما

মাওলানা রূমী বলেন ঃ

رنج راحت شدچو مطلب شدیزرگ
گرد گله توتیائے چشم گرگ

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা ঃ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা-নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুযুর্গগণ বলেন ঃ বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম ; কিন্তু যখন সুখ ও আরাম আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

ত্বরাপ্রবণতা নিন্দনীয় ঃ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ — عجل শব্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র-দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ

মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ। হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাইল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তূর পর্বতে পৌঁছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে "ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে" প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা ত্বরাপ্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন কাজ করা নয় ; বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পুণ্য কাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে ঃ লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

سَأُورِيكُمْ آيَاتِي এখানে ايات (নিদর্শনাবলী) বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জিযা ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে ; —(কুরতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো।

কিয়ামতে আমলের ওযন ও দাঁড়িপাল্লা ঃ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ — موازين শব্দটি ميزان এর বহুবচন। অর্থ ওযনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওযন করার জন্য অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওযন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওযন করা হবে। قسط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওযন করবে—সামান্যও বেশ-কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রা)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমল ওযন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওযন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে। —(মাযহারী)

হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎকাজের পাল্লা ভারী হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেনঃ অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে। সে আর কোনদিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারী হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবেঃ অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কোনদিন কামিয়াব হবে

না। উপরোক্ত হাফেয হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—হযরত জিবরাঈল (আ)।

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি আপানার পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন ? তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এক. যখন আমল ওযন করার জন্য দাঁড়িপাল্লার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ-অশুভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারও কথা কারও স্মরণে আসবে না। দুই. যখন আমলনামাসমূহ উড্ডীন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে–এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কথাই কারও মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আযাবের লক্ষণ হবে। তিন. পুলসিরাতে ওঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে স্মরণ করবে না।—(মাযহারী)

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওযন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওযনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমল কিরূপে ওযন করা হবে ঃ হাদীসে বেতাকাহ্-র ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের লিখিত আমলনানা ওযন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওযন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। কোরআনের وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا প্রভৃতি আয়াত এবং অনেক হাদীস এরই সমর্থন করে।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ ঃ তিরমিযী হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার দুটি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবার কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওযন করা হবে। এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওযন করা হবে। তোমার শাস্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপার মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে। লোকটি এ কথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করনি وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ লোকটি আরয করল ঃ এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।—(কুরতুবী)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

(৪৮) আমি মূসা ও হারূনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, আল্লাহ্ ভীরুদের জন্যে— (৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কিয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত। (৫০) এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (আপনার পূর্বে) মূসা ও হারূন (আ)-কে ফয়সালার, আলোর এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশের বস্তু (অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম, যারা (মুত্তাকীগণ) না দেখে তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং (আল্লাহ্‌কেই ভয় করার কারণে) কিয়ামতকে (ও) ভয় করে (কেননা, কিয়ামতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভয় রয়েছে। তাদেরকে যেমন আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তেমনি) এটা (অর্থাৎ কোরআনও) একটা কল্যাণময় উপদেশ (গ্রন্থ যা আমি নাযিল করেছি) অতএব (কিতাব নাযিল করা আল্লাহ্‌র অভ্যাস এবং কোরআন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তা প্রমাণিত হওয়ার পরও) তোমরা কি (এক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি) অস্বীকার কর ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ এই তিনটি গুণই তওরাতের। فرقان অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, ضياء অর্থাৎ অন্তরসমূহের জন্য আলো এবং ذكر অর্থাৎ মানুষের জন্য উপদেশ ও হিদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন ঃ فرقان বলে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা (আ)-এর সাথে ছিল ; অর্থাৎ ফিরাউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবিলার সময় আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফিরাউনী সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তী সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। ذكر ও ضياء উভয়টিই তওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, الفرقان এর পরে واو দ্বারা পৃথক করা থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে فرقان তওরাত নয়—অন্য কোন বিষয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ
قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾
قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ
وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ
اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ
فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ
اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا
لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾
قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ
فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا
فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ
اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ
يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا
يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يٰنَارُ

كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ
الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا
لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا
صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ
فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

(৫১) আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তাঁর সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত আছি। (৫২) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেনঃ 'এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে আছ ?' (৫৩) তাঁরা বলল ঃ আমরা আমাদের বাপদাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপদাদারাও। (৫৫) তাঁরা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করছ, না তুমি কৌতুক করছ (৫৬) তিনি বললেন ঃ না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহ্‌র কসম, যখন তোমরা পৃষ্ট প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। (৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি ব্যতীত ; যাতে তাঁরা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। (৫৯) তাঁরা বলল ঃ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল ? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। (৬০) কতক লোকে বলল ঃ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (৬১) তাঁরা বলল ঃ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তাঁরা দেখে। (৬২) তাঁরা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ ? (৬৩) তিনি বললেন না, এদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তাঁরা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তাঁরা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল ঃ লোকসকল ; তোমরাই বে-ইনসাব। (৬৫) অতঃপর তাঁরা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে ঃ 'তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না।' (৬৬) তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না ? (৬৭) ধিক তোমাদের জন্য এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না ?' (৬৮) তাঁরা বলল ঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি

তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম ঃ হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (৭০) তাঁরা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (৭১) আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কারস্বরূপ দিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম। (৭৩) আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি ওহী করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার যাকাত দান করার। তাঁরা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি ইতি (অর্থাৎ মূসার যমানার) পূর্বে ইবরাহীম (আ)-কে (উপযুক্ত) সুবিবেচনা দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর (জ্ঞানগত ও কর্মগত পরাকাষ্ঠা) সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত কামেল পুরুষ ছিলেন। তাঁর ঐ সময়টি স্মরণীয়) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে (মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে) বললেন ঃ এই (বাজে) মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজারী হয়ে তোমরা বসে আছ ? (অর্থাৎ এগুলো মোটেই পূজার যোগ্য নয়।) তারা (জওয়াবে) বলল ঃ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (তারা জ্ঞানী ছিল। এতে বোঝা যায় যে, এরা পূজার যোগ্য।) ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ (এদেরকে পূজনীয় মনে করার ব্যাপারে) প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (লিপ্ত) আছ ; (অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছেই এদের পূজনীয় হওয়ার কোন প্রমাণ ও সনদ নেই। তারা এ কারণে ভ্রান্তিতে লিপ্ত। আর তোমরা প্রমাণহীন, ভ্রান্ত কুসংস্কারের অনুসারীদের অনুসরণ করে ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছ। তারা ইতিপূর্বে এমন কথা শোনেনি। তাই আশ্চর্যান্বিত হলো এবং) তারা বলল ঃ তুমি কি (নিজের মতে) সত্য ব্যাপার (মনে করে) আমাদের সামনে উপস্থিত করছ, না (এমনিতেই) কৌতুক করছ ? ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ না (কৌতুক নয় ; বরং সত্য কথা। শুধু আমার মতেই নয়—বাস্তবেও এটাই সত্য যে এরা পূজার যোগ্য নয়) তোমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা (যিনি ইবাদতের যোগ্য) তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। তিনি (পালনকর্তা ছাড়াও) সবাইকে (অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো সহ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুকে) সৃষ্টি করেছেন। আমি এর (অর্থাৎ এই দাবির) পক্ষে প্রমাণও রাখি। (তোমাদের ন্যায় অন্ধ অনুকরণ করি না।) আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদের এই মূতিগুলোর দুর্গতি করব যখন তোমরা (এদের কাছ থেকে) চলে যাবে (যাতে তাদের অক্ষমতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা এ কথা ভেবে যে, সে একা আমাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে হয়তো এ-দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না এবং সবাই চলে গেল)। তখন (তাদের চলে যাওয়ার পর) তিনি মূতিগুলোকে কুড়াল ইত্যাদি দ্বারা ভেঙ্গে-চুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি ব্যতীত। [এটি আকারে অথবা তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত হওয়ার দিক দিয়ে বড়

ছিল। ইবরাহীম তাকে রেহাই দিলেন। এতে একপ্রকার বিদ্রূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, একটি আস্ত ও অন্যগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া থেকে যেন ধারণা জন্মে যে, হয়তো সেই অন্যগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। সুতরাং প্রথমত এই ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এরপর যখন তারা চূর্ণকারীর অনুসন্ধান করবে এবং প্রধান মূর্তির প্রতি সন্দেহও করবে না, তখন তাদের পক্ষ থেকে এর অপারকতারও স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে এবং প্রমাণ আরো অপরিহার্য হবে। সুতরাং পরিণামে এটা জব্দ করা এবং লক্ষ্য অপারকতা প্রমাণ করা। মোটকথা, এই উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) প্রধান মূর্তিকে রেহাই দিয়ে অবশিষ্ট সবগুলো ভেঙ্গে দিলেন।] যাতে তারা ইবরাহীমের কাছে (জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) প্রত্যাবর্তন করে। (এর পর ইবরাহীম জওয়াব দিয়ে পূর্ণরূপে সত্য প্রমাণিত করতে পারেন। মোটকথা, তারা পূজামণ্ডপে এসে মূর্তিগুলোর করুণ দৃশ্য দেখল এবং) তারা (পরস্পরে) বলল ঃ আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এরূপ (ধৃষ্টতাপূর্ণ) আচরণ কে করল ? নিশ্চয় সে বড় অন্যায় করেছে। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বোক্ত কথা تَاللّٰهِ لَأَكِيْدَنَّ الخ যাদের জানা ছিল না, তারাই এ প্রশ্ন করল। হয়তো তারা তখন বিতর্কে উপস্থিত ছিল না। কারণ, বিতর্কে সবারই উপস্থিত থাকা জরুরী নয় অথবা উপস্থিত থেকেও তারা শোনেনি এবং কেউ কেউ শুনেছে। [দুররে মনসূর) তাদের কতক (যারা পূর্বোক্ত কথা জানত তারা) বলল ঃ আমরা এক যুবককে এই মূর্তিদের সম্পর্কে (বিরূপ) সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (অতপর) তারা (সবাই কিংবা যারা প্রশ্ন করেছিল, তারা) বলল ঃ (তাহলে) তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর। যাতে (সে স্বীকার করে এবং) তারা (তার স্বীকারোক্তির) সাক্ষী হয়ে যায় (এভাবে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে শাস্তি দেয়া যায়। ফলে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না। মোটকথা, ইবরাহীম সবার সামনে আসলেন এবং তাঁকে) তারা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এ কাণ্ড করেছ ? তিনি (উত্তর) বললেন ঃ (তোমরা এই সম্ভাবনা মেনে নাও না কেন যে, আমি এ কাণ্ড) করিনি, বরং তাদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। (যখন এই প্রধানের মধ্যে কারক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তখন এই ছোটদের মধ্যে বাকশক্তিশীল হওয়ার সম্ভাবনাও হবে।) অতএব তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর, যদি তারা বাকশক্তিশীল হয়। (পক্ষান্তরে যদি প্রধান মূর্তির কারক হওয়া এবং ছোট মূর্তিগুলোর বাকশক্তিশীল হওয়া বাতিল হয়, তবে তাদের অক্ষমতা তোমরা স্বীকার করে নিলে। এমতাবস্থায় উপাস্য মেনে নেয়ার কারণ কি?) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং (পরস্পর) বলল ঃ আসলে তোমরাই অন্যায়ের উপর আছ। (এবং ইবরাহীম ন্যায়ের উপর আছে। যারা এমন অক্ষম তারা কিরূপে উপাস্য হবে)। অতঃপর (লজ্জায়) তাদের মস্তক নত হয়ে গেল। [তারা ইবরাহীম (আ)-কে পরাজয়ের সুরে বলল ঃ] হে ইবরাহীম, তুমি তো জান যে এই মূর্তিরা (কিছুই) বলতে পারে না। (আমরা এদেরকে কি জিজ্ঞেস করব ! তখন) ইবরাহীম (তাদেরকে খুব ভর্ৎসনা করে) বললেন ঃ (আফসোস, এরা যখন এমন, তখন) তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক, তোমাদের জন্যে (কারণ, তোমরা সত্য পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যাকে আঁকড়ে আছ।) এবং তাদের জন্যেও আল্লাহ্‌

ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদত কর। তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? [ইবরাহীম (আ) মূর্তি ভাঙ্গার কথা অস্বীকার করলেন না। তবে কাজটি যে তাঁরই, তা উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ তাঁ বক্তব্যের জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আরও ক্রুদ্ধ হলো। কারণ,

چو حجت فماند جفا جوئے را
بہ پرخاش درهم کشد روئے را

অর্থাৎ সামর্থ্যবান মূর্খ জওয়াব দিতে অক্ষম হলে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এই নীতি অনুযায়ী] তারা (পরস্পরে) বলল ঃ একে (অর্থাৎ ইবরাহীমকে) পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের (তার কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও। যদি তোমরা কিছু করতে চাও (তবে এ কাজ কর, নতুবা ব্যাপার সম্পূর্ণ রসাতলে যাবে। মোটকথা, সবাই সম্মিলিতভাবে এর আয়োজন করল এবং তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। তখন) আমি (অগ্নিকে বললাম ঃ হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের পক্ষে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (অর্থাৎ পুড়ে যাওয়ার মত উত্তপ্ত হয়ো না এবং কষ্টদায়ক পর্যায়ে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ো না, বরং মৃদুমন্দ বাতাসের মত হয়ে যাও। সেমতে তাই হলো) তারা তাঁর অনিষ্ট করতে চেয়েছিল (যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান), অতঃপর আমি তাদেরকে বিফল মনোরথ করে দিলাম। (তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না, বরং উল্টা ইবরাহীমের সত্যতা আরও অধিকতর প্রমাণিত হয়ে গেল।) আমি ইবরাহীমকে ও (তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে (সে সম্প্রদায়ের বিপরীতে ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কোরআনে আছে فَـآمَنَ لَهُ لُوطٌ এ কারণে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁরও শত্রু এবং অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট ছিল।) ঐ দেশের দিকে (অর্থাৎ সিরিয়ার দিকে) পৌঁছিয়ে (কাফিরদের অনিষ্ট থেকে) উদ্ধার করলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (জাগতিক কল্যাণও, কারণ সেখানে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ফলফুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলে অন্য লোক তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এছাড়া ধর্মীয় কল্যাণও ; কারণ, বহু পয়গম্বর সেখানে বিরাজিত হয়েছেন। তাদের শরীয়তসমূহের কল্যাণ দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবরাহীম আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন।) এবং (হিজরতের পর) আমি তাকে (পুত্র) ইসহাক ও (পৌত্র) ইয়াকুব দান করলাম এবং প্রত্যেককে (পুত্র ও পৌত্রকে উচ্চস্তরের) সৎকর্মপরায়ণ করলাম। (উচ্চস্তরের সৎকর্ম হচ্ছে পবিত্রতা, যা মানুষের মধ্যে নবীদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অর্থ এই যে, প্রত্যেককে নবী করলাম।) আর আমি তাদেরকে নেতা করলাম (যা নবুয়তের অপরিহার্য অঙ্গ)। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত (যা নবুয়তের করণীয় কাজ); আমি তাদের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম সৎ কাজ করার, (বিশেষত) নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার ; (অর্থাৎ নির্দেশ দিলাম যে, এসব কাজ কর।) তারা আমার (খুব) ইবাদত করত। (অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তারা উত্তমরূপে পালন করত। সুতরাং صَالِحِيْنَ বলে নবুয়তের পূর্ণতার দিকে, اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ

فِعْلَ الْخَيْرَاتِ বলে জ্ঞানগত পূর্ণতার দিকে, كَانُوْا لَنَا عَابِدِيْنَ বলে কর্মগত পূর্ণতার দিকে এবং اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ বলে অন্যদের হিদায়তের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি ইবরাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম (আ) তাদের কাছে اِنِّىْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ)-এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হলো যে, কাজটি কে করল ? যদি ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল ? প্রথমেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীমই এ কাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাঁর কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবত তাঁর কথার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি এবং ভুলেও যায়। (বয়ানুল কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেন ঃ ইবরাহীম (আ) উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেন নি ; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে। —(কুরতুবী)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا — جُذَاذ শব্দটি جِذٌّ এর বহুবচন। এর অর্থ খণ্ড। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।

اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ। অর্থাৎ শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় মান্য করত।

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ — اِلَيْهِ। শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দুই রকম সম্ভাবনা আছে। এক. এই দুই সর্বনাম দ্বারা ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি এ কাজ কেন করলে ? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। দুই. কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা كَبِيْر (প্রধান মূর্তি)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে

আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হলো ? সে যখন কোন উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়—রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনাঃ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল ঃ তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি ? তখন ইবরাহীম (আ) জওয়াব দিলেন ঃ না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর। এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আ) নিজে করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহ্র দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না ; যেমন কোরআনে আছে اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থাৎ রহমান আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন সওয়াব বাহ্রে মুহীত, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اسناد مجازى তথা রূপক ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আ) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত ঐ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করি নি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আ) কার্যতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে সেই এ কাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি انبت الربيع البقل (অর্থাৎ বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে ইবরাহীম (আ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে

সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজেদের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন ?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে যাদেরকে আমরা আল্লাহ্ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হতো, কেউই তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে ঃ فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ মোটকথা, কোনরূপ দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, ইবরাহীম (আ) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ ঃ এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ্ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেন নি। (বুখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহ্র জন্য বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে। اِنِّىْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হিফাযতের জন্য বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আ) স্ত্রী হযরত সারাহ্সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলে সে হযরত সারাহ্কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করল এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি ? ইবরাহীম (আ) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন ঃ সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহ্কে গ্রেফতার করা হলো। ইবরাহীম (আ) সারাহ্কেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী

ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আ) জালিমের মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্র কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ্ জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহ্কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্র দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহ্কে ফেরত পাঠিয়ে দিল (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না ; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তওরিয়া'। এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। যুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকাহ্বিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আ) নিজেই সারাহ্কে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলা বাহুল্য, এটাই তওরিয়া। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের 'তাকায়্যুহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না ; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে; যেমন ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। إِنِّيْ سَقِيْمٌ বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা, سَقِيْمٌ (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই 'আমি অসুস্থ' বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহ্র জন্য ছিল" এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গুনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গুনাহের কাজ আল্লাহ্র জন্য করার কোন অর্থই হতে পারে না। গুনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে—একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা ঃ মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্তের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্র দোস্ত ইবরাহীম (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহ্কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরিপন্থী। এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবুদ্ধিতার ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে كذبات (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো ? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আ)-এর ভুলকে عصى ও غوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কোরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোন ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ(সা)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ হাদীসে বর্ণিত ঐ তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ করবেন। এই ত্রুটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে كذبات তথা 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহ্রে মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তিলাওয়াতে, কোরআন শিক্ষা

অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায় ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লিখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা ঃ হাদীসে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্র জন্য ছিল ; কিন্তু হযরত সারাহ্ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয় নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরতুবীতে কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন ঃ তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হিফাযত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে فِى اللّٰهِ (আল্লাহ্র মধ্যে) এবং لِلّٰهِ (আল্লাহ্র জন্য)-এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ। (খাঁটি ইবাদত আল্লাহ্র জন্যই) স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো। কিন্তু পয়গম্বরদের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে।

ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপঃ যারা মু'জিযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন বস্তুর সত্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না—দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে কোন বস্তুর সত্তার জন্য কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহ্র চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্য উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরী, পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরী ; কিন্তু এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ—যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে নি। এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করেন ; অথচ অগ্নিসত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে ; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহ্র নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরদের নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেসব মু'জিযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন ঃ তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بَرْدًا (শীতল) শব্দের আগে وَسَلَامًا (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি

হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নূহ (আ)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ أُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

حَرِّقُوْهُ অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আ)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। শয়তান ইবরাহীম (আ)-কে 'মিন্‌জানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় ইবরাহীম (আ) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্ট জীব চীৎকার করে উঠল ঃ ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ্ তাদের সবাইকে ইবরাহীম (আ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল (আ) বললেনঃ কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো ঃ প্রয়োজন তো আছে ; কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। —(মাযহারী)

قُلْنَا يَا نَارُكُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নিই ছিল না ; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। ইবরাহীম (আ)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আ) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবনে তা ভোগ করিনি। —(মাযহারী)

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাস স্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদনদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের

অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً—অর্থাৎ আমি তাঁকে (দোয়া ও অনুরোধ অনুযায়ী) পুত্র ইসহাক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نافلة বলা হয়েছে।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৪) এবং আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তাঁরা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (৭৫) আমি তাঁকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং লূত (আ)-কে আমি (পয়গম্বরদের উপযোগী) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। (তন্মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ ছিল পুংমৈথুন। এছাড়া আরও অনেক অনর্থক ও মন্দ কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল ; যথা মদ্যপান, গান-বাজনা, শ্মশ্রু মুণ্ডণ, গোঁফ লম্বা করা, কবুতর-বাজি, ঢিলা নিক্ষেপ, শিস বাজানো, রেশমী বস্তু পরিধান। (রূহুল মা'আনী) নিশ্চয় তারা মন্দ ও পাপাচারী সম্প্রদায় ছিল। আমি লূতকে আমার রহমতের (অর্থাৎ যাদের প্রতি রহমত হয়, তাদের) অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। (কেননা) নিঃসন্দেহে সে (উচ্চস্তরের) সৎকর্মশীলদের একজন ছিল (উচ্চস্তরের সৎকর্মপরায়ণ অর্থ নিষ্পাপ, পবিত্র, যা পয়গম্বরের বৈশিষ্ট্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে জনপদ থেকে লূত (আ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদুম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল (আ) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত (আ) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেওয়া হয়েছিল। —(কুরতুবী)

تَعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ — خبائث শব্দটি خبيثة এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خبائث বলা হয়। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্ববৃহৎ নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে

বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকেই خبائث বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ চাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خبائث বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ

الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا

قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

---

(৭৬) এবং স্মরণ করুন নূহকে ; যখন তিনি এর পূর্বে আহবান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবূল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তাঁরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নূহ (আ)-এর (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন এর (অর্থাৎ ইবরাহিমী আমলের) পূর্বে তিনি (আল্লাহ্‌র কাছে) দোয়া করেছিলেন (যে, কাফিরদের কাছ থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।) তখন আমি তাঁর দোয়া কবূল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (এই সংকট কাফিরদের মিথ্যারোপ ও নানারূপ নির্যাতনের ফলে দেখা দিয়েছিল। উদ্ধার এভাবে করেছিলাম যে) আমি ঐ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা আমার বিধানসমূহকে (যেগুলো নূহ আনয়ন করেছিলেন) মিথ্যা বলত নিশ্চয় তারা ছিল খুব মন্দ সম্প্রদায়। তাই আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ — من قبل-এর অর্থ ইবরাহীম ও লূত (আ)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নূহ (আ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন ঃ رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا। অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, পৃথিবীর বুকে কোন কাফির অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনরূপেই তাঁর উপদেশ মানল

না, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ আমি অপারক ও অক্ষম হয়ে গেছি। আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ — كرب عظم (মহা সংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ؗ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

(৭৮) এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সেই ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম ; তাঁরা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে ? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে ; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হতো ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি। (৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে স্মরণ করুন, যখন উভয়েই কোন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে (যাতে শস্য কিংবা আঙ্গুর বৃক্ষ ছিল) বিচার করছিলেন। তাতে (ক্ষেতে) কিছু লোকের মেষপাল রাত্রিকালে ঢুকে পড়েছিল (এবং ফসল খেয়ে ফেলেছিল)। এই ফয়সালা যা (মোকদ্দমা পেশকারী) লোকদের সম্পর্কে হয়েছিল, আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর সেই ফয়সালা (অর্থাৎ ফয়সালার সহজ পদ্ধতি) সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতেই) আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। [অর্থাৎ দাউদের ফয়সালাও শরীয়তবিরোধী ছিল না। মোকদ্দমাটি ছিল এরূপঃ শস্যের যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, তারা মূল্য মেষপালের মূল্যের সমান ছিল। দাউদ (আ) জরিমানায় ক্ষেতের মালিককে মেষপাল দিয়েছিলেন। আইনের বিচার তাই ছিল। তাই সুলায়মান (আ) আপোসরফা হিসেবে উভয় পক্ষের রেয়াত করে প্রস্তাব দিলেন যে, কিছু দিনের জন্য মেষপাল ক্ষেতের মালিকদেরকে দেওয়া হোক। তারা এদের দুধ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে এবং মেষপালের মালিকদের শস্যক্ষেত্র দেওয়া হোক। তারা পানি সেচ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষেতের যত্ন নেবে। যখন ক্ষেতের ফসল পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন ক্ষেত ও মেষপাল তাদের মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হোক। এই আপোসরফা কার্যকর হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত। (দুররে মানসুর) এ থেকে জানা গেল যে, উভয় ফয়সালার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই যে, একটি শুদ্ধ হলে অপরটি অশুদ্ধ হবে। তাই كُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا (যোগ করা হয়েছে) এবং এ পর্যন্ত দাউদ ও সুলায়মান (আ) উভয়ের ব্যাপক ও অভিন্ন মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ও অলৌকিকতার বর্ণনা হচ্ছে ঃ আমি পর্বতসমূহকে দাউদের সাথে অধীন করে দিয়েছিলাম, (তাঁর তসবীহ্ পাঠের সাথে) তারা (ও) তসবীহ পাঠ করত এবং (এমনিভাবে) পক্ষীসমূহকেও ; (যেমন সূরা সাবায় রয়েছে يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ কেউ যেন এতে আশ্চর্যবোধ না করে। কেননা, এসব কাজের) আমিই ছিলাম কর্তা। (আমার মহান শক্তি-সামর্থ্য বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমতাবস্থায় এসব মু'জিযায় আশ্চর্যের কি আছে ? আমি তাকে তোমাদের (উপকারের) জন্য বর্মনির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা (অর্থাৎ বর্ম) তোমাদেরকে (যুদ্ধে) একে অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। (এই বিরাট উপকারের দাবি এই যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হও।) অতএব (এই নিয়ামতের) শোকর করবে (না) কি ? আমি সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, তা তাঁর আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো, যাতে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। [অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। এটা তাঁর বাসস্থান ছিল। অর্থাৎ তাঁর সিরিয়া থেকে কোথাও যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয়ই বায়ুর মাধ্যমে হতো। দুররে মনসুরে বর্ণিত রয়েছে যে, সুলায়মান (আ) পারিষদবর্গসহ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করতেন। এরপর বায়ুকে ডেকে আদেশ করতেন। বায়ু সবাইকে উঠিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক এক মাসের দূরত্বে পৌঁছিয়ে দিত।] আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি।

(সুলায়মানকে এসব বিষয়দানের রহস্য আমার জানা ছিল। তাই দান করেছিলাম।) শয়তানদের মধ্যে (অর্থাৎ জিনদের মধ্যে) কতক সুলায়মান (আ)-এর জন্য (সমুদ্রে) ডুবুরির কাজ করত (যাতে মোতি বের করে তাঁর কাছে আনে) এবং এ ছাড়া তারা অন্য আরও অনেক কাজ (সুলায়মানের জন্য) করত। (জিনরা খুবই অবাধ্য ও দুষ্ট ছিল ; কিন্তু) আমিই তাদেরকে সামাল দিতাম (ফলে তারা টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারত না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ—অভিধানে نفش শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمَانَ — فَهَّمْنَا هَاশব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মোকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না ; কিন্তু আল্লাহ্ তা''আলা সুলায়মান (আ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহ্র কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ঃ দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে ; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। (কেননা, ফিকাহ্র পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দিল। হযরত সুলায়মান (আ) বললেন ঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হতো এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ) বললেন ঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি ? সুলায়মান (আ) বললেন ঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন শস্যক্ষেতের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হযরত দাউদ

(আ) এই রায় পছন্দ করে বললেন ঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি ? এখানে প্রশ্ন হয়, দাঊদ (আ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান (আ)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল ? যদি হযরত দাঊদ (আ) নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কিনা ? —অর্থাৎ রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা।

কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েযই নয় ; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন ক্রীড়নকে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয বরং উত্তম। হযরত উমর ফারূক (রা) আবূ মূসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।—কুরতুবী সংক্ষেপিত) শামসুল আয়িম্মা সুরখসী মবসূতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ হযরত দাঊদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) উভয়ের রায় স্ব স্ব স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই যে, দাঊদ (আ) (আ)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং সুলায়মান (আ) (আ) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মোকদ্দমার রায় ছিল না ; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা। কোরআনে "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" (অর্থাৎ আপস করা উত্তম) বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পন্থাই আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় হয়েছে। —(মাযহারী)

হযরত উমর ফারূক (রা) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মোকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস-রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরীয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। (—মুঈনুল হুক্কাম)

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী দাউদ (আ) (আ)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি ; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপোস-রফার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিত যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, না কোন একটিকে ভ্রান্ত বলা হবে ঃ এ স্থলে কুরতুবী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পরবিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে, না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে ? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলিমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরস্পরবিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا এতে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ) (আ)-এর প্রতি কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সত্য ছিল এবং সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়ও। তবে সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয় তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য ; অর্থাৎ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ) (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে সত্য রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এতে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্হ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসূলে ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে—একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভুল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক সওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছার দ্বিতীয় সওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে)। এই হাদীস থেকে আলিমগণের উপরোক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাব্দিক মতবিরোধের মতই। কেননা, উভয় পক্ষ সত্যপন্থী হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সত্তার দিক দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গুনাহ্ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌঁছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম সওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভর্ৎসনা

করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গুনাহ্গার হবে–এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তফসীরে কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারও জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত ঃ হযরত দাঊদ (আ) (আ)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে ; যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, দাঊদ (আ) (আ)-এর শরীয়তের ফয়সালা আমাদের শরীয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেঈর মাযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারও জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে, তবে জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদের ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিক এ বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেত্রের হিফাযত করা মালিকদের দায়িত্ব। হিফাযত সত্ত্বেও যদি রাত্রিবেলায় কারও জন্তু ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও কূফার ফিকাহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হিফাযতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারও ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হিফাযতকারী না থাকে, জন্তু স্বপ্রণোদিত হয়ে কারও ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, جرح لعجماء جبار অর্থাৎ জন্তু কারও ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না (অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্য মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত)। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়, জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহণ করতে হবে না। বারা ইবনে আযেবের ঘটনা সে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকাহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবেলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ ঃ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ হযরত দাঊদ (আ) (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যবূর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তসবীহ্ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহ্র আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ্ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহ্র কুদরতের অধীন একটি মু'জিযা। মু'জিযার জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক

অচেতন বস্তুর মধ্যে মু'জিযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তিলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তিলাওয়াত শোনার জন্য থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। আবূ মূসা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর তিলাওয়াত শুনেছেন তখন আরয করলেন ঃ আপনি শুনছেন—একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। (ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তিলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল ঃ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ—অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই لباس বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হিফাযতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ অর্থাৎ আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা সরু করতে পারতেন। দুই. আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গম্বরগণের কাজ ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আ)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ অর্থাৎ যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ তরবারির বিপদ থেকে হিফাযত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ, তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্প কর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে ; যেমন দাউদ (আ) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মূসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্প কর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই ; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব

উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা ঃ হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন সুলায়মান (আ) (আ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফিলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ূ দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ-এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেমন দাউদ (আ)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াযের সাথে তসবীহ্ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, দাউদ (আ)-এর বশীকরণের মধ্যে مع (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে ل (জন্য) অক্ষর ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আ) যখন তিলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তসবীহ্ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিত ; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। —(রূহুল মা'আনী, বায়যাভী)

তফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ) (আ) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করত অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আ) (আ)-এর এই সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হতো। এগুলোতে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে

আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌছিয়ে দিত। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আ) (আ) মাথা নত করে আল্লাহ্র যিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডান-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন। —(ইবনে কাসীর)

عـاصـفـة এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رخـاء বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যার দ্বারা ধুলা ওড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুইটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহ্র কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গসংঘাত সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পাখিরও কোনরূপ ক্ষতি হতো না।

সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূতকরণ ঃ وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ অর্থাৎ আমি সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত ; যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاۤءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ অর্থাৎ তারা সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত। সুলায়মান (আ) তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَـيَـاطِيْنَ শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনির্মিত সূক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্য আসলে جن অথবা جنات শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়—কাফির, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সব জিন সুলায়মান (আ)-এর বশীভূত ছিল; কিন্তু মু'মিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই সুলায়মান (আ)-এর নিদর্শনাবলী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَـيَـاطِيْنَ তথা কাফির জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি সুলায়মান (আ)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুন কাফির জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশংকা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ঃ দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন ; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান (আ)-এর জন্য

দেখাও যায় না, এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন ; যেমন বায়ু, জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।—(তফসীরে কবীর)

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۸۳﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿۸۴﴾

(৮৩) এবং স্মরণ করুন আইউবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন ঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই আইউব (আ)-এর কথা আলোচনা করুন, যখন সে (দুরারোগ্য) রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলল ঃ আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও অধিক দয়াবান (অতএব মেহেরবানী করে আমার কষ্ট দূর করে দিন)। অতঃপর আমি তার দোয়া কবূল করলাম এবং তার কষ্ট দূর করলাম এবং (তার অনুরোধ ছাড়াই) তার পরিবারবর্গ (অর্থাৎ যেসব সন্তান-সন্ততি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল অথবা মৃত্যুবরণ করেছিল) ফিরিয়ে দিলাম (তারা তার কাছে এসেছিল কিংবা সমপরিমাণ সন্তান-সন্ততি আরও জন্মগ্রহণ করেছিল) এবং তাদের সাথে (গণনায়) তাদের মত আরও দিলাম (অর্থাৎ পূর্বে যতজন ছিল, তাদের সমান আরও দিলাম, নিজের ঔরসজাত হোক কিংবা সন্তানের সন্তান হোক) আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আইউব (আ)-এর কাহিনী ঃ আইউব (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্দব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য

কোন কারণে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন ; বরং তাদের তুলনায় আরও আধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয ইবনে-কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা আইউব (আ)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসব বস্তু তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আ)। —(ইবনে-কাসীর) সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবা-যত্ন করতেন। আইউব (আ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ অর্থাৎ পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত ; তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহ্র কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ্ তা'আলা আইউব (আ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল।) বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইউব (আ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ যখন আইউব (আ)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহ্র স্মরণ ও ইবাদতে আরও বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্র কাছে আরয করেন ঃ হে আমার পালনকর্তা ! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেয ইবনে-কাসীর লিখেছেন ঃ এই কাহিনী সম্পর্কে ওহ্ব ইবনে মুনাব্বেহ্ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না।

আইউব (আ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী নয় ঃ হযরত আইউব (আ) সাংসারিক ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেন নি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন ? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় (অথচ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়)। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল—বেসবরী ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا (আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইউব (আ)-এর দোয়া কবূল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো ঃ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইউব (আ) তদ্রূপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষতজর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্তমাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে এক পাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন ; কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইউব (আ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন ? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাকে খেয়ে ফেলেছে ? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইউব (আ) বললেন ঃ আমিই আইউব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন ঃ আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন ঃ আইউব (আ) আবার বললেন ঃ লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইউব। আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোয়া কবূল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত

ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। —(ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ হযরত আইউব (আ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন ঃ এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম। -(কুরতুবী)

কেউ কেউ বলেন ঃ পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই লাভ করলেন এবং তাদের মত সন্তান বলে সন্তানের সন্তান বোঝানো হয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

وَأَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

---

(৮৫) এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। (৮৬) আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের (কথা) স্মরণ করুন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন (শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত বিধানাবলীতে) অটল। আমি তাঁদের (সবাই)-কে আমার (বিশেষ) রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা পূর্ণ সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী ? তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে কাসীর বলেন ঃ তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্র নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না ; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়ামা' (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে

একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই ঃ সদাসর্বদা রোযা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল ঃ আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সদাসর্বদা রোযা রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্সা কর না? লোকটি বলল ঃ নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল ঃ যাও, কোনরূপ এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল ঃ সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল ঃ তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? উত্তর হলো ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই যুলুম করেছে, এই যুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন ঃ আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মুকাদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ? উত্তর হলো ঃ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল ঃ হুযূর, আমার শত্রু পক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া

নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে ? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল ঃ আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হন নি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপ রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুলকিফল' শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্বপূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। —(ইবনে-কাসীর)

মুসনাদে আহমদে আরও একটি রেওয়ায়েত আছে ; কিন্তু তাতে যুলকিফলের পরিবর্তে আলকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতে বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে—আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-উমর বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন ঃ বনী-ইসরাইলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফ্‌ল। সে কোন গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাঁকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্না জুড়ে দিল। সে বলল ঃ কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমার উপর কোন জোর-জবরদস্তি করছি ? মহিলা বলল ঃ না, জবরদস্তি কর নি ; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনদিন করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফ্‌ল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল ঃ যাও, এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফ্‌ল আর কোনদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফ্‌ল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল ঃ غفر الله للكفل অর্থাৎ আল্লাহ্ কিফ্‌লকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্ সিত্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেয়া হয়, তবে এতে কিফ্‌লের কথা বলা হয়েছে--যুলকিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোন ব্যক্তি। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা' নবীর খলীফা ও সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

(৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা আলোচনা করুন ; যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি নির্দোষ আমি গুনাহ্গার। (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবেই বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং মাছওয়ালার (অর্থাৎ হযরত ইউনুস পয়গম্বরের) কথা আলোচনা করুন, যখন তিনি (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব টলে যাওয়ার পরও ফিরে আসেন নি এবং এই সফরের জন্য আমার আদেশের অপেক্ষা করেননি) এবং তিনি (নিজের ইজতিহাদ দ্বারা) মনে করেছিলেন যে, আমি (এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে) তাঁকে পাকড়াও করব না [অর্থাৎ এই পলায়নকে তিনি নিজের ইজতিহাদ দ্বারা বৈধ মনে করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেন নি ; কিন্তু যে পর্যন্ত আশা থাকে, সেই পর্যন্ত ওহীর অপেক্ষা করা পয়গম্বরগণের জন্য সমীচীন। এই সমীচীন কাজ তরক করার কারণে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করা হয়। সেমতে পথিমধ্যে সমুদ্র পড়লে তিনি নৌকায় সওয়ার হন। নৌকা চলতে চলতে এক জায়গায় থেমে যায়। ইউনুস (আ)-এর বুঝতে বাকি রইল না যে, বিনা অনুমতিতে পলায়ন পছন্দ করা হয় নি। এ কারণেই নৌকা থেমে গেছে। তিনি নৌকার আরোহীদেরকে বললেন ঃ আমাকে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা সম্মত হলো না। লটারী করা হলে তাতেও তাঁরই নাম বের হলো। অবশেষে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলো। আল্লাহ্র আদেশে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। (দুর্‌রে মনসুর) অতঃপর তিনি জমাট অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ঃ [এক অন্ধকার ছিল মাছের পেটের, দ্বিতীয় সমুদ্রে পানির ; উভয় গভীর অন্ধকার অনেকগুলো অন্ধকারের সমতুল্য ছিল কিংবা তৃতীয় অন্ধকার ছিল রাত্রির। (দুর্‌রে মনসুর)] তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (এটা তওহীদ); তুমি (সব দোষ থেকে) পবিত্র, (এটা পবিত্রতা বর্ণনা) আমি নিশ্চয়ই দোষী। (এটা ক্ষমা প্রার্থনা। এর উদ্দেশ্য আমার ত্রুটি মাফ করে এই সংকট থেকে মুক্তি দাও।) অতঃপর

আমি তাঁর দোয়া কবূল করলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। (এই কাহিনী সূরা সাফফাতে فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে (দুশ্চিন্তা থেকে) মুক্তি দিয়ে থাকি (যদি কিছুকাল চিন্তাগ্রস্ত রাখা উপযোগী না হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَذَا النُّوْنِ হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ)-এর কাহিনী কোরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহেবুল হূত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূন' ও 'হূত' উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুননূন ও সাহেবুল হূতের অর্থ মাসওয়ালা। ইউনুস (আ)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুননূনও বলা হয় এবং সাহেবুল হূত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আ)-এর কাহিনী ঃ তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, ইউনুস (আ)-কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল)। অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মা'দের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবূল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এ দিকে ইউনুস (আ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন্ রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। (মাযহারী) এর ফলে ইউনুস (আ)-এর প্রাণনাশেরও আশংকা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে

লটারি করা হলো। ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হলো। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হলো। পুনরায় লটারি করা হলো। এবারও ইউনুস (আ)-এর নামই বের হলো। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারি করা হলো। কিন্তু নাম ইউনুস (আ)-এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ অর্থাৎ লটারির ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস (আ)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয় ; বরং তার উদর কয়েক দিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না ; বরং আল্লাহ্র ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহ্র নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহ্র রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবূল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে ; বরং প্রাণনাশেরও আশংকা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও গুনাহ্ ছিল না ; কিন্তু উত্তম পন্থায় খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্র নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে। তাদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ক্রটি হলেও তজ্জন্যে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আ) আল্লাহ্র রোষে পতিত হন।

তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আ)-এর প্রতি রোষের এই

ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাব দানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল ; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে ; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। (কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন।

ذَهَبَ مُغَاضِبًا —অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। رب শব্দটিকে مغاضبا এর مفعول বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও مغاضبا لربه অর্থাৎ পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফির ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত।—(কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ অভিধানের দিক দিয়ে نقدر শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি قدرت ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না বলা বাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না ; কারণ এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় এটা قدر ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা ; যেমন এক আয়াতে রয়েছে ঃ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ এই অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ) মনে করতেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, এটা তফসীরের অর্থে قدر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আ) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ্, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

ইউনুস (আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল ঃ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ —অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনুস (আ)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি ; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ মাছের পেটে কৃত ইউনুস (আ)-এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করবেন।—মাযহারী

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ؗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

(৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা আলোচনা করুন, যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (৯০) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবূল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তাঁরা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাঁরা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তাঁরা ছিল আমার কাছে বিনীত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যাকারিয়া (আ)-এর (কথা) আলোচনা করুন, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নিঃসন্তান রেখো না (অর্থাৎ আমাকে সন্তান দিন, যে আমার ওয়ারিস হবে) এবং (এমনিতে তো) ওয়ারিসদের মধ্য থেকে উত্তম (অর্থাৎ সত্যিকার ওয়ারিস) আপনিই (কাজেই সন্তানও সত্যিকার ওয়ারিস হবে না ; বরং এক সময় সেও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাহ্যিক ওয়ারিস দ্বারা কতিপয় ধর্মীয় উপকার হাসিল হবে। তাই তা প্রার্থনা করছি।) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবূল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া (পুত্র) এবং তাঁর জন্য তাঁর (বন্ধ্যা) স্ত্রীকেও প্রসবযোগ্য করেছিলাম। (যে সমস্ত পয়গম্বরের কথা এই সূরায় উল্লেখ করা হলো) তাঁরা সবাই সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আশা ও ভীতি সহকারে আমার ইবাদত করতেন এবং আমার সামনে বিনীত হয়ে থাকতেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন ; কিন্তু সাথে সাথে اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ও বলে দিয়েছেন ; অর্থাৎ পুত্র পাই বা না পাই ; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিস। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরদের আসল মনোযোগ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়।

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কবূল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গুনাহ্ ও ত্রুটির জন্য ভয়ও করে। —(কুরতুবী)

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا
وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তাঁর কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সেই নারীর (অর্থাৎ মারইয়ামের কথা) আলোচনা করুন, যিনি তাঁর সতীত্বকে (পুরুষদের কাছ থেকে) রক্ষা করেছিলেন (বিবাহ থেকেও এবং অবৈধ সম্পর্ক থেকেও)। অতঃপর আমি তার মধ্যে (জিবরাঈলের মধ্যস্থতায়) আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম (ফলে স্বামী ছাড়াই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হয়) এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্র [ঈসা (আ)]-কে বিশ্ববাসীর জন্য (আমার কুদরতের) নিদর্শন করেছিলাম। [যাতে তাকে দেখে শুনে তারা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং পিতামাতা ছাড়াও পারেন ; যেমন আদম (আ)।]

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾
وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ
الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾
وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ
يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ
الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ
كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۖ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (৯৯)
لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ (১০০) اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ
لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (১০১) لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ
وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ (১০২) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ
الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۖ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (১০৩)
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۖ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۖ
وَعْدًا عَلَيْنَا ۖ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ (১০৪) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ (১০৫)

(৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত ; (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফিরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে ; হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম ; বরং আমরা গুনাহ্গারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (৯৯) এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হতো, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে। (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে। (১০৩) মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে ঃ আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া

হয়েছিল। (১০৪) সে দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। (১০৫) আমি উপদেশের পর যবূরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বাপর সম্বন্ধ ঃ এ পর্যন্ত পয়গম্বরদের কাহিনী, ঘটনাবলী এবং অনেক আনুসঙ্গিক মৌলিক ও শাখাগত রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ, রিসালত, পরকালের বিশ্বাস ইত্যাদি মূলনীতি সব পয়গম্বরদের মধ্যে অভিন্ন। এগুলো তাদের দাওয়াতের ভিত্তি। উল্লিখিত ঘটনাবলীতে পয়গম্বরগণের প্রচেষ্টার মূলকেন্দ্র ছিল তওহীদের বিষয়বস্তু। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাহিনীসমূহের ফলাফল হিসেবে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে এবং শিরকের নিন্দা করা হয়েছে।)

লোকসকল, (উপরে পয়গম্বরদের যে তরীকা ও তওহীদী বিশ্বাস জানা গেল,) এটা তোমাদের তরীকা (যা মেনে চলা তোমাদের উপর ওয়াজিব।)—একই তরীকা (এতে কোন নবী ও কোন শরীয়তের মতভেদ নেই। এই তরীকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার ইবাদত কর এবং (যখন এটা প্রমাণিত যে, সব আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এবং সব শরীয়ত এই তরীকার প্রবর্তক, তখন লোকদেরও এই তরীকায় থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু তা হয়নি ; বরং মানুষ তাদের ধর্ম বিষয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। (তারা এর শাস্তি দেখে নেবে ; কেননা) প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে)। অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তার পরিশ্রম বিফলে যাবে না এবং আমি তা লিখে রাখি (এতে ভুলভ্রান্তির আশংকা নেই। এই লেখা অনুযায়ী প্রত্যেকেই সওয়াব পাবে)। আর (সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে—আমার এই কথায় অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করে বলে যে, দুনিয়ায় এত দীর্ঘ বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোন মৃতকে জীবিত হতে এবং তার হিসাব-নিকাশ হতে দেখিনি। তাদের এ সন্দেহ অমূলক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য কিয়ামতের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিনের পূর্বে কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না। এ কারণেই) আমি যেসব জনপদকে (আযাব অথবা মৃত্যু দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, সেগুলোর অধিবাসীদের জন্য এটা (শরীয়তগত অসম্ভাব্যতার অর্থে) অসম্ভব যে, তারা (দুনিয়াতে হিসাব-নিকাশের জন্য) ফিরে আসবে (কিন্তু এই ফিরে না আসা চিরকালীন নয় ; বরং প্রতিশ্রুতি সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।) যে পর্যন্ত না (ঐ প্রতিশ্রুত সময় আসবে, যার প্রাথমিক আয়োজন হবে এই যে,) ইয়াজুজ-মাজুজ (যাদের পথ এখন যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা রুদ্ধ আছে,) মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা (সংখ্যাধিক্যের কারণে) প্রত্যেক উচ্চভূমি (টিলা ও পাহাড়) থেকে অবতরণরত (মনে) হবে। আর (আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের সত্য প্রতিশ্রুত সময়) নিকটবর্তী হলে এমন অবস্থা হবে যে, অবিশ্বাসীদের চক্ষু বিস্ফারিত থেকে যাবে (এবং তারা বলতে থাকবে), হায় আমাদের

দুর্ভাগ্য ; আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম (এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলবে, একে তো তখন গাফিলতি বলা যেত, যখন আমাদেরকে কেউ সতর্ক না করত) বরং (সত্য এই যে,) আমরাই দোষী ছিলাম। (সারকথা এই যে, যারা কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, তারাও তখন তাতে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। এরপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করছ, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে (এবং) তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (কোন কোন মুশরিক যেসব পয়গম্বর ও ফেরেশতাকে দুনিয়াতে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তাঁরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কেননা, তাঁদের ক্ষেত্রে একটি শরীয়তসম্মত অন্তরায় আছে যে, তারা জাহান্নামের যোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে তাঁদের কোন দোষও নেই। পরবর্তী إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ আয়াতেও এই সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এটা বুঝার বিষয় যে,) যদি তারা (মূর্তিরা) বাস্তবিকই উপাস্য হতো, তবে তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করত না (প্রবেশও ক্ষণস্থায়ী নয় ; বরং) প্রত্যেকেই (পূজাকারী ও পূজিত) তাতে চিরকাল বাস করবে। তারা তথায় চীৎকার করবে এবং (হট্টগোলের কারণে) তথায় তারা কারও কোন কথা শুনবে না। (এ হচ্ছে জাহান্নামীদের অবস্থা এবং) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে পুণ্য অবধারিত হয়ে গেছে, (এবং তা তাদের কাজে-কর্মে প্রকাশ পেয়েছে) তারা জাহান্নাম থেকে (এতটুকু দূরে) থাকবে (যে) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না। (কেননা, তারা জান্নাতে থাকবে। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকবে।) তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের মধ্যে চিরবসবাস করবে। তাদেরকে মহাত্রাস (অর্থাৎ কিয়ামতে জীবিত হওয়া এবং হাশরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) চিন্তান্বিত করবে না এবং (কবর থেকে বের হওয়া মাত্রই) ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে। (তারা বলবে ঃ) আজ তোমাদের ঐ দিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (এ সম্মান ও সুসংবাদের ফলে তাদের আনন্দ ও প্রফুল্লতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের ত্রাস ও ভীতি থেকে কেউ মুক্ত থাকবে না—সবাই এর সম্মুখীন হবে। যেহেতু সৎ বান্দারা খুব কম সময়ের জন্য এর সম্মুখীন হবে, তাই সম্মুখীন না হওয়ারই শামিল।) ঐ দিনটিও স্মরণীয়, যেদিন আমি (প্রথম ফুঁৎকারের পর) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেমন লিখিত বিষয়বস্তুর কাগজপত্রকে গুটানো হয়। (গুটানোর পর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া অথবা দ্বিতীয় ফুঁৎকার পর্যন্ত তদবস্থায় রেখে দেওয়া উভয়টি সম্ভবপর।) আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় (প্রত্যেক বস্তুর) সূচনা করেছিলাম, তেমনি (সহজেই) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা, আমি অবশ্যই (একে পূর্ণ) করব। (উপরে সৎ বান্দাদেরকে যে সওয়াব ও নিয়ামতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাচীন ও জোরদার ওয়াদা। সেমতে) আমি (সব আল্লাহ্র) গ্রন্থসমূহে (লওহে মাহ্ফুযে লেখার পর) লিখে দিয়েছি যে, এই পৃথিবীর (অর্থাৎ জান্নাতের) মালিক আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ হবে। (এই ওয়াদার প্রাচীনত্ব এভাবে পরিস্ফুট যে, এটা লওহে মাহ্ফুযে লিখিত আছে এবং জোরদার হওয়া এভাবে বুঝা যায় যে, কোন আল্লাহ্র গ্রন্থ এ ওয়াদা থেকে খালি নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরীয়তগত অসম্ভব' -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

لَا يَرْجِعُوْنَ বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لا অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ حَرَامٌ শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে لا কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী।—(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ এখানে حَتّٰى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ ? আমরা বললাম ঃ আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فتحت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ্ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

حدب শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি—বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের

জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ—অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফিরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা (আ), হযরত ওযায়র (আ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন ? তফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে, এ কারণে জিজ্ঞেস করে না, না তারা সন্দেহ ও জওয়াবের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। লোকেরা আরয করল? আপনি কোন্ আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ আয়াতটি হলো এই ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিতৃষ্ণার অবধি থাকেনি।তারা বলতে থাকে ঃ এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলিম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌঁছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন ঃ আমি বলতাম যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়র (আ) এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন ? (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফিররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ কথার কোন জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা—

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ-

আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ—অর্থাৎ যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ—হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ فزع اكبر (মহাত্রাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উত্থিত হবে। কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন ঃ শিঙ্গায় তিনবার ফুঁৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকার হবে ত্রাসের ফুঁৎকার।

এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فزع اكبر বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুঁৎকার হবে বজ্রের ফুঁৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সবকিছু কানা হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুঁৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মুসনাদে আবূ ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবূ হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(মাযহারী) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاۤءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ হযরত ইবনে আব্বাস سجل শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ প্রমুখও এই অর্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كتب শব্দের অর্থ এখানে مكتوب অর্থাৎ লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী) سجل সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েতে গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্ট বস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্ট বস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ

زبور — শব্দটি زُبُرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে زبور বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذكر বলে তওরাত এবং زبور তওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহ্র গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে ; যথা ইনজীল, যবুর ও কোরআন।—(ইবনে জরীর) যাহ্হাক থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়দ বলেন ঃ ذكر বলে লওহে মাহ্ফুয এবং زبور বলে পয়গম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ সকল আল্লাহ্র গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন।—(রূহুল মা'আনী)

اَلْاَرْضَ সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে ارض (পৃথিবী) বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, ইকরামা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী বলেন ঃ কোরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۤءُ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক

হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু'মিন-কাফির সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। ইবনে আব্বাসের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ارض -এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী—অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। (জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের পৃথিবীতে খলীফা করবেন। আরও এক আয়াতে আছে ঃ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ নিশ্চয় আমি আমার পয়গম্বরগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণেরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আ)-এর যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।—(রূহুল মা'আনী, ইবনে কাসীর)

اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَاۤءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِىْۤ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾ وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

(১০৬) এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (১০৭) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (১০৮) বলুন ঃ আমাকে তো এ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে ? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন ঃ "আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। (১১০) তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না সম্ভবত বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ।' (১১২) পয়গম্বর বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময় তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ কোরআনের অথবা এর খণ্ডাংশে তথা উল্লিখিত সূরায়) পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে, তাদের জন্য—যারা ইবাদতকারী। (পক্ষান্তরে যারা ইবাদত ও আনুগত্যে বিমুখ, এটা তাদের জন্যও হিদায়েত ; কিন্তু তারা হিদায়েত চায় না। তাই এর উপকারিতা থেকে বঞ্চিত।) আমি আপনাকে অন্য কোন বিষয়ের জন্য (রাসূল করে) প্রেরণ করিনি ; কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতি (আপন) অনুগ্রহ করার জন্য। সেই অনুগ্রহ এই যে, বিশ্ববাসী রাসূলের কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু গ্রহণ করে হিদায়েতের ফল ভোগ করবে। কেউ গ্রহণ না করলে সেটা তার দোষ। এতে এসব বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা ক্ষুন্ন হয় না।) আপনি তাদেরকে (সারমর্ম হিসেবে পুনরায়) বলে দিন ঃ আমার কাছে তো (একত্ববাদী ও অংশীবাদীদের পারস্পরিক মতভেদ সম্পর্কে) এ ওহীই এসেছে যে, তোমাদের উপাস্য একই উপাস্য। সুতরাং (তাঁর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর) এখনও তোমরা মানবে কি না? (অর্থাৎ এখন তো মেনে নাও) অতঃপর যদি তারা (তা মানতে) বিমুখ হয়, তবে আপনি (যুক্তি পূর্ণ করার মানসে) বলে দিন ঃ আমি তোমাদের পরিষ্কার সংবাদ দিয়েছি (এতে বিন্দুপরিমাণও গোপনীয়তা নেই। তওহীদ ও ইসলামের সত্যতার সংবাদও দিয়েছি এবং অস্বীকার করলে শাস্তির কথাও পুরোপুরি বর্ণনা করেছি। এখন আমার উপর সত্য প্রচারের দায়িত্বও নেই এবং তোমাদেরও ওযর পেশ করার অবকাশ নেই) এবং (যদি শাস্তি না আসার কারণে তোমরা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ কর, তবে বুঝে নেয়া দরকার যে, শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু) আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী, না দূরবর্তী। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সশব্দে বলা কথাও জানেন এবং যা তোমরা গোপনে বল, তাও জানেন। (আযাবের বিলম্ব দেখে তা বাস্তবায়িত হবে না বলে ধোঁকা খেয়ো না। কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে বিলম্ব হচ্ছে।) আমি জানি না (সেই উপকারিতা কি, হ্যাঁ, এতটুকু বলতে পারি যে, সম্ভব (আযাবের এই বিলম্ব)

তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা (যে, বোধ হয় সতর্ক হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে) এবং এক (সীমিত) সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ (যে গাফিলতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আযাবও বৃদ্ধি পাবে। প্রথম ব্যাপারটি অর্থাৎ পরীক্ষা একটি রহমত এবং দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু ও সুযোগ সুবিধা দান একটি শাস্তি। যখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা হিদায়েত হলো না, তখন) পয়গম্বর (সা) বলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা (আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে) ফয়সালা করে দিন (যা সর্বদা) ন্যায়ের অনুকূল (হয়। উদ্দেশ্য এই যে, কার্যত ফয়সালা করে দিন অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে কৃত সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা পূর্ণ করুন। রাসূল আরও বললেন) আমাদের পালনকর্তা দয়াময়, তোমরা যা বলছ (অর্থাৎ মুসলমানরা নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে) তিনি সে বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার যোগ্য। (আমরা তোমাদের মুকাবিলায় এই দয়াময় পালনকর্তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ — عَالَمِيْن শব্দটি عالم-এর বহুবচন। মানব, জিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) সবার জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সত্যিকার রূহ্। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ্' আল্লাহ' বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদত সব বস্তুর রূহ্, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল। কেননা, দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انا رحمة مهداة আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। (ইবনে আসাকির) হযরত ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ انا رحمة مهداة برفع قوم وخفض اخرين অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহ্‌র আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফিরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মুকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

سُوْرَةُ الْحَجِّ

সূরা হজ্জ

মদীনায় অবতীর্ণ, ১০ রুকূ, ৭৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ②

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় ; বস্তুত আল্লাহ্‌র আযাব সুকঠিন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (এবং ঈমান ও ইবাদত অবলম্বন কর। কেননা, নিশ্চিতভাবেই কিয়ামতের ভূকম্পন অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। (এর আগমন অবশ্যম্ভাবী। সেদিনের বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা এখনই কর। এর উপায় আল্লাহ্‌ভীতি। অতঃপর এই ভূকম্পনের কঠোরতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) যেদিন তোমরা তা (অর্থাৎ ভূকম্পনকে) প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (এই অবস্থা হবে যে,) প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী (ভীতি ও আতংকের কারণে) তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ (দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই) পাত করবে এবং তুমি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) মানুষকে দেখবে মাতাল ; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না (কেননা, সেখানে কোন নেশার বস্তু ব্যবহার করার আশংকা নেই)। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাবই কঠিন ব্যাপার (যার ভীতির কারণে তাদের অবস্থা মাতাল সদৃশ হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন ঃ এই সূরাটি মিশ্র। এতে মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এ উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন ঃ এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য এই যে, এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহ্‌কাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ্ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে।

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ—সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলে করীম (সা) উচ্চৈঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে-কিরাম তাঁর আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ এই আয়াতে উল্লিখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন্ দিন হবে তোমরা জান কি ? সাহাবায়ে-কিরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বলবেন ঃ যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন ঃ এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আতিশয্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কিরাম এ কথা শুনে ভীতবিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন ঃ তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায় (তাই নয়শত নিরানব্বই এর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই হবে)। তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে ঃ কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে ; যথা (১) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا (২) وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً —(৩) اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ইত্যাদি। কেউ কেউ আদম (আ)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের

ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে।—(কুরতুবী)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ
مَّرِيْدٍ ۝৩ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى
عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝৪ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ
فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ
مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ
مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ
اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ
بَهِيْجٍ ۝৫ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝৬ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ

يَبۡعَثُ مَنۡ فِی الۡقُبُوۡرِ ﴿۷﴾ وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ
وَّ لَا هُدًی وَّ لَا کِتٰبٍ مُّنِیۡرٍ ﴿۸﴾ ثَانِیَ عِطۡفِهٖ لِیُضِلَّ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ
لَهٗ فِی الدُّنۡیَا خِزۡیٌ وَّ نُذِیۡقُهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ عَذَابَ الۡحَرِیۡقِ ﴿۹﴾
ذٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتۡ یَدٰکَ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَیۡسَ بِظَلَّامٍ لِّلۡعَبِیۡدِ ﴿۱۰﴾

(৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ—) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৭) এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (৮) কতক মানুষ জ্ঞান, প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং কতক মানুষ আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে) অজ্ঞানতাবশত বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে (অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার এমন যোগ্যতা রাখে যে, যে শয়তান যেভাবে তাকে প্ররোচিত করে, সে

তার প্ররোচনার জালে পড়ে যায়। কাজেই সে চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্ট, তাকে প্রত্যেক শয়তানই পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে)। শয়তান সম্পর্কে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লিখে দেওয়া হয়েছে (এবং নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে) যে, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে (অর্থাৎ তার অনুসরণ করবে), সে তাকে (সৎপথ থেকে) বিপথগামী করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পথ দেখাবে। (অতঃপর বিতর্ককারীদেরকে বলা হচ্ছে) লোকসকল! যদি তোমরা (কিয়ামতের দিন) পুনরায় জীবিত হওয়ার (সম্ভাব্যতা) সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হও, তবে (পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর, যাতে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। বিষয়বস্তু এই) আমি (প্রথমবার) তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি (কেননা, যে খাদ্য থেকে বীর্য উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে উপাদান চতুষ্টয় থেকে তৈরি হয়, যার এক উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।) এরপর বীর্য থেকে (যা খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়) এরপর জমাট রক্ত থেকে (যা বীর্যে ঘনত্ব ও লালিমা দেখা দিলে অর্জিত হয়) এরপর মাংসপিণ্ড থেকে (যা জমাট রক্ত কঠিন হলে অর্জিত হয়) কতক পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং কতক অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্টও হয়। (এরকম গঠন, পর্যায়ক্রমে ও পার্থক্য সহকারে সৃষ্টি করার কারণ এই যে,) যাতে আমি তোমাদের সামনে (আমার কুদরত) ব্যক্ত করি (এটাই পুনরায় সৃষ্টি করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রমাণ। এই বিষয়বস্তুর একটি পরিশিষ্ট আছে, যদ্দ্বারা আরও বেশি কুদরত ব্যক্ত হয়। তা এই যে,) আমি মাতৃগর্ভে যা (অর্থাৎ যে বীর্য)-কে ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য (অর্থাৎ প্রসবের সময় পর্যন্ত) রেখে দেই (এবং যাকে রাখতে চাই না, তার গর্ভপাত হয়ে যায়)। এরপর অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পর) আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় (জননীর গর্ভ থেকে) বাইরে আনি। এরপর (তিন প্রকার হয়ে যায়। এক প্রকার এই যে, তোমাদের কতককে যৌবন পর্যন্ত সময় দেই যাতে) তোমরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ যৌবনের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় (এটা দ্বিতীয় প্রকার) এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স (অর্থাৎ চূড়ান্ত বার্ধক্য) পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে এক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার পর আবার অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন অধিকাংশ বৃদ্ধাকে দেখা যায় যে, এইমাত্র এক কথা বলার পরক্ষণেই তা জিজ্ঞাসা করে। এটা তৃতীয় প্রকার। এসব অবস্থাও আল্লাহ্ তা'আলার মহান শক্তির নিদর্শন। এ পর্যন্ত এক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি ভূমিকে শুষ্ক (পতিত) দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে (এটাও আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ। অতঃপর প্রমাণকে আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য উল্লিখিত কর্মসমূহের কারণ ও রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে) এগুলো (অর্থাৎ উপরে দুইটি প্রমাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বস্তুসমূহের যা কিছু সৃষ্টি ও প্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো) একারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা স্বয়ং সম্পূর্ণ (এটা তাঁর সত্তাগত পূর্ণতা) এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন (এটা তাঁর কর্মগত পূর্ণতা।) এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (এটা তার গুণগত পূর্ণতা। এই তিনটির সমষ্টি উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের কারণ। কেননা পূর্ণতা ত্রয়ের মধ্যে যদি একটিও অনুপস্থিত থাকত, তবে আবিষ্কার সম্ভব হতো না) এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। এতে সামান্যও সন্দেহ নাই এবং কবরে যারা আছে,

আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (এটা উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের রহস্য। অর্থাৎ উল্লিখিত সৃষ্টিসমূহ প্রকাশ করার কারণ এই যে, এতে অন্যান্য রহস্যের মধ্যে এক রহস্য এই ছিল যে, আমি কিয়ামত সংঘটিত করতে এবং মৃতদেরকে জীবিত করতে চেয়েছিলাম। এগুলোর সম্ভাব্যতা উপরোক্ত কর্মসমূহের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে। সুতরাং উপরোক্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টির তিনটি কারণ ও দুইটি রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ব্যাপক অর্থে সবগুলোই কারণ। তাই بِاَنَّ اللّٰهَ বাক্যে بـاسـببـيـه সবগুলোর আগেই সংযুক্ত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিতর্ককারীদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করে তা প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টকরণ অর্থাৎ অপরকে পথভ্রষ্ট করা সহ উভয় পথভ্রষ্টতা ও পথভ্রষ্টকরণের অভিশাপ বর্ণিত হচ্ছে। কতক লোক আল্লাহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলী অথবা কর্ম সম্পর্কে) জ্ঞান (অর্থাৎ অপ্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই এবং উজ্জ্বল কিতাব (অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই (এবং অন্যান্য বিচক্ষণ লোকদের অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি) দম্ভ প্রদর্শন করে বিতর্ক করে, যাতে (অন্যদেরকেও) আল্লাহ্র পথ থেকে (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) বিপথগামী করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে। (যে ধরনের লাঞ্ছনাই হোক। সেমতে কতক বিপথগামী নিহত ও কয়েদী হয়ে লাঞ্ছিত হয় এবং কতক সত্যপন্থীদের কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়ে জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে হেয় হয়।) এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন করাব। (তাকে বলা হবে ঃ) এটা তোমার স্বহস্তকৃত কর্মের প্রতিফল এবং এটা নিশ্চিতই যে আল্লাহ্ (তার) বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না (সুতরাং তোমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ এই আয়াত কট্টর বিতর্ককারী নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কল্পকাহিনী বলত। কিয়ামতে পুনরুত্থানও সে অস্বীকার করত। —(মাযহারী)

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা ঃ فَـاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ —এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় ঃ ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা।—(কুরতুবী)

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করে ঃ يارب مخلقة او غير مخلقة অর্থাৎ এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না ? যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় غير مخلقة তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জওয়াব مخلقة বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা, না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে ? এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয়। (ইবনে কাসীর) مخلقة ও غير مخلقة শব্দদ্বয়ের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে। —কুরতুবী)

مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ উল্লিখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তফসীর এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مخلقة এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غير مخلقة কোন কোন তফসীরকারক مخلقة ও غير مخلقة এর এরূপ তফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে مخلقة অর্থাৎ পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম, সে مخلقة তফসীরের সার সংক্ষেপে এই তফসীরই নেওয়া হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا—অর্থাৎ অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌঁছে যায়। ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ—এর অর্থ তাই। اشد শব্দটি شدة এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

اَرْذَلُ الْعُمُرِ—সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা যায়। রাসূলে করীম (সা) এমন বয়স থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সা'দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে করতেন এবং সা'দ (রা)-ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা ঃ মুসনাদে আহ্মদ ও মুসনাদে আবূ ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার

নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হিফাযত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ্ তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌঁছলে সে আল্লাহ্র দিকে রুজুর তওফীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌঁছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তার অগ্রপশ্চাতের সব গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন ও শাফয়াত কবূল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় 'আমিনুল্লা ও আমিরুল্লাহ্ ফিল আরয' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ্র বন্দী। (কেননা, এই সয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে)। অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওমর' তথা নিষ্কর্মা বয়সে পৌঁছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেয ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতটি মুসনাদে আবূ ইয়ালা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন ঃ

ومع هذا رواه الامام احمد فى سنده موقوفا ومرفوعا – অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল হাদীসটিকে 'মওকুফ ও মরফূ' উভয় প্রকারে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মুসনাদে আবূ ইয়ালা থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ثَانِىَ عِطْفِهٖ শব্দের অর্থ পার্শ্ব। অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তনকারী। এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বুঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ٜاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ
وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٜانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ
هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾

(১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, সে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী !

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত (এমনভাবে) করে (যেমন কেউ কোন বস্তুর) কিনারায় (দণ্ডায়মান থাকে এবং সুযোগ পেলে চম্পট দিতে প্রস্তুত থাকে)। অতঃপর যদি সে কোন (পার্থিব) মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, তবে তার কারণে (বাহ্যত) স্থিরতা লাভ করে। আর যদি সে কোন পরীক্ষায় পড়ে যায়, তবে মুখ তুলে (কুফরের দিকে) চম্পট দেয়। (ফলে) সে ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই হারায়। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (কোন কোন বিপদ দ্বারা ইহকালের পরীক্ষা হয়। কাজেই ইহকালের ক্ষতি তো প্রকাশ্যই। পরকালের ক্ষতি এই যে, ইসলাম ও (আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে এমন কিছুর ইবাদত করছে যে, (এতই অক্ষম ও অসহায় যে,) তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না (অর্থাৎ ইবাদত না করলে কোন ক্ষতি করার এবং ইবাদত করলে কোন উপকার করার শক্তি রাখে না। বলা বাহুল্য, সর্বশক্তিমানের পরিবর্তে এমন অসহায় বস্তুর ইবাদত করা ক্ষতিই ক্ষতি)। এটা চরম পথভ্রষ্টতা। (শুধু তাই নয় যে, তার ইবাদত করলে কোন উপকার পাওয়া যায় না, বরং উল্টা অনিষ্ট ও ক্ষতি হয়। কেননা, সে এমন কিছুর ইবাদত করে, যার ক্ষতি উপকারের চাইতে অধিক নিকটবর্তী। এমন কর্মকারীও মন্দ এবং এমন সঙ্গীও মন্দ (যে কোনরূপে কোন অবস্থায়ই কারও উপকারে আসে না। তাকে অভিভাবক করা ; অথবা বন্ধু ও সহচর করা কোন অবস্থাতেই তার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায় না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ—বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত ঃ এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলত ঃ এই ধর্ম মন্দ। এই

শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধনসম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

(১৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ্ কখনই ইহকাল ও পরকালে রাসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক ; এরপর কেটে দিক ; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা। (১৬) এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ্-ই যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। (আল্লাহ্ যে ব্যক্তি অথবা জাতিকে কোন সওয়াব অথবা আযাব দিতে চান, তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। কেননা,) আল্লাহ্ (সর্বশক্তিমান) যা ইচ্ছা করেন, করে যান। (সত্য ধর্ম সম্পর্কে যাদের বিতর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে তাদের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে) যে ব্যক্তি (রাসূলের সাথে বিরোধ ও কলহ করে) মনে করে যে, (সে জয়ী হবে, রাসূলের প্রচারিত দীনের উন্নতি স্তব্ধ করে দেবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের (ও তাঁর দীনের) ইহকালে ও পরকালে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক (এবং আকাশের সাথে বেঁধে দিক)। এরপর এই রশির সাহায্যে যদি আকাশে পৌঁছতে পারে, তবে পৌঁছে এই ওহী বন্ধ করে দিক। (বলা বাহুল্য, কেউ এরূপ করতে পারবে না।) এমতাবস্থায় চিন্তা করা উচিত যে,

তার (এই) কৌশল (যার বাস্তবায়নে সে সম্পূর্ণ অক্ষম) তার আক্রোশের হেতু (অর্থাৎ ওহী) মওকুফ করতে পারে কি না। আমি একে (অর্থাৎ কোরআনকে) এমনিভাবে নাযিল করেছি (এতে আমার ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া কারও কোন দখল নেই।) এতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (সত্য নির্ধারণে) আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنْ كَانَ يَظُنُّ—সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তখনই সম্ভবপর, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবুয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলা বাহুল্য, কারও পক্ষে আকাশে যাওয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি ? এই তফসীর হুবহু দুররে-মনসুর গ্রন্থে ইবনে সায়দ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর। (বায়ানুল-কোরআন—সহজকৃত)।

কুরতুবী এই তফসীরকেই আবূ জাফর নাহ্হাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এটা সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আব্বাস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে, এখানে سَمَاءِ বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ যদি কোন মূর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তাঁর ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক।—(মাযহারী)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي
الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا
لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿١٨﴾ সিজদা

(১৭) যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহ্র দৃষ্টির সামনে। (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমান, ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও মুশরিক এদের সবার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (কার্যত) ফয়সালা করে দেবেন (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে জান্নাতে এবং সর্বশ্রেণীর কাফিরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন)। নিশ্চিতই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

হে সম্বোধিত ব্যক্তি ! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সামনে (নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী) সবাই বিনয়াবনত হয়–যারা আকাশমণ্ডলীতে আছে, যারা ভূমণ্ডলে আছে এবং (সব সৃষ্ট জীবের আনুগত্যশীল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ পর্যায়ের জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী মানব সবাই আনুগত্যশীল নয় ; বরং) অনেক মানুষও (অনুগত ও বিনয়াবনত হয়।) এবং অনেক মানুষ আছে, যাদের উপর আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। (সত্য এই যে,) যাকে আল্লাহ্ হেয় করেন (অর্থাৎ হিদায়েতের তওফীক দেন না) তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্ (নিজ রহস্য অনুযায়ী) যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফির, অতঃপর কাফিরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দেবেন। তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কোরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয়

সুখশান্তি আছে এবং কাফিরদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সৃষ্ট বস্তু যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 'সিজদার' শিরোনামে ব্যক্ত করে মানব জাতির দুইটি শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরীক। দুই. অবাধ্য বিদ্রোহী সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সিজদা করা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তফসীরের সার সংক্ষেপে তার অনুবাদ করা হয়েছে বিনয়াবনত হয়ো। ফলে সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সিজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথ পালন করা।

সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ ঃ সমগ্র সৃষ্টজগৎ স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার। (১) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফির জীবিত, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা-বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (২) সৃষ্ট জগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করেও অস্বীকার করে, তারা কাফির। আয়াতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় যে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয় ; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে ? এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্ট বস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ স্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়। কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কোরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে আদেশ করলেন ঃ তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয়

বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত্য থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও যমীন আরয করল : আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশিতে আনুগত্য কবূল করলাম। অন্যত্র পর্বতের প্রস্তর সম্পর্কে কোরআন পাক বলে : وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সিজদা শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্ট বস্তু স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—এক. মুমিন, অনুগত ও সিজদাকারী এবং দুই. কাফির, অবাধ্য ও সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। সিজদার তওফীক না দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ (১৯) يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ
بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ (২০) وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ (২১) كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ
يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (২২)
اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ (২৩) وَهُدُوْۤا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ
الْقَوْلِ ۚۖ وَهُدُوْۤا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ (২৪)

(১৯) এই দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফির, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। (২২) তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে : দহনশাস্তি আস্বাদন কর। (২৩) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং

সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২৪) তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহ্র পথপানে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছিল) এরা দুই পক্ষ, (এক পক্ষ মুমিন অপর পক্ষ কাফির। এরপর কাফির দল কয়েক প্রকার—ইহুদী, খ্রিস্টান, সাবেয়ী, অগ্নিপূজারী) এরা এদের পালনকর্তা সম্পর্কে (বিশ্বাসগতভাবে এবং কোন কোন সময় তর্কক্ষেত্রেও) মতবিরোধ করে। (এই মতবিরোধের ফয়সালা কিয়ামতে এভাবে হবে যে,) যারা কাফির, তাদের (পরিধানের) জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হবে (অর্থাৎ আগুন তাদের সমস্ত দেহকে পোশাকের ন্যায় ঘিরে ফেলবে) তাদের মাথার উপর তীব্র ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যদ্দরুন তাদের পেটের বস্তুসমূহ (অর্থাৎ অন্ত্রসমূহ) ও চর্ম গলে যাবে। (অর্থাৎ এই ফুটন্ত পানির কিছু অংশ পেটের ভেতর চলে যাবে। ফলে অন্ত্র এবং পেটের অভ্যন্তরস্থ সব অঙ্গ গলে যাবে। কিছু অংশ উপরে প্রবাহিত হবে। ফলে চর্ম গলে যাবে।) তাদের (মারার) জন্য লোহার গদা থাকবে। (এই বিপদ থেকে তারা কোন সময় মুক্তি পাবে না।) তারা যখনই (দোযখে) যন্ত্রণার কারণে (অস্থির হয়ে যাবে এবং) সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহন-শাস্তি (চিরকালের জন্য) তোমরা আস্বাদন করতে থাক (কখনও বের হতে পারবে না)। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যাদের তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণাকংকন ও মোতি পরিধান করানো হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের। (তাদের জন্য এসব পুরস্কার ও সম্মান এ কারণে যে, দুনিয়াতে) তারা কালেমায় তাইয়্যেবার দিকে পথ প্রদর্শিত হয়েছিল এবং প্রশংসিত আল্লাহ্র পথের পানে পরিচালিত হয়েছিল (এই পথ ইসলাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا আয়াতে উল্লিখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মু'মিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফির ; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সেই দুই পক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রা) ও কাফিরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফির পক্ষে তিনজনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়ের কাছে প্রাণ ত্যাগ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যত এই হুকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—যে কোন যমানার উম্মত হোক না কেন।

জান্নাতীদের কংকন পরিধান করানোর রহস্য ঃ এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দূষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহদের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহ্র হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে ; কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন ঃ জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে—স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। —(কুরতুবী)

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম ঃ আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযায ও বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে ঃ জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে। —(মাযহারী)

ইমাম নাসায়ী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الاخرة ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الاخرة ومن شرب فى آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها فى الاخرة ثم قال رسول الله ﷺ لباس اهل الجنة وشراب اهل الجنة وانية اهل الجنة –

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। —(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে। —(কুরতুবী)

অন্য এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الاخرة وان دخل الجنة لبسه اهل الجنة ولم يلبسه هوا -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে ; কিন্তু সে পরিধান করতে পারবে না। —(কুরতুবী)

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোন বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায়ও কোন উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্ন স্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ—হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এখানে কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বুঝানো হয়েছে। —(কুরতুবী) বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, এখানে এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ ۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾

---

(২৫) যারা কুফ্‌রী করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা কাফির হয়েছে এবং (মুসলমানদেরকে) আল্লাহ্‌র পথে এবং মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয় (যাতে মুসলমানরা ওমরাহ্ ব্রত পালন না করতে পারে ; অথচ হেরেম শরীফে কারও একচেটিয়া অধিকার নেই ; বরং) আমি একে সব মানুষের জন্য রেখেছি। এতে সবাই সমান—এর সীমানায় বসবাসকারীও (অর্থাৎ যারা স্থানীয়) এবং বহিরাগত (মুসাফির) ও, এবং যে কেউ এতে (অর্থাৎ হেরেম শরীফে) অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিন ও কাফির দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোন কোন কাফির এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকেও আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ্জ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানায় ছিল না। ফলে কোনরকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না। বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে (অর্থাৎ গোটা হেরেম শরীফে) কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করবে ; যেমন মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া অথবা অন্য কোন ধর্মবিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো হবে ; বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরকও মিলিত থাকে। মক্কার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্র ও সর্বকালে হারাম, চূড়ান্ত অপরাধ ও শাস্তির কারণ ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশেষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ — سَبِيْلِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র পথ) বলে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই ; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এটা তাদের দ্বিতীয় গুনাহ্। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে-হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয় ; যেমন আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি ; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ্ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় সমজিদে-হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে ঃ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তফসীরে দুররে-মনসুরে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে-হারাম বলে হেরেম শরীফ বুঝানো হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য ঃ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়—যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার, সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনও হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকাহ্‌বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয। হযরত উমর ফারূক (রা) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) থেকে এ ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত অনুযায়ী। (রূহুল মা'আনী) ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ—অভিধানে الحاد। এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'এলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহ্র মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য তফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গুনাহ্ ও আল্লাহ্র নাফরমানী এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা বলেন ঃ 'হেরেমে এলহাদ' বলে এহ্রাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ—এমন কোন কাজ করাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হেরেমে শিকার

করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গুনাহ্ এবং আযাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই, মক্কার হেরেমে সৎ কাজের সওয়াব যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি পাপ কাজের আযাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়। —(মুজাহিদের উক্তি)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়। কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গুনাহ্ লিখা হয়। কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হজ্জ করতে গেলে দু'টি তাঁবু স্থাপন করতেন—একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় كلا والله অথবা بلى والله ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'এলহাদ' করার শামিল।—(মাযহারী)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

(২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য। (২৭) এবং মানুষের

হজ্জের জন্য ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তার দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২৯) এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (ঐ ঘটনা স্মরণ করুন) যখন আমি ইবরাহীম (আ)-কে কাবা গৃহের স্থান বলে দেই (কেননা, তখন কা'বাগৃহ নির্মিত ছিল না এবং আদেশ দেই) যে (এই গৃহকে ইবাদতের জন্য তৈরি কর এবং এই ইবাদতে) আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। (প্রকৃতপক্ষে একথা তাঁর পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সাথে শিরক নিষিদ্ধ করার এক কারণ এটাও যে, বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে নামায এবং এর তওয়াফ থেকে কোন মূর্খ যেন একথা না বুঝে যে, এটাই মাবূদ।) এবং আমার গৃহকে তওয়াফকারী এবং (নামাযে) কিয়াম ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে) পবিত্র রাখ [এটাও প্রকৃতপক্ষে অপরকেও শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। ইবরাহীম (আ) দ্বারা এর বিরুদ্ধাচরণের সম্ভাবনাই ছিল না।] এবং [ইবরাহীম (আ)-কে আরও বলা হলো যে,] মানুষের মধ্যে হজ্জের (অর্থাৎ হজ্জ ফরয হওয়ার) ঘোষণা করে দাও। (এই ঘোষণার ফলে) তারা তোমার কাছে (অর্থাৎ তোমার এই পবিত্র গৃহের আঙিনায়) চলে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দূরত্বের কারণে পরিশ্রান্ত) উটের পিঠে সওয়ার হয়েও, সে উটগুলো দূর-দূরান্ত থেকে পৌছবে। (তারা এজন্য আসবে) যাতে তারা তাদের (ইহলৌকিক) কল্যাণের জন্য উপস্থিত হয়। (পারলৌকিক কল্যাণ তো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ; যদি ইহলৌকিক কল্যাণও উদ্দেশ্য হয়, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, কোরবানীর গোশত প্রাপ্তি ইত্যাদি, তবে তাও নিন্দনীয় নয়।) এবং (এজন্য আসবে, যাতে) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (কোরবানীর দিন দশ থেকে বারই যিলহজ্জ পর্যন্ত) সেই বিশেষ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর উপর (কোরবানীর জন্তু যবেহ করার সময়) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন। [ইবরাহীম (আ)-কে বলার বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীকে বলা হচ্ছে) তা থেকে (অর্থাৎ কোরবানীর জন্তুগুলো থেকে) তোমরাও আহার কর (এটা জায়েয এবং মুস্তাহাব এই যে,) দুঃখী অভাবগ্রস্তকেও আহার করাও। এরপর (কোরবানীর পর) তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয় (অর্থাৎ ইহ্‌রাম খুলে মাথা মুণ্ডায়,) ওয়াজিব কর্মসমূহ (মানত দ্বারা কোরবানী ইত্যাদি ওয়াজিব করে থাকুক কিংবা মানত ছাড়াই হজ্জের যেসব ওয়াজিব কর্ম আছে, সেগুলো সব) পূর্ণ করে এবং এই নিরাপদ ও সংরক্ষিত গৃহের (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র) তওয়াফ করে। (একে তওয়াফে-যিয়ারত বলা হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর আগের আয়াতে মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফে প্রবেশের পথে ব্যধাদানকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর সাথে সম্পর্ক রেখে এখন বায়তুল্লাহ্র বিশেষ ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের দুষ্কর্ম আরও অধিক ফুটে উঠে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সূচনা ঃ وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অভিধানে بَوَّأَ শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই ঃ একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ الْبَيْتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আ)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আ) ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করতেন। নূহ (আ)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহ্র প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয় ঃ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْـئًا অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ) শির্ক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না । তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরিকদের মুকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শির্ক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেওয়া হয় وَطَهِّرْ بَيْتِىَ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না ; কিন্তু বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ্ বলা হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করত।—(কুরতুবী) এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শির্ক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। ইবরাহীম (আ)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ ইবরাহীম (আ) নিজেই এ কাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে ঐ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই ঃ وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। —(বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে আরয করলেন ঃ এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা

শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে ? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। সারা বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আ) মাকামে-ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবূ কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন ঃ 'লোকসকল ! তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্জ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয় ; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলেছে অর্থাৎ হাযির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ ইবরাহীমী আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হজ্জে 'লাব্বায়কা' বলার আসল ভিত্তি।—(কুরতুবী, মাযহারী)

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম (আ)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্র দিকে চলে আসবে ; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহ্র পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা (আ)-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতে আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজ্জের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত ছিল।

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ অর্থাৎ দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে منافع শব্দটি نكره ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই ; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজ্জের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকীর হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি পার্থিব দরিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ্জ-ওমরায়

ব্যয় করলে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজ্জের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক ; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত একটি কল্যাণ কোন অংশে কম নয়। আবূ হুরায়রার এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গুনাহ্‌র কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে ; অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়। —(বুখারী, মুসলিম–মাযহারী)

বায়তুল্লাহ্‌র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সেই সব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত ; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকর, যা এই দিনগুলোতে কোরবানী করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কোরবানীর গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বুঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয ; অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ এর অর্থ ব্যাপক ; ওয়াজিব হোক কিংবা মুস্তাহাব সব রকম কোরবানী এর অন্তর্ভুক্ত।

فَكُلُوا مِنْهَا এখানে كُلُوا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয় ; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা ; যেমন কোরআনের وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ হজ্জের মওসুমে মক্কা মুয়াযযমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু যবেহ করা হয়। কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে ; যেমন কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোন জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোন জন্তুর পরিবর্তে কোন্ ধরনের জন্তু কোরবানী করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকার গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরূপ কোন কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কোরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় এরূপ কোরবানীকে 'দমে-জিনায়াত' (ত্রুটিজনিত কোরবানী) বলা হয়। কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কোরবানী করা জরুরী হয়, কোন কোন কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজের জন্য কোরবানী ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। অধমের বিরচিত 'আহকামুল-হজ্জ' পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকীনদের হক। অন্য কোন ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েয

নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহ্‌বিদ একমত। কোরবানীর অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর মাংস কোরবানীকারী নিজে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে "তামাত্তু ও কেরানের" কোরবানীও ওয়াজিব কোরবানীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কোরবানীই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাধারণ কোরবানী এবং হজ্জের কোরবানীসমূহের গোশ্ত কোরবানীকারী নিজে ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মুসলমান খেতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকীনকে দান করা মুস্তাহাব।এই মুস্তাহাব আদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ — بائس শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং فقير এর অর্থ অভাবগ্রস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, কোরবানীর গোশত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মুস্তাহাব ও কাম্য।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ — تفث এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানো কাটা, উপড়ানো, নখকাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জের কোরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইহ্‌রাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নিচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কোরবানী ও পরে ইহ্‌রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ক্রটি জনিত কোরবানী করতে হবে।

হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ক্রমের গুরুত্ব ঃ হজ্জের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রম কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকাহ্‌বিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রম অনুযায়ী হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্রটিজনিত কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে সওয়াব হ্রাস পায়, কোরবানী ওয়াজিব হয় না। হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসে আছে ঃ من قدم شيئا من نسكه او اخره فليهرق دما অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাভীও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সাঈদ ইবনে জুবায়র, কাতাদাহ্, নখয়ী ও হাসান বসরীর মাযহাবও তাই। তফসীরে মাযহারীতে এই মাস'আলার পূর্ণ বিবরণ ও বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া হজ্জের অন্যান্য মাস'আলাও বর্ণিত হয়েছে।

وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ — نذور শব্দটি نذر-এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে আমি এ কাজ করব অথবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য এ কাজ করা জরুরী, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা

ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গুনাহ্ ও নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গুনাহ্ কাজের মানত করে, তবে সেই গুনাহ্র কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয় ; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরী হবে। আবূ হানীফা (র) প্রমুখ ফিকাহবিদদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত ; যেমন নামায, রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাস'আলা ঃ স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মাযহারীতে এস্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ এই আয়াতে পূর্বেও হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, তথা কোরবানী ও ইহ্রাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে-যিয়ারত-এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে ; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ্জ, হজ্জ ছাড়াও, হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে যে কোন দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি ?

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজ্জের দিন, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজ্জের ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজ্জের জন্য রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎকাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কোরবানীর মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস এখানে মানতের অর্থ কোরবানীর মানতই করেছেন। হজ্জের বিধানের সাথে মানতের আরও একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়—এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েয নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েয হয়ে যায়, তেমনিভাবে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরয হয় ; কিন্তু হজ্জও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফরয হয়ে যায়। ইহরামের সব বিধান প্রায়শ এমনি ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুণ্ডানো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েয কাজ নয় ; কিন্তু ইহরাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরামা (রা) এ স্থলে মানতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজ্জের ওয়াজিব কর্মসমূহ বুঝানো হয়েছে যেগুলো হজ্জের কারণে তার উপর জরুরী হয়ে যায়।

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ—এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে-যিয়ারত বুঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্জের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা হয়। এই তওয়াফ হজ্জের

দ্বিতীয় রোকন ও ফরয। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যিয়ারতের পর ইহ্‌রামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইহ্‌রাম খুলে যায়। —(রূহুল মা'আনী)

بَيْتِ عَتِيْق — عتيق শব্দের অর্থ মুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর গৃহের নাম بَيْت عَتِيْق রেখেছেন ; কারণ আল্লাহ্ একে কাফির ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। —(রূহুল মা'আনী) কোন কাফিরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তি বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

তফসীরে-মাযহারীতে এ স্থলে তওয়াফের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য।

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾

(৩০) এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহ্‌র সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম। উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ; (৩১) আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তার সাথে শরীক না করে ; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল ; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহ্‌র নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের

আল্লাহ্‌ভীতিপ্রসূত। (৩৩) চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোকে পৌছতে হবে মুক্ত গৃহ পর্যন্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ কথা তো হলো (যা ছিল হজ্জের বিশেষ বিধান।) এবং (এখন অন্যান্য সাধারণ বিধি-বিধান শোন, যাতে হজ্জ এ হজ্জ ছাড়া অন্যান্য মাস'আলাও আছে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সম্মানযোগ্য বিধি-বিধানকে সম্মান করে, তা তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে উত্তম। (বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন করা এবং বিধি-বিধান পালনে যত্নবান হওয়াও বিধি-বিধানের সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের সম্মান তার জন্য উত্তম এ কারণে যে, এটা আযাব থেকে মুক্তির উপকরণ এবং চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী।) কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া, যা তোমাদেরকে (সূরা আন'আমের قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْهَا اُوْحِيَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا আয়াতে) পড়ে শোনানো হয়েছে (এই আয়াতে হারাম জন্তুসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, উহা ব্যতীত অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুকে) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (এখানে চতুষ্পদ জন্তুদের হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা থেকে কেউ যাতে সন্দেহ না করে যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তুও নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমেই যখন ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সীমিত, তখন) তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। (কেননা, মূর্তিদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এ স্থলে শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বিশেষভাবে এ কারণে হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা তাদের হজ্জের 'লাব্বায়কা'র সাথে لاشريكا هولك। বাক্যটিও যোগ করে দিত ; অর্থাৎ সেই মূর্তিগুলো ছাড়া আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই ; যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ্‌রই।) এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ; (বিশ্বাসগত মিথ্যা হোক ; যেমন মুশরিকদের শিরকের বিশ্বাস কিংবা অন্য প্রকার মিথ্যা হোক।) আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তার সাথে শরীক না করে এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে (তার অবস্থা এমন,) যেন সে আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখিরা তাকে টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। একথাও (যা ছিল একটি সামগ্রিক নীতি) হয়ে গেল এবং (এখন কোরবানীর জন্তুদের সম্পর্কে একটি জরুরী কথা শুনে নাও) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধর্মের (উপরোক্ত) স্মৃতিসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তবে তার এই সম্মান আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করা থেকে অর্জিত হয়। (স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে কোরবানী সম্পর্কিত খোদায়ী বিধানাবলীর অনুসরণ বুঝানো হয়েছে ; যবেহ করার পূর্বের বিধানাবলী হোক কিংবা যবেহ করার সময়কার হোক ; যেমন জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা কিংবা যবেহ্‌র পরবর্তী বিধানাবলী হোক; যেমন কোরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া না খাওয়া। যে কোরবানীর গোশ্‌ত যার জন্য হালাল, সে তা খাবে এবং যে কোরবানীর গোশ্‌ত যার জন্য হালাল নয়, সে তা খাবে না। এসব বিধানের কতিপয় ধারা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু এখন করা হচ্ছে। তা এই যে,) এগুলো থেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য জায়েয (অর্থাৎ শরীয়তের নীতি অনুযায়ী চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে

কা'বার জন্য উৎসর্গ না করা পর্যন্ত তোমরা এগুলো থেকে দুধ, সওয়ারী, পরিবহন ইত্যাদি কাজ নিতে পার। কিন্তু যখন এগুলোকে কা'বা ও হজ্জ অথবা ওমরার জন্য উৎসর্গ করা হয়ে, তখন এগুলোকে কাজে লাগানো জায়েয নয়)। এরপর (অর্থাৎ উৎসর্গিত হওয়ার পর) এগুলোর যবেহ্ হালাল হওয়ার স্থান মহিমান্বিত গৃহের নিকট (অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। হেরেমের বাইরে যবেহ্ করা যাবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

حُرُمَاتُ اللهِ বলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরীয়তের বিধানাবলী বুঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

أُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ — انعام বলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইহ্‌রাম অবস্থায়ও হালাল। اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ বাক্যে যেসব জন্তুর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ মৃত জন্তু, যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম—ইহ্‌রাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহ্‌রামের বাইরে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ — رجس শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা। اوثان শব্দটি وثن এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রত বলা হয়েছে। কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ — قول زور-এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থী, তাই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। শিরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেনদেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বৃহত্তম কবীরা গুনাহ্ এগুলো ঃ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قـــول الزور -কে বার বার উচ্চারণ করেন।—(বুখারী)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ — شعائر শব্দটি شَعِيْرَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার شعائر বলা হয়। সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শায়ায়েরে-ইসলাম' বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

مِنْ تَقْــــوَى الْقُلُوْبِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহ্‌ভীতির লক্ষণ। যার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি থাকে, সেই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বুঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিলক্ষিত হয়।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সর্ব প্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত

এগুলোকে হেরেম শরীফে যবেহ্ করার জন্য উৎসর্গ না কর। হজ্জ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি যবেহ্ করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায়, তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোন জন্তুকে হেরেমের হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ করা বিশেষ কোন অপারকতা ছাড়া জায়েয নয়। যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপরাকতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ এখানে بيت عتيق (সম্মানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হেরেম বুঝানো হয়েছে। হেরেম বায়তুল্লাহ্‌রই বিশেষ আঙ্গিনা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে-হারাম' বলে হেরেম বুঝানো হয়েছে। محل অর্থাৎ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে যবেহ্ করার স্থান বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু যবেহ্ করার স্থান বায়তুল্লাহ্‌র সন্নিকট অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বুঝা গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী যবেহ্ করা জরুরী, হেরেমের বাইরে জায়েয নয়। হেরেম মিনার কোরবানগাহ্‌ও হতে পারে, মক্কা মুকাররমার অন্য কোন স্থানও হতে পারে। —(রূহুল-মা'আনী)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

(৩৪) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ্ তো একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও ; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৬) এবং কা'বার জন্য উৎসর্গিত উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাধা অবস্থায় তাদের যবেহ্ করার সময় তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাচ্ঞা করে না তাকে এবং যে যাচ্ঞা করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশ্‌ত ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না ; কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শক করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে হেরেম-শরীফে কোরবানী করার যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে, এতে কেউ যেন মনে না করে যে, আসল উদ্দেশ্য হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। প্রকৃতপক্ষে আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র সম্মান ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা। যবেহ্‌কৃত জন্তু ও যবেহ্‌র স্থান এর উপায় মাত্র এবং স্থানের বিশেষত্ব কোন কোন রহস্যের কারণে। যদি এই বিশেষত্ব আসল উদ্দেশ্য হতো, তবে কোন শরীয়তেই তা পরিবর্তন হতো না। কিন্তু এগুলোর পরিবর্তন সবারই জানা। তবে আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য, এটা সব শরীয়তে সংরক্ষিত আছে। সেমতে) আমি (যত শরীয়ত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের) প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দেয়া চতুষ্পদ জন্তুদের উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (সুতরাং এই নাম উচ্চারণ করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল)। অতএব (এ থেকে বুঝা গেল যে,) তোমাদের উপাস্য একই আল্লাহ্ (যাঁর নাম উচ্চারণ করে নৈকট্য লাভের আদেশ সবাইকে করা হতো)। সুতরাং তোমরা সর্বান্তকরণে তাঁরই হয়ে থাক (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদপন্থী থাক, কোন স্থান ইত্যাদিকে আসল সম্মানার্হ মনে করে শিরকের বিন্দু পরিমাণ নামগন্ধ নিজেদের আমলে প্রবিষ্ট হতে দিও না।) এবং [হে মুহাম্মদ (সা), যারা আমার এই শিক্ষা অনুসরণ করে] আপনি (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর সামনে) মস্তক নতকারীদেরকে (জান্নাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যারা (এই খাঁটি তওহীদের বরকতে) এমন যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্‌র (বিধানাবলী, গুণাবলী, ওয়াদা ও সতর্কবাণী) স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয় এবং যারা বিপদাপদে

সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং যারা আমি যা দিয়েছি, তা থেকে (আদেশ ও তওফীক অনুযায়ী) ব্যয় করে (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদ এমন বরকতময় যে, এর বদৌলতে মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনিভাবে উপরে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে কোন কোন উপকার লাভ নিষিদ্ধ বলে জানা গেছে। এ থেকেও সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কোরবানী আসল সম্মানার্হ। কেননা, তা দ্বারাও আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য। বিশেষত্বগুলো তার একটি পন্থা মাত্র। সুতরাং) কোরবানীর উট ও গরুকে (এমনিভাবে ছাগল-ভেড়াকে) আমি আল্লাহ্‌র (ধর্মের) স্মৃতি করেছি (এ সম্পর্কিত বিধানাবলীর জ্ঞানার্জন ও আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ধর্মের সম্মান প্রকাশ পায়। আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গিত জন্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে রূপক মালিকের মতামত অগ্রাহ্য হলে তার দাসত্ব এবং সত্যিকার মালিক আল্লাহ্‌র উপাস্যতা প্রকাশ পায় এবং এই ধর্মীয় রহস্য ছাড়া) এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের (আরও) উপকার আছে (যেমন পার্থিব উপকার নিজে খাওয়া ও অপরকে খাওয়ানো এবং পারলৌকিক উপকার সওয়াব।) সুতরাং (যখন এতে এসব রহস্য আছে, তখন) এগুলোর উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় (যবেহ্ করার সময়) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। (এটা শুধু উটের জন্যে বলা হয়েছে। কারণ, উটকে দণ্ডায়মান অবস্থায় যবেহ্ করা উত্তম। কারণ এতে যবেহ্ ও আত্মা নির্গমন সহজ হয়। সুতরাং এর ফলে পারলৌকিক উপকার অর্থাৎ সওয়াব অর্জিত হলো এবং আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল। কেননা, তাঁর নামে একটি প্রাণের কোরবানী হলো। ফলে তিনি যে স্রষ্টা এবং এটা যে সৃষ্টি, তা প্রকাশ করে দেয়া হলো।) অতঃপর যখন উট কাত হয়ে পড়ে যায় (এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়), তখন তা থেকে তোমরাও খাও এবং আহার করাও যে যাচ্ঞা করে, তাকে এবং যে যাচ্ঞা করে না, তাকে (এরা بائس فقير এর দুই প্রকার। এটা পার্থিব উপকারও।) এমনিভাবে আমি এসব জন্তুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি (তোমরা দুর্বল এবং তারা শক্তিশালী। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে এভাবে যবেহ্ করতে পার), যাতে তোমরা (এই অধীন করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এই রহস্য প্রত্যেক যবেহ্‌র মধ্যে—কোরবানীর হোক বা না হোক। অতঃপর যবেহ্‌র বিশেষত্বগুলো যে আসল উদ্দেশ্য নয়, তা একটি যুক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দেখ, এটা জানা কথা,) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এগুলোর গোশ্‌ত ও রক্ত পৌঁছে না ; কিন্তু তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া (নৈকট্যের নিয়ত এবং আন্তরিকতা যার শাখা, অবশ্য) পৌঁছে। (সুতরাং এটাই আসল উদ্দেশ্য প্রমাণিত হলো। উপরে كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا বলে অধীন করার একটি সাধারণ রহস্য বর্ণনা করা হয়েছিল। অর্থাৎ কোরবানী হোক বা না হোক। অতঃপর অধীন করার একটি বিশেষ রহস্য অর্থাৎ কোরবানী হওয়ার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) এমনিভাবে আল্লাহ্ এসব জন্তুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা (এগুলোকে আল্লাহ্‌র পথে কোরবানী করে) আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে (এভাবে কোরবানী করার) তওফীক দিয়েছেন। (নতুবা আল্লাহ্‌র তওফীক পথপ্রদর্শক না হলে হয় যবেহ্‌র মধ্যেই সন্দেহ করে

এই ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকতে, না হয় অন্যের নামে যবেহ্ করতে।) এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি আন্তরিকতাশীলদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন (পূর্বেকার সুসংবাদ আন্তরিকতার শাখা সম্পর্কে ছিল। এটা বিশেষ করে আন্তরিকতা সম্পর্কে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا আরবী ভাষায় نسك ও منسك কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. জন্তু কোরবানী করা, দুই. হজ্জের ক্রিয়াকর্ম এবং তিন. ইবাদত। কোরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই তফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে منسك এর অর্থ কোরবানী নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কোরবানীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কাতাদাহ্ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ্জ ফরয করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহ্র ইবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরয করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল ; কিন্তু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ আরবী ভাষায় خبت শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خبيت বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ ও মুজাহিদ مُخْبِتِينَ -এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর ইবনে আউস বলেন ঃ এমন লোকদেরকে مُخْبِتِينَ বলা হয়, যারা অন্যের উপর যুলুম করে না। কেউ তাদের উপর যুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন ঃ যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্র ফয়সালা ও তকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مُخْبِتِينَ

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ — وجل এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি, যা কাহারও মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিকর ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে شعائر বলা হয়। কোরবানীও এমন বিধানাবলীর অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ — صواف শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কোরবানী করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় যবেহ্ করা সুন্নত।

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا এখানে وجبت-এর অর্থ سقطت ; যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় وجبت الشمس। অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বুঝানো হয়েছে।

اَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ যাদেরকে কোরবানীর গোশ্‌ত দেওয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بائس فقير বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তৎস্থলে قانع ومعتر শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তফসীর করা হয়েছে। قانع ঐ অভাবগ্রস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারও কাছে যাচ্ঞা করে না, দরিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে معتر ঐ ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে,—মুখে সওয়াল করুক বা না করুক।—(মাযহারী)

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয় ; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য ঃ لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا —বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কোরবানী একটি মহান ইবাদত ; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এর গোশ্‌ত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কোরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয় ; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে ওঠাবসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয় ; বরং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বতবর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামোও এ-কারণে জরুরী যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

إِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

---

(৩৮) আল্লাহ্ মু'মিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (মুশরিকদের প্রাধান্য ও নির্যাতনের শক্তিকে) মু'মিনদের থেকে (সত্বরই) হটিয়ে দেবেন (এরপর হজ্জ ইত্যাদি কর্মে তারা বাধাই দিতে পারবে না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক কুফরকারীকে পছন্দ করেন না। (বরং এরূপ লোকদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। পরিণামে তিনি তাদেরকে পরাভূত এবং মু'মিনদেরকে জয়ী করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হেরেম শরীফ ও মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে এবং ওমরা আদায় করতে বাধা দিয়েছিল ; অথচ তাঁরা ওমরার ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে এই ওয়াদা দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা সত্বরই মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে দেবেন। ষষ্ঠ হিজরীতে এই ঘটনা ঘটেছিল। এরপর থেকে উপর্যুপরি কাফির মুশরিকদের শক্তি দুর্বল ও তারা মনোবলহীন হতে থাকে। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজিত হয়ে যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ ﴿٣٩﴾

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ

اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ

وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا

الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾

(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে ; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্‌র সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। (৪১) তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপকারিতার কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না; কিন্তু এখন) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, যাদের সাথে (কাফিরপক্ষ থেকে) যুদ্ধ করা হয় ; কারণ তাদের প্রতি (ঘোর) অত্যাচার করা হয়েছে। (এটা যুদ্ধ বৈধকরণের কারণ) এবং (এই অনুমতি প্রদানের অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা ও কাফিরদের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে জয়ী করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (অতঃপর মুসলমানগণ কিরূপ নির্যাতিত হচ্ছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ (অর্থাৎ তওহীদ বিশ্বাস করার কারণেই কাফিররা তাদের প্রতি নির্যাতনের স্টীমরোলার চালায়। ফলে তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। অতঃপর জিহাদ বৈধকরণের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ যদি (অনাদিকাল থেকে) মানুষের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, (অর্থাৎ সত্যপন্থীদেরকে অসত্যপন্থীদের উপর জয়ী না করতেন) তবে (নিজ নিজ আমলে) খ্রিস্টানদের নির্জন উপাসনালয়, ইবাদতখানা, ইহুদীদের ইবাদতখানা এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত (ও নিশ্চিহ্ন) হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। (অতঃপর সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, আন্তরিকতার সাথে জিহাদ করলে বিজয় দান করা হবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্য করে (অর্থাৎ আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত করাই যুদ্ধের খাঁটি নিয়ত হওয়া চাই)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী (ও) শক্তিধর। (তিনি যাকে ইচ্ছা শক্তি ও বিজয় দিতে পারেন। অতঃপর জিহাদকারীদের ফযিলত বয়ান করা হচ্ছে ঃ) তারা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নিজেরাও নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং (অপরকেও) সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। সব কাজের পরিণাম তো আল্লাহ্রই ইখতিয়ারভুক্ত। (সুতরাং মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে কিরূপে বলা যায় যে, পরিণামেও তারা তদ্রূপই থাকবে ; বরং এর বিপরীত হওয়াও সম্ভবপর। সেমতে তাই হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ ঃ মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফিরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না-কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফিরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) জওয়াবে বলতেন ঃ সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। —(কুরতুবী)

যখন রাসূলে করীম (সা) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয় ঃ اخرجوا نبيهم ليهلكن। অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। —(কুরতুবী)

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাইয়্যান, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই প্রথম আয়াত কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলো। ইতিপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য ঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকেও কাফিরদের মুকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোন মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ—বিগত যমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেইসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যমানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না ; যেমন অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের ইবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

صَوَامِعُ শব্দটি صومعة-এর বহুবচন। এটা খ্রিস্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। بِيَعٌ শব্দটি بيعة-এর বহুবচন। খ্রিস্টানদের সাধারণ গির্জাকে بيعة বলা হয়। صَلَوٰتٌ শব্দটি صلوت-এর বহুবচন। ইহুদীদের ইবাদতখানাকে صلوت এবং মুসলমানদের ইবাদতখানাকে مساجد বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা (আ)-এর আমলে صلوت ঈসা (আ)-এর আমলে صوامع ও بيع এবং শেষ নবী (সা)-এর যমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত।—(কুরতুবী)

খুলাফায়ে রাশিদীনের পক্ষে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশ ঃ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ এই আয়াতে তাদের বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ আয়াতে ছিল। অর্থাৎ যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের

কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত উসমান গনী (রা) বলেন ঃ ثناء قبل بلاء অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা কীর্তন করার শামিল এরপর আল্লাহ্ তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চারজন খুলাফায়ে-রাশিদীন এবং মুহাজিরগণ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

এ কারণেই আলিমগণ বলেন ঃ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে-রাশিদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল।—(রূহুল-মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন ঃ এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আনজাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খুলাফায়ে-রাশিদীন তাদের যমানায় আনজাম দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী)

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ
إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَٰبُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَٰفِرِينَ
ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِيَ
ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

(৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নূহ, আদ, সামূদ (৪৩) ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায়ও। (৪৪) এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম! (৪৫) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গুনাহ্গার। এইসব জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে! (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না ; কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। (৪৭) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে ; অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গুনাহ্গার ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৯) বলুন ঃ হে লোকসকল! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী। (৫০) সুতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে পাপ মার্জনা এবং সম্মানজনক রুযী। (৫১) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য চেষ্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা (অর্থাৎ বিতর্ককারীরা) যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে (আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা) তাদের পূর্বে কওমে নূহ, আদ, সামূদ, ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরাও (নিজ নিজ পয়গম্বরকে) মিথ্যাবাদী বলেছে। এবং মূসা (আ)-কেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। (কিন্তু মিথ্যাবাদী বলার পর) আমি

কাফিরদেরকে (কিছুদিন) সুযোগ দিয়েছিলাম, (যেমন বর্তমান কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়ে রেখেছি।) এরপর তাদেরকে (আযাবে) পাকড়াও করলাম। অতএব (দেখ,) আমার আযাব কেমন ছিল! আমি কত জনপদ (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত। এসব জনপদ এখন ছাদের উপর পতিত স্তূপে পরিণত হয়েছে (অর্থাৎ জনমানব শূন্য। স্বভাবত প্রথমে ছাদ ও পরে প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়। এমনিভাবে এসব জনপদ) কত পরিত্যক্ত কূপ (যেগুলো পূর্বে আবাদ ছিল) ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ (যা এখন ভগ্নস্তূপ—এসব জনপদে ধ্বংস করা হয়েছে। এমনিভাবে প্রতিশ্রুত সময় আসলে এ যুগের মানুষকেও আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হবে।) তারা কি দেশভ্রমণ করে নি, যাতে তারা এমন হৃদয়ের অধিকারী হয়, যদ্বারা বুঝে এবং এমন কর্ণের অধিকারী হয়, যদ্বারা শ্রবণ করে। বস্তুত (যারা বুঝে না, তাদের) চক্ষু তো অন্ধ নয় ; বরং (বক্ষস্থিত) অন্তরই অন্ধ হয়ে যায়। (বর্তমান কাফিরদেরও অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে; নতুবা পরবর্তী লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত।) তারা (নবুয়তে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে (আযাব তাড়াতাড়ি না আসায় তারা প্রমাণ করতে চায় যে, আযাব আসবেই না) অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না (অর্থাৎ ওয়াদার সময় অবশ্যই আযাব আসবে।) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন (যেদিন আযাব আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন—তা দৈর্ঘ্যে অথবা কঠোরতায়) তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। (সুতরাং তারা নেহাৎ নির্বোধ বলেই এমন ধরনের বিপদ ত্বরান্বিত করতে বলে।) এবং (উল্লিখিত জওয়াবের সারমর্ম আবার শুনে নাও যে) আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছিলাম এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত, অতঃপর তাদেরকে (আযাবে) পাকড়াও করেছি। সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (তখন পূর্ণ শাস্তি পাবে।) আপনি (আরও) বলে দিন ঃ হে লোকগণ, আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (আযাব আসা না আসার ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। আমি এর দাবিও করি নি।) সুতরাং যারা (এই সতর্কবাণী শোনে) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রুযী এবং যারা আমার আয়াত সম্পর্কে (অস্বীকার ও বাতিল করার) চেষ্টা করে, (নবীকে ও মু'মিনদেরকে) হারাবার (অর্থাৎ অক্ষম করার) জন্য, তারাই দোযখের অধিবাসী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য ঃ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীত কাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত্তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে আদেশ দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আল্লাহ্র পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি

ভেঙ্গে যায়।—(রূহুল-মা'আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য : اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার এক দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বুঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে একেই اشتداد (দীর্ঘ মনে হওয়া) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেক তফসীরকারক এখানে এই অর্থই নিয়েছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি ; আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহ্র একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি امتداد শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : সূরা মায়ারেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই : كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ—এতেও উপরোক্ত উভয় প্রকার তফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম-বেশি হবে, তাই এই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় ; অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জওয়াব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ
فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾
وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿۵۵﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۗ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۵۶﴾
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۵۷﴾

(৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, তাদের জন্য, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষাণ হৃদয়। গুনাহ্গাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে ; (৫৪) এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে ; তারা যেন জানে যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য।' অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহ্ই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) কাফিররা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। (৫৬) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্রই ; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নিয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে (৫৭) এবং যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা), এরা যে শয়তানের প্ররোচনায় আপনার সাথে তর্কবিতর্ক করে, এটা নতুন কিছু নয় ; বরং] আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই (আল্লাহ্র বিধি-বিধান থেকে) কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে (কাফিরদের মনে) সন্দেহ (ও আপত্তি) প্রক্ষিপ্ত করেছে। (কাফিররা এসব

সন্দেহ্ ও আপত্তি উত্থাপন করে পয়গম্বরদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ –

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের প্রক্ষিপ্ত সন্দেহকে (অকাট্য জওয়াব ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা) নিশ্চিহ্ন করে দেন। (এটা জানা কথা যে, বিশুদ্ধ জওয়াবের পর আপত্তি দূর হয়ে যায়।) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন (পূর্বেও প্রতিষ্ঠিত ছিল ; কিন্তু আপত্তির জওয়াব দ্বারা এই প্রতিষ্ঠা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এসব আপত্তি সম্পর্কে) জ্ঞানময় (এবং এগুলোর জওয়াব শিক্ষাদানে) প্রজ্ঞাময়। (এই ঘটনা বর্ণনা করার কারণ এই যে) শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্ তা'আলা তা তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, যাদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ আছে এবং যাদের অন্তর (সম্পূর্ণই) পাষাণ যে, তারা সন্দেহ্ পেরিয়ে মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, দেখা যাক জওয়াবের পরও তারা সন্দেহের অনুসরণ করে, না জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করে সত্যকে গ্রহণ করে। বাস্তবিকই (এই) যালিমরা (অর্থাৎ সন্দেহকারীরা এবং মিথ্যায় বিশ্বাস পোষণকারীরা) সুদূর বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। (কারণ, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা হঠকারিতাবশত তা কবূল করে না। পরীক্ষার জন্যই শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল) এবং (বিশুদ্ধ জওয়াব ও হিদায়েতের নূর দ্বারা এসব সন্দেহ এ কারণে বাতিল করা হয় যে) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন (এসব জওয়াব ও হিদায়েতের নূরের সাহায্যে) দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, এটা (অর্থাৎ নবী যা আবৃত্তি করেছেন) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, অতঃপর তারা যেন ঈমানে সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং (দৃঢ় বিশ্বাসের বরকতে) তাদের অন্তরে যেন এর (আমল করার) প্রতি অধিক বিনয়ী হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (এমতাবস্থায় তাদের হিদায়েত হবে না কেন? এ হচ্ছে মু'মিনদের অবস্থা।) আর কাফিররা সর্বদাই এ সম্পর্কে (অর্থাৎ পঠিত নির্দেশ সম্পর্কে) সন্দেহই পোষণ করবে (যে সন্দেহ্ শয়তান তাদের মনে প্রক্ষিপ্ত করেছিল।) যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে (আযাব না হলেও যার ভয়াবহতাই যথেষ্ট) অথবা (তদুপরি) এসে পড়ে তাদের কাছে অকল্যাণ দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের) শাস্তি। (বাস্তবে উভয়টিরই সমাবেশ হবে এবং তা হবে চরম বিপদের কারণ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আযাব প্রত্যক্ষ না করে কুফর থেকে বিরত হবে না ; কিন্তু তখন তা ফলদায়ক হবে না।) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্ তা'আলারই হবে। তিনি তাদের (কার্যকর) ফয়সালা করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তারা সুখ-কাননে বাস করবে এবং যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে, তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ—এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে—তাঁকে কোন স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, ঈসা (আ) ঐ শেষনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)। এবং যে পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত হারূন (আ)। তিনি মূসা (আ)-এর কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। 'রাসূল' তাঁকে বলা হয়, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন, তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরী। কিন্তু যিনি নবী হবেন, তাঁর রাসূল হওয়া জরুরী নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রাসূল বলা এর পরিপন্থী নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ—আয়াতে تَمَنّٰى শব্দের অর্থ قرأ (আবৃত্তি করে) এবং امنية শব্দের অর্থ قراءة অর্থাৎ আবৃত্তি করা। আরবী অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে আয়াতের যে তফসীর লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও নির্মল। আবূ হাইয়ান বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে এবং আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা 'গারানিক' নামে খ্যাত। অধিক সংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের আবিষ্কার বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের তফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয় ; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপৃত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হলো। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾

(৫৮) যারা আল্লাহ্র পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, সহনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ দীনের হিফাযতের জন্য) নিজ গৃহ ত্যাগ করেছে (যাদের কথা পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ اُخْـرِجُـوْا مِنْ دِيَارِهِمْ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে) এরপর কাফিরদের মুকাবিলায় নত হয়েছে অথবা (এমনিতেই স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে, (তারা ব্যর্থকাম ও বঞ্চিত নয় ; যদিও তারা পার্থিব উপকারিতা লাভ করতে পারেনি ; কিন্তু পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযিক দেবেন (অর্থাৎ জান্নাতের অগণিত নিয়ামত) এবং অবশ্যই আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। (এই উৎকৃষ্ট রিযিকের সাথে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (ঠিকানাও উৎকৃষ্ট দিবেন অর্থাৎ) এমন এক স্থানে দাখিল করবেন, যাকে তারা (খুবই) পছন্দ করবে। (এখন প্রশ্ন রইল যে, কোন কোন মুহাজির পার্থিব বিজয়, সাহায্য ও উপকারিতা থেকে কেন বঞ্চিত হলো এবং কাফিররা তাদেরকে হত্যা করতে কিরূপে সক্ষম হলো ? কাফিরদেরকে আল্লাহ্র গজব দ্বারা ধ্বংস করা হলো না কেন ? এসব প্রশ্নের উত্তর এই যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (প্রত্যেক কাজে রহস্য ও উপকারিতা সম্পর্কে) জ্ঞানময়, (তাদের এই বাহ্যিক ব্যর্থতার মধ্যে অনেক উপকারিতা ও রহস্য নিহিত আছে এবং) অত্যন্ত সহনশীল। (তাই শত্রুদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না।)

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ

اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

---

(৬০) এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ (বিষয়বস্তু) তো হলো, (এরপর শোন যে) যে ব্যক্তি (শত্রুকে) ততটুকুই নিপীড়ন করে, যতটুকু (শত্রুর পক্ষ থেকে) তাকে নিপীড়ন করা হয়েছিল, এরপর (সমান সমান হয়ে যাওয়ার পর যদি শত্রুর পক্ষ থেকে) সে অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

(কয়েক আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মযলুম তথা অত্যাচারিতকে সাহায্য করেন ; وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ কিন্তু মযলুম দুই প্রকার। এক. যে শত্রুর কাছ থেকে কোন প্রতিশোধই গ্রহণ করে না ; বরং ক্ষমা করে দেয় কিংবা চুপ করে বসে থাকে। দুই. যে শত্রুর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যখন সমান হয়ে যায়, তখন বাদ বিসম্বাদ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ; কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রু যদি পুনরায় তার উপর আক্রমণ করে বসে এবং আরও জুলুম করে, তবে এ ব্যক্তি মযলুমই থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতে এই দ্বিতীয় প্রকার মযলুমকে সাহায্য করারই ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবর করে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকাই আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় ; যেমন অনেক আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণত (১) فَمَنْ عَفٰى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ (২) وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (৩) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ এসব আয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে এবং ক্ষমা করতে ও সবর করতে বলা হয়েছে। কোরআন পাকের এসব নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ পন্থাই উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি শত্রুর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে এই উত্তম পন্থা ও কোরআনী নির্দেশাবলী পালন করে না। কাজেই সন্দেহ হতে পারত যে, সে বোধহয় আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যক্তির উত্তমপন্থা বর্জন করার ত্রুটি ধরবেন না ; বরং সে পুনরায় অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ
وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْ
عُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۡ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ
مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ
اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ
وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ

لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

(৬১) এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্‌ই সত্য আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহ্‌ই সবার উচ্চে, মহান। (৬৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুক্ষদর্শী সর্ববিষয় খবরদার। (৬৪) নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহ্‌ই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী। (৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ্ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং আকাশকে স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা (অর্থাৎ ম'মিনদেরকে বিজয়ী করা) এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা (সর্বশক্তিমান। তিনি) রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশ বিশেষকে) দিনের মধ্যে এবং দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশ বিশেষকে) রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন। (এই নৈসর্গিক পরিবর্তন এক জাতিকে অন্য জাতির উপর বিজয়ী করে দেওয়ার মত বিপ্লবের চাইতে অধিক আশ্চর্যজনক।) এবং এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা) সম্যক শুনেন ও খুব দেখেন। (তিনি শুনেন ও দেখেন যে, কাফিররা যালিম ও মু'মিনরা মযলুম। তাই তিনি সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাতও এবং তাঁর শক্তি সামর্থ্যও সর্ববৃহৎ এই সমষ্টিই কারণ দুর্বলদেরকে জয়ী করার।) এটা (অর্থাৎ সাহায্য) এ কারণেও (নিশ্চিত) যে, (এতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই। কেননা) আল্লাহ্-তা'আলাই পরিপূর্ণ সত্তা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদের ইবাদত করে, তারা সম্পূর্ণই অপদার্থ। (কেননা, তারা আপন সত্তায় যেমন পরমুখাপেক্ষী, তেমনি দুর্বল। এমতাবস্থায় তাদের সাধ্য কি যে, আল্লাহ্কে বাধা দেয় ?) আল্লাহ্ তা'আলাই সবার উচ্চে, মহান। (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তওহীদ যে সত্য এবং শিরক বাতিল, তা সবাই বুঝতে পারে। এ ছাড়া) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে ভূপৃষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত মেহেরবান, সর্ববিষয়ে খবরদার। তাই বান্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে উপযুক্ত মেহেরবানী করেন।) যা কিছু আকাশ মণ্ডলে আছে এবং যা

কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, সব তাঁরই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাই অভাবমুক্ত, সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহকে এবং জলযানগুলোকেও (ও), যা তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলমান হয় এবং তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন, যাতে ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়; কিন্তু যদি তাঁর আদেশ হয়ে যায়, (তবে সবকিছু হতে পারে। বান্দাদের গুনাহ্ ও মন্দ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এরূপ আদেশ করেন না। কারণ এই যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল, পরম দয়ালু। তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর (প্রতিশ্রুত সময়ে) মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় (কিয়ামতে) জীবিত করবেন। (এ সব নিয়ামত ও অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তওহীদ মেনে নেওয়া ও কৃতজ্ঞ হওয়া মানুষের উচিত ছিল ; কিন্তু) বাস্তবিকই মানুষ বড় নিমকহারাম। (ফলে এখনও কুফর ও শিরক থেকে বিরত হয় না। এখানে সব মানুষকে বুঝানো হয়নি। বরং তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা নিমকহারামিতে লিপ্ত রয়েছে)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَخَّرَلَكُمْ مَّافِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে تسخير এর তরজমা "কাজে নিয়োজিত করা" দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্ তা'আলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হতো। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোন এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর একজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ
وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۭ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾ وَاِنْ جٰدَلُوْكَ
فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

(৬৭) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন ঃ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (৭০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্র কাছে সহজ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যত শরীয়তধারী উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য যবেহ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি ; তারা এভাবেই যবেহ্ করে। অতএব তারা (অর্থাৎ আপত্তিকারীরা) যেন এ (যবেহ্র) ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। (তাদের তো আপনার সাথে বিতর্ক করার অধিকার নাই ; কিন্তু আপনার অধিকার আছে। তাই) আপনি তাদেরকে প্রতিপালকের (অর্থাৎ তাঁর ধর্মের) দিকে আহবান করুন। আপনি নিশ্চিতই বিশুদ্ধ পথে আছেন। (বিশুদ্ধ পথের পথিক ভ্রান্ত পথের পথিককে নিজের পথে আহবান করার অধিকার রাখে ; কিন্তু ভ্রান্ত পথিকের এরূপ অধিকার নাই।) তারা যদি (এরপরও) আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (তিনিই তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন। অতঃপর এরই ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে (কার্যত) ফয়সালা করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে। (এরপর এরই সমর্থনে বলা হয়েছে ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূ-মণ্ডলে আছে। (আল্লাহ্র জ্ঞানে সংরক্ষিত হওয়ার সাথে এটাও) নিশ্চিত যে, (তাদের) এসব (কথাবার্তা ও অবস্থা) আমলনামায়ও লিখিত আছে। (অতএব) নিশ্চয়ই (প্রমাণিত হলো) এটা (অর্থাৎ ফয়সালা করা) আল্লাহ্র কাছে সহজ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে منسك শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে نسك ও منسك কোরবানীর অর্থে হজ্জের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত

হয়েছিল। এজন্য সেখানে واو সহকারে ولكل امة বলা হয়েছিল। এখানে منسك-এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ যবেহ্ করার বিধানাবলী অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বুঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে واو সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের এক তফসীর তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক করত। তারা বলত ঃ তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃতজন্তু, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(রূহুল-মা'আনী) অতএব এখানে منسك এর অর্থ হবে যবেহ্ করার নিয়ম। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উম্মত ও শরীয়তের জন্য যবেহের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাসূলে-করীম (সা)-এর শরীয়ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মুকাবিলা কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েয নয় ; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও ব্যতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মুকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে ? মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয় ; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা—(রূহুল-মা'আনী) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে منسك শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা, অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। একারণেই হজ্জের বিধি-বিধানকে مناسك الحج বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে।—(ইবনে-কাসীর) কামুসে نسك শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে ইবাদত। কোরআনে وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مناسك বলে ইবাদতের বিধানাবলী বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই দ্বিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, منسك বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা শুনে নিক যে, কোন পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোন উম্মত ও শরীয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরীয়তের কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা

রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ -এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষনবী (সা) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরীয়তের বিধি-বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার কারও নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যবেহ্ সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে—অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবে ; বরং নতুন শরীয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اُدْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্কবিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের কারণ ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রিস্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা মূসা ও ঈসা (আ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন। وَاِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧١﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ
بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۗ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمُ ۗ
النَّارُ ۗ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٢﴾ يٰۤاَيُّهَا
النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ۗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ
الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٧٣﴾
مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٧٤﴾

(৭১) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। (৭২) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখেমুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে ওঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব ? তা আগুন ; আল্লাহ্ কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (৭৩) হে লোকসকল। একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুন ; তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (৭৪) তারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যাদের (ইবাদতের বৈধতা) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোন দলীল (স্বীয় কিতাবে) প্রেরণ করেননি এবং তাদের কাছে এর কোন (যুক্তিগত) প্রমাণ নেই এবং (কিয়ামতে যখন শিরকের কারণে

তাদের শাস্তি হবে তখন) জালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না (অর্থাৎ তাদের কর্ম যে ভাল ছিল, এর কোন দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না এবং কার্যত কেউ তাদেরকে শাস্তির কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। গোমরাহী এবং সত্যপন্থীদের প্রতি শত্রুতা পোষণে তাদের বাড়াবাড়ি এত বেশি যে,) যখন তাদের সামনে আমার (তাওহীদ ইত্যাদি সম্পর্কিত) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (সত্যপন্থীদের মুখ থেকে) আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখে-মুখে (আন্তরিক অসন্তোষের কারণে) মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে (যেমন মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হওয়া, নাক সিটকানো, ভ্রূকুঞ্চন ইত্যাদি। এসব প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়) যেন তারা তাদের উপর (এখন) আক্রমণ করে বসবে, যারা আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করে। অর্থাৎ সর্বদাই আক্রমণের আশংকা হয় এবং মাঝে মাঝে হয়েও যায়। আপনি (মুশরিকদেরকে) বলেন ঃ (তোমরা যে কোরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাক সিটকাও, তবে) আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কোরআন অপেক্ষা) মন্দ কিছুর সংবাদ দেব ? তা আগুন। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা নিকৃষ্ট ঠিকানা! (অর্থাৎ কোরআনকে সহ্য না করার ফল অসহনীয় দোযখ ভোগ। ক্রোধ, গোস্সা ও প্রতিশোধ দ্বারা তো এই বিরক্তি কিছুটা পুষিয়েও নাও। কিন্তু দোযখ ভোগের যে বিরক্তি, তার কোন প্রতিকার নেই। এরপর একটি জাজ্বল্যমান দলীল দ্বারা শিরক বাতিল করা হচ্ছে ঃ) লোকসকল! একটি বিচিত্র বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন (তা এই যে), তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর, তারা (সামান্য) একটি মাছিই সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা সকলেই একত্রিত হয়। (সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তারা তো এমন অক্ষম যে,) মাছি যদি তাদের কাছ থেকে (তাদের নৈবেদ্য থেকে) কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে উহা থেকে তারা তা উদ্ধার (ও) করতে পারে না। ইবাদতকারী ও যার ইবাদত করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (আফসোস,) তারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য সম্মান করেনি। (উচিত ছিল তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করা ; কিন্তু তারা শিরক করতে শুরু করেছে। অথচ) আল্লাহ্ তা'আলা পরম শক্তিধর, সর্বশক্তিমান। (সুতরাং ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই প্রাপ্য ছিল। যে শক্তিধর ও পরাক্রমশালী নয়, যার শক্তিহীনতা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা জানা হয়ে গেছে, সে ইবাদতের যোগ্য নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা ঃ ضُرِبَ مَثَلٌ এই শব্দটি সাধারণত কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয় ; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামি একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে ? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে ; অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশি শক্তিহীন হবে। مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্র মর্যাদা বুঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٧٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۗءَ عَلَى النَّاسِ ښ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

(৭৫) আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মু'মিনগণ, তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) তোমরা আল্লাহ্র জন্য শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (স্বাধীন। তিনি) রিসালতের জন্য (যাকে চান মনোনীত করেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে (যে ফেরেশতাদেরকে চান আল্লাহ্র) বিধান (পয়গম্বরদের কাছে) পৌছানেওয়ালা (নিযুক্ত করেন) এবং (এমনিভাবে) মানুষের মধ্য থেকেও (যাকে চান সাধারণ মানুষের কাছে বিধান পৌছানেওয়ালা নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র মনোনয়নের উপরই রিসালত ভিত্তিশীল। এতে ফেরেশতা হওয়ার কোন বিশেষত্ব নেই ; বরং যেভাবে ফেরেশতা রাসূল হতে পারে, যা মুশরিকরাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে মানবও রাসূল হতে পারে। এখন প্রশ্ন রইল যে, মনোনয়ন বিশেষ একজনকে কেন দান করা হয় ? এর বাহ্যিক কারণ রাসূলগণের অবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং এটা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (অর্থাৎ) তিনি (সব ফেরেশতা ও মানুষের) ভবিষ্যৎ ও অতীত অবস্থাসমূহ (খুব) জানেন (অতএব বর্তমান অবস্থা তো আরও উত্তমরূপে জানবেন। মোটকথা, সব দেখা ও শোনা অবস্থা তাঁর জানা। তন্মধ্যে কারও কারও অবস্থা এই মনোনয়নের পশ্চাতে কাজ করেছে।) এবং (প্রকৃত কারণ এর এই যে,) সব কাজ আল্লাহ্ তা'আলারই উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক ও স্বাধীন কর্তা। তাঁর ইচ্ছা এককভাবে সবকিছুর অগ্রাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। এই ইচ্ছার জন্য কোন অগ্রাধিকারীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রকৃত কারণ আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করা অনর্থক। لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ আয়াতের অর্থ তাই ; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর কোন কর্মের কারণ জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও নেই।

এই সূরার উপসংহারে প্রথমে শাখাগত বিধান ও শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে। এবং ইবরাহীমী ধর্মে অটল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতি উৎসাহ দানের নিমিত্ত কতক বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে।) হে মু'মিনগণ, (তোমরা মৌলিক বিধান মেনে নেওয়ার পর শাখাগত বিধানও পালন কর ; বিশেষত নামাযের বিধান। সুতরাং) তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং (সাধারণভাবে অন্যান্য শাখাগত বিধানও পালন করে) তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর। আশা করা যায় যে, (অর্থাৎ ওয়াদা করা হচ্ছে যে,) তোমরা সফলকাম হবে। আল্লাহ্র কাজে অক্লান্ত চেষ্টা কর, যেমন চেষ্টা করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (অন্যান্য উম্মত থেকে) স্বতন্ত্র করেছেন। (যেমন جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ইত্যাদি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।) এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। (হে মু'মিনগণ! যে ইসলামের বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন করার আদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই ইবরাহীমী মিল্লাত।) তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম থাক। তিনি তোমাদের উপাধি 'মুসলমান' রেখেছেন পূর্বেও এবং এতেও (অর্থাৎ কোরআনেও), যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং (রাসূলের সাক্ষ্যদানের পূর্বে) তোমরা একটি বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ পয়গম্বরগণ এবং প্রতিপক্ষ তাঁদের বিরোধী জাতিসমূহ হবে ; বিরোধী) লোকদের বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা হও (রাসূলের সাক্ষ্য দ্বারা তোমাদের সাক্ষ্য সমর্থিত হবে এবং পয়গম্বরগণের

পক্ষে ফয়সালা হবে।) সুতরাং (আমার বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন কর। অতএব) তোমরা (বিশেষভাবে) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং (অবশিষ্ট বিধানেও) আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ কর (অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে ধর্মের বিধি-বিধান পালন কর। আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির লাভ ক্ষতির দিকে ভ্রূক্ষেপ করো না)। তিনি তোমাদের কার্যোদ্ধারকারী। (অতএব) তিনি কতই না উত্তম কার্যোদ্ধারকারী এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হজ্জের সিজদায়ে তিলাওয়াত ঃ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ সূরা হজ্জে এক আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লিখিত আয়াতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী (র)-এর মতে এই আয়াতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে সিজদার সাথে রুকূ ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। এতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এখানে নামাযের সিজদা বুঝানো হয়েছে, যেমন وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাযের সিজদা উদ্দেশ্য। (এই আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে এই আয়াতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা হজ্জ অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দুইটি সিজদায়ে তিলাওয়াত আছে। ইমাম আযমের মতে এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ — جهاد ও مجاهدة শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حق جهاده-এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নামযশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ حق جهاده-এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা।

যাহ্‌হাক ও মুকাতিল বলেন ঃ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, اعملو حق عمله واعبدوه حق عبادته অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর যেমন করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেন ঃ এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বুঝানো হয়েছে এবং এটাই حق جهاده

অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ। ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

قد متم خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قال مجاهدة العبد لهواه অর্থাৎ তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য ঃ তফসীরে-মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনও চালু ছিল ; কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্র মনোনীত উম্মত ঃ هُوَاجْتَبٰكُمْ হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্য থেকে বনী হাশিমকে এবং বনী-হাশিমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।—(মুসলিম, মাযহারী)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই'—এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন গুনাহ্ নেই যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গুনাহ্ও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হতো না।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাইলের উপর আরোপিত হয়েছিল। কোরআন পাকে একে اصر ও اغلال শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উম্মতকে এমন কোন বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন ঃ সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এই ধর্মে এমন কোন অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতই না পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় ; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোন কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়,

তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায় ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে মাযহারীতে বলেন ঃ ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, এ কথার তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ جعلت قرة عينى فى الصلوة অর্থাৎ নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয়। —(আহ্‌মদ, নাসায়ী, হাকিম)

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফযীলতে শামিল হয় ; যেমন হাদীসে আছে ঃ الناس تبع لقريش فى هذا الشان مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কুরাইশীদের অনুগামী এবং কাফির কাফির কুরাইশীর অনুগামী। —(মাযহারী)

কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সা) হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মু'মিনীন' অর্থাৎ মু'মিনদের মাতা। নবী করীম (সা) যে হযরত ইবরাহীমের বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا —অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমই কোরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন ; যেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ—কোরআনে মু'মিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম নন ; কিন্তু কোরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও ইবরাহীম (আ)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উম্মতে মুহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উম্মতেরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গম্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্

তা'আলার বিধানাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের যমানায় উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে ? উম্মতে মুহাম্মদীর তরফ থেকে জেরার জওয়াবে বলা হবে ঃ আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই ; কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল (সা)-এর মুখে এ কথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবূল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ—উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্র বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া! বিধানাবলীর মধ্যে এ স্থলে শুধু নামায ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ ; যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ—অর্থাৎ সব কাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এই বাক্যের অর্থ এই যে, কোরআন ও সুন্নাহ্কে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক ; যেমন এক হাদীসে আছে ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله -

আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে ; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব ও-অপরটি আমার সুন্নত। —(মাযহারী)

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ

সূরা আল-মু'মিনূন

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬ রুকূ, ১১৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ① الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ② وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ③ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ④ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ⑤ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ⑥ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ⑦ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ⑧ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ⑨ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ⑩ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, (৩) যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, (৪) যারা যাকাত দান করে থাকে (৫) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে ; (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। (৮) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে (৯) এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

সূরা মু'মিনূনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত উমর ফারুক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হতো, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হতো। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্য থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বেশি দাও—কম দিও না; আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর—লাঞ্ছিত করো না; আমাদেরকে দান কর—বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দাও—অন্যদেরকে দিও না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এক্ষুণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এই দশটি আয়াত পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোল্লিখিত দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায়ে ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর চরিত্র অর্থাৎ স্বভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এগুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ও অভ্যাস।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় সেইসব মুসলমান (পরকালে) সফলকাম হয়েছে, যারা (বিশ্বাস শুদ্ধকরণের সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত ; অর্থাৎ তারা) নামাযে (ফরয হোক কিংবা নফল ইত্যাদি) বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক বিষয়াদি থেকে (উক্তিগত হোক কিংবা কর্মগতভাবে হোক) বিরত থাকে, যারা (কর্ম ও চরিত্রে) তাদের আত্মশুদ্ধি করে এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে (অবৈধ কামবাসনা চরিতার্থ করা থেকে) সংযত রাখে ; তবে তাদের স্ত্রী ও (শরীয়তসম্মত) দাসীদের ক্ষেত্রে (সংযত রাখে না)। কেননা, (এ ব্যাপারে) তারা তিরস্কৃত হবে না। হ্যাঁ, যারা এগুলো ছাড়া (অন্যত্র কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) ইচ্ছুক হবে, তারা (শরীয়তের) সীমালংঘনকারী হবে। এবং যারা (গচ্ছিত) আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি (যা কোন কাজ-কারবার প্রসঙ্গে করে কিংবা এমনিতেই প্রাথমিক পর্যায়ে করে) মনোযোগ থাকে এবং যারা তাদের (ফরয) নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা (সুউচ্চ) ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে (এবং) তথায় তারা চিরকাল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ — فلاح (সাফল্য) শব্দটি কোরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আযান ও

ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।—(কামূস) এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর চাইতে বেশি কোন কিছু কামনাই করতে পারে না। বলা বাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা—এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতের কোন মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোন কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রেই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারও জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খটকা এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُنِ الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ -

অর্থাৎ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন। এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হলো। কোরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রাখা। এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে ঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى। অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক ; অথচ পরকাল উত্তমও ; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে—দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা—এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সেইসব মু'মিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মু'মিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাবে—এ কথা বোধগম্য, কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফির ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রতি যুগের পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সুস্পষ্ট। দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীনই হবে না ; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহিযগার সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফির ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তাই ; অর্থাৎ মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে? অতএব পরিণামের ওপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ ঃ সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সেই সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই ঃ

প্রথম, নামাযে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া। 'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা ; অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা, অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা।—(বয়ানুল কোরআন) বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহ্‌বিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া 'নামাযের মাকরূহসমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণত হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ ডানে-বামে, ভ্রূক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশূ। হযরত আতা বলেন ঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশূ। হাদীসে হযরত আবূ যর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ নামাযের সময় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।—(আহমাদ, নাসায়ী আবূ দাউদ-মাযহারী) নবী করীম (সা) হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন ঃ সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে বামে ভ্রূক্ষেপ করো না।—(বায়হাকী মাযহারী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ لو خضع قلب هذا الخشعت جوارحه অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকত।—(মাযহারী)

নামাযে খুশূর প্রয়োজনীয়তার স্তর ঃ ইমাম গাযযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরও কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে খুশূ ফরয। সম্পূর্ণ নামায খুশূ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাযই হবে না। অন্যেরা বলেছেন ঃ খুশূ নিঃসন্দেহে নামাযের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামায নিষ্প্রাণ; কিন্তু একে নামাযের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাযই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরয।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরয নয় ; কিন্তু নামায কবূল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরয। তাবরানী 'মু'জামে-কবীরে' হযরত আবূ দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম যে বিষয় উম্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশূ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোন খুশূ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না।—(বয়ানুল-কোরআন)

পূর্ণ মু'মিনের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ —لغو-এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তর গুনাহ্, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই ক্ষতি বরং বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসার্হ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه—অর্থাৎ 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল ম'মিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ যাকাত ঃ এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয়। কোরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরয হয়নি—মদীনায় হিজরতের পর ফরয করা হয়েছে। ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ—এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ-এর সাথে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ—উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যাঁরা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই। যাঁরা বলেন যে, মদীনায় পৌঁছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এ স্থলে 'যাকাত' শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও এই অর্থ নেওয়া হয়েছে। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত

কোরআন পাকে যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে اٰتُوا ও يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ايتاء ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ —الزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ—فَاعِلُوْنَ বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বুঝানো হয়নি। এছাড়া فَاعِلُوْنَ শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে فعل (কাজ)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক যাকাত فعل নয়; বরং অর্থকড়ির একটা অংশ। فَاعِلُوْنَ শব্দ দ্বারা এই অংশ বুঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে যাকাতের পারিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে যাকাত যে মু'মিনের জন্য অপরিহার্য ফরয, তা বর্ণনার অপেক্ষ রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরযই। কেননা, শিরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গুনাহ্। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয।

চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ অর্থাৎ যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে-জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; যেমন যিনা—তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ, বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা—এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে استمناء باليد অর্থাৎ হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।—(বয়ানুল কোরআন, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ 'আমানত' শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়—হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকুকুল-ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক

আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত। অর্থাৎ কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হিফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হিফাযত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঃ অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বুঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে العدة دين। অর্থাৎ ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গুনাহ্। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে ; কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত এর খেলাফ করা গুনাহ্।

সপ্তম গুণ নামাযে যত্নবান হওয়া ঃ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ—নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রূহুল-মা'আনী) এখানে صلوات শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صلوت শব্দটির একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক—নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল ম'মিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ—উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। قد افلح বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿১২﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

مَكِينٍ ﴿১৩﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿১৪﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿১৫﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تُبْعَثُونَ ﴿১৬﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿১৭﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ

لَقَادِرُونَ ﴿১৮﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا

فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿১৯﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ

تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ ﴿২০﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿২১﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿২২﴾

---

(১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি ; অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়!

(১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান নই। (১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি ; এবং আমি তা অপসারণ করলেও করতে পারি (১৯) অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (২০) এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২১) এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে মানব সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (অর্থাৎ খাদ্য) থেকে সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রথমে মাটি, অতঃপর তা থেকে উদ্ভিদের মাধ্যমে খাদ্য অর্জিত হয়)। এরপর আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যা (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) এক সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ গর্ভাশয়ে)অবস্থান করেছে (তা খাদ্য থেকে অর্জিত হয়েছিল।) অতঃপর আমি বীর্যকে জমাট রক্ত করেছি। এরপর জমাট রক্তকে (মাংসের) পিণ্ড করেছি। এরপর আমি পিণ্ডকে (অর্থাৎ পিণ্ডের কতক অংশকে) অস্থি করেছি। এরপর অস্থিকে মাংস পরিধান করিয়েছি। (ফলে অস্থি আবৃত হয়ে গেছে। এরপর (অর্থাৎ এসব বিবর্তনের পর) আমি (তাতে রূহ নিক্ষেপ করে) তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। (যা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে খুবই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। কারণ, ইতিপূর্বে একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মধ্যে সব বিবর্তন হচ্ছিল, এখন তা একটি প্রাণবিশিষ্ট জীবিত মানুষে পরিণত হয়েছে।) অতএব শ্রেষ্ঠতম কারিগর আল্লাহ্ কত মহান। (কেননা, অন্যান্য কারিগর আল্লাহ্র সৃজিত বস্তুসমূহে জোড়াতালি দিয়েই কোন কিছু তৈরি করতে পারে। জীবন সৃষ্টি করা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ! বীর্যের উপর উল্লিখিত বিবর্তনসমূহ এই ক্রমানুসারেই 'কানূন' ইত্যাদি চিকিৎসা গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। এরপর মানুষের সর্বশেষ পরিণতি ফানার কথা বর্ণিত হচ্ছে)। অতঃপর তোমরা (এসব বৈচিত্র্যময় ঘটনার পর) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। (অতঃপর পুনরুত্থান বর্ণিত হচ্ছে ঃ) অতঃপর তোমরা কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে। (আমি যেভাবে তোমাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে অস্তিত্ব দান করেছি, তেমনি তোমাদের স্থায়িত্বের বন্দোবস্তও করেছি। সেমতে) আমি তোমাদের উর্ধ্বে সপ্তাকাশ (যেগুলোতে ফেরেশতাদের যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে) সৃষ্টি করেছি। (এগুলোর সাথে তোমাদেরও কিছু কিছু উপকারিতা সংশ্লিষ্ট আছে।) এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে বেখবর ছিলাম না। (বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকে উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি করেছি।) এবং আমি (মানুষের দায়িত্ব ও ক্রমবিকাশের জন্য) আকাশ থেকে

পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমি তা (কিছুকাল পর্যন্ত) ভূভাগে সংরক্ষিত রেখেছি (সেমতে কিছু পানি ভূভাগের উপরে এবং কিছু পানি অভ্যন্তরে চলে যায়, যা মাঝে মাঝে বের হতে থাকে)। আমি (যেমন তা বর্ষণ করতে সক্ষম, তেমনি) তা (অর্থাৎ পানি) বিলোপ করে দিতে (ও) সক্ষম (বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে হোক কিংবা মৃত্তিকার সুগভীর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়ে হোক; যেখান থেকে তোমরা যন্ত্রপাতির সাহায্যেও উত্তোলন করতে না পার। কিন্তু আমি পানি অব্যাহত রেখেছি।) অতঃপর আমি তা (অর্থাৎ পানি) দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর মেওয়াও আছে (টাটকা খাওয়া হলে এগুলোকে মেওয়া মনে করা হয়)। এবং তা থেকে (যা শুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়, তাকে খাদ্য হিসেবে) তোমরা আহারও কর এবং (এই পানি দ্বারা) এক (যয়তূন) বৃক্ষও (আমি সৃষ্টি করেছি) যা সিনাই পর্বতে (প্রচুর পরিমাণে) জন্মায় এবং যা তৈল নিয়ে উৎপন্ন হয় এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন নিয়ে। (অর্থাৎ এই বৃক্ষের ফল দ্বারা উভয় প্রকার উপকার লাভ হয়। বাতি জ্বালানোর এবং মালিশ করার কাজেও লাগে এবং রুটি ডুবিয়ে খাওয়ার কাজেও লাগে। উল্লিখিত ব্যবস্থাদি পানি ও উদ্ভিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়) এবং (অতঃপর জীবজন্তুর মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন উপকার বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যেও চিন্তা করার বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু (অর্থাৎ দুধ) পান করতে দেই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আরও অনেক উপকারিতা আছে। (তাদের চুল ও পশম কাজে লাগে।) এবং তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণও কর। তাদের (মধ্যে যেগুলো বোঝা বহনের যোগ্য, তাদের) পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা (ও) কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁর বিধি-বিধান পালনে বাহ্যিক কাজকর্ম ও অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং সব বান্দার হক আদায় করাকে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের পন্থা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও মানবজাতি সৃজনে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যাতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, জ্ঞান ও চেতনাশীল মানুষ এছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করতেই পারে না।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ — سلالة অর্থ সারাংশ এবং طين অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আ) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তফসীরবিদ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ বলে মানুষের শুক্রই

বুঝানো হয়েছে। কেননা, শুক্র সুখাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ অর্থাৎ মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ।

হযরত ইবনে-আব্বাস বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব ঃ তফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত উমর ফারূক (রা) একবার সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন ঃ রমযানের কোন্ তারিখে শবে কদর ? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন। তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে কদর রমযানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন ঃ এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরাপুরি গজায়নি ; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লিখিত আছে ঃ فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا —এই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ اَبٌّ জন্তুদের খাদ্য।

কোরআন পাকের ভাবালঙ্কার লক্ষণীয় যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি ; বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যস্তরে বিবর্তনকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওয়া বুঝায় এবং কোথাও فَـ অব্যয় দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওয়া বুঝায়। এতে সেই ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে। কোন কোন বিবর্তন মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয় না। সেমতে কোরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে—প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্যে পরিণত করা। এখানে ثُمَّ ব্যবহার করে ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً বলেছে। কেননা, মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকার ধারণ করা মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ। এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্যের জমাট রক্তে পরিণত হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একেও ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর জমাট রক্তের মাংসপিণ্ড হওয়া, মাংসপিণ্ডের অস্থি হওয়া এবং অস্থির উপর মাংসের প্রলেপ হওয়া—এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন

হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে فـ অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির সর্বশেষ ثم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে রূহ্ ও জীবন সৃষ্টি করা মানব বুদ্ধির দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ কাজ ছিল সেখানে ثم শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে অব্যয় فـ প্রয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছায় চল্লিশ দিন করে ব্যয় হয়। কারণ, এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহ্‌র কুদরতের কাজ।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা ঃ কোরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে ঃ ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ—অর্থাৎ আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদান ও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগৎ অর্থাৎ রূহ জগৎ তথা রূহ্ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ্ ও জৈব রূহ্ ঃ এখানে خَلْقًا اٰخَرَ-এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তফসীরবিদ 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ্ বলে জৈব রূহ্ বুঝানো হয়েছে। কারণ, এটাও বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহ বিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ্ বলে। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ثم শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে-আরওয়াহ্' তথা রূহ্ জগৎ থেকে প্রকৃত রূহ্‌কে এনে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহ্‌কে মানব-সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ্ তা'আলা এসব রূহ্‌কে সমবেত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে بَلٰى বলে আল্লাহ্‌র প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বুঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে। এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহ্ও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ — خلق ও تخليق এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خالق (স্রষ্টা) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خلق ও تخليق শব্দ

কারিগরির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে ঃ تَخْلُقُونَ اِفْكًا হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেছে ঃ اِنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ—এসব ক্ষেত্রে خلق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে خَالِقِيْن শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ—পূর্ববর্তী তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দুই আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আয়াতে আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ — طَرَائِق শব্দটি طَرِيْقَة এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طَرِيْقَة এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ—এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করে ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না ; বরং তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল--ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে ঃ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ -

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ

সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আযাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থী। যদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। যদি কোনরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহ্র কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িকভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্তু তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌঁছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোন ধূলা বালু এমনকি মানুষ ও জীবজন্তু পৌঁছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়া এবং অব্যবহারযোগ্য হওয়ারও কোন আশংকা নেই। এরপর এই বরফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফগলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফল্গুধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কূপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কোরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্য وَأَسْكَنَّاهُ فِى الْأَرْضِ এ ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয় ; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাটির গভীরতর অংশে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল। আয়াতের শেষে وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ বাক্যে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এসব বাগানে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তূন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তূনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তূনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ যয়তূন বৃক্ষের জন্য বিশেষত তূর পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তুফানে নূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তূন।—(মাযহারী)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا অর্থাৎ এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্য পাক সাফ দুধ তৈরি করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে ঃ শুধু ; দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং এর দ্বারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয়। জন্তুর পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুর গোশতও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্তুর সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ চাকার মাধ্যমে চলে এমন সব যানবাহনও নৌকার হুকুম রাখে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ۚ
مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ
حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ
الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ
فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ
أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

(২৩) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবূদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না ? (২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিল ঃ এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর ; কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে

পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাদের ছাড়া ! এবং তুমি জালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে। (২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল ঃ আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। (২৯) আরও বল ঃ হে পালনকর্তা আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (৩০) এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের সৃষ্টি এবং তার স্থায়িত্ব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম সৃষ্টি করার কথা আলোচনা করা হয়েছিল। অতঃপর তার আধ্যাত্মিক লালন-পালন ও ধর্মীয় সাফল্য লাভের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।) এবং আমি নূহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছিলাম। সে (তাঁর সম্প্রদায়কে) বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। (যখন একথা প্রমাণিত, তখন) তোমরা কি (অপরকে উপাস্য করতে) ভয় কর না ? অতঃপর [নূহ (আ)-এর একথা শুনে] তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা (জনগণকে) বলল ঃ এ তো তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ বৈ (রাসূল ইত্যাদি) নয়। (এটা দাবির পিছনে) তার (আসল) মতলব তোমাদের উপর নের্তত্ব করা (অর্থাৎ জাঁকজমক ও সম্মান লাভই তার লক্ষ্য) যদি আল্লাহ্ (রাসূল প্রেরণ করতে) চাইতেন, তবে (এ কাজের জন্য) ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। (সুতরাং তার দাবি মিথ্যা। তওহীদের দাওয়াতও তার দ্বিতীয় ভ্রান্তি। কেননা, আমরা এরূপ কথা (যে, অন্য কাউকে উপাস্য করো না) আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে (কখনও) শুনিনি। বস্তুত সে একজন উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। (তাই সারা জাহানের বিরুদ্ধে কথা বলে যে, সে রাসূল এবং উপাস্য এক।) সুতরাং নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময়) পর্যন্ত তার (অবস্থার) ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (অবশেষে এক সময় সে খতম হবে এবং সব পাপ ঘুচে যাবে) নূহ [(আ) তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে] আরয করল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি (তাঁর দোয়া কবূল করে) তাঁর কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। (কারণ, এখন প্লাবন আসবে এবং এর সাহায্যে তুমি ও ঈমানদাররা নিরাপদ থাকবে।) এরপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ (নিকটে) আসে এবং (এর আলামত এই যে,) ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হয়, তখন প্রত্যেক প্রকার (জন্তুর মধ্য) থেকে (যা মানুষের জন্য উপকারী এবং পানিতে জীবিত থাকতে পারে না, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট, ঘোড়া, গাধা, ইত্যাদি) এক এক জোড়া (নর ও মাদা) এতে (নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও (সওয়ার করিয়ে নাও) তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (যে, তারা নিমজ্জিত হবে) তাদের ছাড়া। (অর্থাৎ তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে কাফির, তাকে নৌকায় সওয়ার করো না।) এবং (শুনে রাখ যে, আযাব আসার সময়ে) আমার

কাছে কাফিরদের (মুক্তি) সম্পর্কে কোন কিছু বলো না। (কেননা,) তারা সবাই নিমজ্জিত হবে। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার (মুসলমান) সঙ্গীরা নৌকায় বসে যাবে, তখন বল ঃ আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদেরকে কাফিরদের (দুষ্কৃতি) থেকে উদ্ধার করেছেন এবং (যখন প্লাবন থেমে যাওয়ার পর নৌকা থেকে স্থলে অবতরণ করতে থাক, তখন) আরও বল ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কল্যাণকরভাবে (স্থলে) নামিয়ে দাও (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিশ্চিন্তায় রেখো।) তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী (অর্থাৎ অন্য যারা মেহমান নামায়, তারা নিজ মেহমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির শক্তি রাখে না। তুমি সব কাজের শক্তি রাখ) এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনায় বুদ্ধিমানদের জন্য আমার কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি (এসব নিদর্শন জানিয়ে দিয়ে আমার বান্দাদেরকে) পরীক্ষা করি (যে, কে এগুলো দ্বারা উপকৃত হয় এবং কে হয় না। নিদর্শনাবলী এই ঃ রাসূল প্রেরণ করা, মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা, কাফিরদেরকে ধ্বংস করা, হঠাৎ প্লাবন সৃষ্টি করা, নৌকাকে নিরাপদ রাখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَفَارَ التَّنُّورُ — تنور চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই অনুবাদ করা হয়েছে। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কূফার মসজিদে এবং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই নূহ (আ)-এর জন্য মহাপ্লাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল। —(মাযহারী)।

হযরত নূহ (আ) তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾
وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا
مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا

تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ
بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ
نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

(৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম। (৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাবূদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? (৩৩) তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফির ছিল, পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল : এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সে তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সেকি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (৩৬) তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে ? (৩৭) আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। (৩৯) তিনি বললেন : হে আমার পালনকর্তা আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (৪০) আল্লাহ্ বললেন : কিছু দিনের মধ্যে তারা অনুতপ্ত হবে। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে হতচকিত করল এবং আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। অতঃপর ধ্বংস হোক পাপী সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এরপর (অর্থাৎ কওমে-নূহের পর) আমি তাদের পশ্চাতে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম (এরা আদ অথবা সামূদ সম্প্রদায়) এবং আমি তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম। [ইনি হূদ অথবা সালেহ্ (আ) পয়গম্বর, বলেছিলেনঃ] তোমরা আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাবূদ নাই। তোমরা কি (শিরককে) ভয় কর না ? তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কাফির ছিল,

পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও দিয়েছিলাম, তারা বলল ঃ বাস, সে তো তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষ। (সেমতে) তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (সে যখন তোমাদের মতই মানুষ তখন) তোমরা যদি তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চিতই তোমরা (বুদ্ধিতে) ক্ষতিগ্রস্ত। (অর্থাৎ এটা খুবই নির্বুদ্ধিতা।) সে কি তোমাদেরকে এ কথা বলে যে, তোমরা মরে গেলে এবং (মরে) মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হয়ে গেলে (মাংসল অংশ মৃত্তিকা হয়ে গেলে অস্থিসমূহ মাংসবিহীন থেকে যায়। কিছুদিন পর তাও মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই ব্যক্তি বলে যে, এ অবস্থায় পৌছে গেলে) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (এরূপ ব্যক্তিও কি অনুসরণীয় হতে পারে ?) খুবই অবান্তর, যা তোমাদেরকে বলা হয়। জীবন তো আমাদের এই পার্থিব জীবনই। কেউ আমাদের মধ্যে মরে এবং কেউ জন্মলাভ করে। আমরা পুনরুত্থিত হব না। এই ব্যক্তি তো এমন, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা গড়ে (যে তিনি তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নেই এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী।) আমরা তো কখনও তাকে সত্যবাদী মনে করব না। পয়গম্বর দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ নাও। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। আল্লাহ্ বললেন ঃ কিছুদিনের মধ্যে তারা অনুতপ্ত হবে। (সেমতে) সত্যসত্যই এক ভয়ংকর শব্দ (অথবা মহা-আযাব) তাদেরকে পাকড়াও করল)। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপর (ধ্বংস করার পর) আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা (-এর মত) পদদলিত করে দিলাম। অতএব আল্লাহ্র গযব কাফিরদের উপর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হিদায়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে নূহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারগণ বলেন ঃ লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে আদ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হুদ (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের পয়গম্বর ছিলেন হযরত সালেহ্ (আ)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক صيحه অর্থাৎ ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহাচীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে قَرْنًا اٰخَرِيْنَ বলে সামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, صيحه শব্দের অর্থ আযাব হলে আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

اِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ—পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফিরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো

খোলাখুলি কাফিরই ; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে ওঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ط (৪২) مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ
اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ط (৪৩) ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ط كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً
رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ج
فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (৪৪) ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ لا
بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ لا (৪৫) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا
قَوْمًا عَالِيْنَ ج (৪৬) فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ج (৪৭)
فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ (৪৮) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُوْنَ (৪৯) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ
ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ع (৫০)

(৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্টকালের অগ্রে যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাধিক্রমে আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তার রাসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (৪৫) অতঃপর আমি মূসা ও হারূনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব ; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস ? ৯৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। (৪৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সৎপথ পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম-তনয়

ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তাদের (অর্থাৎ আদ ও সামূদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার) পরে আমি আরও বহু উম্মত সৃষ্টি করেছি। (রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে তারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার যে মুদ্দত আল্লাহ্র জ্ঞানে নির্ধারিত ছিল), কোন উম্মত (তাদের মধ্য থেকে) তার নির্দিষ্ট মুদ্দতের (ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে) আগে যেতে পারত না এবং (সেই মুদ্দত থেকে) পশ্চাতেও যেতে পারত না ; (বরং ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। মোটকথা, প্রথমে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়) এরপর আমি (তাদের কাছে) একের পর এক আমার রাসূল (হিদায়াতের জন্যে) প্রেরণ করেছি ; (যেমন তাদেরকেও একের পর এক সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর (বিশেষ) রাসূল (আল্লাহ্র বিধানাবলী নিয়ে আগমন করেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আমি (-ও ধ্বংস করার ব্যাপারে) তাদের একের পর একেকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি (অর্থাৎ তারা এমন নেস্তনাবুদ হয়েছে যে, কাহিনী ছাড়া তাদের কোন নাম-নিশানা রইল না) সুতরাং ধ্বংস হোক তারা, যারা (পয়গম্বরগণের বুঝানোর পরও) বিশ্বাস স্থাপন করতো না। অতঃপর আমি মূসা (আ) ও তার ভাই হারুন (আ)-কে আমার নির্দেশাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। (বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত হওয়া তো জানাই রয়েছে।) অতঃপর তারা (তাদেরকে সত্যবাদী বলতে ও আনুগত্য করতে) অহংকার করল এবং তারা ছিল প্রকৃতই উদ্ধত। (অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল। সেমতে) তারা (পরস্পরে) বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই দুই ব্যক্তিতে (যাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বলতে কোনকিছু নেই) বিশ্বাস স্থাপন করব (এবং তাদের অনুগত হয়ে যাব) অথচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা (স্বয়ং) আমাদের অনুগত? (অর্থাৎ আমরা তো স্বয়ং তাদের নেতা। এমতাবস্থায় এই দুই ব্যক্তির ক্ষমতা ও নেতৃত্বকে আমরা কিরূপে মেনে নিতে পারি ? তারা ধর্মীয় নেতৃত্বকে পার্থিব নেতৃত্বের সাথে এক করে দেখেছে যে, তারা যেহেতু এক প্রকার নেতৃত্বের অর্থাৎ পার্থিব নেতৃত্বের অধিকারী। কাজেই অন্য প্রকার নেতৃত্বেরও তারাই অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে এই দুই ব্যক্তি যখন পার্থিব নেতৃত্ব পায়নি, তখন ধর্মীয় নেতৃত্ব কিরূপে পেতে পারে ?) তারা উভয়কে মিথ্যাবাদীই বলতে লাগল। ফলে (এই মিথ্যাবাদী বলার কারণে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। (তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর) আমি মূসা (আ)-কে কিতাব (তওরাত) দিয়েছিলাম যাতে (তার মাধ্যমে) তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাইল) হিদায়াত লাভ করে এবং আমি (আমার কুদরত ও তাওহীদ বুঝানোর জন্যে এবং বনী ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য) মারইয়াম-তনয় ঈসা (আ)-কে এবং তাঁর মাতা (মারইয়াম)-কে আমার কুদরতের ও তাদের সত্যতার) বড় নিদর্শন করেছিলাম (পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা উভয়েরই বড় নিদর্শন ছিল) এবং (যেহেতু তাঁকে পয়গম্বর করা লক্ষ্য ছিল এবং জনৈক অত্যাচারী বাদশাহ শৈশবেই তাঁকে

হত্যা করার চেষ্টায় ছিল, তাই) আমি (তার কাছ থেকে সরিয়ে)তাদেরকে এমন এক টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা (শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন হওয়ার কারণে) অবস্থানযোগ্য এবং (নদীনালা প্রবাহিত হওয়ার কারণে) সবুজ-শ্যামল ছিল। (ফলে তিনি শান্তিতেই যৌবনে পদার্পণ করেন এবং নবুয়ত প্রাপ্ত হন। তখন তাওহীদ ও রিসালতের দাবিতে তাঁকে সত্যবাদী মনে করা জরুরী ছিল ; কিন্তু কেউ কেউ করেনি।)

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوْۤا
اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِىْ
غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾ اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾
نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

(৫১) হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা ; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্য তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি, (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ? বরং তারা বুঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি যেভাবে তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি এবং ইবাদত করার আদেশ করেছি, তেমনিভাবে সব পয়গম্বরকে এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের উম্মতগণকেও আদেশ করেছি যে,) হে পয়গম্বরগণ, তোমরা (এবং তোমাদের উম্মতগণ) পবিত্র বস্তু আহার কর (কারণ, তা আল্লাহ্‌র নিয়ামত) এবং (আহার করে শোকর কর ; অর্থাৎ সৎকাজ কর (অর্থাৎ ইবাদত)। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমি অবগত (অতএব তাদেরকে ইবাদত ও সৎ কর্মের প্রতিদান দেব।) এবং (আমি তাদেরকে আরও বলেছিলাম যে, যে তরিকা এখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে) এটা তোমাদের তরিকা (যা মেনে চলা ওয়াজিব) একই তরিকা (সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতগণের। কোন শরীয়তে তা বদলায়নি)। এবং তরিকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাকে ভয় কর। (অর্থাৎ

আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করো না। কেননা, পালনকর্তা হওয়ার কারণে আমি তোমাদের স্রষ্টা ও মালিক এবং নিয়ামতদাতা হওয়ার কারণে তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামতও দান করি। এসব বিষয় আনুগত্যই দাবি করে।) কিন্তু (এর ফলশ্রুতি হিসেবে সবাই উল্লিখিত একই তরিকার অনুগামী থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি ; বরং) মানুষ তাদের দীন ও তরীকা আলাদা আলাদা করত বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যে দীন (অর্থাৎ নিজেদের তৈরি মতবাদ) আছে, তারা তাতেই বিভোর ও সন্তুষ্ট। (বাতিল হওয়া সত্ত্বেও তাকেই সত্য মনে করে।) অতএব আপনি তাদেরকে তাদের অজ্ঞানতায় বিশেষ সময় পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকতে দিন। (অর্থাৎ তাদের মূর্খতা দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না। তাদের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে, তখন সব স্বরূপ খুলে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর আযাব আসে না দেখে) তারা কি মনে করে যে, আমি যে তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেই, এতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ? (কখনই নয়) বরং তারা (এই অবকাশ দেওয়ার কারণ) জানে না। অর্থাৎ (এই অবকাশ তো তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, যা পরিণামে তাদের জন্য আরও বেশি আযাবের কারণ হবে। কারণ, অবকাশ পেয়ে তারা আরও উদ্ধত ও অবাধ্য হবে এবং পাপকাজে বাড়াবাড়ি করবে। ফলে আযাব বাড়বে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا — طيبات এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই طيبات শব্দ দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক. হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর। দুই. সংকর্ম কর। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলিমগণ বলেন ঃ এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহ্র সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে ইয়া রব বলে ডাকে ; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবূল হতে পারে ? —(কুরতুবী)

এ থেকে বুঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবূল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবূল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً — امة শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বুঝানো হয়েছে।

فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا — زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন ; কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরীকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زبر শব্দটি কোন সময় زبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَاۤ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

(৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, (৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে ; (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা (আল্লাহ্র পথে) যা দান করবার তা দান করে, (দান করা সত্ত্বেও) তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত থাকে এ কারণে যে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সেখানে তাদের দান খয়রাতের কি ফল প্রকাশ পাবে। কোথাও এই দান আদেশ অনুযায়ী না হয়ে থাকে ; যেমন দানের মাল হালাল ছিল না, কিংবা নিয়ত খাঁটি ছিল না। এসব হলে উল্টা বিপদে পড়তে হবে। অতএব যাদের মধ্যে এসব গুণ আছে) তারাই নিজেদের কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (উল্লিখিত আমলগুলো তেমন কঠিনও নয় যে, তা পালন করা দুষ্কর হবে। কেননা,) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজ করতে বলি না। (তাই এসব কাজ সহজ এবং এগুলোর শুভ পরিণতি নিশ্চিত। কেননা,) আমার কাছে এক কিতাব (আমলনামা সংরক্ষিত) আছে, যা ঠিক ঠিক (সবার অবস্থা) ব্যক্ত করবে এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا أٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ — يؤتون শব্দটি ايتاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দেওয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে এর এক কিরাআত يَاْتُوْنَ مَـا اَتَوْا ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যা আমল করার, তা আমল কর। এতে দান-খয়রাত নামায, রোযা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে ; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সৎকর্ম ; যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত হবে ? তারা, কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে সিদ্দীকতনয়া, এরূপ নয় ; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহ্র কাছে (আমাদের কোন ত্রুটির কারণে) কবূল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা-মাযহারী), হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না। —(কুরতুবী)

أُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا

عَامِلُونَ (৬৩) حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (৬৪) لَا تَجْأَرُوا

الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ (৬৫) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَا

بِكُمْ تَنكِصُونَ (৬৬) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (৬৭) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ

أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (৬৮) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ

لَهُ مُنكِرُونَ (৬৯) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ

كَارِهُونَ (৭০) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ (৭১) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا

فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (৭২) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ

مُّسْتَقِيمٍ (৭৩) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (৭৪)

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (৭৫)

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (৭৬) حَتَّىٰ

إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (৭৭)

(৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা তারা করছে। (৬৪) এমনকি যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চিৎকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চিৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হতো, তখন তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা

করে না ? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রাসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে ? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল ? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান ? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন ; (৭৪) আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম ; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হলো না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে মু'মিনদের অবস্থা শুনলে ; কিন্তু কাফিররা এরূপ নয় ;) বরং (এর বিপরীতে,) কাফিরদের অন্তর এ (দীনের) বিষয়ে (যা بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ এ উল্লিখিত হয়েছে) অজ্ঞানতায় (সন্দেহে) নিমজ্জিত রয়েছে। (তাদের অবস্থা فَذَرْهُمْ فِىْ غَمْرَتِهِمْ আয়াতেও জানা গেছে)। এছাড়া (অর্থাৎ এই অজ্ঞানতা ও অস্বীকৃতি ছাড়া) তাদের আরও (মন্দ ও অপবিত্র) কাজ আছে, যা তারা (অনবরত) করছে। (তারা শিরক ও মন্দকাজে সর্বদা লিপ্ত থাকবে) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে (যাদের কাছে মাল-দৌলত, চাকর-নওকর সবকিছু রয়েছে, মৃত্যু-পরবর্তী) আযাব দ্বারা পাকড়াও করব (গরীবদের তো কথাই নেই, এবং তাদের আযাব থেকে বাঁচার কোন প্রশ্নই উঠে না। মোটকথা, যখন তাদের সবার উপর আযাব নাযিল হবে) তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠবে (এবং তাদের বর্তমান অস্বীকৃতি ও অহঙ্কার কর্পূরের ন্যায় উবে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ) আজ আর্তনাদ করো না (কারণ, কোন ফায়দা নেই) আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না। (কারণ, এটা প্রতিদান জগৎ—কর্মজগৎ নয়, যাতে আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতি কাজে আসে। কর্ম জগতে তো তোমাদের এমন অবস্থা ছিল যে,) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে (রাসূলের মুখে) পাঠ করে শোনানো হতো, তখন তোমরা দম্ভভরে এই কোরআন সম্পর্কে বাজে গল্পগুজব বলতে বলতে উল্টোপায়ে সরে পড়তে (কেউ একে যাদু বলত এবং কেউ কবিতা বলত। সুতরাং তোমরা কর্মজগতে যা করেছ, প্রতিদান জগতে তা ভোগ কর। তারা যে কোরআন ও কোরআনবাহীকে মিথ্যাবাদী বলছে, এর কারণ কি ?) তারা কি এই (আল্লাহ্‌র) কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনি ? (যাতে

এর অলৌকিকতা ফুটে উঠত এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করত) না, তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি ? (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানাবলী আসা, যা নতুন কিছু নয়। চিরকালই পয়গম্বরদের মাধ্যমে উম্মতদের কাছে বিধানাবলীই এসেছে। যেমন এক আয়াতে আছে مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ সুতরাং মিথ্যাবাদী বলার এই কারণও অসার প্রতিপন্ন হলো। এই দুইটি কারণ কোরআন সম্পর্কিত ; অতঃপর কোরআনবাহী সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) না, (মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে) তারা তাদের রাসূল সম্পর্কে (অর্থাৎ রাসূলের সততা, ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে) জ্ঞাত ছিল না, ফলে, তাঁকে অস্বীকার করে ? (অর্থাৎ এই কারণও বাতিল। কেননা, রাসূলের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করত।) না (কারণ এই যে,) তারা (নাউযুবিল্লাহ্) বলে যে, সে পাগল ? (রাসূল যে উচ্চস্তরের বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাও সুস্পষ্ট। অতএব উল্লিখিত কোন কারণই বাস্তবে যুক্তিযুক্ত নয়।) বরং (আসল কারণ এই যে,) তিনি (রাসূল) তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। (ব্যস, মিথ্যাবাদী বলার এবং অনুসরণ না করার এটাই একমাত্র কারণ। বস্তুত তারা সত্য ধর্মের কি অনুসরণ করবে, তারা তো উল্টা এটাই চায় যে, সত্য ধর্মই তাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করুক। কাজেই কোরআনে যেসব বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারার বিপক্ষে রয়েছে, সেগুলোকে বাতিল কিংবা পরিবর্তন করা হোক। যেমন এক আয়াতে আছে قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ এবং (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) যদি (বাস্তবে এমন হতো এবং) সত্য তাদের কামনা-বাসনার আনুগামী (ও অনুকূলে) হতো, তবে (সারা বিশ্বে কুফরেরই শিরক ছড়িয়ে পড়ত। ফলে, আল্লাহ্র গযব বিশ্বকে গ্রাস করে নিত। পরিণামে) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত ; (যেমন কিয়ামতে সব মানুষের মধ্যে পথভ্রষ্টতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার গযবও সবার উপর ব্যাপক আকারে হবে এবং গযব ব্যাপক হওয়ার কারণে ধ্বংসযজ্ঞও ব্যাপক হবে। কোন বিষয় যদি সত্য হয়, তবে তা উপকারী না হলেও কবূল করা ওয়াজিব হয়। এমতাবস্থায় কবূল না করাই স্বয়ং অপরাধ। কিন্তু তাদের শুধু সত্যকে অপছন্দ করারই দোষ নয় ;) বরং (এছাড়া অন্য আরও দোষ আছে। তা এই যে, সত্যের অনুসরণ থেকে তারা দূরে পলায়ন করে ; অথচ এতে তাদেরই উপকার ছিল। ব্যস,) আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ (ও উপকার) প্রেরণ করেছি ; কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না (উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়া তাদের মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে, তাদের সন্দেহ হয়েছে যে,) আপনি তাদের কাছে প্রতিদান জাতীয় কোনকিছু চান ? (এটাও ভুল। কেননা, আপনি যখন জানেন যে,) আপনার পালনকর্তার প্রতিদানই সর্বোত্তম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম দাতা (তখন আপনি তাদের কাছে কেন প্রতিদান চাইতে যাবেন ? তাদের অবস্থার সারমর্ম এই যে,) আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে (যাকে উপরে সত্য বলা হয়েছে) দাওয়াত দিচ্ছেন, আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা এই (সরল) পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। (উদ্দেশ্য এই যে, সত্য হওয়া, সরল হওয়া ও উপকারী হওয়া এগুলো সবই ঈমানের দাবি করে এবং অন্তরায়ের যেসব কারণ হতে পারত, তার একটিও বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায়

ঈমান না আনা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।) এবং (তাদের অন্তর এমনি কঠোর ও হঠকারী যে, শরীয়তের নিদর্শনাবলী দ্বারা যেমন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তেমনি বালা-মুসীবত ও গযবের নিদর্শনাবলী দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হয় না, যদিও বিপদ মুহূর্তে আমাকে আহবান করে, কিন্তু এই আহবান নিছক বিপদ বলানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সেমতে) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূরও করে দেই, তবুও তারা অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে (এবং বিপদের সময় যে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছিল, সব খতম হয়ে যাবে ; যেমন এ আয়াতে আছে اذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دعانا الخ অন্য আয়াতে আছে اذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ الخ এর প্রমাণ এই যে, মাঝে মাঝে) আমি তাদেরকে আযাবে গ্রেফতারও করেছি ; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে (পুরোপুরি) নত হয়নি এবং কাকুতি-মিনতি করেনি। (সুতরাং ঠিক বিপদমুহূর্তেও যখন—বিপদও এমন কঠোর, যাকে আযাব বলা চলে ; যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদদোয়ার ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল–তারা নতি স্বীকার করেনি, তখন বিপদ দূর হয়ে গেলে তো এরূপ আশা করাই বৃথা। কিন্তু তাদের এসব বেপরোয়া ভাব ও নির্ভীকতা অভ্যস্ত বিপদাপদ পর্যন্তই থাকবে।) অবশেষে আমি যখন তাদের জন্য কঠিন আযাবের দ্বার খুলে দেব (যা হবে অলৌকিক, দুনিয়াতেই কোন গায়েবী গযব এসে পড়বে কিংবা মৃত্যুর পর তো অবশ্যম্ভাবী হবে), তখন তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যাবে (যে একি হলো ? তখন সব নেশা উধাও হয়ে যাবে;)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

غَمْرَةٌ—এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই غمره শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্খতাকে غمره বলা হয়েছে,যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোন দিক থেকেই আলোর কিরণ পৌছত না।

وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ — অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

مُتْرَفِيْهِمْ শব্দটি ترف থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ্র আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সেই আযাব বুঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারও কারও মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে

দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে করীম (সা) কাফিরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف —(বুখারী, মুসলিম–কুরতুবী)

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ—অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে بِهٖ শব্দের সর্বনাম হেরেমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। سَامِرًا শব্দটি سمر থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত্রি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سمر শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سامر বলা হয় গল্পগুজবকারীকে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহ্র আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই।

تَهْجُرُوْنَ—শব্দটি هُجْرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ। আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে তারা বলত।

এশার পর কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ, এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ ঃ রাত্রিকালে কিস্সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গুনাহ্সমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয় ; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও কত রকমের গুনাহ্ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যূষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত উমর (রা) এশার পর কাউকে গল্পগুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন ঃ শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবত শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফীক হয়ে যাবে। —(কুরতুবী)

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ থেকে اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে : بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ—অর্থাৎ রিসালত অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই ; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই।

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ—অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুয়তের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই ; কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি ? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যামানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফির সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন'—সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَلَا يَتَضَرَّعُوْنَ -

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্র কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রাসূলে করীম (সা)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহ্র কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়াঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমি আপনাকে আল্লাহ্র আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনি কি একথা বলেন নি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবূ সুফিয়ান বলল ঃ আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ الخ আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল ; কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। —(মাযহারী)

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾
وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْ
يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلْ
قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ
اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ
السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ

عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾
بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ
مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

(৭৮) তিনি তোমাদের কান চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন ; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? (৮১) বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। (৮২) তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব ? (৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেওয়া হয়েছে। এটা তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার ? যদি তোমরা জান, তবে বল। (৮৫) এখন তারা বলবে ঃ সবই আল্লাহ্‌র। বলুন ঃ তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না ? (৮৬) বলুন ঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে ? (৮৭) এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্। বলুন তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? (৮৮) বলুন ঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ? (৮৯) এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ? (৯০) কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবূদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবূদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্য জনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা যাকে শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন (শক্তিশালী ও নিয়ামতদাতা), যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন (যাতে আরামও অর্জন কর এবং ধর্মও অনুধাবন কর। কিন্তু) তোমরা খুবই কম শোকর করে থাক। (কেননা, এই নিয়ামতদাতার ধর্ম গ্রহণ করা এবং কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার না করাই ছিল প্রকৃত শোকর)। তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমরা সবাই (কিয়ামতে) তাঁরই কাছে সমবেত হবে। (তখন নিয়ামত অস্বীকার করার স্বরূপ জানতে পারবে।) তিনি এমন,

যিনি প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং রাত্রি ও দিবসের বিবর্তন তারই কাজ। তোমরা কি (এতটুকুও) বুঝ না ? (যে, এসব প্রমাণ তাওহীদ ও কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন দুই-ই বুঝায়। কিন্তু তবুও মান না।) বরং তারা তেমনি বলে, যেমন পূর্ববর্তীরা বলত। (অর্থাৎ) তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুজ্জীবিত হব ? এই ওয়াদা তো আমাদেরকে এবং (আমাদের) পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে। এগুলো কল্পিত কাহিনী বৈ কিছুই নয়, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে। (এই উক্তি দ্বারা আল্লাহ্র শক্তিসামর্থ্যের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে এবং পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির ন্যায় তাওহীদেরও অস্বীকৃতি হয়। তাই এর জওয়াবে শাক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ করার সাথে সাথে তাওহীদও প্রমাণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ) আপনি (জওয়াবে) বলুন ঃ (আচ্ছা বল তো,) পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কার ? যদি তোমরা খবর রাখ। তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্র। বলুন ঃ তবে চিন্তা কর না কেন ? (যাতে পুনরুত্থানের ক্ষমতা ও তাওহীদ উভয়ই প্রমাণিত হয়ে যায়।) আপনি আরও বলুন ঃ (আচ্ছা বল তো,) সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের অধিপতি কে ? তারা অবশ্যই বলবে, এটাও আল্লাহ্র। বলুন ঃ তবে তোমরা (তাঁকে) ভয় কর না কেন ? (যাতে কুদরত ও পুনরুত্থানের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতে।) আপনি (তাদেরকে) আরও বলুন ঃ যার হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব, তিনি কে ? এবং তিনি (যাকে ইচ্ছা) আশ্রয় দেন ও তার মুকাবিলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারেন না, যদি তোমরা জান। (তবুও জওয়াবে) তারা অবশ্যই বলবে, এসব গুণও আল্লাহ্রই। আপনি (তখন) বলুন ঃ তাহলে তোমরা দিশেহারা হচ্ছ কেন ? (প্রমাণের বাক্যাবলী সব স্বীকার কর ; কিন্তু ফলাফল স্বীকার কর না, যা তাওহীদ ও কিয়ামতের বিশ্বাস। অতঃপর তাদের إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ উক্তি বাতিল করা হচ্ছে; অর্থাৎ কিয়ামত আসা এবং মৃতদের জীবিত হওয়া পূর্ববর্তীদের উপকথা নয়।) বরং আমি তাদেরকে সত্য বাণী পৌছিয়েছি এবং নিশ্চয় তারা (নিজেরা) মিথ্যাবাদী। (এ পর্যন্ত কথোপকথন সমাপ্ত হলো এবং তাওহীদ ও পুনরুত্থান প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে তাওহীদের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পরিশিষ্টে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কোন সন্তান গ্রহণ করেননি (যেমন মুশরিকরা ফেরেশতাদের সম্পর্কে একথা বলে) তাঁর সাথে কোন মাবূদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবূদ তার সৃষ্টি (ভাগ করে) পৃথক করে নিত এবং (দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের ন্যায় অন্যের সৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে একজন অপরজনের উপর আক্রমণ করত। এমতাবস্থায় সৃষ্টির ধ্বংসলীলার শেষ থাকত না ; কিন্তু বিশ্বব্যবস্থায় এমন কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা যেসব (ঘৃণ্য) কথাবার্তা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি তাদের শিরক থেকে উর্ধ্বে (ও পবিত্র)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, আযাব, মুসীবত ও দুঃখকষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মুকাবিলায় কাউকে

আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না।—(কুরতুবী)

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُل رَّبِّ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا
فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

(৯৩) বলুন ঃ 'হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (৮৪) হে আমার পালনকর্তা ! তবে আপনি আমাকে গুনাহগার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।" (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (৯৭) বলুন ঃ 'হে আমার পালনকর্তা ! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে ঃ 'হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। (১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' কখনই নয়, এ তো তার একটি কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, কাফিরদের সাথে যে আযাবের কথা ওয়াদা করা হচ্ছে (যেমন উপরে إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ থেকেও জানা যায়) তা যদি আমাকে দেখান, (উদাহরণত আমার জীবদ্দশাতেই তাদের উপর এভাবে আসে যে, আমিও দেখি। কারণ, এই প্রতিশ্রুত আযাবের কোন বিশেষ সময় বলা হয়নি।

উল্লিখিত আয়াতও এ ব্যাপারে অস্পষ্ট। ফলে, উল্লিখিত সম্ভাবনাও বিদ্যমান। মোটকথা, যদি এরূপ হয়) তবে হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দিচ্ছি,তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (তবে যে পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসে,) আপনি (তাদের সাথে এই ব্যবহার করুন যে) তাদের মন্দকে এমন ব্যবহার দ্বারা প্রতিহত করুন, যা খুবই উত্তম (ও নরম। নিজের জন্য প্রতিশোধ নেবেন না ; বরং আমার হাতে সমর্পণ করুন) তারা (আপনার সম্পর্কে) যা বলে, সে বিষয়ে আমি সবিশেষ জ্ঞাত। (যদি মানুষ হিসেবে আপনার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে) আপনি দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি (যা শরীয়ত-বিরোধী না হলেও উপযোগিতা বিরোধী কাজে উৎসাহিত করে) এবং হে আমার পালনকর্তা, আমার নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, প্ররোচিত করা তো দূরের কথা। এই দোয়ার ফলে ক্রোধ দূর হয়ে যাবে। কাফিররা তাদের কুফর ও পরকালের অস্বীকৃতি থেকে বিরত হবে না ; এমনকি যখন তাদের কারও মাথার উপর মৃত্যু এসে (দণ্ডায়মান হয় এবং পরকাল দেখতে থাকে), তখন (চোখ খুলে এবং মূর্খতা ও কুফরের কারণে অনুতপ্ত হয়ে) বলে হে আমার পালনকর্তা, (মৃত্যুকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন এবং) আমাকে (দুনিয়াতে) পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে যাকে (অর্থাৎ যে দুনিয়াকে) আমি ছেড়ে এসেছি, তাতে (পুনরায় গিয়ে) সৎকাজ করি (অর্থাৎ ধর্মকে সত্য জানি ও ইবাদত করি। আল্লাহ্ তা'আলা এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেছেনঃ) কখনও (এরূপ হবে) না, এ তো তার একটি কথা মাত্র, যা সে বলে যাচ্ছে। (তা বাস্তবে পরিণত হবে না। কারণ,) তাদের সামনে এক আড়াল (আযাব) আছে (যার আসা জরুরী। এটাই দুনিয়াতে ফেরত আসার পথে বাধা। অর্থাৎ মৃত্যু। এই মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই হবে। وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا —মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরে আসাও) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (আল্লাহর আইনের খেলাফ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ـ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফিরদের উপর আযাবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়, তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর যমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু যালিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সৎ লোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন আযাব ভোগ করবে না; বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। কোরআন পাক বলে ঃ اِتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ এমন আযাবকে

ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু যালিমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না ; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ্, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই যালিমদের সাথে রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্র আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন।—(কুরতুবী)

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ—অর্থাৎ আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আযাব আসা দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আযাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল। اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ—অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, যুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ-কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। যুলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে ; যেমন কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মুকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। অই পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই ঃ

فَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ - وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ -

همز শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেওয়া। পশ্চাদ্দিক থেকে আওয়াজ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন,

যাতে ক্রোধ ও গোস্‌সার অবস্থায় মানুষ যখন বেকাবু হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালিদ (রা)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রাসূলুল্লাহ (সা)-তাঁকে এই দোয়া পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ -

اَنْ يَّحْضُرُوْنِ—সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে।—(কুরতুবী)

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبِّ ارْجِعُوْنِ অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফির ব্যক্তি পরকালের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎ কর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম!

ইবনে জারীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে ; তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব ? আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফিরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, رَبِّ ارْجِعُوْنِ অর্থাৎ আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -

برزخ-এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবন পায় না, এটাই আইন।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (১০২) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ (১০৩) تَلْفَحُ

وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ (১০৪) اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ

فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ (১০৫) قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا

ضَآلِّيْنَ (১০৬) رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ (১০৭) قَالَ

اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ (১০৮) اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ (১০৯) فَاتَّخَذْ

تُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ (১১০)

اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ (১১১) قٰلَ كَمْ

لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ (১১২) قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ (১১৩) قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ (১১৪) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ (১১৫)

(১০১) অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। (১০৫) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হতো না ? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (১০৬) তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা ! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর ; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গুনাহগার হব। (১০৮) আল্লাহ

বলবেন ঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। (১০৯) আমার বান্দাদের একদল বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। (১১১) আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (১১২) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কি পরিমাণ বিলম্ব করলে বছরের গণনায়। (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। (১১৪) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে ! (১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন (কিয়ামত দিবসে) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন (এমন ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হবে যে,) তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনও সেদিন (যেন) থাকবে না। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না ; অপরিচিতের মত ব্যবহার করবে।) এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (যে, ভাই, তুমি কি অবস্থায় আছ ? মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব পরিচয় কাজে আসবে না। সেখানে একমাত্র ঈমানই হবে উপকারী বিষয়। এর প্রকাশ্য পরিচিতির জন্য একটি পাল্লা খাড়া করা হবে এবং তাতে ক্রিয়াকর্ম ও বিশ্বাস ওজন করা হবে।) অতএব যাদের পাল্লা (ঈমানের) ভারী হবে (অর্থাৎ যারা মু'মিন হবে) তারাই সফলকাম (অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত) হবে (এবং মু'মিনগণ উপরোক্ত ভয়ভীতি ও অজিজ্ঞাসামূলক অবস্থার সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ।এবং যাদের (ঈমানের) পাল্লা হাল্কা হবে, (অর্থাৎ যারা কাফির হবে) তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। (জাহান্নামের) অগ্নি তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। (আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরকে বলবেন ঃ) কেন, (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হতো না কি ? আর তোমরা সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (এটা তারই শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে।) তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, (বাস্তবিকই) আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং (নিঃসন্দেহে) আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। (অর্থাৎ আমরা অপরাধ স্বীকার এবং তজ্জন্য অনুশোচনা ও ওযরখাহী করে আবেদন করছি যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এ (জাহান্নাম) থেকে (এখন) বের করে দিন (এবং পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন;) যেমন সূরা সিজদায় আছে فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা পুরোপুরি দোষী (তখন আমাদেরকে খুব শাস্তি দেবেন। এখন ছেড়ে দিন)। আল্লাহ্ বলবেন ঃ

তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এতেই (অর্থাৎ জাহান্নামেই) পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন নামঞ্জুর। তোমাদের কি মনে নেই যে,) আমার বান্দাদের এক (ঈমানদার) দলে বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা (শুধু এই কথার উপর যারা সর্বাবস্থায় উত্তম ও গ্রহণযোগ্য ছিল,) তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করেছিলে, এমনকি তা (অর্থাৎ এই বৃত্তি) তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে হাস্য করতে। (অতএব তাদের তো কোন ক্ষতি হয়নি, কিছুদিনের কষ্টের জন্য সবর করতে হয়েছে মাত্র। এই সবরের পরিণতিতে) আজ আমি তাদের সবরের এই প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (আর তোমরা এহেন অকৃতকার্যতায় গ্রেফতার হয়েছ। জওয়াবের উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তির সময় অন্যায় স্বীকার করলেই ক্ষমা করা হবে—তোমাদের অন্যায় এরূপ নয়। কেননা, তোমাদের আচরণে আমার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বান্দার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বান্দাও কেমন, আমার সাথে বিশেষ সম্পর্কশীল মকবুল ও প্রিয় বান্দা। তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করায় বান্দার হক নষ্ট হয়েছে এবং ঠাট্টার আসল লক্ষ্য সত্যকে মিথ্যা বলায় আল্লাহ্‌র হক নষ্ট হয়েছে। সুতরাং এর জন্য স্থায়ী ও পূর্ণ শাস্তিই উপযুক্ত। তাদের সামনে মু'মিনদেরকে জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করাও কাফিরদের জন্য একটি শাস্তি। কেননা, শত্রুর সফলতা দেখলে অত্যধিক পীড়া অনুভূত হয়। এ হচ্ছে তাদের আবেদনের জওয়াব। অতঃপর তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম যে বাতিল তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা ও পরিতাপের উপর পরিতাপ হওয়াতে শাস্তি আরও তীব্র হয়ে যায়। তাই) বলা হবে ঃ (আচ্ছা বল তো,) তোমরা বছরের গণনায় কি পরিমাণ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছ ? (যেহেতু কিয়ামতের দিন ভয়ভীতির কারণে তাদের হুঁশ-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সেদিনের দৈর্ঘও দৃষ্টিতে থাকবে, তাই) তারা জওয়াব দেবে (বছর কোথায়, বড় জোর থাকলে) একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ আমরা অবস্থান করেছি (সত্য এই যে, আমাদের মনে নেই), আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে, যারা আমল ও বয়স সবকিছুর হিসাব রাখে) জিজ্ঞেস করুন। আল্লাহ বললেন ঃ (একদিন ও দিনের কিছু অংশ ভুল ; কিন্তু তোমাদের বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তি থেকে এতটুকু তো প্রমাণিত হয়েছে যে,) তোমরা (দুনিয়াতে) অল্পদিনই অবস্থান করেছ, কিন্তু ভাল হতো যদি তোমরা (একথা তখন) বুঝতে (যে, দুনিয়ার স্থায়িত্ব ধর্তব্য নয় এবং এটা ছাড়া আরও অবস্থানস্থল আছে। কিন্তু তোমরা স্থায়িত্বকে দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেছ এবং জগতকে অস্বীকার করেছ। وَقَالُوْا اِنْ هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ—এখন ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং তোমরা ঠিক মনে করছ ; কিন্তু বেকার। বিশ্বাসের ভ্রান্তি বর্ণনা করার পর এই বিশ্বাসের কারণে সতর্ক করা হচ্ছে) তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক (উদ্দেশ্যহীনভাবে) সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না ? (উদ্দেশ্য এই যে, যখন আমি বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা সত্য প্রমাণিত আয়াতসমূহে

কিয়ামত ও তাতে আমলের প্রতিদানের সংবাদ দিয়েছিলাম, তখনই মানব সৃষ্টির অন্য রহস্যসমূহের মধ্যে এ রহস্যও জানা হয়ে গিয়েছিল যে, কিয়ামত অস্বীকার করা ছিল অতি জঘন্য ব্যাপার।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ—কিয়ামতের দিন দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে যমীন, আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কোরআন পাকের فَاِذَا نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াতে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকার—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিম্মায় কারও প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সন্তুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ-

অর্থাৎ সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মু'মিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য ঃ কিন্তু এ আয়াতে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে—মু'মিনগণের নয়। কারণ, উপরে কাফিরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন বলে যে, اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ্ তা'আলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে।

মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যই।—(মাযহারী)

এমনিভাবে হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না)—আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলিমগণ বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ, তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না ; কিন্তু এটা কাফিরদের অবস্থা। মু'মিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ—অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হাশরের বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভয়বীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে।—(মাযহারী)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সেই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফিরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফিরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে।

কোরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহ্র পাল্লায় কোন ওযনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না, শূন্যের মতই হাল্কা হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম ওযনই করব না। কামিল মু'মিনদের এই অবস্থা বর্ণিত হলো। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোন গুনাহ্ সংঘটিতই হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গুনাহের পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফিরদের নেক আমলও ঈমানের শর্ত

বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওযন হাল্কা হবে। গুনাহ্গার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গুনাহ্র পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি ; বরং কোরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কোরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গুনাহ্ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারও দ্বারা কোন গুনাহ্ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মিশ্র। তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহ্র চাইতে বেশি হবে—এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে যার গুনাহ্ নেকীর চাইতে বেশি হবে—এক গুনাহ্ বেশি হলেও সে দোযখে যাবে ; কিন্তু মু'মিন গুনাহ্গারের দোযখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে হবে ; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোযখের অগ্নি দ্বারা যখন তার গুনাহ্র মরিচা দূরীকরণ হবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস আরও বলেন ঃ কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওযন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক-সেদিক হবে না। যার নেকী ও গুনাহ্ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ এবং দোযখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সেও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। —(মাযহারী)

ইবনে আব্বাসের এই উক্তিতে কাফিরদের উল্লেখ নেই, শুধু মু'মিন গুনাহ্গারদের কথা আছে।

আসল ওযনের ব্যবস্থা ঃ কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফির ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওযন করা হবে। কাফিরের কোন ওযনই হবে না, সে যত মোটা স্থূলদেহীই হোক না কেন। (—বুখারী, মুসলিম) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওযন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজহা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম এই বিষয়বস্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওযনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থার পাল্লায় রাখা হবে এবং ওযন করা হবে। তাবারানী প্রমুখ ইবনে আব্বাসের ভাষ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আবদুর রাজ্জাক 'ফযলুল ইলম' গ্রন্থে ইব্রাহীম নাখয়ী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওযনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাল্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে, পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে ঃ তুমি জান এটা কি? (যার দ্বারা পাল্লা ভারী হয়ে গেছে)। সে বলবে ঃ আমি জানি না। তখন বলা হবে ঃ এটা

তোমার ইল্‌ম, যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন শহীদদের রক্ত এবং আলিমদের কলমের কালি (যদ্দ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন) পরস্পরে ওযন করা হবে। আলিমদের কালির ওযন শহীদদের রক্তের চাইতে বেশি হবে।—(মাযহারী)

আমল ওযনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওযন করার মধ্যে কোন অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ — كالح অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

وَلَا تُكَلِّمُونِ হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ এটা জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা হবে। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না ; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন ঃ কোরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটি জওয়াব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জওয়াবে لَا تُكَلِّمُونِ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না।—(মাযহারী)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

---

(১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্ তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (১১৭) যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এসব বিষয়বস্তু যখন জানা গেল) অতএব (এ থেকে পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় যে,)

আল্লাহ্ মহিমান্বিত, তিনি বাদশাহ্ (এবং বাদশাহ্-ও) সত্যিকার। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই (এবং তিনি) মহান আরশের অধিপতি। যে ব্যক্তি (এ বিষয়ে প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর) আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মাবূদের ইবাদত করে, যার (মাবূদ হওয়া) সম্পর্কে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে হবে, (যার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে,) নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না। (বরং চিরকাল আযাব ভোগ করবে এবং যখন আল্লাহ্ তা'আলার শান এই, তখন) আপনি (এবং অন্যরাও) বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (আমার ত্রুটিসমূহ) ক্ষমা করুন ও (সর্বাবস্থায় আমার প্রতি) রহম করুন (জীবিকায়, ইবাদতের তওফীকদানে, পরকালের মুক্তির ব্যাপারে এবং জান্নাত দানের ব্যাপারেও।) রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মু'মিনূনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا থেকে নিয়ে শেষ সূরা পর্যন্ত বিশেষ ফযীলত রাখে। বগভী ও সালাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ ? আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ আমি এই আয়াতগুলো পাঠ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ — এখানে اغفر ও ارحم। উভয়ের مفعول তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।—(মাযহারী)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। —(কুরতুবী)

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ সূরা মু'মিনূনের সূচনা قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং সমাপ্তি لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ফালাহ্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফিররা এ থেকে বঞ্চিত।

سُوْرَةُ النُّوْرِ

সূরা আন্-নূর

মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ রুকূ ; ৬৪ আয়াত

সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ এই সূরার অধিকাংশ বিধান সতীত্বের সংরক্ষণ ও পর্দাপুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসাবে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল-মু'মিনূনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ সূরায় সতীত্বকে গুরুত্বদানের জন্যে এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

হযরত উমর ফারূক (রা) কূফাবাসীদের নামে এক ফরমানে লিখেছেন ঃ علموا نساءكم سورة النور অর্থাৎ তোমাদের নারীদেরকে সূরা আন-নূর শিক্ষা দাও।

এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে ; অর্থাৎ سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا এটাও এ সূরার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ②

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) এটা একটা সূরা, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এবং এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে কশাঘাত কর। আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা

আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে ; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা একটা সূরা, যা (অর্থাৎ যার ভাষাও) আমি (ই) অবতীর্ণ করেছি, যা (অর্থাৎ যার অর্থসম্ভার তথা বিধানাবলীও) আমি (ই) নির্ধারিত করেছি (ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব, মনদূব হোক কিংবা মুস্তাহাব) এবং আমি (এসব বিধান বুঝানোর জন্য) এতে (অর্থাৎ এই সূরায়) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝ এবং আমল কর)। ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (উভয়ের বিধান এই যে,) তাদের প্রত্যেককে একশ করে দুররা মার এবং তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয় (যেমন দয়ার বশবর্তী হয়ে ছেড়ে দাও কিংবা শাস্তি হ্রাস করে দাও), যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। তাদের শাস্তির সময় মুসলমানদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে (যাতে তাদের লাঞ্ছনা হয় এবং দর্শক ও শ্রোতারা শিক্ষা গ্রহণ করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যদ্দ্বারা এর বিধানাবলীর বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি—যা সূরার উদ্দেশ্য—উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হিফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহ্র বিধানাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচাইতে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং বৃহৎ অপরাধ ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরও শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয় ; অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্য এর শরীয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; তাই শরীয়তে এর শাস্তিও সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও মুতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা; অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' (দণ্ড) বলা হয়। হুদূদ চারটি ঃ

চুরি, কোন সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনি বোধ হয় অন্য কোন অপরাধে নেই।

(১) কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কোরবানী করা যতটুকু কঠিন নয়, যতটুকু তার অন্দরমহলের উপর হাত রাখা কঠিন। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরমহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

(২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারও বংশই সংরক্ষিত থাকে না; জননী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদির সাথে বিবাহ হারাম ; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের চাইতেও কঠোরতম অপরাধ।

(৩) চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাদের শাস্তির চাইতে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত থাকে ; তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কোরআনে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পুংলিঙ্গ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতিকে সংগোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয় ; যেমন اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর

অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত ঃ নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি ; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে দ্বিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হিফাযতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা এর বিপরীত। পুরুষকে আল্লাহ্ তা'আলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রূপ নয়। সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে।

فَـاجْلِدُوْا — جلد শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি جلد (চামড়া) থেকে উদ্ভূত। কারণ, চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কশাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কশাঘাতের শাস্তিতে কার্যের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয়, মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন কষ্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট, বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা ঃ স্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে ; যেমন মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কোরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতদ্বয় এই ঃ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً - وَالَّذَانِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا -

"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ করে দেন এবং

তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তওবা কবূলকারী, দয়ালু।" এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ সম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হলো। আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ নয়—ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا অংশের মর্ম তাই।

উল্লিখিত শাস্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি। বরং কোরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি ; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস মন্তব্য করলেন ঃ সূরা নিসায় اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোন পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে ; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস একশ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন ঃ يعنى الرجم للثيب والجلد للبكر অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে।

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা-একথা হযরত ইবনে আব্বাস কোন হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اللّٰه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বাৎলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।—(ইবনে কাসীর)

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, না বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরিতও করে দেবেন-এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল ; অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা-এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্রিত হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতে أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً আয়াতের তফসীর করেছেন। তফসীরে সূরা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের উপর কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম, একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া ; দ্বিতীয়, এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং তৃতীয়, বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান। বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহ্‌র ওহী ও আল্লাহ্‌র আদেশ বলেই ছিল। إِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى পয়গম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কোরআন ও অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'এয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ্ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে, জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ لأقضين بينكما بكتاب الله অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিতা মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়সকে আদেশ দিলেন। উনায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো। —(ইবনে কাসীর)

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শাস্তিকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা বলেছেন; অথচ নূরের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে—প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে এই আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এই তফসীর আল্লাহ্র কিতাবেরই অনুরূপ ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহ্র কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষায় ঃ

قال عمربن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ ان الله بعث محمدا صلعم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلوا بتركه فريضة انزلها الله وان الرجم فى كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت ابينة او كان الحبل او الاعتراف -

হযরত উমর ফারূক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। মনে রেখ, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য—যদি ব্যভিচারের শরীয়ত সম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।—(মুসলিম ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এই রেওয়ায়েত সহীহ্ বুখারীতে আরও বিস্তারিত বর্ণিত আছে। —(বুখারী, ২য় খণ্ড ১০০৯ পৃঃ) নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষা এরূপ ঃ

انا لانجد من الرجم بدا فانه حد من حدود الله الا وان رسول الله ﷺ قد رجم ورجمنا بعده ولولا ان يقول قائلون ان عمر زاد فى كتاب الله ماليس فيه لكتبت فى ناحية المصحف وشهد عمربن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان ان رسول الله ﷺ رجم ورجمنا بعده -

"শরীয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা, এটা আল্লাহ্র অন্যতম হদ। মনে রেখ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরূপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে উমর আল্লাহ্র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কোরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। উমর ইবনে খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রজম করেছি।—(ইবনে কাসীর)

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত উমর সেই আয়াতের ভাষা প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতটি কোরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন ? তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহ্র কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াতটি কোরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।—(নাসায়ী)

এই রেওয়ায়েতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কোরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হযরত উমর মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এখানে আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত উমর একথা বলেননি—আমি এই আয়াতকে কোরআনে দাখিল করে দিতাম ; বরং বলেছেন, আমি একে কোরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত উমর (রা) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের যে তফসীর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল (সা)-এর কার্যপ্রণালীকে তিনি আল্লাহ্র কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই তফসীর ও বিবরণ কিতাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোন শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোন আয়াত নয় ; বরং সূরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এস্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েতে সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কোরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহ্‌বিদগণ একে "তিলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়" এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কোরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

সারকথা এই যে, সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাখ্যা ও তফসীরের ভিত্তিতে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পবিত্র সত্তার প্রতি আয়াত নাযিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন

ভাষায় বর্ণিত আছে। শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কিরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়ন ও প্রমাণিত রয়েছে। এই প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌঁছেছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধানে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা) থেকে একথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহসিন' ও 'গায়র মুহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদ শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর ঃ উপরোক্ত রেওয়ায়েত ও কোরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রাসূলুল্লাহ্ (সা) উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামী আইনে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও কড়া রাখা হয়েছে ঃ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি হদ মাফ হয়ে শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরী ; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর 'হদ্দে কযফ' জারি করা হবে ; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুইজন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলী ফিকাহ্ গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

পুরুষ কোন পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তি কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয় ; কিন্তু এর শাস্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে কম নয়। সাহাবায়ে কিরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছেন।

لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ—ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয় ; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানব জাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ—অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে ; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্ছনাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা ঃ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকারবার দমনের জন্য ইসলামী শরীয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারী কণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বুঝাবার আদেশ আছে ; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরীয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ততটুকুই যত্নবান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ؗ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ
اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③

(৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মু'মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ব্যভিচার এমন নোংরা কাজ যে, এতে মানুষের মেজাযই বিগড়ে যায়। তার আগ্রহ মন্দ বিষয়াদির প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। এমন বদ লোকের প্রতি আগ্রহ তার মতই আরেকজন চরিত্রভ্রষ্ট বদ লোকেরই হতে পারে। সেমতে) ব্যভিচারী পুরুষ (ব্যভিচারী ও ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং (এমনিভাবে) ব্যভিচারিণীকেও (ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না। এবং এটা (অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর যে বিবাহ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়, যার ফলস্বরূপ সে ভবিষ্যতেও ব্যভিচারিণী থাকবে অথবা যে বিবাহ কোন মুশরিকা নারীর সাথে হয়) মুসলমানদের উপর হারাম (এবং গুনাহ্র কারণ) করা হয়েছে (যদিও শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যভিচারিণীকে কেউ বিয়ে করলে গুনাহ্ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে মুশরিকা নারীকে বিয়ে করলে গুনাহ্ তো হবেই, বিয়েও শুদ্ধ হবে না ; বরং বাতিল হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীর সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত তফসীরই অধিক সহজ ও নির্ভেজাল মনে হয়। এর সারমর্ম এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে শরীয়তের কোন বিধান নয়, বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় দুশ্চরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোন নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারক অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয় ; কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ ঐ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয় ; বরং মুশরিকা নারীদের

প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোন সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কিনা অথবা শরীয়ত মতে বাতিল হবে কিনা, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় এ-কথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে—পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোন মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্যের অর্থ ঃ অর্থাৎ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন সত্যিকার মু'মিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, মু'মিন মুসলমানের আসল লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না ; বিশেষত যখন এ কথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হ্যাঁ, এরূপ নারীকে কোন ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা–বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে ; তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোন মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দু'টি বিষয়ের সমাবেশ হবে অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ ; অর্থাৎ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ

উল্লিখিত তফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বুঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোন সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোন ব্যভিচারিণী নারী কোন সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বুঝা যায় না। শরীয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকাহ্‌বিদের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলী প্রমাণিত আছে। তফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে। وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোন কোন তফসীরকারকের মতে ذٰلِكَ বলে যিনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মু'মিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বুঝানো আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তফসীরকারক বলেন যে, ذٰلِكَ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে

মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় এটা হবে দায়্যুসী (ভেড়ুয়াপনা) যা শরীয়তে হারাম। এমনিভাবে কোন সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোন ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ্। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়–এক. কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোন পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়; যেমন কোন মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গুনাহ্ এবং শরীয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দুই. কাজটি হারাম অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য গুনাহ; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোন নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এমন শরীয়তানুযায়ী দুইজন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গুনাহ্ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু পার্থিব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরীয়তারোপিত ফলাফল–যেমন ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে حُرِّمَ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোন কোন তফসীরকারক আয়াতটিকে মনসূখ তথা রহিত বলেন ; কিন্তু বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মনসূখ বলার প্রয়োজন নেই।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

---

(৪) যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবূল করবে না। এরাই নাফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয় ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, (যাদের ব্যভিচারিণী হওয়া কোন প্রমাণ অথবা শরীয়তসম্মত ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত নয়) অতঃপর (দাবির স্বপক্ষে) চরজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও কবূল করবে না (এটাও অপবাদ আরোপের শাস্তির অংশ। তাদের সাক্ষ্য চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ হচ্ছে দুনিয়ার শাস্তি।) এবং এরা (পরকালেও শাস্তির যোগ্য। কেননা তারা) পাপাচারী। কিন্তু যারা এরপর (আল্লাহ্‌র কাছে) তওবা করে (কেননা, অপবাদ আরোপ করে তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছে এবং আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছে) এবং (যার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, তার দ্বারা ক্ষমা করিয়েও) নিজের (অবস্থার) সংশোধন করে; (কেননা, তারা তার হক নষ্ট করেছিল) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (অর্থাৎ খাঁটি তওবা করলে পরকালের আযাব মাফ হয়ে যাবে ; যদিও জাগতিক শাস্তি অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া বহাল থাকবে। কেননা, এটা শরীয়তের হদের অংশ এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তওবা করলে হদ মওকুফ হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান; মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপবাদ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও জওয়াব ঃ এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোন সময় শরীয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই

ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন গায়র মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবার্তা বলা অবস্থায় দেখে এ-ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোন শর্ত আরোপিত নেই। এ-ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরীয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এ ক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না ; বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না। কিন্তু অবাধ মেলামেশার সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শাস্তি দিতে পারবে।

মুহ্সিনাত কারা ? محصنات শব্দটি احصان থেকে উদ্ভূত। শরীয়তের পরিভাষায় احصان দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য احصان এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য احصان এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই।—(জাস্সাস)

মাসআলা ঃ কোরআনের আয়াতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী কিংবা শানে নযূলের ঘটনার কারণে অপবাদের শাস্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে আছে অপবাদ আরোপকারী পুরুষ ও অপরদিকে যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সেই সতী-সাধ্বী নারী। কিন্তু শরীয়তের বিধান কারণের অভিন্নতাবশত ব্যাপক ; কোন নারী অন্য নারীর প্রতি অথবা কোন পুরুষের প্রতি কিংবা কোন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে এবং প্রমাণ উপস্থিত না করলে সবাই এই শাস্তির যোগ্য বলে গণ্য হবে।—(জাস্সাস, হিদায়া)

○ ব্যভিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে উল্লিখিত এই শাস্তি শুধু এই অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোন অপরাধের অপবাদ আরোপ করা হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কোরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, এই হদ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের কথা বলা এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত শুধু ব্যভিচার প্রমাণের জন্যই নির্দিষ্ট।—(জাস্সাস, হিদায়া)

○ অপবাদের হদে বান্দার হক অর্থাৎ যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, তার হকও শামিল রয়েছে। তাই এই হদ তখনই কার্যকর করা হবে, যখন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যার প্রতি আরোপ করা হয়, সে হদ কার্যকর করার দাবিও করে। নতুবা হদ জারি করা হবে না—

(হিদায়া), ব্যভিচারের হদ এরূপ নয়। এটা খাঁটি আল্লাহ্‌র হক। কাজেই কেউ দাবি করুক বা না করুক, হদ কার্যকর হবে।

وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا—অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে ; তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে ; দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোন মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবূল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলিমগনের মতে তার সাক্ষ্য কবূল করা হয় না। হ্যাঁ, তবে গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় ; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে ঃ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যাদের উপর অপবাদের হদ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবূ হানীফা ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে ; অর্থাৎ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ—অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সে ফাসেক ; কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া—এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। কেননা, প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদেরই অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় না ; যদিও পরকালীন আযাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাস্সাস ও মাযহারীতে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও জওয়াব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑥ وَالْخَامِسَةُ

أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

এবং (৬) যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য ঐভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী ; (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লানত। (৮) এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী ; (৯) পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে। (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া (অর্থাৎ নিজেদের দাবি ছাড়া) তাদের আর কোন সাক্ষী নেই ; এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য (যাতে আটকাদেশ অথবা অপবাদের হদ দূর হয়ে যায়) ঐভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার উপর আল্লাহ্‌র লানত হবে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। (এরপর) স্ত্রীর শাস্তি (অর্থাৎ আটক থাকা অথবা ব্যভিচারের হদ) রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার বলে যে, এই পুরুষ অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার উপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে যদি এই পুরুষ সত্যবাদী হয় (এভাবে উভয় স্বামী-স্ত্রী পার্থিব শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবে। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে)। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত (যে কারণে মানুষের স্বভাবগত প্রবণতার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে বিধানাবলী প্রদান করেছেন) এবং আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী ও প্রজ্ঞাময় না হতেন, তবে তোমরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে (যেগুলো পরে বর্ণনা করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান ঃ لعان ও ملاعنت শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী

উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কোরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। লেয়ানের এই বিবরণ ফিকাহ্ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে।

ইসলামী শরীয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টা তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে ; কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা-বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ

দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লেয়ান শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ান আয়াতের শানে-নযূল কোন্ ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে-নযূল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজর এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নবভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে-নযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানী বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই জবানী মুসনাদে আহ্‌মদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ যখন কোরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা কি শুন্‌লে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর এ কথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই ; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি ? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না ? এ স্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপ বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই।—(কুরতুবী)

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াযের এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন,

এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলাল ইবনে ইমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালের ব্যাপার শুনে কোরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে আরয করলেন ঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ) লেয়ানের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন ; অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ الاية

আবূ ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল আরয করলেন ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বলল ঃ আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে ? হিলাল আরয করলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেয়ান করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কোরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহ্কে হাযির ও নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কোরআনী ভাষা এরূপ ঃ যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালকে বললেন ঃ দেখ হিলাল, আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহ্র আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হিলাল আরয করলেন ঃ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ একটু থাম। আল্লাহ্কে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্র আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত

করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্র গযব হবে। এভাবে লেয়ানের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে—পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না।—(মাযহারী)

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোন পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব ? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন।

এক শুক্রবারে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুম'আর নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিগত জুম'আয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা, আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।—(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে ? নতুবা সে কি করবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও, স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহল বলেন ঃ তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম। —(মাযহারী)

উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হাজর ও ইমাম নববী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ান-আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন। তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فنزل جبرئيل এবং ওয়ায়মেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قد انزل الله فيك এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।—(মাযহারী) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

মাসআলা ঃ বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায় ; যেমন দুগ্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المتلاعنان لايجتمعان ابدا। লেয়ানের সাথে-সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায় ; কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ লেয়ানের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না ; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলাল ইরনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়েরই ঘটনায় এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লেয়ানের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে যাবে ; কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারজ সন্তান বলাও কারও জন্য জায়েয হবে না। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। وقضى بان لاترمى ولا ولدها

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱﴾ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ

بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ﴿১২﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿১৩﴾ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿১৪﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ ﴿১৫﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿১৬﴾
يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿১৭﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمُ الْآيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿১৮﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿১৯﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿২০﴾
يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿২১﴾
وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِينَ
وَالْمُهٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ
لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿২২﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

لُعِنُوا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ
الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ اَلْخَبِيثٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ
لِلْخَبِيثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ أُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

(১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গুনাহ্ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (১২) তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি ; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী। (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৯) যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ্ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। (২১) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না।

কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (২৩) যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ, ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত ; (২৫) সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে 'ইফ্কের ঘটনা' নামে খ্যাত। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তফসীর বুঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ

হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন।সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য-এরূপ ধারণাও কারও মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের

মধ্যে হযরত হাসসান, মিস্তাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিল-এ শ্রেণীভুক্ত। তফসীরে দুররে মনসুরে ইবনে মরদুওয়াইহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে, اعانه اى عبد الله بن ابى حسان ومسطح وجمنه

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আয়াতগুলোর তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদে বর্ণিত কোরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে ? ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে মরদুওয়াইহ্ হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনজন মুসলমান মিসতাহ্, হামনাহ্ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসল অপবাদ রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে। —(বয়ানুল কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানগণ, তোমরা যারা হযরত আয়েশা সম্পর্কিত মিথ্যা অপবাদ খ্যাত হওয়ার কারণে দুঃখিত হয়েছ , হযরত আয়েশাও এর অন্তর্ভুক্ত, তোমরা অধিক দুঃখ করো না। কেননা) যারা এই মিথ্যা অপবাদ (হযরত আয়েশা সম্পর্কে) রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র) দল। (কেননা অপবাদ আরোপকারী মোট চারজন ছিল ; একজন সরাসরি এবং মিথ্যা অপবাদ রচয়িতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং তিনজন পরোক্ষভাবে তার প্রচারণায় প্রভাবান্বিত হয়ে যায় অর্থাৎ, হাসসান, মিসতাহ্ ও হামনাহ্। এরা ছিল খাঁটি মুসলমান। কোরআন তাদের সবাইকে منكم বলে মুসলমনদের অন্তর্ভুক্ত করেছে ; অথচ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক। এর কারণ ছিল তার বাহ্যিক মুসলমানিত্বের দাবি। আয়াতের উদ্দেশ্য সান্ত্বনা দান করা যে, অধিক দুঃখ করো না। প্রথমত, সংবাদই মিথ্যা, এরপর বর্ণনাকারীও মাত্র চারজন। অধিকাংশ লোক তো এর বিপক্ষেই। কাজেই সাধারণভাবেও এটা অধিক চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। অতঃপর অন্য এক পন্থায় সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে ঃ) তোমরা একে (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকে) নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না (যদিও বাহ্যত দুঃখজনক কথা ; কিন্তু বাস্তবে এতে তোমাদের ক্ষতি নেই।) বরং এটা (পরিণামের দিক দিয়ে) তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। (কেননা, এই দুঃখের কারণে তোমরা সবরের সওয়াব পেয়েছ। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিদের পবিত্রতা সম্পর্কে অকাট্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যতেও মুসলমানদের জন্য এতে মঙ্গল আছে। কারণ, এরূপ

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঘটনা থেকে সান্ত্বনা লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে চর্চাকারীদের ক্ষতি হয়েছে যে,) তাদের মধ্যে যে যতটুকু করেছে, তার গুনাহ্ (উদাহরণত মুখে উচ্চারণকারীদের অধিক গুনাহ্ হয়েছে। যারা শুনে নিশ্চুপ রয়েছে কিংবা মনে মনে কুধারণা করেছে, তাদের তদনুযায়ী গুনাহ্ হয়েছে।) এবং তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে (অর্থাৎ অপবাদ রটনায়) যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে (অর্থাৎ একে আবিষ্কার করেছে। এখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে।) তার (সর্বাধিক) কঠোর শাস্তি হবে (অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে। কুফর, কপটতা ও রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণের কারণে পূর্ব থেকেই সে এর যোগ্য ছিল। এখন সে আরও অধিক শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত বলা হলো যে, দুঃখিতদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং অপবাদ আরোপকারীদেরই ক্ষতি হয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মুসলমান ছিল তাদেরকে উপদেশমূলক তিরস্কার করা হচ্ছে ঃ) যখন তোমরা এ-কথা শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ (হাসসান ও মিসতাহ্ও এর অন্তর্ভুক্ত)। এবং মুসলমান নারীগণ (হামনাহ্ ও এর অন্তর্ভুক্ত) কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে (অর্থাৎ হযরত আয়েশা ও সাফওয়ান সাহাবী সম্পর্কে মনেপ্রাণে) সুধারণা করেনি এবং (মুখে) বলেনি যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা। (দুররে মনসুরে আবূ আইউব ও তাঁর স্ত্রীর এরূপ উক্তিই বর্ণিত আছে। এতে অপবাদ আরোপকারীদের সাথে তারাও শামিল রয়েছে, যারা শুনে নিশ্চুপ ছিল কিংবা সন্দেহে পড়েছিল। সাধারণ ঈমানদার পুরুষ ও নারী সবাইকে তিরস্কার করা হয়েছে। অতঃপর এই অপবাদ খণ্ডন এবং সুধারণা রাখা যে ওয়াজিব, তার কারণ ব্যক্ত করা হচ্ছে ঃ) তারা (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা) কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি ? (যা ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য শর্ত। অতঃপর যখন তারা (নিয়ম অনুযায়ী) সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন আল্লাহ্র কাছে (যে আইন আছে, তার দিক দিয়ে) তারাই মিথ্যাবাদী। (অতঃপর অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল, তাদের প্রতিও রহমতের কথা বলা হচ্ছে ঃ) যদি (হে হাসসান, মিসতাহ্ ও হামনাহ্) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত ইহকালে (যেমন তওবার সময় দিয়েছেন) এবং পরকালে, (যেমন তওবার তওফীক দিয়ে তা কবূলও করেছেন। এরূপ না হলে) তবে তোমরা যে কাজে লিপ্ত হয়েছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত যেমন তওবা না করার কারণে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে স্পর্শ করবে, যদিও এখন দুনিয়াতে তাকেও অবকাশ দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু উভয় জাহানে তার প্রতি রহমত নেই। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের তওবা কবূল হবে এবং তাঁরা পাক অবস্থায় পরকালে আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত হবেন। عليكم এ ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর ইঙ্গিত প্রথমত উপরের আয়াতে ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ দ্বিতীয়ত فِى الْاٰخِرَةِ বলা। কেননা, মুনাফিক তো পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অতএব তারা নিশ্চিতই পরকালে রহমতপ্রাপ্ত হতে পারবে না এবং তৃতীয়ত সম্মুখে يَعِظُكُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ আয়াতে তাবারানী ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ-এ শুধু অর্থাৎ يريد مسطحا وحمنة وحسانا তিনজন মু'মিনকে সম্বোধন করা হয়েছে—মিসতাহ্, হামনাহ ও হাস্সান। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মু'মিনদের তওবার তওফীক ও তওবা কবূল করে যদি আল্লাহ্ তা'আলা

তাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে তারা যে কাজ করেছিল, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে গুরুতর আযাবের কারণ ছিল। বলা হয়েছে ঃ) যখন তোমরা এই মিথ্যা কথাটিকে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন (প্রমাণভিত্তিক) জ্ঞান তোমাদের ছিল না। (এই খবরের বর্ণনাকারী যে মিথ্যাবাদী, তা فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ বাক্যে বিবৃত হয়েছে।) তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর (অর্থাৎ মহাপাপের কারণ) ছিল। [প্রথমত কোন সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ স্বয়ং মস্ত গুনাহ্। তদুপরি নারীও কে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্রা স্ত্রী, যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা রাসূলে মকবুল (সা)-এর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। সুতরাং এতে গুনাহের অনেক কারণ একত্রিত হয়েছে।) তোমরা যখন এ কথা (প্রথমে) শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের জন্য শোভন নয়। আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই; এ তো গুরুতর অপবাদ। (কোন কোন সাহাবী এ কথা বলেও ছিলেন ; যেমন সা'দ ইব্‌নে মু'আয, যায়দ ইবনে হারিসা ও আবূ আইউব (রা)। আরও অনেকে হয়তো বলে থাকবেন। উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদ আরোপকারী এবং নিশ্চুপ ব্যক্তি সবারই এ কথা বলা উচিত ছিল। এ পর্যন্ত অতীত কাজের জন্য তিরস্কার ছিল। এখন, ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তিরস্কারের আসল উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বিধান বর্ণনা করেন (উপরোল্লিখিত উপদেশ, অপবাদের হদ, তওবা কবূল ইত্যাদি সব এর অন্তর্ভুক্ত।) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [তোমাদের অন্তরের অনুশোচনার অবস্থাও তিনি জানেন। ফলে তওবা কবূল করেছেন এবং শাসনের রহস্য সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তাই শাসনের কারণে তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছেন। (ইব্‌নে আব্বাস—দূররে মনসুর) এ পর্যন্ত পবিত্রতার আয়াত নাযিলের পূর্বে যারা অপবাদের চর্চা করত, তাদের কথা আলোচনা করা হলো। অতঃপর তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও কুৎসা রটনায় বিরত হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বেঈমানই হবে। বলা হচ্ছে ঃ] যারা (এসব আয়াত অবতরণের পরেও) পছন্দ করে (অর্থাৎ কার্যত চেষ্টা করে) যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীল কথা প্রচার লাভ করুক (অর্থাৎ মুসলমানগণ নির্লজ্জ কাজ করে—এ সংবাদ প্রসার লাভ করুক। সারকথা এই যে, যারা এই পবিত্র লোকজনের প্রতি ব্যভিচার আরোপ করে) তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (এ কারণে শাস্তির জন্য বিস্মিত হয়ো না ; কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা জানেন (যে, কোন্ গুনাহ্ কোন্ স্তরের) এবং তোমরা [এর স্বরূপ পুরোপুরি) জান না। (ইবনে আব্বাস—দুররে মনসুর) এরপর যারা তওবা করে পরকালের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে ঃ] এবং (হে তওবাকারিগণ) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, (যে কারণে তোমরা তওবার তওফীক লাভ করেছ) এবং আল্লাহ্ দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন, (যে কারণে তিনি তোমাদের তওবা কবূল করেছেন) তবে তোমরাও (এই হুমকি থেকে) বাঁচতে পারতে না। (অতঃপর মুসলমানগণকে উল্লিখিত গুনাহ্‌সহ সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার আদেশ এবং

তওবা দ্বারা আত্মশুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, যা গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইরশাদ করা হচ্ছে যে) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (অর্থাৎ তার প্ররোচনায় কাজ করো না) যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ; শয়তান তো (সর্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিকে) নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে (যেমন এই অপবাদের ঘটনায় তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার এবং গুনাহ্ অর্জন করার পর তার অবধারিত অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়াও আমারই অনুগ্রহ ছিল। নতুবা) যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও (তওবা করে) পবিত্র হতে পারত না। (হয় তওবার তওফীকই হতো না ; যেমন মুনাফিকদের হয়নি ; না হয় তওবা কবূল করা হতো না। কেননা আমার উপর কোন বিষয় ওয়াজিব নয়।) কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান, (তওবার তওফীক দিয়ে) পবিত্র করেন। (তওবার পর নিজ কৃপায় তওবা কবূল করার ওয়াদাও করেছেন।) আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন, জানেন। (সুতরাং তোমাদের তওবা শুনেছেন এবং তোমাদের অনুশোচনা জেনেছেন। তাই অনুগ্রহ করেছেন। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকরসহ অন্য কয়েকজন সাহাবী ক্রোধের আতিশয্যে কসম খেয়ে ফেললেন যে, যারা এই অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেছে, এখন থেকে আমরা তাদেরকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করব না। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে কয়েকজন অভাবগ্রস্তও ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে সাহায্য পুনর্বহাল করার জন্য বলেন ঃ) তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্যশালী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। (অর্থাৎ তারা যেন এই কসমের উপর কায়েম না থাকে এবং কসম ভেঙ্গে দেয়। নতুবা কসম তো হয়েই গিয়েছিল। অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলীর কারণে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত ; বিশেষত যার মধ্যে সাহায্যের কোন হেতু বিদ্যমান আছে, যেমন হযরত মিসতাহ্ হযরত আবূ বকরের আত্মীয় ছিলেন এবং মিসকীন ও মুহাজিরও ছিলেন। অতঃপর উৎসাহদানের জন্য বলা হয়েছে ঃ) তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন ? (অতএব তোমরাও দোষী ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দাও।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম করুণাময়। (অতএব তোমাদেরও আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত। অতঃপর মুনাফিকদের প্রতি উচ্চারিত শাস্তিবাণী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা উপরে إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ الاية আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ) যারা (আয়াত নাযিল হওয়ার পর) সতী-সাধ্বী, নিরীহ ও ঈমানদার নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, [যাদের পবিত্রতা কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিদের সবাইকে শামিল হওয়ার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এমন পবিত্রা নারীদেরকে অভিযুক্ত করে ; বলা বাহুল্য, তারা কাফির ও মুনাফিকই হতে পারে।] তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত (অর্থাৎ তারা কুফরের কারণে উভয় জাহানে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত থেকে দূরে থাকবে) এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের হস্তপদও (সাক্ষ্য দেবে)

যা কিছু তারা করত। (উদাহরণত জিহ্বা বলবে, সে আমার দ্বারা অমুক অমুক কুফরের কথা বলেছে এবং হস্তপদ বলবে, সে কুফরের বিষয়াদি প্রচলিত করার জন্য এমন-এমন চেষ্টা সাধনা করেছে।) সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং (সেদিন ঠিক ঠিক) তারা জানবে যে, আল্লাহ্ সত্য ফয়সালাকারী এবং স্পষ্ট ব্যক্তকারী (অর্থাৎ এখন তো কুফরের কারণে এ বিষয়ে তাদের যথার্থ বিশ্বাস নেই ; কিন্তু কিয়ামতের দিন বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের উপযুক্ত ফয়সালা হবে চিরন্তন আযাব। এই আয়াতগুলো তওবা করেনি এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও অপবাদের বিশ্বাস থেকে বিরত হয়নি। তওবাকারীদেরকে فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهٗ আয়াতে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে لُعِنُوْا বলে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে لَمَسَّكُمْ فِىْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ বাক্যে আযাব থেকে নিরাপদ বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি এমন লোকদেরকে لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ বলে এবং এর আগে وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ বলে আযাবে লিপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদের জন্য اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বাক্যে ক্ষমা ও গুনাহ্ উপেক্ষা করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদের জন্য تَشْهَدُ ও يُوَفِّيْهِمُ বাক্যে ক্ষমা না করা ও লাঞ্ছিত করার হুমকি উচ্চারণ করা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে مَا زَكٰى مِنْكُمْ বাক্যে পবিত্র বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে পরবর্তী আয়াতে خَبِيْث তথা দুশ্চরিত্র বলা হয়েছে। একেই পবিত্রতার বিষয়বস্তুর প্রমাণ হিসেবে পেশ করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সামগ্রিক নীতি যে দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। (এ হচ্ছে প্রমাণের এক বাক্য। এর সাথে আরও একটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য সংযোজিত হবে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রত্যেক বস্তু তাঁর জন্য যোগ্য ও উপযুক্তই দেওয়া হয়েছে এবং তা পবিত্র বৈ নয়। অতএব এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিবিগণও সচ্চরিত্রা। তাঁরা সচ্চরিত্রা হলে এই বিশেষ অপবাদ থেকে হযরত সাফওয়ানের নিষ্কলুষতাও জরুরী হয়ে পড়ে। তাই পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ) তাঁদের সম্পর্কে (মুনাফিক) লোকেরা যা বলে বেড়ায়, তা থেকে তাঁরা পবিত্র। তাঁদের জন্য (পরকালে) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (অর্থাৎ জান্নাত) আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আয়েশা সিদ্দীকার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী এবং অপবাদ-কাহিনীর অবশিষ্টাংশঃ শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে যে উপায় তাদের মস্তিষ্কে উদিত হতে পারত, তা সবগুলোই তারা সন্নিবেশিত করেছে। কাফিরদের তরফ থেকে তিনি যেসব কষ্ট পেয়েছেন, তন্মধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট। মুনাফিক

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদুষী, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত ও পবিত্রতমা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও তাঁর সাথে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা এতে রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় ছিল এই যে, কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রান্তে প্রভাবান্বিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে লাগল। এই ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-আপনিই খুলে যেত ; কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মুল মু'মিনীনের মানসিক ক্লেশ মোচনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর কোন প্রকার ইঙ্গিতকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং কোরআনের প্রায় দুইটি রুকূ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাযিল করেন। যারা এই অপবাদ রচনা করে অথবা এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তাদের সবার প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় ইতিপূর্বে অন্য কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই অপবাদ-ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার সাথে সাথে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। বলা বাহুল্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দশটি আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে। স্বয়ং আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার সাফাই ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন ; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কোরআনে চিরকাল পঠিত হবে, এমন আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাযিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরও কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তফসীর হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক হবে। তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে ঃ

সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন। মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত আয়েশা বলেন ঃ সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি এ যাবৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে যে ভালবাসা ও কৃপা পেয়ে এসেছিলাম, তা অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম করতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করে ফেরত চলে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর রটনা করা হচ্ছে, আমি যেহেতু তা জানতাম না, তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ব্যবহারের হেতু আমার কাছে উদ্ঘাটিত হতো না। আমি এই আগুনেই দগ্ধ হতে লাগলাম। একদিন দুর্বলতার কারণে মিসতাহ্ সাহাবীর জননী উম্মে মিস্তাহ্কে সাথে নিয়ে আমি বাহ্যের প্রয়োজন মিটানোর

উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা, তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরি করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উম্মে মিস্‌তাহ্‌র পা তার বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল تعس مسطح (মিস্‌তাহ্‌ নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বাদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। জননীর মুখে পুত্রের জন্য বদদোয়ার বাক্য শুনে হযরত আয়েশা বিস্মিতা হলেন। তিনি বললেন ঃ এ তো খুবই খারাপ কথা। তুমি একজন সৎ লোককে মন্দ বলছ। সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তখন উম্মে মিস্‌তাহ্‌ আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বলল ঃ মা, তুমি কি জান না আমার পুত্র মিস্‌তাহ্‌ কি বলে বেড়ায় ? আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ সে কি বলে? তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ অভিযানের আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং মিস্‌তাহ্‌র তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা করল। হযরত আয়েশা বলেন ঃ একথা শুনে আমার অসুস্থতা দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। পিতামাতার কাছে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি সেখানে পৌঁছে মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ মা, তোমার মত মেয়েদের শত্রু থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না। আপনা-আপনিই ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ্‌! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে সবর করব ? আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চক্ষু লাগেনি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে দারুণ মর্মাহত ছিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে কোন ওহীও তাঁর কাছে আগমন করেনি। তাই পরিবারেরই লোক হযরত আলী (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত ? হযরত উসামা পরিষ্কার আরয করলেন ঃ যতদূর আমি জানি, হযরত আয়েশা সম্পর্কে কোনরূপ কুধারণাই করা যায় না। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু নেই, যদ্দ্বারা কুধারণার পথ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী (রা) তাঁকে চিন্তা ও অস্থিরতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা করেননি। গুজবের কারণে হযরত আয়েশার প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরও অনেক মহিলা আছে। হযরত আয়েশার বাঁদী বরীরার কাছ থেকে খোঁজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দূর হতে পারে। সেমতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বরীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরীরা আরয করল ঃ অন্য কোন দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি ; তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে। মাঝে মাঝে আটা গুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। (এরপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ভাষণ দান, মিম্বরে দাঁড়িয়ে অপবাদ ও গুজব রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত

কাহিনী এই যে) হযরত আয়েশা বলেন ঃ আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হলো। আমার পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন। তারা আশংকা করছিলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার পিতামাতা আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে এসে আমার কাছে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই ঘটনা চালু হয়েছিল, তারপর থেকে পূর্বে তিনি কখনও আমার কাছে এসে বসেননি। এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদতের খুতবা পাঠ করে বললেন ঃ হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি দোষমুক্ত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন)। পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। বান্দা তার গুনাহ্ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই আমার অশ্রু একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দু অশ্রুও আর রইল না। আমি পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললাম ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার উত্তর দিন। পিতা বললেন ঃ আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি। অতঃপর আমি মাকে বললাম ঃ আপনি উত্তর দিন। তিনিও ওযর পেশ করে বললেন ঃ আমি কি জওয়াব দেব! তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হলো। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা বালিকা। এখন পর্যন্ত কোরআনও বেশি পড়িনি। পাঠকবর্গ চিন্তা করুন, এহেন দুশ্চিন্তা ও চরম বিষাদময় আবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিজ্ঞসুলভ উক্তি। নিম্নে তার বক্তব্য হুবহু তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করা হলো ঃ

والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقرفى انفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم انى بريئة والله يعلم انى بريئة لا تصدقونى ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم انى منه بريئة لتصدقونى والله لا اجدلى ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون -

"আল্লাহ্র কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত ; যেমন আল্লাহ্ তা'আলাও জানেন যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। আল্লাহর কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা ব্যতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা ইয়াকুব (আ)

পুত্রদের ভ্রান্ত কথাবার্তা শুনে বলেছিলেন ঃ আমি সবরে জমীল অবলম্বন করছি এবং তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছ, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষমুক্ত আছি আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোষমুক্ততার বিষয় অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু এরূপ কল্পনাও ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কোরআনের এমন আয়াত নাযিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম অনুভব করতাম। এরূপ ধারণা ছিল যে, সম্ভবত স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ততার বিষয় প্রকাশ করা হবে। হযরত আয়েশা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও কেউ তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্থিত হলো, যা ওহী অবতরণের সময় উপস্থিত হতো। ফলে, কন্‌কনে শীতের মধ্যেও তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এই ভাবান্তর দূর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিমুখে গাত্রোত্থান করলেন এবং সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিল এই ঃ

ابشرى يا عائشة اما الله فقد ابراك —অর্থাৎ হে আয়েশা, সুসংবাদ শোন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন ঃ দাঁড়াও আয়েশা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যাও। আমি বললাম ঃ না মা, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ঋণ স্বীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ ইমাম বগভী উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে বলেছেন ঃ হযরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন। প্রথম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন ঃ এ আপনার স্ত্রী। (তিরমিযী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি। তৃতীয়, তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন। পঞ্চম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কখনও ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তম, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশার ফকীহ্ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা) বলেন ঃ আমি আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। —(তিরমিযী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পুত্র ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের দশটি আয়াত নাযিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর, তফসীরের সার-সংক্ষেপে আলোচিত হয়ে গেছে। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ বাক্য সম্পর্কে যেসব আলোচনা আছে, সেগুলো দেখা যেতে পারে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ — افك শব্দের আভিধানিক অর্থ পাল্টিয়ে দেয়া, বদলিয়ে দেয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলিয়ে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্‌ভীরুকে ফাসিক ও ফাসিককে আল্লাহ্‌ভীরু পরহিযগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকেও افك বলা হয়। عصبة শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশির জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। مِّنكُمْ বলে মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মু'মিন নয়—মুনাফিক ছিল ; কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানী দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মু'মিনদের বাহ্যিক বিধানাবলী প্রযোজ্য হতো। তাই مِّنكُمْ শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মু'মিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবূল করেন। হযরত হাসসান ও মিসতাহ্ তাদেরই অন্যতম ছিলেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে মাগফিরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশার সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না ; যদিও তিনি অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলতেন ঃ হাসসান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে কাব্যমধ্যে কাফিরদের চমৎকার মুকাবিলা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোন সময় হযরত আয়েশার কাছে আগমন করলে তিনি সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিতেন। —(মাযহারী)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم — এতে নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা, সাফওয়ান ও সকল মু'মিন মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে তাদের দোষমুক্ততা নাযিল করে তাদের সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাযিল করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছে, সেই পরিমাণে তার গুনাহ্ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই

খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে।

وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ — كبر শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আযাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। (বগভী)

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ — অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা ? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম بِاَنْفُسِهِمْ শব্দ দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে ; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, لَاتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোন মুসলমান ভাইকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে। আরও এক জায়গায় আছে وَلَا تُخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ কোন মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরও বলা হয়েছে, وَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কোরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা, সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নামই এর পরিণতি। সাদী বলেন ঃ

چوا زقومے یکے بے دانشی کرد
نـہ کـہ رامنزلت مانـد نـہ مـہ را

কোরআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছে, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে। এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ بِاَنْفُسِكُمْ خَيْرًا সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল ; যেমন শুরুতে سَمِعْتُمُوْهُ সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করত সম্বোধনপদের পরিবর্তে ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মু'মিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে—এটাই ছিল ঈমানের দাবি।

এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য "هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ" এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন গুনাহ্ অথবা দোষ শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গুনাহ্ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাৎ ঈমানের পরিচয়।

মাসআলা ঃ এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা নিছক গীবত (পরনিন্দা) এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। —(মাযহারী)

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ—এই আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলামানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ্‌র কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনরূপেই বুঝে আসে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে ? এই প্রশ্নের দুই জওয়াব আছে। প্রথম, এখানে 'আল্লাহ্‌র কাছে' বলার অর্থ আল্লাহ্‌র বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, আল্লাহ্‌র বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, অনর্থক কোন কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য ; বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষ্য গুনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে। কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে ; সে যেন দাবি করে যে, আমি মানব জাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরীয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না ; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শাস্তি ভোগ করতে হবে। তখন সে আল্লাহ্র কাছে উপরোক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরীয়তের ধারা মোতাবিক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। —(মাযহারী)

একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারী ঃ উপরোক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেন ? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেন রইলেন ? এমনকি, তিনি হযরত আয়েশাকে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমা দ্বারা কোন ভুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি খবরটির সত্যায়নও করেননি এবং তদনুযায়ী কোন কর্মও করেন নি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেননি। সাহাবায়ে-কিরামের সমাবেশে তিনি এ কথাই বলেছেন যে, ما علمت على اهلى الا خيرا অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না।—(তাহাভী) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কর্মপন্থা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও দূর হয়ে যায়, এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোটকথা এই যে, অন্তরে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) করেছেন, মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থী ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোন কর্মও করেননি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল।

"وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَاۤ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ" যেসব মুসলমান ভুলক্রমে এই অপবাদে কোন না কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণ দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত ; যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হতো। কিন্তু মু'মিনদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত

গুনাহ্র জন্যে সত্যিকার তওবার তওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবূল করেছেন। পরকালে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ — تلقى শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তা সত্যাসত্য, যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া বুঝানো হয়েছে।

وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ —অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শুনলে তাই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা যখন এই গুজব শুনেছিলে, তখন এ কথা কেন বলে দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ্ পবিত্র। এ তো গুরুতর অপবাদ। এই আয়াতে পুনর্বার সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, যা পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোন ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোন কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বুঝা যায় না। কাজেই এরূপ কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরূপে বলা যেতে পারে ? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে গুনাহ্ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরীয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলীলে যে কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মু'মিন-মুসলমানের প্রতি শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা আপবাদ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ যারা এই অপবাদে কোন-না কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা এরূপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার প্রসারই কামনা করে।

নির্লজ্জতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরী উপায়, যার উপেক্ষার ফলে আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছে ঃ কোরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিশেষ কর্মসূচী তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে না। রটিত হলেও শরীয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে সাধারণ সমাবেশে ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের উপায় করে দেয়া

যায়। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নির্লজ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণ ভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতার ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই দুষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরীয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কোরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না ; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইইলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোন ব্যক্তি শর্তাবলীর অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

সাহাবায়ে-কিরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ঃ وَلَايَأْتَلِ — اِئْتِلَاء শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবূল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ্ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোন

বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারও আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে গুনাহ্‌র কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের দলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবগত দুঃখের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিল, তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ্‌কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবূ বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন ঃ যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিত নয়। আয়াতে أُوْلُوا الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ –এ অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হইয়েছে ঃ اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহ্ মাফ করবেন ? আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ঃ وَاللّٰهُ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِى অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন। আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতাহ্‌র আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন ঃ এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না। —(বুখারী, মুসলিম)

এহেন উচ্চাঙ্গের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কিরাম লালিত হন। বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ليس الواصل بالمكا فى ولكن لواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها অর্থাৎ যারা আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয় ; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এই আয়াতে বাহ্যত ঃ ইতিপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ– কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই ; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহকালের ও পরকালের অভিশাপ

এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বুঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশার চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করেনি। এমনকি কোরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাযিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজ কোন মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোন মুসলমানও কোরআনের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফির মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهٗ বলে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করেনি, তাদেরকে এই আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছেন। তওবাকারীদেরকে আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আযাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তওবাকারীদেরকে اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করে নি তাদেরকে পরবর্তী يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ আয়াতে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। —(বয়ানুল-কোরআন)

একটি জরুরী হুঁশিয়ারী ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কোরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হয়নি। আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির, কোরআনে অবিশ্বাসী। যেমন শিয়াদের কোন কোন দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহ্গার তার গুনাহ্ স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ্ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে। বরং তাদের জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় ও

জিহ্বাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ ۚ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা পত্নী ও তাঁদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত ভার্যাকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সেই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ)-এর বিবিগণ কাফির ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফির হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : ما بغت امرأة نبى قط অর্থাৎ কোন পয়গম্বরের বিবি কোনদিন ব্যভিচার করেনি। —(দুররে মনসুর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরের বিবি কাফির হবে—এটা তো সম্ভবপর ; কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে—এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর স্বাভাবিকভাবে ঘৃণার কারণে হয় না। —(বয়ানুল কোরআন)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا

عَلَىٰٓ اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا

تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ

لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

(২৭) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে, এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই। এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা ঃ সূরা নূরের শুরু থেকেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা দমন করার জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারও প্রতি অপবাদ আরোপের নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অশ্লীলতা দমন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা সুগম হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী এসবের অন্যতম। অর্থাৎ কারও গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উঁকি দিয়ে দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাহ্রাম নয় এমন নারীদের উপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।

গৃহ চার প্রকার ঃ ১. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারও আসার সম্ভাবনা নেই ; ২. যে গৃহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহ্রাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সম্ভাবনা আছে ; ৩. যে গৃহে কারও কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা আছে ; ৪. যে গৃহ কোন বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয় ; যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি সাধারণের আসা-যাওয়ার স্থান। প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্ঞাত যে, এতে প্রবেশের জন্য কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিষ্কারভাবে এই বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে

বর্ণিত হচ্ছে ঃ) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের (বিশেষ বসবাসের) গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে (যাতে অন্য লোক বসবাস করে, সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক কিংবা বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক) প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি লাভ না কর এবং (অনুমতি লাভ করার পূর্বে) গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। (অর্থাৎ প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করে জিজ্ঞেস কর যে, ভেতরে প্রবেশের অনুমতি আছে কি ? বিনানুমতিতে এমনিতেই ঢুকে পড়ো না। যদিও কতক লোক অনুমতি নেয়াকে মর্যাদাহানিকর মনে করে ; কিন্তু বাস্তবে) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। (বিষয়টি তোমাদের এ জন্য বলা হলো,) যাতে তোমরা স্মরণ রাখ (এবং তদনুযায়ী আমল কর। এতে অনেক রহস্য আছে। এ হলো দ্বিতীয় প্রকার গৃহের বিধান)। যদি গৃহে কোন মানুষ নেই বলে মনে হয় (বাস্তবে থাকুক বা না থাকুক), তবে সেখানে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়। (কেননা, প্রথমত সেখানে কেউ থাকার সম্ভাবনা আছে ; যদিও তুমি জান না। বাস্তবে কেউ না থাকলেও অপরের খালি গৃহে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়া তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল, যা জায়েয নয়। এ হলো তৃতীয় প্রকার গৃহের বিধান।) যদি (অনুমতি চাওয়ার সময়) তোমাদেরকে বলা হয় (এখন) ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে আস। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (সেখানে এই মনে করে অটল হয়ে থাকা যে, একবার তো বাইরে আসবে ; তা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এতে নিজের অবমাননা এবং অপরকে অহেতুক চাপ প্রয়োগ করে কষ্ট দেওয়া হয়। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজ কর্মের খবর রাখেন। (বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি পাবে। এ বিধান তখনও যখন গৃহের লোকেরা ফিরে যেতে বলে না ; কিন্তু হ্যাঁ, না-ও কিছুই বলে না। এমতাবস্থায় হয়তো শোনেনি এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে তিনবার অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এরপরও কোন জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে আসা উচিত ; যেমন হাদীসে স্পষ্টত একথা বলা হয়েছে) এমন গৃহে (বিশেষ অনুমতি ব্যতীত) প্রবেশ করাও গুনাহ্ হবে না যাতে (বাসগৃহ হিসেবে) কেউ বাস করে না, এবং যাতে তোমাদের উপকার আছে। (অর্থাৎ এসব গৃহ ভোগ করার ও ব্যবহার করার অধিকার তোমাদের আছে। এ হলো চতুর্থ প্রকার গৃহের বিধান, যা জনহিতকর কাজের জন্য নির্মিত হয়। ফলে সেখানে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার থাকে)। তোমরা যা প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর, আল্লাহ্ তা'আলা তার সব জানেন। (কাজেই সর্বাবস্থায় তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি অপরিহার্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ঃ কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারও গৃহে প্রবেশ করো না ঃ পরিতাপের বিষয়, ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গুনাহ্ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে ;

কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কোরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কোরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিল্লাহ্ ... ...।

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কোরআন পাক অমূল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে ঃ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেওয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও কষ্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোন ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকস্মাৎ বিপদ মনে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কোরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তির বিধি-বিধানে সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারও গোপন কথা জবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও গুনাহ্ এবং অপরের জন্য কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাস'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাস'আলা পরে বর্ণিত হবে।

মাসআলা ঃ আয়াতে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুষের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যেমন কোরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপয় বিশেষ

মাস'আলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীদের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারও গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রা) বলেন ঃ আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম। —(ইবনে কাসীর)

মাসআলা ঃ এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ মাহ্‌রাম ও গায়র-মাহ্‌রাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন মাহরাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন ঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। তিনি বললেন ঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর ? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশ্যযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে—পিতামাতা, ভাইবোন প্রমুখ থাকে না।

মাসআলা ঃ যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে, তাতে প্রবেশ করার জন্য যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়। বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হুঁশিয়ার করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ্ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন।—(ইবনে কাসীর) এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী ? তিনি বললেন ঃ না। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত করে বলেন ঃ এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোস্তাহাবও উত্তম এ ক্ষেত্রেও।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নাত তরীকা ঃ আয়াতে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا বলা হয়েছে ; অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারও গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম استيناس শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে استيناس শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি

লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়—সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে,গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্রপশ্চাৎ নেই। তিনি আবূ আইউব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদি বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, কাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নাত তরীকা ত্যাগ করেছে। —(রূহুল মা'আনী) আবূ দাঊদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল ঃ الج। আমি কি ঢুকে পড়ব ? তিনি খাদেমকে বললেন ঃ লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক ঃ السلام عليكم ادخل। অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি ? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনে السلام عليكم ادخل। বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। —(ইবনে কাসীর) বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ لا تاذنوا لمن لا يبدأ بالسلام অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না।-(মাযহারী) এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'টি সংশোধন করেছেন—প্রথমে সালাম করা উচিত এবং ادخل। এর স্থলে الج। শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, الج। শব্দটি ولوج থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। মার্জিত ভাষার পরিপন্থী। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

মাসআলা ঃ উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত উমর ফারুক (রা) তাই করতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দ্বারে এসে বললেন, السلام على رسول الله السلام عليكم ايدخل عمر। অর্থাৎ সালামের পর বললেন, উমর প্রবেশ করতে পারে কি ? —(ইবনে কাসীর) সহীহ্ মুসলিমে আছে, হযরত আবূ মূসা হযরত উমরের কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, السلام عليكم هذا ابو موسى السلام عليكم هذا الاشعرى এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবূ মূসা বলেছেন,

এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে জওয়াব দেয়া যায় না।

মাসআলা ঃ এ ব্যাপারে কোন কোন লোকের পন্থা মন্দ। তারা বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চায় ; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না। ভেতর থেকে গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করে, কে ? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলা বাহুল্য, এটা জিজ্ঞাসার জওয়াব নয়। যে প্রথম শব্দে চেনেনি, সে 'আমি' শব্দ দ্বারা কিরূপে চিনবে ?

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায় হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরা ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে ? উত্তর হলো, আনা অর্থাৎ আমি। হযরত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে তো কারও নাম 'আনা' নেই। এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন যে, একদিন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য দরজায় কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে, উত্তরে জাবের 'আনা' বলে দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে শাসিয়ে বললেন ঃ 'আনা' 'আনা' অর্থাৎ 'আনা' 'আনা' বললে কাউকে চেনা যায় নাকি ?

মাসআলা ঃ এর চাইতেও আরও মন্দ পন্থা আজকাল অনেক লেখাপড়া জানা লোকেরাও অবলম্বন করে থাকে। দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে ? তখন তারা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে—কোন জওয়াবই দেয় না। এটা প্রতিপক্ষকে উদ্বিগ্ন করার নিকৃষ্টতম পন্থা। এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, দরজার কড়া নেড়ে নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা করে—অনুমতি চাওয়ার এ পন্থাও জায়েয।

মাসআলা ঃ কিন্তু এত জোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রোতা চমকে ওঠে, বরং মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌছে যায় এবং কোনরূপ কর্কশতা প্রকাশ না পায়। যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরজায় কড়া নাড়তেন তারা নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কষ্ট না হয়।—(কুরতুবী) অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা। যারা এই উদ্দেশ্য বুঝে তারা আপনা-আপনি সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে জরুরী মনে করবে। প্রতিপক্ষ কষ্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে তারা বেঁচে থাকবে।

জরুরী হুঁশিয়ারী ঃ আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার গুনাহ্। যারা সুন্নাত তরীকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌছা মুশকিল হয়। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রতি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পন্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে

যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট শর্ত এই যে, ঘন্টা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌঁছে। এছাড়া অন্য কোন পন্থা কোন স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েয। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে ; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পন্থা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কারও কাছে অনুমতি চায় এবং উত্তরে বলা হয়, এখন সাক্ষাৎ হতে পারবে না—ফিরে যান, তবে একে খারাপ মনে না করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে বাইরে না আসতে বাধ্য হয় এবং আপনাকেও ভেতরে ডেকে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় তার ওযর মেনে নেওয়া উচিত। উল্লিখিত আয়াতেরও নির্দেশ তাই। বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ অর্থাৎ যখন আপনাকে আপাতত ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পরবর্তীকালের জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি সারা জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারও কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কোরআনের এই আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করি ; কিন্তু হায়, এই নিয়ামত কখনও আমার ভাগ্যে জুটল না।

মাসআলা ঃ ইসলামী শরীয়ত সুন্দর সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে এবং সবাইকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য দ্বিমুখী সুষম ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই আয়াতে যেমন আগন্তুককে অনুমতি না দিলে এবং ফিরে যেতে বললে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে এক হাদীসে এর অপর পিঠ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ان لزورك عليك حقا অর্থাৎ সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিরও আপনার উপর হক আছে। তাকে কাছে ডাকুন, বাইরে তার সাথে মোলাকাত করুন, তার সম্মান করুন, কথা শুনুন এবং গুরুতর অসুবিধা ও ওযর ছাড়া সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক।

মাসআলা ঃ কারও দরজায় অনুমতি চাইলে যদি ভেতর থেকে জওয়াব না আসে,তবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নাত। যদি তৃতীয়বারও জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসারই নির্দেশ আছে। কারণ তৃতীয়বার বলতে এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আওয়াজ শুনেছে ; কিন্তু নামাযরত থাকা অথবা গোসলরত থাকা অথবা পায়খানায় থাকার কারণে সে জওয়াব দিতে পারছে না। কিংবা এক্ষণে তার সাক্ষাতের ইচ্ছা নেই। উভয় অবস্থায় সেখানে অটল হয়ে থাকা এবং অবিরাম কড়া নাড়াও কষ্টের কারণ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষ্যই কষ্ট দান থেকে বেঁচে থাকা।

হযরত আবূ মূসা আশআরী বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع অর্থাৎ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও

যদি জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত। —(ইবনে কাসীর) মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম করলেন। হযরত সা'দ সালামের জওয়াব দিলেন ; কিন্তু খুবই আস্তে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) না শোনেন। তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হযরত সা'দ প্রত্যেকবার শুনতেন এবং আস্তে জওয়াব দিতেন। তিনবার এরূপ করার পর তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ যখন দেখলেন যে, আওয়াজ আসছে না, তখন গৃহ থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং ওযর পেশ করে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ শুনেছি এবং জওয়াবও দিয়েছি, কিন্তু আস্তে দিয়েছি। যাতে আপনার পবিত্র মুখ থেকে আমার সম্পর্কে আরও বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময়। অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত বলে দিলেন যে, তিনবার জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত। এরপর হযরত সা'দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গৃহে নিয়ে যান এবং কিছু খাবার পেশ করেন। তিনি তা কবূল করেন।

হযরত সা'দের এই কার্য ছিল অধিক ইশ্ক ও মহব্বতের প্রতিক্রিয়া। তখন তিনি এদিকে চিন্তাও করেননি যে, দু'জাহানের সরদার হুযূর পাক (সা) দরজায় উপস্থিত আছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁর পদচুম্বন করা উচিত। বরং তাঁর চিন্তাধারা এদিকে নিবদ্ধ ছিল যে, রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশ্যে যত বেশি 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাণকর হবে। মোটকথা, এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জওয়াব না আসলে ফিরে যাওয়া সুন্নাত। সেখানেই অটল হয়ে বসে যাওয়া সুন্নাত বিরোধী এবং প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক।

মাসআলা ঃ এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম. কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি লাভ করার জন্য তিন বার চেষ্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া কষ্টদায়ক। কিন্তু যদি কোন আলিম অথবা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া ব্যতীত ও খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তবে তা উপরোক্ত বিধানের মধ্যে দাখিল নয় ; এবং এটাই আদব ও শিষ্টাচার। স্বয়ং কোরআন নির্দেশ দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গৃহাভ্যন্তরে থাকেন, তখন তাকে আওয়াজ দিয়ে আহবান করা আদবের খেলাপ ; বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মুতাবিক বাইরে আগমন করেন, তখন সাক্ষাৎ করা উচিত। আয়াত এই ঃ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মাঝে মাঝে আমি কোন আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করি, যাতে তিনি বাইরে আগমন করলে তাঁর কাছে কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তাঁর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি একে আদবের খেলাফ মনে করি। তাই অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করে নেই।—(বুখারী)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ — متاع শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া। যা দ্বারা উপকৃত

হওয়া যায়, তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্থাৎ ভোগ করার অধিকার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবি লোকেরা কি করবে ? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়া কি উপায় ? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে ? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় -(মাযহারী)। শানে নুযূলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয় ; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ্, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

মাসআলা ঃ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা মুতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। উদাহরণত রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে টিকিট ব্যতীত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্লাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরী ; এর বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ। বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিদ্ধ, সেখানে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া শরীয়তে নাজায়েয।

মাসআলা ঃ এমনিভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যেসব কক্ষ ব্যবস্থাপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ; যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কক্ষ, অফিস গৃহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া নিষিদ্ধ ও গুনাহ্।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরও কতিপয় মাসআলা

পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়।

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোন দরকারী কাজ অথবা নামাযে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েয নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত।

টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরম্ভ করব। কারণ, প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারী কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোন নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায় ? এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ان لزورك عليك حقا। অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার জওয়াব দিন।

কারও গৃহে পৌঁছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে আপনি অবগত না হউন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।—(বুখারী, মুসলিম) রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীতে না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম থাকত ; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশংকা থাকত। —(মাযহারী)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায়। যদি দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত। —(মাযহারী)

যাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে যদি দূতের সাথেই এসে যায়, তবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই ; দূতের আগমনই অনুমতি। তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ اذا دعى احدكم فجاء مع الرسول فان ذالك له اذن। অর্থাৎ যাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভেতরে আসার অনুমতি। —(আবূ দাঊদ, মাযহারী)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

(৩০) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(নারীদের পর্দা সম্পর্কিত ষষ্ঠ নির্দেশ) আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন ঃ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয, সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে (অর্থাৎ অবৈধ পাত্রে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করে। ব্যভিচার ও পুংমৈথুন সব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। (এর খেলাফ করলে, হয় ব্যভিচার, না হয় ব্যভিচারের ভূমিকায় লিপ্ত হবে) নিশ্চয় আল্লাহ্ অবহিত আছেন যা কিছু তারা করে। (সুতরাং বিরুদ্ধাচরণকারীরা শাস্তিযোগ্য হবে) আর

(এমনিভাবে) মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন ঃ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে। (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। (ব্যভিচার, পারস্পরিক কোলাকুলি সব এর অন্তর্ভুক্ত) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রদর্শন না করে। ('সৌন্দর্য' বলে গহনা ; যেমন কংকন, চুরি, পায়ের অলংকার, বাজুবন্দ, বেড়ী, ঝুমুর,পট্টি, বালি ইত্যাদি এবং 'সৌন্দর্যের স্থান' বলে হাত, পায়ের গোছা, বাহু, গ্রীবা, মাথা, বক্ষ, কান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব স্থান সবার কাছ থেকে গোপন রাখবে, সেই ব্যতিক্রমদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, যা পরে বর্ণিত হবে। এসব স্থানকে বেগানাদের কাছ থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব এবং মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। পরে এ কথা বর্ণিত হবে। অতএব দেহের অন্যান্য অঙ্গ—যেমন পিঠ, পেট ইত্যাদি আবৃত রাখাও আয়াতদৃষ্টে ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ,এগুলো মাহরামের সামনেও খোলা জায়েয নয়। সারকথা এই যে, নারীরা যেন তাদের আপাদমস্তক আবৃত রাখে। উপরোক্ত দু'টি ব্যতিক্রমের প্রথমটি প্রয়োজনের খাতিরে ব্যক্ত হয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে যেসব অঙ্গ খোলার প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বিবরণ এরূপ ঃ) কিন্তু যা (অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের স্থান সাধারণত) খোলা (ই—) থাকে (যা আবৃত করার মধ্যে সার্বক্ষণিক অসুবিধা রয়েছে। এরূপ সৌন্দর্যের স্থান বলে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এবং বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী পদযুগলও বুঝানো হয়েছে। কেননা মুখমণ্ডল তো প্রকৃতিগতভাবেই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও কোন কোন সাজসজ্জা এতে করা হয় ; যেমন সুরমা ইত্যাদি। হাতের তালু, অঙ্গুলি মেহেদী ও আংটির স্থান। পদযুগল, আংটি ও মেহেদীর স্থান। এসব স্থান না খুলে কাজকর্ম সম্ভবপর নয় বলেই এগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে مَا ظَهَرَ-এর তফসীরে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু উল্লেখ করা হয়েছে। ফিকহবিদগণ কারণের ভিত্তিতে অনুমান করে পদযুগলকে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন) এবং (বিশেষ করে তারা যেন খুব যত্ন সহকারে মাথা ও বক্ষ আবৃত করে এবং) তাদের ওড়না (যা মাথা আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়) বক্ষদেশে ফেলে রাখে (যদিও বক্ষদেশ জামা দ্বারা আবৃত হয়ে যায় ; কিন্তু প্রায়ই জামার বোতাম খোলা থাকে এবং বক্ষের আকৃতি জামা সত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন আছে। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম বর্ণিত হচ্ছে। এতে মাহরাম পুরুষদেরকে পর্দার উল্লিখিত বিধান থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে (অর্থাৎ সৌন্দর্যের উল্লিখিত স্থানসমূহকে কারও কাছে) প্রকাশ না করে ; কিন্তু স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র,স্বামীর পুত্র, (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়) ভ্রাতা, (চাচাত, মামাত ইত্যাদি ভ্রাতা নয়) ভ্রাতুষ্পুত্র, (সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া) ভগ্নিপুত্র, (চাচাত, খালাত বোনদের পুত্র নয়) নিজেদের (ধর্মে শরীক) স্ত্রীলোক (অর্থাৎ মুসলমান স্ত্রীলোক। কাফির স্ত্রীলোক বেগানা পুরুষের মতই) বাঁদী (কাফির হলেও ; কেননা পুরুষ ক্রীতদাসের বিধান ইমাম আবূ হানীফার মতে বেগানা পুরুষের মত। তার কাছেও পর্দা ওয়াজিব), এমন পুরুষ যারা (শুধু পানাহারের জন্য) সেবক (হিসাবে থাকে

এবং ইন্দ্রিয় সঠিক না হওয়ার কারণে) মহিলাদের প্রতি উৎসাহী নয়। [বিশেষভাবে এদের কথা বলার কারণ এই যে, তখন এ ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল। (দুররে-মনসুর) প্রত্যেক নির্বোধ ব্যক্তির বিধান তাই। কাজেই এই বিধানটি নির্বোধ হওয়ার উপর ভিত্তিশীল, সেবক হওয়ার উপর নয়। কিন্তু তখন যারা সেবক ছিল, তারা এমনি ছিল। তাই তাবে' তথা সেবক উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বোধশক্তির অধিকারী, তারা বৃদ্ধ খোজা অথবা লিঙ্গকর্তিত হলেও বেগানা পুরুষ। তাদের কাছে পর্দা ওয়াজিব।] অথবা এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ (অর্থাৎ যেসব বালক এখনও পর্যন্ত সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং কামভাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরোক্ত সবার সামনে মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়ের তালু ও পদযুগল ছাড়াও সাজসজ্জার উল্লিখিত স্থানসমূহ প্রকাশ করাও জায়েয ; অর্থাৎ মাথা ও বক্ষ। স্বামীর সামনে কোন অঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব নয়। তবে বিশেষ অঙ্গকে দেখা অনুত্তম।

قالت سيدتنا ام المؤمنين عائشة ما محصله لم ارمنه ولم يرمنى ذالك الموضع اورده فى المشكواة وروى بقى بن مخلد وابن عدى عن ابن عباس مرفوعا اذا جامع احدكم زوجته او جاريته فلا ينظر الى فرجها فان ذالك يورث العمى قال ابن صلاح جيد الاسناد كذا فى الجامع الصغير -

এবং (পর্দার প্রতি এতটুকু যত্নবান হতে পারে যে, চলার সময়) সজোরে পদক্ষেপ করবে না, যাতে তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অলংকারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষদের কানে পৌঁছে যায়)। হে মুসলমানগণ, (এসব বিধানের ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা যে ত্রুটি হয়ে গেছে, তজ্জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (নতুবা গুনাহ্ পূর্ণ সফলতার পরিপন্থী হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পর্দাপ্রথা নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ঃ মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহ্যাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারও মতে তৃতীয় হিজরী এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরী। তফসীরে ইবনে কাসীর ও নায়লুল আওতার গ্রন্থে পঞ্চম হিজরীকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীতে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিবাহের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সূরা নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পরে এবং সূরা আহযাবের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহযাবের

আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহযাবেই ইনশাআল্লাহ্ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের তফসীর লিখিত হচ্ছে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ –

يغضوا শব্দটি غض থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কম করা এবং নত করা।—(রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরূহ—এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল(চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত)। এ ছাড়া কারও গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ—যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ—যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টও উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ—যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র) হযরত ওবায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, كل ما عصى الله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين অর্থাৎ যদ্বারা আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত--সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

النظر سهم من سهام ابليس مسموم من تركها مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه

—দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।—(ইবনে কাসীর) হযরত আলী (রা)-এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে গুনাহ্। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করারও বিধান অনুরূপ ঃ ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ঃ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ — এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহ্‌রাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলিমের মতে নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম ; কামভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হযরত উম্মে সালমার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ একদিন হযরত উম্মে সালমা ও মায়মূনা (রা) উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে সালমা আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে তো অন্ধ। সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ।—(আবূ দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন ফিকাহবিদ বলেন ঃ কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ একবার ঈদের দিন মসজিদে নব্বীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। আয়াতে ভাষা দৃষ্টে আরও বুঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত বাকিগুলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরয। কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরও সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থী। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ -

অভিধানে زينت এমন বস্তুকে বলা হয়, যদ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল ; যেমন বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زينت-এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান; অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজসজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব।—(রূহুল মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে ; একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসাবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসাবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম ঃ প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ নারীর কোন সাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে ; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। —(ইবনে কাসীর) এতে কোন্ কোন্ অঙ্গ বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন ঃ مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাকে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বুঝানো হয়েছে। কেননা কোন নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েয নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। এ কারণে ফিকাহ্‌বিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েয নয় এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েয নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয এবং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে।

কাযী বায়যাভী ও 'খায়েন' এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনকিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোন প্রেয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ—গুনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েয ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওযর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লিখিত উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয নয়। যাওয়াজের গ্রন্থে ইবনে হাজার মক্কী শাফে'ঈ (র) ইমাম শাফেঈ (র)-ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামায হয়ে যায়; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েয নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকাহবিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েয, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয। বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خمر শব্দটি خمار-এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جيوب শব্দটি جيب-এর বহুবচন। এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ মূর্খতাযুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। মূর্খতাযুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। —(রূহুল মা'আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের কাছে শরীয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। এক. যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা

মাহ্‌রাম। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে ঃ স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নেই। দুই. সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম—গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যও জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহ্‌রাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহযাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

হুঁশিয়ারী ঃ স্মরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহ্‌রাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ্‌ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহ্‌রাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ ঃ প্রথমত স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ ما راى منى ولا رأيت منه অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর দেখিনি।

দ্বিতীয়ত, পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত, শ্বশুর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থত, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চমত. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ. ভ্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়র-মাহরাম। সপ্তম. ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বুঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোন বুঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহ্‌রাম। নবম, أَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক ; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে—গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহ্‌রাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

نِسَائِهِنَّ মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফির মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, কাফির নারীর সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্য জায়েয নয়। কিন্তু সহীহ্‌ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিবিদের সামনে কাফির রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারও মতে কাফির নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফির উভয়

প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন ; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী বলেনঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফির সব নারীই نِسَائِهِنَّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফির নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রুহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলুসী এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন ঃ

هذا القول اوفق بالناس اليوم فانه لايكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات অর্থাৎ এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফির নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

দশম প্রকার أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহ্‌রামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন ঃ لا يغرنكم اية النور فانه فى الاماء دون الزكوة অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, ما ملكت ايمانهن শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন বলেন ঃ পুরুষ দাসের জন্য তার প্রভু নারীর কেশ দেখা জায়েয নয়।—(রূহুল মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু নারী দাসীদেরকেই বুঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী أَوْنِسَائِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন ঃ نِسَائِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফিরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে।

একাদশ প্রকার أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই।--(ইবনে কাসীর) ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবূ আবদুল্লাহ্, ইবনে জুবায়র ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও কোন ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এই কারণেই ইবনে হাজর মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন ঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার

কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ শব্দের সাথে اَلتَّابِعِيْنَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহূত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর অনাহূত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

দ্বাদশ প্রকার أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।—(ইবনে কাসীর) ইমাম জাসসাস বলেন ঃ এখানে طفل বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ—অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় ঃ আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই— গোপন সাজসজ্জার যে কোনভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েয নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলঙ্কার ঝঙ্কৃত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে নাজায়েয। এ কারণেই অনেক ফিকাহ্‌বিদ বলেন ঃ যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো; তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরও কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাওয়ায়েল গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কোরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাযে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী আওয়াজ করতে পারবেন না ; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান ঃ নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ

বর্তমান। ইমাম শাফেঈর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াযেলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আযান মাকরূহ্। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশংকা নেই, সেখানে জায়েয।—(জাসসাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া ঃ নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজসজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌঁছা নাজায়েয। তিরমিযীতে হযরত আবূ মূসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েয ঃ ইমাম জাসসাস বলেন ঃ কোরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র।—(জাসসাস)

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ অর্থাৎ মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারও দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওবা করা নেহায়েত জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ

لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

---

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুক্তদের মধ্যে) যারা বিবাহহীন (পুরুষ হোক কিংবা নারী বিবাহহীন হওয়াও ব্যাপক অর্থে—এখন পর্যন্ত বিবাহই হয়নি কিংবা হওয়ার পর স্ত্রীর মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে বিবাহহীন হয়ে গেছে) তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং (এমনিভাবে) তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা এর (অর্থাৎ) বিবাহের) যোগ্য, (অর্থাৎ বিবাহের হক আদায় করতে সক্ষম) তাদেরও (বিবাহ সম্পাদন করে দাও। শুধু নিজেদের স্বার্থে তাদের বিবাহের স্বার্থকে বিনষ্ট করো না এবং মুক্তদের মধ্যে যারা বিবাহের পয়গাম দেয়, তাদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার প্রতি লক্ষ্য করে অস্বীকার করো না যদি তাদের মধ্যে জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা থাকে, কেননা) তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিত্তশালী করে দেবেন। (মোটকথা এই যে, বিত্তশালী না হওয়ার কারণে বিবাহ অস্বীকার করো না এবং এরূপও মনে করো না যে, বিবাহ হলে খরচ বৃদ্ধি পাবে। ফলে এখন যে বিত্তশালী সেও বিত্তহীন ও কাঙ্গাল হয়ে যাবে। কারণ, আসলে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরই জীবিকা নির্ভরশীল। তিনি কোন বিত্তশালীকে বিবাহ ছাড়াও নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত করতে পারেন এবং কোন দারিদ্র বিবাহওয়ালাকে বিবাহ সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা থেকে মুক্তি দিতে পারেন।) আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচুর্যময় (যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং সবার অবস্থা সম্পর্কে) জ্ঞানময়। (যাকে বিত্তশালী করা রহস্যের উপযোগী হবে তাকে বিত্তশালী করে দেন এবং যাকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত রাখাই উপযুক্ত, তাকে দরিদ্র রাখেন।) আর (যদি কেউ দারিদ্র্যের কারণে বিবাহের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী না হয়, তবে) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন প্রবৃত্তিকে বশে রাখে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। অভাবমুক্ত করা হলে বিবাহ করবে)।

বিবাহের কতিপয় বিধান ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা নূরে বেশির ভাগ সতীত্ব ও পবিত্রতার হিফাযত এবং নির্লজ্জতা অশ্লীলতা দমন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এই পরম্পরায় ব্যভিচার ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির কঠোর শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর অনুমতি চাওয়া ও পর্দার বিধান বিধৃত হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর যাবতীয় বিধি-বিধানে সমতা নিহিত আছে। এক দিকে মানুষের স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং অপরদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই একদিকে যখন মানুষকে অবৈধ পন্থায় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, তখন স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর কোন বৈধ ও বিশুদ্ধ পন্থাও

বলে দেয়া জরুরী ছিল। এছাড়া মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার ভেতরে থেকে নর ও নারীর মেলামেশার কোন পন্থা প্রবর্তন করাও যুক্তি ও শরীয়তের দাবি। কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় এই পন্থার নাম বিবাহ। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে স্বাধীন নারীদের অভিভাবক এবং দাস-দাসীদের মালিকদেরকে তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ — ايامى শব্দটি ايم-এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই, আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফু' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য যদি সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ; বিশেষত এ কারণেও যে, أَيَامَىٰ (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ— কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নাত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ? ঃ মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে

শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ্ করার শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ্ করা ফরয অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন গুনাহ্গার থাকবে। হ্যাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে ; যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্যধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোযা রাখবে। রোযার ফলে কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওকাফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার স্ত্রী আছে কি ? তিনি বললেন ঃ না! আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন শরীয়তসম্মত বাঁদী আছে কি ? উত্তর হলো ঃ না। প্রশ্ন হলো ঃ তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল ? উত্তর হলো ঃ হ্যাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হ্যাঁ বললে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরও বললেন ঃ বিবাহ আমাদের সুন্নত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ্ না করে মারা গেছে।—(মাযহারী)

যে ক্ষেত্রে বিবাহ্ না করলে গুনাহ্র আশংকা প্রবল, ফিকাহ্‌বিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহ্‌মদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহ্ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহ্‌হীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।—(মাযহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে বিবাহ্ না করলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকাহ্‌বিদ একমত যে কোন ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ্ করলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন গুনাহ্ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ্ করা হারাম অথবা মাকরূহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার গুনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ্ করলেও কোন গুনাহের আশংকা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ্ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ্ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফার মতে নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ্ করা উত্তম। ইমাম শাফেঈ বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ্ সত্তাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ্ তথা শরীয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ্ করে যে, এর মাধ্যমে সে গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ

যদি এরূপ সদুদ্দেশ্যে যে কোন মুবাহ্ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেঈ ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবূ হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মুবাহ্ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ্ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গম্বরদেরও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ্ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গম্বরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও নিদ্রাও পয়গম্বরগণের সুন্নত। কারণ, তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গম্বরগণের সুন্নত। বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গম্বরগণের সুন্নাত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিজের সুন্নাত বলা হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোন গুনাহতে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও নেই, এরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার যিকর ও ইবাদতের অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ করা উত্তম। সকল পয়গম্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরূপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক যিকর ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কোরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র যিকর থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ — অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস ও বাঁদীদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও প্রভুদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। صالحين শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ স্ত্রীর বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মোহর আদায় করার যোগ্যতা। যদি صالحين শব্দের সুবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদীদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা প্রভুদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করা। বরং অনুমতি দেওয়া প্রভুদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ, ক্রীতদাস ও বাঁদীদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কোরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ —অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে।—(তিরমিযী)

সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেইজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিম্মায় ওয়াজিব--এটা জরুরী নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ—যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্মকর্মের হিফাযতের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই ; আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হিফাযত ও সুন্নাতে রাসূল (সা) পালন করার সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন।—ইবনে কাসীর)। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, যহরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ হযরত ইবনে মাসউদ বলেন ঃ তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ —(ইবনে কাসীর)

হুঁশিয়ারী ঃ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্মতর্ব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নাত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াত ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ যারা অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ্ করলে আশংকা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গুনাহ্গার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোযা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ সম্পদ দান করবেন।

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ
خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى
الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ
اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

(৩৩-এর বাকী অংশ)

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে (দাস হোক কিংবা দাসী) যারা মোকাতাব হতে ইচ্ছুক (উত্তম এই যে,) তাদেরকে মোকাতাব করে দাও যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ (অর্থাৎ কল্যাণের চিহ্ন) দেখতে পাও। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত অর্থসম্পদ থেকে তাদেরকেও দান কর (যাতে দ্রুত মুক্ত হতে পারে)। তোমাদের (অধিকারভুক্ত) দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না (বিশেষত) যদি তারা সতী থাকতে চায় (এবং তোমাদের এই হীন কর্ম) শুধু এ কারণে যে, তোমরা পার্থিব জীবনের কিছু উপকার (অর্থাৎ ধনসম্পদ) লাভ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে (এবং তারা বাঁচতে চাইবে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর জবরদস্তি করার পর (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে,

তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদীদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদীরা যদি মালিকদের সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয় ; কিন্তু মুস্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ ঃ কোন গোলাম অথবা বাঁদী তার মালিককে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি প্রভু ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব ও পেশ গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অঙ্ককে 'বদলে-কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরীয়ত এর কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম বেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরীকৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামী শরীয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদী মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাঁদীর সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ও তাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরীয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদী, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদী মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের অর্থ বলেছেন উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন ঃ এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা নেই ; উদাহরণত সে কাফির হলে এবং তার

কাফির ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোন রূপ ক্ষতির আশংকাও না থাকা চাই।—(মাযহারী)

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیْ اٰتٰكُمْ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত নয়। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরও কম হ্রাস করে দিতেন।—(মাযহারী)

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা এবং সে সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা ঃ আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকাল বিস্মৃত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালিজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরোক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এগুলোর কোন একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই। বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাঁদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকুই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন

ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াকফ ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে ?

প্রথম মতবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফিরদের ছিল। তারা হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল ঃ এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েয-নাজায়েযের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কোরআনের اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। দ্বিতীয় মতবাদ সোশ্যালিজম মানুষকে কোন বস্তুর উপর কোনরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না ; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভুক্তও করে দেওয়া হলো।

কোরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে মূলনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ্, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে ; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক যায়গায় হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে। আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন। وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰىكُمْ অর্থাৎ এই অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সেই ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এক. ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ্। দুই. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন। তিন. তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব মুস্তাহাব, উত্তম করেছেন। والله اعلم এবং মূর্খতা যুগের কুপ্রথা উৎপাটন, ব্যভিচার ও নির্লজ্জতা দমন করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, وَلَا تُكْرِهُوْا

فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ অর্থাৎ তোমাদের বাঁদীদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থকড়ি উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্খতা যুগের অনেক মানুষ বাঁদীদেরকে এ কাজে ব্যবহার করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি জারি করল এবং মুক্ত ও গোলাম নির্বিশেষে সবাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিধান প্রদান করাও জরুরী ছিল।

اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا —অর্থাৎ যদি বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার ও সতীত্ব রক্ষা করার ইচ্ছা করে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করা খুবই নির্লজ্জ কাজ। বাক্যটি যদিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সর্বসম্মত মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় যে, বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চাইলে তাদের উপর জবরদস্তি করা জায়েয নয় এবং বাঁচতে না চাইলে জায়েয। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাঁদীদের মধ্যে লজ্জাশরম ও সতীত্ববোধ মূর্খতাযুগে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামী বিধানাবলী আগমনের পর তারা যখন তওবা করল, তখনও তাদের প্রভুরা অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিক জবরদস্তি করতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, তারা যখন ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চায়, তখন তোমরা তাদেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের প্রভুদেরকে শাসানো উদ্দেশ্য যে, বাঁদীরা তো সতীসাধ্বী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য কর—এটা নিরতিশয় বেহায়াপনার কাজ।

فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ —এই বাক্যের সারমর্ম এই যে, বাঁদীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হারাম। কেউ এরূপ করলে এবং প্রভুর জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে কোন বাঁদী ব্যভিচার করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং সমস্ত গুনাহ্ জবরকারীর উপর বর্তাবে।—(মাযহারী)

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۴﴾ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ
كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۳۵﴾ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ

اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿৩৬﴾ رِجَالٌ ۙ

لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿৩৭﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا

عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿৩৮﴾ وَالَّذِيْنَ

كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ

لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ

الْحِسَابِ ﴿৩৯﴾ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ

فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ

يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿৪০﴾

(৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচপাত্রে স্থাপিত, কাচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পূতঃপবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৬) আল্লাহ্ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ; (৩৭) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান করেন। (৩৯) যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই

পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহ্‌কে, অতঃপর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কাল মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (তোমাদের হিদায়াতের জন্যে এই সূরায় অথবা কোরআনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট (শিক্ষাগত ও কর্মগত) বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের (অথবা তাদের মত লোকদের) কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যে উপদেশ (অবতীর্ণ করেছি)। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডলের (বাসিন্দাদের) এবং ভূমণ্ডলের (বাসিন্দাদের) জ্যোতি (অর্থাৎ হিদায়াত) দাতা। (অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা হিদায়াত পেয়েছে, তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলাই হিদায়াত দিয়েছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বলে সমগ্র বিশ্ব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যেসব সৃষ্ট জীব নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাইরে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদল।) তাঁর জ্যোতির (হিদায়াতের) আশ্চর্য অবস্থা এমন, যেমন (মনে কর) একটি তাক, তাতে একটি প্রদীপ (স্থাপিত)। প্রদীপটি (স্বয়ং তাকে স্থাপিত নয় ; বরং) একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত (এবং কাচপাত্রটি তাকে রাখা আছে।) কাচপাত্রটি (এমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ) যেন একটি উজ্জ্বল তারকা।

প্রদীপটি একটি উপকারী বৃক্ষ (অর্থাৎ বৃক্ষের তৈল) দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়, যা যয়তূন (বৃক্ষ)। বৃক্ষটি (কোন আড়ালের) পূর্বমুখী নয় এবং (কোন আড়ালের) পশ্চিমমুখীও নয়। (অর্থাৎ এর পূর্বদিকে কোন বৃক্ষ অথবা পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনের শুরুতে তার উপর রৌদ্র পতিত হবে না এবং তার পশ্চিম দিকেও কোন পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনশেষে তার উপর রৌদ্র পড়বে না ; বরং বৃক্ষটি উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত, যেখানে সারাদিন রৌদ্র থাকে। এমন বৃক্ষের তৈল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এবং) এর তৈল (এতটুকু পরিষ্কার ও প্রজ্বলনশীল যে) অগ্নি স্পর্শ না করলেও মনে হয় যেন আপনা-আপনি জ্বলে উঠবে। (আর যখন অগ্নি স্পর্শ করে, তখন তো) জ্যোতির উপর জ্যোতি। (অর্থাৎ একে তো তার মধ্যে জ্যোতির যোগ্যতা উৎকৃষ্ট স্তরের ছিল, এরপর আগুনের সাথেও মিলিত হয়েছে। মিলনও এমনভাবে যে, প্রদীপটি কাচপাত্রে রাখা আছে, যদ্দরুন চাকচিক্য দৃশ্যত আরও বেড়ে যায়। এরপর কাচপাত্রটি তাকে স্থাপিত আছে, যা একদিক থেকে বন্ধ। এমতাবস্থায় কিরণ এক স্থানে সংকুচিত হয়ে আলো অনেক তীব্র হয়ে যায়। তৈলও যয়তূনের, যা পরিষ্কার আলো ও কম ধোঁয়া হওয়ার জন্যে প্রসিদ্ধ। ফলে অনেকগুলো আলোর একত্র সমাবেশের ন্যায় প্রখর আলো হবে। একেই "জ্যোতির উপর জ্যোতি" বলা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত সমাপ্ত হলো। এমনিভাবে মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন হিদায়াতের নূর সৃষ্টি করেন, তখন তার অন্তর দিন দিন সত্য গ্রহণের জন্যে উন্মুক্ত হতে থাকে এবং সর্বদাই আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত থাকে ; যদিও কার্যত কোন কোন আদেশের জ্ঞান থাকে না। কেননা, জ্ঞান ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যয়তূনের

তৈল যেমন অগ্নি সংযোগের পূর্বেই আলো বিকীরণের জন্যে প্রস্তুত ছিল, তেমনি মু'মিনও নির্দেশাবলীর জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই সেগুলো পালন করার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এরপর যখন জ্ঞান হাসিল হয়, তখন কর্মের নূর অর্থাৎ পালন করার দৃঢ় সংকল্পের সাথে জ্ঞানের নূরও মিলিত হয়। ফলে, সে তৎক্ষণাৎ তা কবূল করে নেয়। সুতরাং কর্ম ও জ্ঞান একত্রিত হয়ে নূরের উপর নূর হয়ে যায়। নির্দেশাবলীর জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর মু'মিন সত্য গ্রহণে কোনরূপ দ্বিধা করে না। এই উন্মুক্ততা ও নূর অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নূরের উপর থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ মোটকথা, এ হচ্ছে নূরে হিদায়াতের দৃষ্টান্ত।) আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (এবং পৌঁছিয়ে দেন। হিদায়াতের এই দৃষ্টান্তের ন্যায় কোরআনে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারাও মানুষের হিদায়াত উদ্দেশ্য। তাই) আল্লাহ তা'আলা মানুষের (হিদায়াতের) জন্য (এসব) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (যাতে জ্ঞানগত বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর ন্যায় বোধগম্য হয়ে যায়)। আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে জ্ঞাত। (তাই যে দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট, সেই দৃষ্টান্তই অবলম্বন করেন। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ খুবই যথোপযুক্ত হয়ে থাকে। এরপর হিদায়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) তারা এমন গৃহে (গিয়ে ইবাদত করে), (যেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ; (অর্থাৎ মসজিদসমূহ। মসজিদের সম্মান এই যে, তাতে নাপাক ও হায়েযওয়ালী প্রবেশ করবে না, কোন অপবিত্র বস্তু সেখানে নেয়া যাবে না, গণ্ডগোল করা যাবে না, পার্থিব কাজ ও কথাবার্তা বলার জন্যে সেখানে বসা যাবে না, দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খেয়ে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। মোটকথা) সেগুলোতে (অর্থাৎ মসজিদসমূহে) এমন লোকেরা সকাল ও সন্ধ্যায় (নামাযে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদেরকে আল্লাহ্র মরণ (অর্থাৎ নির্দেশাবলী পালন) থেকে এবং (বিশেষভাবে) নামায পড়া থেকে এবং যাকাত প্রদান থেকে (শাখাগত নির্দেশাবলীর মধ্যে এগুলো প্রধান) ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না। (আনুগত্য ও ইবাদত সত্ত্বেও তাদের ভয়বীতি এরূপ যে) তারা সেই দিনকে (অর্থাৎ সেই দিনের ধরপাকড়কে) ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (যেমন অন্য আয়াতে আছে يوتون ما اتو او قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র পথে খরচ করে এবং এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তর কিয়ামতের ধরপাকড়কে ভয় করে। এখানে হিদায়াত ও নূর ওয়ালাদের গুণাবলী ও কর্ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।) পরিণাম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজ-কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবেন (অর্থাৎ জান্নাত দেবেন।) এবং (প্রতিদান ছাড়াও) নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেবেন। (প্রতিদান তো এটা—যার ওয়াদা বিস্তারিত উল্লিখিত আছে, অধিক হলো—যার ওয়াদা বিস্তারিত নেই, যদিও সংক্ষিপ্ত আছে।) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, অগণিত (অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে) রুযী দান করেন। (সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে এমনিভাবে অপরিসীম দেবেন। এ পর্যন্ত হিদায়াত ও হিদায়াতওয়ালাদের বর্ণনা ছিল। অতঃপর পথভ্রষ্টতা ও

পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা কাফির (পথভ্রষ্ট এবং নূরে-হিদায়াত থেকে দূরে) তাদের কর্ম (কাফিরদের দুই প্রকার হওয়ার কারণে দু'টি দৃষ্টান্তের অনুরূপ। কেননা, এক প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামত বিশ্বাসী এবং তাদের যেসব কর্ম তাদের ধারণা অনুযায়ী সওয়াবের কাজ, পরকালে সেগুলোর প্রতিদান আশা করে। দ্বিতীয় প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী। প্রথম প্রকার কাফিরদের কর্ম তো) মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে (দূর থেকে) পানি মনে করে (এবং তার দিকে দৌড় দেয়) ; এমনকি, সে যখন তার কাছে পৌঁছে, তখন তাকে (যা মনে করেছিল) কিছুই পায় না এবং) চরম পিপাসা তদুপরি নিদারুণ নৈরাশ্যের কারণে শারীরিক ও আত্মিক আঘাত পেয়ে সে ছটফট করতে করতে মারা যায়। এমতাবস্থায় বলা উচিত যে, পানির পরিবর্তে) আল্লাহ্‌র ফয়সালা অর্থাৎ মৃত্যুকে পায়। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা তার (জীবনের) হিসাব চুকিয়ে দেন (অর্থাৎ জীবন সাঙ্গ করে দেন)। আল্লাহ্ তা'আলা (যার মেয়াদ এসে যায়, তার) দ্রুত হিসাব (নিষ্পত্তি) করে দেন। (তাঁকে মোটেই ঝামেলা পোহাতে হয় না যে, দেরী লাগবে। সুতরাং এই বিষয়টি এমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ اَنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَايُؤَخَّرُ আরও বলা হয়েছে ঃ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন মরীচিকাকে পানি মনে করে, তেমনিভাবে কাফিররা তাদের কর্মকে বাহ্যিক আকারে গ্রহণযোগ্য ও আখিরাতেও ফলদায়ক মনে করে এবং যেমন মরীচিকা পানি নয়, তেমনিভাবে তাদের কর্ম কবূলের শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য ও ফলদায়ক নয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি মরীচিকার কাছে পৌঁছে যেমন আসল স্বরূপ জানতে পারে, তেমনিভাবে কাফিররাও আখিরাতে পৌঁছে তার কর্ম ও বিশ্বাসের স্বরূপ জানতে পারবে। পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে হা-হুতাশ করতে করতে মারা গেল, তেমনিভাবে কাফিরও তার আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে চিরন্তন ধ্বংস অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার কাফিরের কর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) অথবা তাদের (কর্ম কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে) গভীর সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ অন্ধকারের ন্যায়, (যার এক কারণ সমুদ্রের গভীরতা, তদুপরি) তাকে (অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগকে) একটি বিশাল তরঙ্গ ঢেকে রেখেছে (তরঙ্গও একা নয়, বরং) তার (তরঙ্গের) উপর অন্য তরঙ্গ (আছে, এরপর) তার উপর কাল মেঘ আছে, যদ্দরুন তারকা ইত্যাদির আলোও পৌঁছে না। মোটকথা) উপর-নীচে অনেক অন্ধকারই অন্ধকার। যদি (এমতাবস্থায় কোন লোক সমুদ্রের গভীরে হাত বের করে এবং তা দেখতে চায়) তবে (দেখা দূরের কথা) দেখার সম্ভাবনাও নেই। (এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, যেসব কাফির পরকাল, কিয়ামত ও তাতে প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় অস্বীকার করে, তাদের কাছে কাল্পনিক নূরও নেই; যেমন প্রথম প্রকার কাফিরদের কাছে একটি কাল্পনিক নূর ছিল। কেননা, তারা তাদের কতক সৎকর্মকে পরকালের পুঁজি মনে করেছিল, কিন্তু ঈমানের শর্ত না থাকার কারণে তা প্রকৃত নূর ছিল না—একটি কাল্পনিক নূর ছিল। পরকাল অস্বীকারকারীরা তাদের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী কোন কাজ পরকালের জন্যে করেইনি, যার নূরের কল্পনা তাদের মনে থাকতে পারে। মোটকথা, তাদের কাছে অন্ধকারই আছে, নূরের কল্পনাও তাদের কাছে হতে পারে না। সমুদ্রের গভীরতার দৃষ্টান্তে তাই আছে। না দেখা যাওয়ার

ব্যাপারে বিশেষভাবে হাতকে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে হাত নিকটতম। এছাড়া একে যতই নিকটে আনতে চাইবে ততই নিকটে আসবে। এমতাবস্থায় হাতই যখন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা বলাই বাহুল্য। অতঃপর এই কাফিরদের অন্ধকারে থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, (যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নূর দেন না, সে (কোথা থেকেও) নূর পেতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতকে আলিমগণ 'নূরের আয়াত' বলে থাকেন। কেননা, এতে ঈমানের নূর ও কুফরের অন্ধকারকে বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

নূরের সংজ্ঞা ঃ নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী বলেন ঃ الظاهر بنفسه والمظهر لغيره অর্থাৎ যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমন সব বস্তুকে অনুভব করে ; যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে ; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, 'নূর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন, বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য দানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন দানশীলকে 'দান' বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণশীলকে ন্যায়পরায়ণতা বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্ট জীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হিদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ اَللّٰهُ هَادِئْ اَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হিদায়াতকারী।

মু'মিনের নূর ঃ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার যে নূরে-হিদায়াত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে-জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ

هو المؤمن الذى جعل الله الايمان والقرأن فى صدره فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والارض فبدا بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من امن به فكان ابى بن كعب يقراها مثل نور من امن به –

অর্থাৎ—এটা সেই মু'মিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও কোরআনের নূরে-হিদায়াত রেখেছেন। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অতঃপর মু'মিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন مَثَلُ نُوْرِهٖ উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের কিরআতও مَثَلُ نُوْرِهٖ এর পরিবর্তে مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ পড়তেন। সাঈদ ইবনে জুবায়র এই কিরআত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ مثل نوره এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। এক, এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র নূরে-হিদায়াত, যা মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত مِشْكٰوةٍ এটা হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি। দুই, সর্বনাম দ্বারা মু'মিনকেই বুঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এই মু'মিন বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মু'মিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তূন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হিদায়াতের দৃষ্টান্ত, যা মু'মিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তূন তৈল রাখা নূরে-হিদায়াত যখন আল্লাহ্র ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মু'মিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মু'মিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হিদায়াত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশষেভাবে মু'মিনের অন্তরেই রাখা হয় না ; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় স্বভাবে এই নূরে-হিদায়াত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক ; কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

একটি সহীহ্ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, كل مولود يولد على الفطرة অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হিদায়াত। ঈমানের হিদায়াত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এই নূরে হিদায়াতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মু'মিন ও কাফিরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয় ; বরং

এর সম্পর্ক কোরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহ্র তাওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেন ঃ

اذا لم يكن عون من الله للفتى

فاول من يجنى عليه اجتهاده

অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা তার জন্য ক্ষতিকর হয়।

নবী করীম (সা)-এর নূর ঃ ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহবার তওরাত ও ইনজীলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, زجاجة তথা কাচপাত্র মানে তাঁর পূত পবিত্র অন্তর এবং مصباح তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী-নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। কেননা, 'মু'জিযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলী বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এক ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'এরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'খাসায়েসে-কোবরা' গ্রন্থে, আবূ নায়ীম 'দালায়েলে নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলিমও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তফসীরে মাযহারীতে অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

যয়তূন তৈলের বৈশিষ্ট্য ঃ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ — এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলিমগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না—আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ।—(মাযহারী)

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ -

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে নিজের নূরে-হিদায়াত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন ঃ এই নূর দ্বারা সেই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ চান ও তওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মু'মিনের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মু'মিনের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়—সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী فِىْ بُيُوْتٍ এর সম্পর্ক يَهْدِى اللّٰهُ بِنُوْرِهٖ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يُسَبِّحُ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী يُسَبِّحُ শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লিখিত আল্লাহ্ তা'আলার নূরে-হিদায়াত পাওয়ার স্থান সেইসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদ ঃ আল্লাহ্র ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব ঃ কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

من احب الله عز وجل فليحبنى ومن احبنى فليحب اصحابى ومن احب اصحابى فليحب القرآن ومن احب القرآن فليحب المساجد فانها افنية الله اذن الله فى رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون اهلها محفوظة محفوظ اهلها هم فى صلاتهم والله عز وجل فى حوائجهم هم فى المساجد والله من ورائهم –

—যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে কোরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। আল্লাহ্ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহ্র হিফাযতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহ্র হিফাযতে থাকে। যারা নামাযে মশগুল হয়, আল্লাহ্ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হিফাযত করেন।—(কুরতুবী)

رفع مساجد এর অর্থ ঃ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ — اَذِنَ শব্দটি اَذِنَ থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি দেওয়া। تُرْفَعَ শব্দটি رفع থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার

মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

ইকরামা ও মুজাহিদ বলেন ঃ رفع বলে মসজিদ নির্মাণ বুঝানো হয়েছে ঃ যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ এখানে رفع قواعد বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ رفع مساجد বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইযযত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছেঃ যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন।—(ইবনে মাজাহ্)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন।—(কুরতুবী)

প্রকৃত কথা এই যে, ترفع শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই দাখিল আছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রসুন ও পিয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে এ কথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্রূপ নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারূকে আযম বলেন ঃ আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন-পিয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এই হাদীসের আলোকে ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয় তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামায পড়া।

رفع مساجد এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত উসমান (রা) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ ; কিন্তু কেউ তাঁর এ কাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহ্রা তো মসজিদ নির্মাণে

অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তাঁর খিলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিতকরণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানীর তিনগুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিধ্যমান আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফার মতে যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহ্র নাম ও আল্লাহ্র ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই ; বরং সওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফযীলত : আবূ দাউদে হযরত আবূ উমামার বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি গৃহে ওযূ করে ফরয নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে ইহরাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্য যায়। যে ব্যক্তি ইশরাকের নামায পড়ার জন্য গৃহ থেকে ওযূ করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাযের পরে অন্য নামায ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।—(মুসলিম)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : পুরুষের নামায জামা'আতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামায পড়ার চাইতে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নাত অনুযায়ী ওযূ করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাযের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তবা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌছা পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামা'আতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাযেরই সওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে—ইয়া আল্লাহ্, তার প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার ওযূ না ভাঙ্গে। হযরত হাকাম ইবনে ওমায়রের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ নম্রচিত্ত হও। আল্লাহ্ নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং (আল্লাহ্র ভয়ে) অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এরূপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। হযরত আবূ দারদা তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন : তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে শুনেছি-মসজিদ মুত্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক যিকির দ্বারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার যিম্মাদার হয়ে যান। আবূ সাদেক ইজদী শুআয়ব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্র লিখেছেন : মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসজিদ পয়গম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : শেষ যমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে দুনিয়ার ও তার মহব্বতের কথাবার্তা

বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা, এ ধরনের মসজিদে আগমনকারীদের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলার নেই।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বলল। কাজেই মুখ থেকে ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের না করা তার দায়িত্ব।—(কুরতুবী)

মসজিদের পনরটি আদব ঃ আলিমগণ মসজিদের পনরটি আদব উল্লেখ করেছেন। (১) মসজিদে পৌঁছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ বলবে। কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামায, তিলাওয়াতে-কোরআন, তসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় সালাম করা দুরস্ত নয়। (২) মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল-মসজিদ নামায পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাযের জন্য মাকরূহ সময় না হয়: অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। (৩) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। (৪) মসজিদে তীরতরবারি বের না করা। (৫) মসজিদে নিখোঁজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। (৬) মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা না বলা। (৭) মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। (৮) মসজিদে বসার জায়গায় কারও সাথে ঝগড়া না করা। (৯) যেখানে কাতারে পুরোপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। (১০) নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। (১১) মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। (১২) অঙ্গুলি না ফুটানো। (১৩) শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। (১৪) নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। (১৫) অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকা। কুরতুবী এই পনরটি আদব লিখার পর বলেন ঃ যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্ত পরিশোধ করে এবং মসজিদ তার জন্য হিফাযত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়। বর্তমান তফসীরকার মসজিদের আদব-কায়দা ও এ প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন।

যেসব গৃহ আল্লাহ্র যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ ঃ তফসীরে-বাহ্রে-মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন ঃ কোরআনের فى بيوت শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়ায-নসিহত অথবা যিকরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বুঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

اَذِنَ اللهُ। বাক্যে اَذِنَ শব্দের বিশেষ রহস্য ঃ তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে اَذِنَ শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে حكم ও امر শব্দের পরিবর্তে اَذِنَ শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি ? রূহুল মা'আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ—এখানে তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল নামায, কোরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিকর বুঝানো হয়েছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ — যেসব মু'মিন আল্লাহ্ তা'আলার নূরে-হিদায়াতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে رِجَالٌ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে নামায পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خير مساجد النساء قعر بيوتهن অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আয়াতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তিজারত' শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোন কোন তফসীরবিদ মুকাবিলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে তিজারতের অর্থ ক্রয় এবং بيع শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بيع কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোন বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্র যিকর ও নামাযের মুকাবিলায় মু'মিনগণ কোন বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ এই আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন ঃ একদিন আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর নামাযের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন ঃ এদের সম্পর্কেই কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ-

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন ও অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওযন করার সময় আযানের শব্দ শ্রুতিগোচর হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাযের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আযানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে কাঁদের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাযে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁদের প্রশংসায়ই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। —(কুরতুবী)

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই ব্যবসাজীবী ছিলেন ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে

বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা, আল্লাহ্র স্মরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে।—(রূহুল মা'আনী)

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত মু'মিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্র যিকর, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্যও হয়ে যায় না ; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত নূরে হিদায়াতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয় ; বরং আল্লাহ্ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন।

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোন সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রুযী দান করবেন। এ পর্যন্ত যেসব সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের বক্ষ নূরে হিদায়াতের তাক এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হিদায়াতকে গ্রহণ করে, সেই সব মু'মিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর সেই সব কাফিরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নূরে-হিদায়াতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু তখন এই উপকরণকে ঔজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌঁছল না, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফির ও অস্বীকারকারী—এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাই দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। উভয় দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিররা নূরে-হিদায়াত থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। আল্লাহ্র নূর কোথায় পাবে ?

আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না ; বরং এটা নিরেট আল্লাহ্র দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে।—(মাযহারী)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ

يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ
فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۗ يَكَادُ
سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ
عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ۗ
يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

(৪১) তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৪২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন ; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়। (৪৪) আল্লাহ্ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নগণের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু করতে সক্ষম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তোমার কি (প্রমাণাদি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা) জানা নেই যে, আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে ? (উক্তিগতভাবে হোক, যেমন কোন কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা পরিদৃষ্টও হয় অথবা অবস্থাগতভাবে হোক, যেমন সব সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা আছে) এবং বিশেষভাবে পক্ষীকুল (ও), যারা পাখা বিস্তার করে (উড়ডীয়মান) আছে। (তারা আরও আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বুঝায় তাদের দেহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও তারা শূন্যে অবস্থান করে) প্রত্যেকেরই (অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষীরই) নিজ নিজ দোয়া (এবং আল্লাহ্র কাছে অনুনয়-বিনয়)

এবং তসবীহ্ (ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি ইলহাম দ্বারা) জানা আছে (এসব প্রমাণ জানা সত্ত্বেও কেউ কেউ তাওহীদ স্বীকার করে না। অতএব) তারা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত আছেন। (এই অমান্যতার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেবেন) আল্লাহ্ তা'আলারই রাজত্ব নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে (এখনও) এবং (পরিশেষে) আল্লাহ্র দিকেই (সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তখনও সর্বময় বিচার-ক্ষমতা তাঁরই হবে। সে মতে রাজত্বের একটি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হচ্ছে হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা (একটি) মেঘখণ্ডকে (অন্য মেঘখণ্ডের দিকে) সঞ্চালিত করেন, অতঃপর সেই মেঘখণ্ডকে (অর্থাৎ তার সমষ্টিকে) পরস্পরে মিলিয়ে দেন, এরপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন, অতঃপর তুমি দেখ যে, তার (মেঘমালার) মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি মেঘমালা থেকে অর্থাৎ তার বিরাট স্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যাকে (অর্থাৎ যার প্রাণ অথবা মালকে) ইচ্ছা আঘাত করেন (ফলে তার ক্ষতি হয়ে যায়) এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তাকে ফিরিয়ে নেন (এবং তার জান ও মালকে বাঁচিয়ে দেন। সেই মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুৎও সৃষ্টি হয়, এমন চোখ ঝলসানো যে) তার বিদ্যুৎঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি বিলীন করে দিতে চায় (এটাও আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম ক্ষমতা)। আল্লাহ্ তা'আলা দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান (এটাও তাঁর অন্যতম ক্ষমতা)। এতে (অর্থাৎ এর সমষ্টি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য প্রমাণ আছে। (যদ্দ্বারা তাওহীদ ও لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করে। এটাও আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতা যে) আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে (স্থলের হোক কিংবা জলের) পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে (যেমন সর্প, মাছ) কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন মানুষ ও উপবিষ্ট পাখী) এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন চতুষ্পদ জন্তু। এমনিভাবে কতক আরো বেশির উপরও ভর দিয়ে চলে। আসল কথা এই যে আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (তাঁর জন্য কিছুই কঠিন নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ—আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হযরত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমীন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপৃত আছে-এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত—উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

যামাখশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার

বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তসবীহ্ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে মশগুল থাকে। كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও নামাযে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ব্যাপৃত আছে ; কিন্তু প্রত্যেকের নামায ও তসবীহ্ পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদ অন্য পদ্ধতিতে নামায ও তসবীহ্ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্ন রূপ। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত কর্তব্য পূর্ণ করে আসছে। এছাড়া তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্য সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেমন কৌশল অবলম্বন করে।

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا — এখানে سماء মানে মেঘমালা এবং جبال মানে বড় বড় মেঘখণ্ড। برد — এর অর্থ শিলা।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾
وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ
بَعْدِ ذٰلِكَ ۗ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ
مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۗ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا
دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۗ
قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾ قُلْ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم
مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

(৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন। (৪৭) তারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি ; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে ; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ? বরং তারাই তো অবিচারকারী। (৫১) মু'মিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকামী। (৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তাঁরা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন ঃ তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত। (৫৪) বলুন ঃ আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (সত্যকে) বুঝানোর প্রমাণাদি (ব্যাপক হিদায়াতের জন্য) অবতীর্ণ করেছি। সাধারণের মধ্য হতে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎ পথের দিকে (বিশেষ) হিদায়াত করেন। (ফলে সে আল্লাহ্র জ্ঞাতব্য হক অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং কার্যগত হক অর্থাৎ ইবাদত পালন করে। নতুবা অনেকেই বঞ্চিত থাকে।) মুনাফিকরা (মুখে) দাবি করে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং (আল্লাহ্ ও রাসূলে) আদেশ (মনে-প্রাণে) মানি। এরপর (যখন কর্মের মাধ্যমে দাবি প্রমাণের সময় আসল, তখন) তাদের একদল (যারা খুবই পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় [অর্থাৎ তাদের কাছে যখন কারও প্রাপ্য পরিশোধযোগ্য হয় এবং প্রাপক সেই মুনাফিককে বলে যে, চল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বিচার নিয়ে যাই, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেননা, সে জানে যে, তাঁর এজলাসে হক প্রমাণিত হলে তিনি তার পক্ষেই ফয়সালা দেবেন। পরবর্তী وَإِذَا دُعُوا আয়াতে এর এরূপ বর্ণনাই উল্লিখিত হয়েছে। সকল মুনাফিকই

এরূপ ছিল, এতদসত্ত্বেও বিশেষভাবে এক দলের কথা বলার কারণ এই যে, গরীব মুনাফিকরা আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিষ্কার অস্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারত না। যারা প্রভাবশালী ও শক্তিমান, তারাই এ কাজ করত] তারা মোটেই ঈমানদার নয়। (অর্থাৎ কোন মুনাফিকের অন্তরেই ঈমান নেই ; কিন্তু তাদের বাহ্যিক কৃত্রিম ঈমানও নেই; যেমন এক আয়াতে আছে, وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ অন্য এক আয়াতে আছে قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ তাদের এই আদেশ লংঘনের বর্ণনা এই যে) তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, যাতে রাসূল তাদের (ও তাদের প্রতিপক্ষের) মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের একদল (সেখানে যেতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং তালবাহানা করে। এই আহবান রাসূলের দিকেই করা হয় ; কিন্তু রাসূল যেহেতু আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন, তাই আল্লাহ্র দিকেও আহবান করা হয় বলা হয়েছে। মোটকথা, তাদের কাছে কারও হক প্রাপ্য হলে তারা এরূপ করে) আর যদি (ঘটনাক্রমে) তাদের হক এক (অন্যের কাছে) থাকে, তবে তারা বিনয়াবনত হয়ে (নির্দ্বিধায় তাঁর ডাকে তাঁর কাছে ছুটে আসে। কারণ, তারা নিশ্চিত যে, সেখানে সত্য ফয়সালা হবে। এতে তাদের উপকার হবে। অতঃপর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও উপস্থিত না হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি সম্ভাবনা উল্লেখ করে সবগুলোকে বাতিল ও একটিকে সপ্রমাণ করা হয়েছে) কি (এই মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ এই যে) তাদের অন্তরে (নিশ্চিত কুফরের) রোগ আছে (অর্থাৎ তারা নিশ্চিত যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল নন) না তারা (নবুয়তের ব্যাপারে) সন্দেহে পতিত আছে, (অর্থাৎ রাসূল না হওয়ার বিশ্বাস তো নেই ; কিন্তু রাসূল হওয়ারও বিশ্বাস নেই) না তারা আশংকা করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন (এবং তাদের কাছে যে হক প্রাপ্য, তার চাইতে বেশি দিতে বলবেন। বাস্তব ঘটনা এই যে, এগুলোর মধ্যে একটিও কারণ নয়) বরং (আসল কারণ এই যে) তারাই (এসব মোকদ্দমায়) অন্যায়কারী। (তাই রাসূলের দরবারে মোকদ্দমা আনতে রাজী হয় না। এছাড়া পূর্ববর্তী সব কারণ অনুপস্থিত)। মুসলমানদের (অবস্থাও তাদের) উক্তি যে, যখন তাদের (কোন মোকদ্দমায়) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো (হৃষ্টচিত্তে) একথাই বলে ঃ আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। (এরপর তৎক্ষণাৎ চলে যায়। এটা এরই আলামত, যে তাদের اَمَنَّا ও اَطَعْنَا বলা দুনিয়াতেও সত্য।) তারাই (পরকালেও) সফলকাম। (আমার নিকট তো সামগ্রিক নীতি এই যে) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম হবে। (এটাও মুনাফিকদের অবস্থা যে) তারা দৃঢ়ভাবে কসম খায় যে, (আমরা এমন অনুগত যে) যদি আপনি তাদেরকে (অর্থাৎ আমাদেরকে) আদেশ করেন (যে, বাড়িঘর ছেড়ে দাও) তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) এখনি (সব ত্যাগ করে) বের হব। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ জানা আছে। (কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা তোমারে কাজকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন। (তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন ঃ যেমন অন্যত্র আছে قُلْ لَا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ (কথায় লাভ হবে না, কাজ কর। অর্থাৎ) আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা গুরুত্বদানের জন্য স্বয়ং তাদেরকে

সম্বোধন করেন যে, রাসূলের এই আদেশ ও প্রচারের পর) পুনরায় যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মনে রেখ (যে, এতে রাসূলের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) রাসূলের দায়িত্ব প্রচার, যা তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে (তিনি তা সম্পন্ন করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন) এবং তোমাদের দায়িত্ব তা (অর্থাৎ আনুগত্য করা) যা তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। (তোমরা তা পালন করনি। সুতরাং ক্ষতি তোমাদেরই হবে) যদি (মুখ না ফিরাও, বরং) তাঁর আনুগত্য কর (যা আল্লাহ্রই আনুগত্য) তবে সৎ পথ পাবে। (মোটকথা) রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া (এরপর কবূল করলে কি না তা তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে যমীন সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল ঃ চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এজলাসে মোকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীর কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সাফল্য লাভের চারটি শর্ত ঃ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ —এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।

একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ তফসীরে-কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ফারূকে আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে ওঠে। হযরত ফারূকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রূমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ —হযরত ফারূকে আযম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি ? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ফারূক জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর কোন কারণ আছে কি ? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমি তওরাত, ইনজীল, যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত। ফারূকে আযম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আয়াতটি কি ? রূমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই তিলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব তফসীরও বর্ণনা করল যে, مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ আল্লাহ্র ফরয কার্যাদির সাথে, ورسوله রাসূলের সুন্নাতের সাথে, وَيَخْشَ اللّٰهَ অতীত জীবনের সাথে এবং وَيَتَّقْهِ ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ-এর সুসংবাদ দেয়া হবে। فائز তথা সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়। ফারূকে আযম একথা শুনে বললেন ঃ রাসূলে করীম (সা)-এর কথায়

এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ اوتيت جـوامع الكلم অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত।—(কুরতুবী)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (৫৬) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (৫৭) তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কত নিকৃষ্ট না এই প্রত্যাবর্তনস্থল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সফল উম্মত) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত নূরে-হিদায়াতের পুরোপুরি অনুসরণ করে।) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাদেরকে (এই অনুসরণের কল্যাণে) পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী (হিদায়াত প্রাপ্ত) লোকদেরকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। (উদাহরণত বনী-ইসরাইলকে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় কিবতীদের উপর প্রবল করেছিলেন। এরপর শাম দেশে আমালেকার ন্যায় দুর্ধর্ষ জাতির উপর তাদেরকে আধিপত্য দিয়েছিলেন এবং মিসর ও শাম দেশের শাসনকর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী করেছিলেন)। আর (এই রাজত্ব দান করার উদ্দেশ্য এই যে) তিনি যে ধর্মকে তাদের জন্য পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ ইসলাম ; যেমন অন্য আয়াতে আছে رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) তাকে তাদের (পরকালীন উপকারে) জন্য

শক্তিশালী করবেন এবং (শত্রুদের তরফ থেকে তাদের যে স্বাভাবিক ভয়ভীতি) তাদের ভয়ভীতির পর তাদেরকে শান্তি দান করবেন এই শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন প্রকার শিরক করবে না। (প্রকাশ্যও নয় অপ্রকাশ্যও নয়, যাকে রিয়া বলা হয়) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রতিশ্রুতি ধর্মের উপর পূর্ণরূপে কায়েম থাকার শর্তাধীন। এই প্রতিশ্রুতি তো দুনিয়ার জন্য। পরকালে ঈমান ও সৎ কর্মের কারণে যে মহান প্রতিদান ও চিরন্তন সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি আছে, সেটা ভিন্ন।) যে ব্যক্তি এরপর (অর্থাৎ এই প্রতিশ্রুতি জাহির হওয়ার পর) অকৃতজ্ঞ হবে, (অর্থাৎ ধর্ম বিরোধী পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য এই প্রতিশ্রুতি নয়; কেননা) তারাই নাফরমান। (প্রতিশ্রুতি ছিল ফরমাবরদারদের জন্য। তাই তাদেরকে দুনিয়াতেও রাজত্ব দান করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি এবং পরকালের শাস্তিও ভিন্ন হবে। হে মুসলমানগণ, তোমরা যখন ঈমান ও সৎ কর্মের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকারিতা শুনেছ, তখন তোমাদের উচিত যে) তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং (অবশিষ্ট বিধানাবলীতেও) রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহ করা হয়। (এরপর কুফর ও অবাধ্যতার পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, হে সম্বোধিত ব্যক্তি) কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করো না যে, পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করবে এবং) আমাকে হারিয়ে দেবে (এবং আমার ক্রোধ থেকে বেঁচে যাবে। না, বরং তারা স্বয়ং হেরে যাবে এবং ক্রোধের শিকার ও পরাভূত হবে। এটা দুনিয়ার পরিণাম। পরকালে) তাদের ঠিকানা দোযখ। কত নিকৃষ্টই না এ ঠিকানা!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযূল ঃ কুরতুবী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহী অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফির ও মুশরিকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে সেখানেও সর্বদা মুশরিকদের আক্রমণের আশংকা বিদ্যমান ছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় শান্তিতে ও সুখে বসবাস করব—এরূপ সময় কি কখনও আসবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এরূপ সময় অতি সত্বরই আসবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। —(কুরতুবী, বাহর) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উম্মতে মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইনজীলে দিয়েছিলেন। —(বাহরে-মুহীত)

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্য-বীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোন ভয়ভীতি থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শ্যাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্, (সা)-এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর উসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন।—(ইবনে কাসীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। পর অর্থ খিলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খিলাফত হযরত আলী (রা) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা, ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রা) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

ইবনে কাসীর এ স্থলে সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত জাবের ইবনে যামরা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের কাজ অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন। ইবনে কাসীর বলেন ঃ এই হাদীসটি উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরী। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন ; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে এরূপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ হবেন হযরত মাহদী। রাফেযী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোন প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এটাও জরুরী নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোন ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ্ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও

সত্তার পরিনাম এই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কোরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে। إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ— অর্থাৎ আল্লাহ্র দলই প্রবল থাকবে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা খোলাফায়ে-রাশেদীনের খিলাফত ও আল্লাহ্র কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণ ঃ এই আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের প্রমাণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহ্র কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রাসূল ও উম্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয় ; যেমন রাফেযীদের ধারণা তদ্রূপই ; তবে বলতে হবে যে, কোরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্। সত্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে-রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহ্র ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎকর্মের সেই মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই ; এবং খিলাফত ও রাজত্বের সেই গাম্ভীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ — كفر শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থ বুঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালংঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্য-বীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। তাই بَعْدَ ذَٰلِكَ বলে একে জোরদার করা হয়েছে। ইমাম বগভী বলেন ঃ তফসীরবিদ আলিমগণ বলেছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ্ তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত উসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই ঃ

যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পদার্পণ করেন, সেইদিন থেকে আল্লাহ্র ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হিফাযতে মশগুল আছে। যদি তোমরা

উসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহ্র সামনে হস্ত কর্তিত অবস্থায় হাযির হবে, তার হাত থাকবে না। সাবধান, আল্লাহ্র তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহ্র কসম, যদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে যাবে না। কেননা, যখন কোন নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোন খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। —(মযহারী)

সেমতে হযরত উসমান গনীর হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই রয়েছে। হযরত উসমানের হত্যাকারীরা খিলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নিয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খুলাফায়ে-রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। نسئل الله الهداية وشكر نعمته

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ
تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫ ثَلٰثُ
عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾
وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ﴿۵۹﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ؕ
وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۶۰﴾

(৫৮) হে মু'মিনগণ, তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময় ; এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্য দোষ নেই তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, (তোমাদের কাছে আসার জন্য) তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, (এক) ফজরের নামাযের পূর্বে, (দুই) দুপুরে যখন তোমরা (নিদ্রার জন্য অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখ এবং (তিন) এশার নামাযের পর। এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দার সময় (অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই তিনটি সময় একান্তবাস ও বিশ্রাম গ্রহণের সময়। এতে মানুষ খোলাখুলি থাকতে চায়। একান্তে কোন সময় আবৃত অঙ্গও খুলে যায় অথবা প্রয়োজনে খোলা হয়। তাই নিজের দাসদাসী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদেরকে বুঝাও, যাতে বিনা খবরে ও বিনানুমতিতে এ সময়ে তোমাদের কাছে না আসে)। এ সময়গুলো ছাড়া (বিনানুমতিতে আসতে দেওয়ায় ও নিষেধ না করায়) তোমাদের কোন দোষ নেই। (কেননা) তোমাদেরকে একে অপরের কাছে তো বারংবার যাতায়াত করতেই হয়। (সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি চাওয়া কষ্টকর। যেহেতু এটা পর্দার সময় নয়, তাই আবৃত অঙ্গ গোপন রাখা কঠিন নয়।) এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন তোমাদের (অর্থাৎ মুক্তদের) বালকরা (যাদের বিধান উপরে বর্ণিত হয়েছে) বয়োপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সাবালক ও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়) তখন তারাও যেন (এমনিভাবে) অনুমতি গ্রহণ করে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠরা) অনুমতি গ্রহণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমদের কাছে তাঁর বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (জানা উচিত যে, পর্দার বিধানের কঠোরতা, অনর্থের আশংকার উপর ভিত্তিশীল। যেখানে স্বভাবগতভাবে অনর্থের সম্ভাবনা নেই ; উদারণত) বৃদ্ধা নারী যারা (কারও সাথে) বিবাহের আশা রাখে না (অর্থাৎ আকর্ষণীয়া নয়—এটা বৃদ্ধা হওয়ার ব্যাখ্যা) এতে তাদের কোন গুনাহ্ নেই যে, নিজ (অতিরিক্ত) বস্ত্র (যদ্দ্বারা মুখ ইত্যাদি আবৃত থাকে এবং তা গায়র-মাহ্রামের সম্মুখেও খুলে রাখে, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রকাশ না করে ; (যা মাহ্রাম নয়, তা এমন ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এবং কারও কারও মতে পদযুগলও। পক্ষান্তরে অনর্থের আশংকার

কারণে যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ইত্যাদিরও পর্দা জরুরী। এবং (যদি বৃদ্ধা ও নারীদের জন্য মাহ্রাম নয় এমন ব্যক্তির সামনে মুখমণ্ডল খোলার অনুমতি আছে ; কিন্তু এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম (কেননা, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পর্দাহীনতাকে উচ্ছেদ করা)। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, সূরা নূরের অধিকাংশ বিধান নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন করার উদ্দেশ্যে বিবৃত হয়েছে। এগুলোর সাথে সম্পর্ক রেখে সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতেরও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় নারীদের পর্দার বিধান বর্ণিত হচ্ছে।

আত্মীয়স্বজন ও মাহ্রামদের জন্য বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশ ঃ সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতে "অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী" শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ হোক কিংবা নারী-সবার জন্য অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহ্রাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণত এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দ পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে গৃহে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়—মুস্তাহাব। এটা তরক করা মাকরূহ তানযিহী। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ

فمن اراد الدخول فى بيت نفسه وفيه محرماته يكره له الدخول فيه من غير استيذان تنزيها لاحتمال روية واحدة منهن عريانة وهو احتمال ضعيف مقتضاه التنزه –

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আর এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাযের পরবর্তী সময় । এই তিন সময়ে মাহ্রাম আত্মীয়স্বজন এমনকি, সমঝদার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে

কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলি ভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ—অর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই। কেননা, সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও করে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয় ; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা শরীয়তের কোন আদেশ নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ।

জওয়াব এই যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই—এই সময়ে জিজ্ঞেস না করে ভেতরে এসো না ; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামায শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাযের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোন جناح নেই। جناح শব্দটি সাধারণত গুনাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এখানে لاجناح এর অর্থ তাই; অর্থাৎ কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গুনাহ্গার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল।—(বয়ানুল কোরআন)

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ-এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল আছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সে মাহ্রাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী প্রভুকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

মাসআলা ঃ এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব, না মুস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকাহ্বিদের মতে আয়াতটি মোহ্কাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব। —(কুরতুবী)। কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারও আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও

ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওযর বর্ণনা করেছেন।

প্রথম রেওয়ায়েতটি ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ তিনটি আয়াতের আমল লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনুমতি চাওয়ার আয়াত يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ —এতে আত্মীয়-স্বজন ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকেও অনুমিত গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبٰى—এতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বণ্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বণ্টনের সময় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা মনঃক্ষুণ্ন না হয়। তৃতীয় আয়াত হচ্ছে إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ —এতে বলা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মান ও সম্ভ্রমের পাত্র, যে সর্বাধিক মুত্তাকী। আজকাল যার কাছে পয়সা বেশি, যার বাংলো ও কুঠি সুরম্যও সুদৃশ্য, তাকেই মানুষ সম্মানের পাত্র মনে করে। কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাসের ভাষা এরূপ ঃ তিনটি আয়াতের ব্যাপারে শয়তান মানুষকে পরাভূত করে রেখেছে। অবশেষে তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার দাসীকেও এই তিন সময়ে অনুমতি ব্যতীত আমার কাছে না আসতে বাধ্য করে রেখেছি।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হযরত ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসকে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন إِنَّ اللّٰهَ سَتِيْرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্দাশীল। তিনি পর্দার হিফাযত পছন্দ করেন। আসল কথা এই যে, এসব আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সামাজিক চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। মানুষের দরজায় পর্দা ছিল না এবং গৃহের ভেতরেও পর্দাবিশিষ্ট মশারি ছিল না। তখন মাঝে মাঝে চাকর অথবা পুত্র-কন্যা হঠাৎ এমন সময় গৃহে প্রবেশ করত যে, গৃহকর্তা তখন স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় লিপ্ত থাকত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দেন। বর্তমানে মানুষের দরজায় পর্দা আছে এবং গৃহমধ্যে মশারির ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে, তাই মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, এই পর্দাই যথেষ্ট—অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই।—(ইবনে কাসীর) ঃ ইবনে আব্বাসের এই দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর সাথে লিপ্ত থাকা, আবৃত অঙ্গ খুলে যাওয়া, কারও আগমনের সম্ভাবনা ইত্যাদি ঘটনার আশংকা না থাকলে অনুমতি গ্রহণের বিধান শিথিল হতে পারে। কিন্তু কারও স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করা উচিত। সবারই সুখে শান্তিতে থাকা দরকার। যারা পরিবারের সদস্যদেরকে এ ধরনের অনুমতি গ্রহণের বাধ্য করে না, তারা স্বয়ং কষ্টে পতিত থাকে। তারা নিজেদের প্রয়োজন ও বাঞ্ছিত কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা বোধ করে।

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরও একটি ব্যতিক্রম ঃ ইতিপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিধান বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যতিক্রম দর্শকের দিক দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে। দর্শকের দিক দিয়ে মাহ্‌রাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত

করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিক দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক বোরকা অথবা বড় চাদর বুঝানো হয়েছিল এবং কারও কারও মতে নারীর মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরূপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্‌রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্‌রামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الاية—এর তফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গ মাহরামের সামনে খোলা যায়—যে মাহ্‌রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। কিন্তু শর্ত এই যে, যাদ সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ —অর্থাৎ সে যদি মাহ্‌রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্য উত্তম।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

(৬১) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই, এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের

ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে ; যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি তোমরা কোন অন্ধ, খঞ্জ ও রোগী অভাবীকে তোমাদের কোন স্বজন অথবা পরিচিতের গৃহে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দাও অথবা নিজেরা পানাহার কর, এমতাবস্থায় সেই স্বজন তোমাদের খাওয়ানো ও খাওয়ার কারণে অসন্তুষ্ট ও কষ্ট অনুভব করবে না বলে নিশ্চিতরূপে জানা গেলে) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা (নিজেরা অথবা উপরোক্তদের সহ সবাই) নিজেদের গৃহে (এতে স্ত্রী ও সন্তানদের গৃহেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে) আহার করবে। অথবা (পরে উল্লিখিত গৃহসমূহে আহার করবে। অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের আহার করা ও উপরোক্ত বিকলাঙ্গদের আহার করার মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। এমনিভাবে তোমাদের খাওয়ানো ও তাদের খাওয়ার মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। গৃহগুলো এই ঃ) তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। (এতেও) তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর (মনে রেখ যে) যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের (অর্থাৎ সেখানে যেসব মুসলমান থাকে, তাদের) প্রতি সালাম বলবে (যা) দোয়া হিসেবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং (সওয়াব পাওয়ার কারণে) কল্যাণময়, (এবং প্রতি পক্ষের মন সন্তুষ্ট করার কারণে) উত্তম কাজ। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (নিজের) বিধানাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝ (এবং পালন কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সামাজিকতার রীতিনীতি ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেওয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কোরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের হিফাযতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা কোন মুসলমানের অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ রাসূলের সংসর্গে থাকার জন্য

এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশের প্রতি উৎসর্গ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন। কোরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সংসর্গের পরশ পাথর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁদের জন্য ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ভীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বিধানা-বলী অবতীর্ণ হয়। তফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবলী নিম্নরূপ ঃ

(১) ইমাম বগভী তফসীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশি না খায় এবং সবাই সমান অংশ পায়। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চাইতে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মত বসতে পারি না, দুই জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিদার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

(২) বগভী ইবনে-জারীরের জবানী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কোরআন পাকে لَا تَاكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না) আয়াতটি নাযিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুগ্ন ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোন্টি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশি হওয়ার চিন্তা করো না।

(৩) সাঈদ ইবনে-মুসাইয়িব বলেন ঃ মুসলমানগণ জিহাদে যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে,

তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে বাযযারে হযরত আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জিহাদে যোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ্-ভীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হয়নি আশংকা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের صديقكم (অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করার দোষ নেই) শব্দটি হারিস ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়দের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়দ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। —(মাযহারী) বলা বাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে।

মাসআলা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়ের মতে লৌকিকতার বালাই ছিল না। একে অপরের গৃহে কিছু খেলে গৃহকর্তা মোটেই কষ্ট ও পীড়া অনুভব করত না ; বরং এতে সে আনন্দিত হতো। এমনিভাবে আত্মীয় যদি নিজের সাথে কোন বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও মিসকীনকেও খাইয়ে দিত, তাতেও সে কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করত না। এসব বিষয়ের স্পষ্টত অনুমতি না দিলেও অভ্যাসগতভাবে অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, যেকালে অথবা যেস্থানে এরূপ লোকাচার নেই এবং গৃহকর্তার অনুমতি সন্দেহযুক্ত হয়, সেখানে গৃহকর্তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পানাহার করা হারাম, যেমন আজকাল সাধারণত এই লোকাচার নেই এবং কেউ এটা পছন্দ করে না যে, কোন আত্মীয় তার গৃহে যা ইচ্ছা পানাহার করবে অথবা অপরকে পানাহার করাবে। তাই আজকাল সাধারণভাবে এই আয়াতের অনুমতি অনুযায়ী পানাহার জায়েয নয়। তবে যদি কোন বন্ধু ও স্বজন সম্পর্কে কেউ নিশ্চিতরূপে জানে যে, সে পানাহার করলে অথবা অপরকে পানাহার করালে কষ্ট কিংবা অস্বস্তিবোধ করবে না ; বরং আনন্দিত হবে ; তবে বিশেষ করে তার গৃহে পানাহার করার ব্যাপারে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করা জায়েয।

মাসআলা ঃ উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে—এ কথা বলা ঠিক নয়; বরং বিধানটি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকর আছে। তবে গৃহকর্তার নিশ্চিত অনুমতি এর জন্য শর্ত। এরূপ অনুমতি না থাকলে তা আয়াতের আওতায় পড়ে না। ফলে পানাহার করা জায়েয নয়।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ এমনিভাবে এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান কেবল আয়াতে বর্ণিত বিশেষ আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তার তরফ থেকে পানাহার করা ও করানোর অনুমতি আছে,

এতে সে আনন্দিত হবে এবং কষ্ট অনুভব করবে না, তবে তার ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য।—(মাযহারী) কারও গৃহে অনুমতিক্রমে প্রবেশের পর যেসব কাজ জায়েয অথবা মুস্তাহাব, উল্লিখিত বিধান সেসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এসব কাজের মধ্যে পানাহার ছিল প্রধান, তাই একে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ বলে তাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ্ হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰٓ
أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ
فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾
لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ
إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

(৬২) মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসূলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্য অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৬৩) রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ্ তাদেরকে

জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (৬৪) মনে রেখ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা আল্লাহ্‌রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ, তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুসলমান তো তারাই, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং রাসূলের কাছে যখন কোন সমষ্টিগত কাজের জন্য একত্রিত হয় (এবং ঘটনাক্রমে সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়) তখন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত (এবং তিনি অনুমতি না দিলে সভাস্থল থেকে ওঠে) চলে যায় না। (হে রাসূল) যারা আপনার কাছে (এরূপ স্থলে) অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। (অতঃপর তাদেরকে অনুমতিদানের কথা বলা হচ্ছে ঃ) অতএব তারা (বিশ্বাসীরা এরূপস্থলে) তাদের কোন কাজের জন্যে আপনার কাছে (চলে যাওয়ার) অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যার জন্য (উপযুক্ত মনে করেন এবং অনুমতি দিতে) চান, অনুমতি দিন। (এবং যার জন্য উপযুক্ত মনে করবেন না, তাকে অনুমতি দেবেন না। কেননা, অনুমতি প্রার্থী হয় তো তার কাজটিকে খুব জরুরী মনে করে ; কিন্তু বাস্তবে তা জরুরী নয়, অথবা জরুরী হলেও তার চলে যাওয়ার কারণে তদপেক্ষা বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার ফয়সালা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) এবং অনুমতি দিয়েও তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের, দোয়া করুন। (কেননা, তাদের এই বিদায় প্রার্থনা শক্ত ওযরের কারণে হলেও এতে দুনিয়াকে দীনের উপর অগ্রগণ্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা এক প্রকার ত্রুটি। এর জন্য আপনার পক্ষ থেকে মাগফিরাতের দোয়া করা দরকার। দ্বিতীয়ত এটাও সম্ভব যে, অনুমতিপ্রার্থী যে ওযর ও প্রয়োজনকে শক্ত মনে করে অনুমতি নিয়েছে, তাতে সে ইজতিহাদগত ভুল করেছে। এই ইজতিহাদী ভুল সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সংশোধিত হতে পারত। এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা না করা একটি ত্রুটি। ফলে ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন আছে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাদের নিয়ত ভাল ছিল, তাই এ ধরনের সূক্ষ্ম ব্যাপারাদিতে তিনি ধরপাকড় করেন না)। তোমরা রাসূলের আহবানকে (যখন তিনি কোন ইসলামী প্রয়োজনে তোমাদেরকে একত্রিত করেন) এরূপ (সাধারণ আহবান) মনে করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে আহ্বান কর (যে আসলে আসল, না আসলে না আসল। এসেও যতক্ষণ ইচ্ছা বসল, যখন ইচ্ছা উঠে চলে গেল। রাসূলের আহ্বান এরূপ নয় ; বরং তাঁর আদেশ পালন করা ওয়াজিব এবং অনুমতি ছাড়াই চলে যাওয়া হারাম। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া চলে যায়, তবে রাসূলের তা অজানা থাকতে পারে ; কিন্তু (মনে রেখ) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালভাবে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে (অপরের) চুপিসারে (পয়গম্বরের মজলিস থেকে) সরে যায়। অতএব যারা আল্লাহ্‌র আদেশের (যা রাসূলের মাধ্যমে পৌঁছে) বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে,

তাদের উপর (দুনিয়াতে) কোন বিপর্যয় পতিত হবে, অথবা (পরকালে, তাদেরকে কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে আযাব হওয়াও সম্ভব। আরও মনে রেখ, যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ্ তা'আলা তা জানেন এবং সেদিনকেও, যেদিন সবাই তাঁর কাছে পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তিনি তাদেরকে সব বলে দেবেন, যা তারা করেছিল। তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কিয়ামতের দিনই শুধু নয় আল্লাহ্ তা'আলা তো সব কিছুই জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশেষভাবে রাসূলে করীম (সা)-এর মজলিসের এবং সাধারণ সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে দুইটি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক. যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জিহাদ ইত্যাদির জন্য একত্রিত করেন, তখন ঈমানের দাবি হলো একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে মজলিস ত্যাগ না করা। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, যারা ঈমানের দাবির বিরুদ্ধে দুর্নামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে মজলিসে উপস্থিত হয়ে যায় ; কিন্তু এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে।

আহযাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে 'গাযওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। (কুরতুবী)

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমত আসতেই চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্য সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন এবং অনুমতি নেওয়া জরুরী মনে করতেন না। জওয়াব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয়নি। বরং কোন প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, তার বিধান ; যেমন খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এই বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

اَمْرٍ جَامِعٍ বলে কি বুঝানো হয়েছে?ঃ এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরী মনে করেন ; যেমন আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল।

এই আদেশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না ব্যাপক? ফিকাহ্‌বিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় ; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এই বিধান, তিনি সবাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েয। (কুরতুবী, মাযহারী, বয়ানুল কোরআন) বলা বাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসের জন্য এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য ; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মুস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোন মজলিসে কোন সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য একত্র হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ الاية -এর তফসীরের সার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اضافت الى الفاعل) আয়াতের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছাধীন, বরং তখন সাড়া দেওয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনা ধারার সাথে এই তফসীর অধিক খাপ খায়। তাই মাযহারী ও বয়ানুল কোরআনে এই তফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এর অপর একটি তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, دعاء الرسول-এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন কাজের জন্য ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اضافت الى المفعول)

এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন প্রয়োজনে আহবান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর নাম দিয়ে 'ইয়া মোহাম্মদ' বলো না—এটা বেআদবী ; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' অথবা 'ইয়া নবী আল্লাহ্' বল। এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং যা আদবের পরিপন্থী কিংবা যদ্দারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হুজুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا—অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বল, তখন আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চস্বরে কথা বলো না; যেমন লোকেরা পরস্পরে বলে। আরও একটি উদাহরণ ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ—অর্থাৎ তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে ডেকো না, বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক।

হুঁশিয়ারি ঃ এই দ্বিতীয় তফসীরে বুযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব জানা গেল। তা এই যে, মুরুব্বী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেআদবী। সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহবান করা উচিত।

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ

সূরা আল-ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬ রুকূ, ৭৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ﴿١﴾ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়, (২) তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে (৩) তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কত মহান সেই সত্তা, যিনি ফয়সালার গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) তাঁর বিশেষ দাসের প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য বিশ্বাস স্থাপন না করা অবস্থায় আল্লাহ্‌র আযাব থেকে সতর্ককারী হয়, তিনি এমন সত্তা যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কাউকে নিজের সন্তান সাব্যস্ত করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সবার

পৃথক পৃথক প্রকৃতি রেখেছেন। কোনটির প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য এক রকম এবং কোনটির অন্য রকম। মুশরিকরা আল্লাহ্র পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কোনক্রমেই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা, তারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট এবং নিজেদের কোন ক্ষতির অর্থাৎ ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোন উপকার (অর্জন) করার ক্ষমতা রাখে না। তারা কারও মৃত্যুর মালিক নয় অর্থাৎ কোন প্রাণীর প্রাণ বের করতে পারে না, কারও জীবনেরও ক্ষমতা রাখে না অর্থাৎ কোন নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না এবং কাউকে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত করারও ক্ষমতা রাখে না। যারা এসব বিষয়ে সক্ষম নয়, তারা উপাস্য হতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বৈশিষ্ট্য ঃ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। হযরত ইবনে-আব্বাস ও কাতাদাহ তিনটি আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। —(কুরতুবী) এই সূরার সারমর্ম কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব প্রদান করা।

تَبَارَكَ শব্দটি بركت থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। ইবনে আব্বাস বলেনঃ আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। فرقان কোরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা। কোরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু'জিযার মাধ্যমে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে কোরআন বলা হয়।

لِلْعَالَمِيْنَ—এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا — تخليق-এর পর تقدير উল্লেখ করা হয়েছে। تخليق-এর অর্থ কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা—তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ বিশেষ রহস্য ঃ تقدير—এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা

সেই কাজের উপযোগী, যার জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর ও লোহার ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল ; কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌঁছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ্ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন, কোনরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌঁছে যায় ; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম গায্যালী (র) এ বিষয়ে الحكمة فى مخلوقات الله تعالى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عبده খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্ট মানবের জন্য এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

بنده حسن بصد زبان گفت كے بندة توام
تو بزبان خود بگو بنده نواز كيستى

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ٰافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ﴿٤﴾ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٥﴾ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦﴾ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ﴿٧﴾ اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٨﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩﴾

(৪) কাফিররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। (৫) তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের উপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে শিখানো হয়। (৬) বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপনভেদ অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৭) তারা বলে, এ কেমন রাসূল যা খাদ্য আহার করে এবং হাটেবাজারে চলাফেরা করে ? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হলো না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত ? (৮) অথবা তিনি ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন অথবা তাঁর একটি বাগান হলো না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন ? জালিমরা বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) কিছুই নয়, নিরেট মিথ্যা (ই মিথ্যা) যাকে তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর) উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকে (এই উদ্ভাবনে) তাঁকে সাহায্য করেছেন [এখানে সেসব গ্রন্থধারীকে বুঝানো হয়েছে, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এমনিতেই যাতায়াত করত।] অতএব (এ কথা বলে) তারা যুলুম ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে (এটা যে যুলুম ও মিথ্যা, তা পরে বর্ণিত হবে)। তারা (কাফিররা এই আপত্তির সমর্থনে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) পুরাকালের উপকথা, যা তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর সুন্দর ভাষায় চিন্তাভাবনা করে করে সাহাবীদের হাতে) লিখিয়ে নিয়েছেন (যাতে সংরক্ষিত থাকে), এরপর তাই সকাল-সন্ধায় তাঁর কাছে পঠিত হয় (যাতে স্মরণ থাকে। এরপর মুখস্থ করা অংশ জনসমাবেশে বর্ণনা করে আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া হয়।) আপনি (জওয়াবে) বলে দিন, একে তো সেই (পবিত্র) সত্তা অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব গোপন বিষয় জানেন। (জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এই কালামের অলৌকিকতা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, কাফিরদের এই আপত্তি ভ্রান্ত, মিথ্যা ও যুলুম। কেননা, কোরআন পুরাকালের উপকথা হলে কিংবা অপরের সাহায্যে রচিত হলে সমগ্র বিশ্ব এর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে কেন অক্ষম হতো ?) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাই এ ধরনের মিথ্যা ও যুলুমের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না।) তারা [কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে] বলে, এ কেমন রাসূল যে, (আমাদের মত) খাদ্য (ও) আহার করে এবং (জীবিকার ব্যবস্থার জন্য আমাদের মতই) হাটেবাজারে চলাফেরা করে। (উদ্দেশ্য এই যে, রাসূল মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতা হওয়া উচিত যে পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে।) কমপক্ষে এতটুকু তো হওয়া দরকার যে, রাসূল স্বয়ং ফেরেশতা না হলে তার মুসাহিব ও উপদেষ্টা কোন ফেরেশতা হওয়া উচিত। (তাই তারা বলে) তাঁর কাছে কেন একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হলো না যে, তাঁর সাথে তাকে (মানুষকে আযাব থেকে) সতর্ক করত অথবা (এটাও না হলে কমপক্ষে রাসূলকে পানাহারের প্রয়োজন থেকে নিশ্চিত হওয়া

উচিত, এভাবে যে) তাঁর কাছে (গায়েব থেকে) কোন ধনভাণ্ডার আসত অথবা তাঁর কোন বাগান থাকত, যা থেকে আহার করত। (মুসলমানদেরকে) জালিমরা বলে, (যখন তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা নেই, ধনভাণ্ডার নেই এবং বাগান নেই ; এরপরও সে নবুয়ত দাবি করে, তখন বুঝা যায় যে, তাঁর বুদ্ধি নষ্ট। তাই) তোমরা তা একজন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পথে গমন করছ। (হে মুহাম্মদ) দেখুন, তাঁরা আপনার কেমন অদ্ভুত উপমা বর্ণনা করে। অতএব তাঁরা (এসব প্রলাপোক্তির কারণে) পথভ্রষ্ট হয়েছে, অতঃপর তাঁরা পথ পেতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তাঁর জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয় ; বরং মুহাম্মদ (সা) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরাকালের উপকথা ইহুদী, খ্রিস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর—লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেয় যে, এটা আল্লাহ্র কালাম।

কোরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে ঃ أَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ—এর সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাযিলকারী আল্লাহ্ তা'আলার সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কোরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহ্র কালাম বলে স্বীকার না কর, কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ ; এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মুকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারও হয়নি। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতায় নিজেদের ধনসম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মত ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানব রচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়াই এর অর্থ সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে। পাঠকবর্গ প্রথম খণ্ডে তা দেখে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না ; বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এত ধনভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহ্র রাসূল এ কথা আমরা কিরূপে মানতে পারি ; প্রথম তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয় কোন ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না যে তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি যাদুগ্রস্ত। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا অর্থাৎ দেখুন এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোন উপায় নেই। বিস্তারিত জওয়াব পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٢﴾ وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾ قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا

الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ لا فَمَا

تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ

أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ ع

(১০) কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন—বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি। (১২) অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও চীৎকার। (১৩) যখন এক শিকলে তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। (১৪) বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না—অনেক মৃত্যুকে ডাক। (১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে ? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (১৬) তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার প্রতিপালকের দায়িত্ব। (১৭) সেদিন আল্লাহ্ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই ব্যান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিল ? (১৮) তারা বলবে—আপনি পবিত্র, আমরা আনপার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না ; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (১৯) (আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন,) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গুনাহ্গার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব। (২০) আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি তোমরা সবর কর কি না। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কাফিরদের ফরমায়েশের চাইতে) উত্তম বস্তু দিতে পারেন। (অর্থাৎ অনেক গায়েবী) বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় (উত্তম এ কারণে যে, তারা শুধু বাগ-বাগিচার ফরমায়েশ করত ; যদিও তা একই হয়। একাধিক বাগান যে এক বাগানের চাইতে উত্তম তা বলাই বাহুল্য) এবং (বাগবাগিচার সাথে অন্য উপযুক্ত জিনিসও দিতে পারেন, যার ফরমায়েশ তারা করেনি ; অর্থাৎ) দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ (যেগুলো বাগানেই নির্মিত কিংবা বাইরে। এতে তাদের ফরমায়েশ আরও অধিকতর নিয়ামতসহ পূর্ণ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, যা জান্নাতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তা দুনিয়াতেই আপনাকে দিতে পারেন, কিন্তু কতক রহস্যের কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি এবং মূলতঃ জরুরী ছিল না। অতএব সন্দেহ অনর্থক। তাদের সন্দেহের কারণ নিছক দুষ্টামি এবং সত্যের প্রতি অনীহা। এই অনীহা ও দুষ্টামির কারণ এই যে,) তারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে। (তাই পরিণামের চিন্তা নেই ; যা মনে আসে করে এবং বলে) এবং (তাদের পরিণাম হবে এই যে,) যারা কিয়ামতকে মিথ্যা, মনে করে, আমি তাদের (শাস্তির) জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছি। (কেননা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করলে আল্লাহ্ ও রাসূলকে মিথ্যা মনে করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা জাহান্নামে যাওয়ার আসল কারণ। জাহান্নামের অবস্থা এই যে) সে (অর্থাৎ জাহান্নাম যখন দূর থেকে) তাদেরকে দেখবে, তখন (দেখামাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে এমন গর্জন করে উঠবে যে) তারা (দূর থেকেই) তার গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে। যখন তারা হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে আহবান করবে (যেমন বিপদকালে স্বভাবতই মৃত্যুকে ডাকা হয় এবং মৃত্যু কামনা করা হয়। তখন তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা এক মৃত্যুকে আহবান করো না ; বরং অনেক মৃত্যুকে আহবান কর। (কারণ, মৃত্যুকে আহবান করার কারণ বিপদ। তোমাদের বিপদ অশেষ। প্রত্যেক বিপদই মৃত্যুর আহবান চায়। কাজেই আহবানও অনেক হবে। এখানে বিপদের আধিক্যকেই মৃত্যুর আধিক্য বলা হয়েছে) আপনি (তাদেরকে এই বিপদের কথা শুনিয়ে) বলুন, (বল) এই (বিপদের) অবস্থা ভাল (যা তোমাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে হয়েছে) না চিরকাল বসবাসের জান্নাত (ভাল), যার ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্ ভীরুদেরকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) দিয়েছেন? সেটা তাদের আনুগত্যের) প্রতিদান এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। তারা সেখানে যা চাইবে, তা পাবে (এবং) তারা (তথায়) চিরকাল থাকবে। (হে পয়গম্বর) এটা একটা ওয়াদা, যা পূরণ করা (কৃপা হিসেবে) আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব এবং দরখাস্তযোগ্য। (বলা বাহুল্য, চিরকাল বসবাসের জান্নাতই শ্রেষ্ঠ। অতএব আয়াতে ভীতি প্রদর্শনের পর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।) আর (সেইদিন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন,) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে (যারা স্বেচ্ছায় কাউকে পথভ্রষ্ট করেনি তা মূর্তি হোক কিংবা ফেরেশতা প্রমুখ হোক) একত্রিত করবেন, অতঃপর (উপাসকদের লাঞ্ছনার জন্য উপাস্যদেরকে) বলা হবে, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে (সৎপথ থেকে) বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা (নিজেরাই) পথভ্রান্ত হয়েছিল ? উদ্দেশ্য এই

যে, তোমাদের ইবাদত বাস্তবে পথভ্রষ্টতা ছিল। তারা এই ইবাদত তোমাদের আদেশ ও সম্মতিক্রমে করেছিল; যেমন তাদের ধারণা তাই ছিল যে, এই উপাস্যরা আমাদের ইবাদতে সন্তুষ্ট হয় এবং সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে, না তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি দ্বারা এটা উদ্ভাবন করেছিল ?) তারা (উপাস্যরা) বলবে, আমাদের কি সাধ্য ছিল যে, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করি ? সেই মুরুব্বী আমরাই হই কিংবা অন্য কেউ হোক। অর্থাৎ আমরা যখন খোদায়ীকে আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করি, তখন শিরক করার আদেশ অথবা তাতে সম্মতি কিরূপে করতে পারতাম ? কিন্তু তাঁরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পথভ্রষ্টও এমন অযৌক্তিকভাবে হয়েছে যে, তারা কৃতজ্ঞতার কারণসমূহকে কুফরের কারণ করে দিয়েছে। সেমতে) আপনি তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে (খুব) ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন। (তাদের উচিত নিয়ামতদাতাকে চেনা, তাঁর শোকর ও আনুগত্য করা ; কিন্তু) তারা পরিণামে কুপ্রবৃত্তি ও আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে) আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। (জওয়াবে তারা একথাই বলল যে, তাঁরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে, আমরা করেনি। আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তাদের পথভ্রষ্টতাকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপাসনাকারীদেরকে জব্দ করার জন্য বলবেন এবং এটাই প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদের উপাস্যরা তো তোমাদের কথা মিথ্যাই সাব্যস্ত করল, (ফলে তাঁরাও তোমাদের সাহচর্য ত্যাগ করেছে এবং অপরাধ পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে গেছে)। অতএব (এখন) তোমরা (নিজেরাও শাস্তি) প্রতিরোধও করতে পারবে না এবং (অন্য কারও পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (এমনকি, যাদের উপর পূর্ণ ভরসা ছিল, তারাও পরিষ্কার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং তোমাদের বিরোধিতা করছে) তোমাদের মধ্যে যে জালিম (অর্থাৎ মুশরিক), আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব (যদিও তখন সম্বোধিতরা সবাই মুশরিক হবে ; কিন্তু যুলুমের দাবি ও যে শাস্তি, তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য বিধায় একথা বলা হয়েছে।) আপনার পূর্বে আমি যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তাঁরা সবাই খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুয়ত ও খানা খাওয়া ইত্যাদির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেমতে যাদের নবুয়ত প্রমাণিত, আপত্তিকারীরা স্বীকার না করলেও তারা সবাই এসব কাজ করেছেন। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধেও এই আপত্তি ভ্রান্ত। হে পয়গম্বর, হে পয়গম্বরের অনুসারীবৃন্দ, তোমরা কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হয়ো না। কেননা) আমি তোমাদের (সমষ্টির) এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। (এই চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণকে উম্মতের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি যে, দেখা যাক, কে তাঁদের মানবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করত মিথ্যারোপ করে এবং কে তাদের নবুয়তের গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করত ঃ সত্যায়িত করে। যখন এ কথা জানা গেল, তখন) তোমরা কি (এখনও) সবর করবে ? (অর্থাৎ সবর করা উচিত।) এবং (নিশ্চয়) আপনার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন। (সেমতে প্রতিশ্রুত সময়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কাজেই আপনি দুঃখিত হবেন কেন ?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাণ্ডার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ করা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি ; যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে অগাধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পর্থিব ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনাদে আহ্মদ ও তিরমিযীতে হযরত আবূ উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমগ্র মক্কাভূমি ও তাঁর পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরয করলাম না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব—এ অবস্থাই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। —(মাযহারী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণত ঃ দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয় ; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিত্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোন ঔৎসুক্যই হয় নাই। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফিরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফিরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্র রাসূল মানব হতে পারে না—ফেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য। কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গম্বরকে তোমরাও নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন ; তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী নয় وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اَنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الاية আয়াতে এই বিষয়ই বর্ণিত আছে।

মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ঃ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সবকিছু করার শক্তি ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না ; কিন্তু এর কারণে বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবলও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণী, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ন ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রূপ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমা অপেক্ষা বেশি কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিম্নস্তরের—যাতে তুমি হিংসার গুনাহ্ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শোকর করতে পার।

(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না কেন ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন ? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। (২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার আশংকা করে না, (কেননা, তারা কিয়ামত ও তাতে বিচারের সম্মুখীন হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ হওয়া অস্বীকার করে,) তারা (রিসালত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না কেন ? (যদি ফেরেশতা এসে বলে যে, তিনি রাসূল) অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে প্রত্যক্ষ করি (এবং তিনি নিজে আমাদেরকে বলে দেন যে, তিনি রাসূল, তবে আমরা

তাঁকে সত্য মনে করব। জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) তারা নিজের অন্তরে নিজেদেরকে খুব বড় মনে করেছে। (তাই তারা নিজেদেরকে ফেরেশতা অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে সম্বোধনের যোগ্য বলে মনে করে। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়াতে দেখা এবং তাঁর সাথে কথা বলার ফরমায়েশে) তারা (মানবতার) সীমালংঘন করে অনেক দূর চলে গিয়েছে। (কেননা, ফেরেশতা ও মানবের মধ্যে তো কোন কোন বিষয়ে অভিন্নতা আছে ; তারা উভয়েই আল্লাহ্র সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ও মানবের মধ্যে অভিন্নতা ও সামঞ্জস্য নেই। তারা আল্লাহ্কে দেখার যোগ্য তো নয়ই ; কিন্তু ফেরেশতা একদিন তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। তবে যেভাবে তারা চায়, সেভাবে নয়, বরং তাদের আযাব, বিপদ ও পেরেশানী নিয়ে) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে, (সেদিন হবে কিয়ামতের দিন) সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসতে দেখে অস্থির হয়ে) তারা বলবে, আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا — رجا শব্দের সাধারণ অর্থ কোন প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোন সময় আশংকা করার অর্থও ব্যবহৃত হয়। (কিতাবুল-আযদাদ ইবনুল-আম্বারী) এখানে এই অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সেই করতে পারে, যে এ পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত থাকে যে, সে ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলী সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকার আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

حِجْرًا مَّحْجُوْرًا — حجر এর শাব্দিক অর্থ সুরক্ষিত স্থান। محجور এর তাকীদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয় ঃ আশ্রয় চাই ; আশ্রয় চাই। অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কিয়ামতের দিনেও যখন কাফিররা ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী এ কথা বলবে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ حراما محرما বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা জওয়াবে حِجْرًا مَّحْجُوْرًا বলবে। অর্থাৎ কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ। —(মাযহারী)

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ
الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ
مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِي
عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ
الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا
لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

(২৩) আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব। (২৪) সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (২৫) সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, (২৬) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্র এবং কাফিরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৭) জালিম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস ! আমি যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম ! (২৯) আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে দাগা দেয়। (৩০) রাসূল (সা) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে। (৩১) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। আপনার জন্য আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (সেদিন) তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) সেসব (সৎ) কাজের প্রতি, যা তারা (দুনিয়াতে) করেছিল মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে (প্রকাশ্যভাবে) বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (অর্থাৎ ধূলিকণার ন্যায় নিষ্ফল) করে দেব। (বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা যেমন কোন কাজে আসে না, তেমনিভাবে কাফিরদের কৃতকর্মের কোন সওয়াব হবে না। তবে) জান্নাতবাসীদের

সেদিন আবাসস্থলও হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থলও হবে মনোরম। (مستقر ও مقيل বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে ; অর্থাৎ জান্নাত তাদের আবাসস্থল ও বিশ্রামস্থল হবে। এটা যে উত্তম, তা বলাই বাহুল্য।) যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং (সেই মেঘলামার সাথে আকাশ থেকে) প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতা (পৃথিবীতে) নামানো হবে, (তখনই আল্লাহ্ তা'আলা হিসাব নিকাশের জন্য বিরাজমান হবেন এবং) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় আল্লাহ্রই হবে। (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান-শাস্তিদানের কাজে কারও প্রভাব খাটবে না ; যেমন দুনিয়াতে বাহ্যিক ক্ষমতা অল্পবিস্তর অন্যের হাতেও থাকে।) সেদিন কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। (কেননা, জাহান্নামই তাদের হিসাব-নিকাশের পরিণতি।) এবং সেদিন জালিম (অর্থাৎ কাফির অত্যন্ত পরিতাপ সহকারে) আপন হস্তদ্বয় দংশন করবে (এবং) বলবে, হায়, যদি আমি রাসূলের সাথে (ধর্মের) পথে থাকতাম। হায় আমার দুর্ভোগ, (এরূপ করিনি।) যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। সে (হতভাগা) আমাকে উপদেশ আগমনের পর তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে (সরিয়ে দিয়েছে) শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে সাহায্য করতে অস্বীকার করে বসে। (সেমতে সে এই বিপদকালে কাফিরের কোন সাহায্য করেনি। করলেও অবশ্য কোন লাভ হতো না। দুনিয়াতে বিভ্রান্ত করাই তার কাজ ছিল।) এবং (সেদিন) রাসূল (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে) বলবেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় কোরআনকে (যা অবশ্য পালনীয় ছিল) সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করে রেখেছিল। (আমল করা তো দূরের কথা, তারা এদিকে ভ্রুক্ষেপই করত না। উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা নিজেরাও তাদের পথভ্রষ্টতা স্বীকার করবে এবং রাসূলও সাক্ষ্য দেবেন ; যেমন বলা হয়েছে। وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا অপরাধ প্রমাণের এ দু'টি পন্থাই সর্বজনস্বীকৃত। স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য—এ দু'টি একত্রিত হওয়ার কারণে অপরাধ প্রমাণ আরও জোরদার হয়ে যাবে এবং তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে) এমনি ভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। (অর্থাৎ এরা যে, কোরআন অস্বীকার করে আপনার বিরোধিতায় মেতেছে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়, যার জন্য আপনি দুঃখ করবেন) এবং (যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা হয়, তাকে) হিদায়াত করার জন্য ও (হিদায়াত বঞ্চিতদের মুকাবিলায় আপনাকে) সাহায্য করার জন্য আপনার পালনকর্তাই যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا — مستقر শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مقيل শব্দটি قيلولة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مقيل এর উল্লেখ সম্ভবত এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিপ্রহরের সময় সৃষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। —(কুরতুবী)

تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ এখানে بالغمام এর অর্থ عن الغمام অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নিচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ্ তা'আলার দ্যূতি থাকবে,

আশেপাশে থাকবে ফেরেশতার দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। —(বয়ানুল-কোরআন)

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا—এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবতীর্ণ হয়েছে ; কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনা এই ঃ ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোন সফর থেকে ফিরে এলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ্ এক, ইবাদতের তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। ওকবা এই কালেমা উচ্চারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হলো। ওকবা ওযর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ (সা) আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য এই কালেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল ঃ আমি তোমার এই ওযর কবূল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হলো এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। —(বগভী) পরকালে তাদের শাস্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে ঃ হায় আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। —(মাযহারী, কুরতুবী)

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে ঃ তফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল ; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فلانا (অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে মিলিত হয় এবং শরীয়তবিরোধী কার্যাবলীতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে আহ্মদ তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لاتصاحب الامؤمنا ولاياكل مالك الاتقى কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার

ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) যেন পরহিযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ পরহিযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবূ হুরায়রার জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المرء على دين خليله فلينظر من يخالل — প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। —(বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম ? তিনি বললেন ঃ من ذكركم بالله رويته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالاخرة عمله অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়। —(কুরতুবী)

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا—অর্থাৎ রাসূল মুহাম্মদ (সা) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ্র দরবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ—অর্থাৎ আপনার শত্রুরা কোরআন অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা, এটাই আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গম্বরগণ তজ্জন্যে সবর করেছেন।

কোরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ ঃ কোরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফিরদেরই কাজ। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কোরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সেও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يارب العالمين ان عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه –

যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে ; রীতিমত তিলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কোরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উত্থিত হবে। কোরআন আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন।—(কুরতুবী)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

(৩২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ হলো না কেন ? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা বলে, তাঁর (অর্থাৎ পয়গম্বরের) প্রতি কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ করা হলো না কেন ? (এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন আল্লাহ্র কালাম হলে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল। এতে তো সন্দেহ হয় যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই চিন্তা করে করে অল্প অল্প রচনা করেন। এর জওয়াব এই যে,) এমনিভাবে (ক্রমে ক্রমে) এজন্য (অবতীর্ণ করেছি,) যাতে এর মাধ্যমে আমি আপনার হৃদয়কে মজবুত রাখি এবং (এজন্যই) আমি একে অল্প অল্প করে (তেইশ বছরে) নাযিল করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে কাফির ও মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জওয়াব দেয়া হচ্ছিল। এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। প্রথম, এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাযিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনরূপ পেরেশানী থাকে না। দ্বিতীয়. কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্য কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কোরআন এক দফায় নাযিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনা বাণী কোরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরী ছিল না। তৃতীয়, আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহ্র পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য আছে। তন্মধ্যে কতক সূরা বনী ইসরাইলের, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কোরআন)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا

مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

(৩৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট। (৩৫) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তাঁর সাথে তাঁর ভ্রাতা হারূনকে সাহায্যকারী করেছি। (৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা আপনার কাছে যত অভিনব প্রশ্নই উপস্থাপিত করুক আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি (যাতে আপনি বিরোধীদেরকে উত্তর দেন। এটা বাহ্যত হৃদয় মজবুত করার বর্ণনা, যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য হচ্ছে আপনার অন্তর মজবুত করা। কাফিরদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জওয়াব প্রদান করা হয়)। তারা এমন লোক, যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। তাদের স্থান নিকৃষ্ট এবং তাঁরা তরিকার দিক দিয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। (এ পর্যন্ত রিসালত অস্বীকার করার কারণে শাস্তিবাণী এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এর সমর্থনে অতীত যুগের কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যাতে রিসালত অস্বীকারকারীদের পরিণতি ও বিস্ময়কর অবস্থা বিবৃত হয়েছে। এতেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সান্ত্বনা ও হৃদয় মজবুত করার উপকরণ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে যেভাবে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে শত্রুর উপর প্রবল করেছেন, আপনার ক্ষেত্রেও তাই করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথম ঘটনা হযরত মূসা (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে যে,) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) দিয়েছিলাম এবং (এর আগে) আমি তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারূনকে তাঁর সাহায্যকারী করেছিলাম। অতঃপর আমি (উভয়কে) বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে (হিদায়াত করার জন্য) যাও, যারা আমার (তওহীদের) প্রমাণাদিকে মিথ্যারোপ করেছে (অর্থাৎ

ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়। সেমতে তাঁরা সেখানে গেলেন এবং বুঝালেন ; কিন্তু তারা মানল না)। অতঃপর আমি তাদেরকে (আযাব দ্বারা) সমূলে ধ্বংস করে দিলাম (অর্থাৎ সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিলাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا —এতে ফিরাউন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে. তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তওরাত মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এখানে তওরাতের আয়াতকে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে না; বরং আয়াতের অর্থ—হয় তওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধিজ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে—এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ করা বলা হয়েছে, না হয় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ঐতিহ্য, যা কিছু না কিছু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে। মিথ্যারোপ দ্বারা এসব ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি বুঝানো হয়েছে ঃ যেমন কোরআন পাকে বলা হয়েছে وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে। —(বয়ানুল কোরআন)

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۚ ﴿۳۷﴾ وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿۳۸﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۫ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْۤ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿۴۰﴾ وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿۴۱﴾ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَاۤ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۴۲﴾ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿۴۳﴾ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۴۴﴾

(৩৭) নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। জালিমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামূদ, কূপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। (৩৯) আমি প্রত্যেকের জন্যই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (৪০) তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না ? বরং তারা পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা করে না। (৪১) তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন ? (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। তবুও কি আপনি যিম্মাদার হবেন ? (৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে ? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত ; বরং আরও পথভ্রান্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নূহের সম্প্রদায়কেও (তাদের সময়ে) আমি ধ্বংস করেছি। তাদের ধ্বংস ও ধ্বংসের কারণ ছিল এরূপ) তারা যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে (প্লাবনে) নিমজ্জিত করে দিলাম এবং তাদের (ঘটনা)-কে করে দিলাম মানব জাতির জন্যে (শিক্ষার) নিদর্শনস্বরূপ। (এ হলো দুনিয়ার শাস্তি) এবং (পরকালে আমি (এই) জালিমদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামূদ, কূপবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। আমি (তাদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকের (হিদায়াতের) জন্যে অভিনব (অর্থাৎ কার্যকরী ও প্রাঞ্জল) বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছি এবং (যখন তারা মানল না, তখন) আমি সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা (কাফিররা সিরিয়ার সফরে) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, যার উপর বর্ণিত হয়েছিল (প্রস্তরের) মন্দ বৃষ্টি (লূতের সম্প্রদায়ের জনপদ বুঝানো হয়েছে)। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না ? (এরপরও শিক্ষা গ্রহণ করে কুফর ও মিথ্যারোপ ত্যাগ করে না, যার কারণে লূতের সম্প্রদায় শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। আসল কথা এই যে, শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণ প্রত্যক্ষ না করা নয় ;) বরং (আসল কারণ এই যে,) তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের আশংকাই রাখে না (অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাস করে না, তাই কুফরকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে না এবং পূর্ববর্তীদের বিপর্যয়কে কুফরের দুর্ভোগ মনে করে না ; বরং আকস্মিক ঘটনা মনে করে)। যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন কেবল ঠাট্টা-বিদ্রোপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে (এবং বলে ঃ) এই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন ? (অর্থাৎ এমন নিঃস্ব ব্যক্তির রাসূল হওয়া ঠিক নয়। রিসালত বলে কোন কিছু থাকলে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির রাসূল হওয়া উচিত। সুতরাং সে রাসূলই নয়। তবে তার বর্ণনাভঙ্গি এত চিত্তাকর্ষক যে,) সে তো আমাদেরকে আমাদের

উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে (শক্তরূপে) আঁকড়ে না থাকতাম। (অর্থাৎ আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর খণ্ডন করে বলেন, জালিমরা এখন তো নিজেদেরকে পথপ্রাপ্ত এবং আমার পয়গম্বরকে পথভ্রষ্ট বলছে, মৃত্যুর পর) যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে পথভ্রষ্ট ছিল, (তারা নিজেরা না পয়গম্বর ? এতে তাদের অনর্থক আপত্তির জওয়াবের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবুয়ত ও ধনাঢ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। ধনাঢ্য না হওয়ার কারণে নবুয়ত অস্বীকার করা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু দুনিয়াতে মনে যা ইচ্ছা হয় করুক, পরকালে স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যাবে)। হে পয়গম্বর, আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন, যে তার উপাস্য করেছে তার প্রবৃত্তিকে ? অতএব আপনি কি তার দায়িত্ব নিতে পারেন ? অথবা কি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে ?) (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের হিদায়াত না পাওয়ার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনি এ জন্যে আদিষ্ট নন যে, তারা চাক বা না চাক, আপনি তাদেরকে সৎপথে আনবেনই। তাদের কাছ থেকে হিদায়াত আশাও করবেন না। কারণ তারা সত্য কথা শোনে না এবং বুঝেও না ;) তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, (চতুষ্পদ জন্তু কথা শোনে না এবং বুঝেও না) বরং তারা আরও পথভ্রষ্ট। (কারণ, চতুষ্পদ জন্তু ধর্মের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন নয় ; কাজেই তাদের না বুঝা নিন্দনীয় নয় কিন্তু তারা এর আওতাধীন। এরপরও তারা বুঝে না। এছাড়া চতুষ্পদ জন্তু ধর্মের জরুরী বিষয়সমূহে বিশ্বাসী না হলেও অবিশ্বাসীও তো নয়: কিন্তু তারা অবিশ্বাসী। আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন প্রমাণ ও সন্দেহ নয়, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণই এর কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নূহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রাসূল ছিলেন না এবং তারাও কোন রাসূলকে মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ)-কে মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরের অভিন্ন, তাই একজনকে মিথ্যারোপ করাও সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল।

اَصْحٰبُ الرَّسِّ —অভিধানে رس শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। কোরআন পাক ও কোন সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি। ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিভিন্ন রূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কূপের ধারে বাস করত। (কামুস, দুররে মনসুর) তাদের শাস্তি কি ছিল, তাও কোরআনে ও কোন সহীহ্ হাদীস বিবৃত হয়নি।—(বয়ানুল কোরআন)

শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা ঃ اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ এই আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তিযার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। —(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا

الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿৪৫﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿৪৬﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿৪৭﴾ وَهُوَ الَّذِي

أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿৪৮﴾

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿৪৯﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿৫০﴾ وَلَوْ

شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿৫১﴾ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ

بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿৫২﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ

أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿৫৩﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ

الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿৫৪﴾ وَيَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ

رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿৫৫﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿৫৬﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿৫৭﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ

الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿৫৮﴾

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى

الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿৫৯﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ

قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ق اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾ (সিজদা) تَبٰرَكَ الَّذِىْ

جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِىْ

جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

(৪৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে লম্বা করেন ? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্য। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, (৪৯) তা দ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। (৫০) এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শকারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। (৫৩) তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিস্বাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (৫৪) তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। (৫৫) তারা ইবাদত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না ; কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গুনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (৫৯) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাঁকে জিজ্ঞেস কর। (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে ? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব ? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও উজ্জ্বল্যময় চন্দ্র। (৬২) যারা

অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি তোমার পালনকর্তার (এই কুদরতের) দিকে দেখনি যে, তিনি (যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দণ্ডায়মান বস্তুর) ছায়াকে কিভাবে (দূর পর্যন্ত) বিস্তৃত করেন ? (কেননা, সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া লম্বা হয়।) তিনি ইচ্ছা করলে একে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন (অর্থাৎ সূর্য উপরে উঠলেও ছায়া হ্রাস পেত না এভাবে যে, সূর্যের কিরণ এত দূরে আসতে দিতেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কারণেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে পৌঁছে ; কিন্তু আমি রহস্যের কারণে একে এক অবস্থায় রাখিনি ; বরং বিস্তৃতিশীল রেখেছি)। অতঃপর আমি সূর্যকে (অর্থাৎ সূর্য দিগন্তের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়াকে) এর (অর্থাৎ ছায়ার বড় ও ছোট হওয়ার) উপর (একটি বাহ্যিক) আলামত করেছি। (উদ্দেশ্য এই যে, আলো ও ছায়া এবং এদের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক তো আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা, সূর্য কিংবা অন্য কোন কিছু সত্যিকার নিয়ন্ত্রক নয় ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে সৃষ্ট বিষয়সমূহের জন্যে কিছু বাহ্যিক কারণ বানিয়ে দিয়েছেন এবং কারণের সাথে তার ঘটনার এমন ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, কারণের পরিবর্তনে ঘটনার মধ্যেও পরিবর্তন হয়।) এরপর (এই বাহ্যিক সম্পর্কের কারণে) আমি একে (অর্থাৎ ছায়াকে) নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (অর্থাৎ সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকে, ছায়া ততই নিঃশেষিত হতে থাকে। যেহেতু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল আল্লাহ্‌র কুদরতেই ছায়া অদৃশ্য হয় এবং সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে অদৃশ্য নয়, তাই "নিজের দিকে গুটিয়ে আনি" বলা হয়েছে।) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছেন এবং দিনকে (নিদ্রা মৃত্যুর মত এবং দিবা জাগ্রত হওয়ার সময়—এদিক দিয়ে যেন) জীবিত হওয়ার সময় করেছেন। তিনিই স্বীয় রহমত বৃষ্টির প্রাক্কালে বাতাস প্রেরণ করেন, যা (বৃষ্টির আশা সঞ্চার করে অন্তরকে) আনন্দিত করে। আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, যাতে তা দ্বারা মৃত ভূ-ভাগকে জীবিত করি এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষকে পান করাই। আমি তা (অর্থাৎ পানি উপযোগীতা পরিমাণে) মানুষের মধ্যে বিতরণ করি, যাতে তারা চিন্তা করে (যে, এসব কর্ম কোন সর্বশক্তিমানের, তিনিই ইবাদতের যোগ্য)। অতএব (চিন্তা করে তাঁর ইবাদত করা উচিত ছিল ; কিন্তু) অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা না করে রইল না। (এর মধ্যে সর্ববৃহৎ অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে কুফর ও শিরক। কিন্তু আপনি তাদের, বিশেষ করে অধিকাংশের অকৃতজ্ঞতা শুনে অথবা দেখে ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবে না। আপনি একাই কাজ করে যান। কেননা, আপনাকে একা নবী করার উদ্দেশ্য আপনার পুরস্কার ও নৈকট্য বৃদ্ধি করা।) আমি ইচ্ছা করলে (আপনাকে ছাড়া এ সময়েই) প্রত্যেক জনপদে একজন পয়গম্বর প্রেরণ

করতে পারতাম (এবং একা আপনাকে সব দায়িত্ব অর্পণ করতাম না ; কিন্তু যেহেতু আপনার পুরস্কার বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য, তাই আমি এরূপ করিনি। এভাবে আপনার দায়িত্বে বেশি কাজ অর্পণ করাও আল্লাহ্‌র নিয়ামত)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি কাফিরদের আনন্দিত হওয়ার মত কাজ করবেন না। (অর্থাৎ আপনি প্রচার কার্য ছেড়ে দিলে কিংবা কম করলে এবং তাদেরকে কিছু না বললে তারা আনন্দিত হবে) এবং কোরআন দ্বারা (অর্থাৎ কোরআনে যেসব প্রমাণ উল্লিখিত আছে, যেমন এখানেই তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দ্বারা) তাদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে সংগ্রাম চালিয়ে যান। (অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ প্রচারকার্য চালান, সবাইকে বলুন, বারবার বলুন এবং মনে অটুট বল রাখুন। এ পর্যন্ত যেমন করে এসেছেন, তা অব্যাহত রাখুন। এরপর আবার তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনিই দুই সমুদ্র মিলিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, তৃপ্তিদায়ক এবং একটির পানি লোনা, বিস্বাদ এবং (দেখার মধ্যে পরস্পর মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে (স্বীয় কুদরত দ্বারা) একটি অন্তরায় ও (সত্যিকারভাবে মিশে যাওয়া রোধ করার জন্যে) একটি দুর্ভেদ্য আড়াল রেখেছেন (যা স্বয়ং প্রকাশ্য ও অনুভূত নয় ; কিন্তু তার প্রভাব অর্থাৎ উভয় পানির স্বাদের পার্থক্য অনুভূত ও প্রত্যক্ষ। এখানে 'দুই সমুদ্র' বলে এমন স্থান বুঝানো হয়েছে, যেখানে মিঠাপানির নদী ও নহর প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। এরূপ স্থানে পানির পৃষ্ঠদেশ এক মনে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কুদরতে নদী ও সমুদ্রের মাঝখানে একটি ব্যবধান থাকে। ফলে সঙ্গমস্থলের একদিকের পানি মিষ্টি এবং নিকটবর্তী অপরদিকের পানি লোনা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যেস্থানে মিঠা পানির নদী-নালা সমুদ্রের পানিতে পতিত হয়, সেখানে দেখা যায় যে, কয়েক মাইল পর্যন্ত মিষ্ট ও লোনা পানি আলাদা-আলাদা প্রবাহিত হয়। ডানদিকে মিঠা পানি এবং বামদিকে লোনা ও তিক্ত পানি অথবা উপরে নিচে মিঠা ও তিক্ত পানি আলাদা আলাদা দেখা যায়। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী এই আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, বয়ানুল কোরআনে দুইজন নির্ভরযোগ্য বাংলা ভাষী আলিমের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নদীর দুই দিকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দু'টি নদী দৃষ্টিগোচর হয়। একটির পানি সাদা এ অপরটির পানি কালো। কালো পানিতে সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় এবং সাদা পানি স্থির থাকে। সাম্পান সাদা পানিতে চলে। উভয়ের মাঝখানে একটি স্রোতরেখা দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে ; এটা উভয়ের সঙ্গমস্থল। জনশ্রুতি এই যে, সাদা পানি মিষ্ট এবং কালো পানি লোনা। আমার কাছে বরিশালের জনৈক ছাত্র বর্ণনা করেছে যে, বরিশাল জেলায় একই সাগর থেকে নির্গত দু'টি নদীর মধ্যে একটির পানি লোনা ও তিক্ত এবং অপরটি পানি মিষ্ট ও সুস্বাদু। আমি গুজরাটে আজকাল যে স্থানে অবস্থানরত আছি (ডাভেল, জেলা সুরাট) সমুদ্র এখান থেকে প্রায় দশ-বার মাইল দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের নদীগুলোতে সব সময় জোয়ার ভাটা হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য লোকের বর্ণনা এই যে, জোয়ারের সময় যখন সমুদ্রের পানি নদীতে প্রবেশ করে, তখন মিঠা পানির উপরিভাগে

লোনা পানি সবেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তখনও উভয় পানি পরস্পর মিশে যায় না। উপরে লোনা পানি থাকে এবং নিচে মিঠা পানি। ভাটার সময় উপর থেকে লোনা পানি সরে যায় এবং মিঠা পানি যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ এসব সাক্ষ্য প্রমাণদৃষ্টে আয়াতের উদ্দেশ্য বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র কুদরত দেখুন, লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়ার পানি কোথাও না কোথাও একাকার হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে একটি অপরটি থেকে পৃথক থাকে !) তিনিই পানি থেকে (অর্থাৎ বীর্য থেকে) মানব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কশীল করেছেন (সে মতে বাপ , দাদা ইত্যাদি শরীয়তগত বংশ এবং মা, নানী ইত্যাদি প্রচলিত বংশ। জন্মের সাথে সাথেই তাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর বিবাহের পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাও কুদরতের প্রমাণ যে, আল্লাহ্ বীর্যকে কিরূপে রক্তবিশিষ্ট করে দেন এবং এটা নিয়ামতও ; কারণ এসব সম্পর্কের উপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তোমার পালনকর্তা সর্বশক্তিমান। (আল্লাহ্র পরিপূর্ণ সত্তা ও গুণাবলী দৃষ্টে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত ছিল ; কিন্তু) তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা (ইবাদত করার কারণে) তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং (ইবাদত না করলে) কোন অপকারও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকারী। (কারণ, তারা তাঁর পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করে। কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ জ্ঞাত হয়ে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে কেবল (মু'মিনদেরকে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা এবং (কাফিরদেরকে দোযখ থেকে) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (তারা বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনার কি ক্ষতি ? আপনি তাদের বিরোধিতা জেনে এরূপ চিন্তাও করবেন না যে, তারা যখন আল্লাহ্র বিরোধী তখন আল্লাহ্র দিকে আমার দাওয়াতকে তারা হিত-কামনা মনে করবে না : বরং তারা আমার স্বার্থপরতা ভেবে এদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। অতএব অন্তরায় দূর করার জন্য তাদের ধারণা কিরূপে সংশোধন করা যায় ? সুতরাং তাদের এই ধারণা যদি আপনি ইশারা ইঙ্গিতে কিংবা মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন, তবে) আপনি (জওয়াবে এতটুকু) বলে দিন (এবং নিশ্চিত হয়ে যান) যে, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য (অর্থাৎ প্রচারকার্যের জন্য) কোন (অর্থগত কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিগত) বিনিময় চাই না। তবে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দিকে (পৌঁছার) রাস্তা অবলম্বন করার ইচ্ছা করে, (আমি অবশ্যই তা চাই। একে তোমরা বিনিময় বল কিংবা না বল। কাফিরদের বিরোধিতার কথা জেনে আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টেরও আশংকা করবেন না ; বরং প্রচারকার্যে) সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং নিশ্চিন্তে তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (কাফিরদের দ্বারা অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই আশংকায় তাদের জন্য দ্রুত শাস্তি কামনা করবেন না। কেননা,) তিনি (আল্লাহ্) বান্দার গুনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। [তিনি যখন উপযুক্ত মনে করবেন, শাস্তি দেবেন। সুতরাং উপরোক্ত কয়েকটি বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনোকষ্ট ও চিন্তা দূর করা হয়েছে।

অতঃপর আবার তাওহীদ বর্ণনা করা হচ্ছে] তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে (—যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ এভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর জন্য উপযুক্ত ; এ সম্পর্কে সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকূর শুরুর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে)। তিনি পরম দয়াময়, তাঁর সম্পর্কে যে অবগত, তাঁকে জিজ্ঞেস কর (যে তিনি কিরূপ ? কাফির ও মুশরিকরা কি জানে। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই তারা শিরক করে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ) তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, রহমানকে সিজদা কর, তখন (মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে) তারা বলে, রহমান আবার কে ? (যার সামনে আমাদেরকে সিজদা করতে বলছে ?) তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা তাকে সিজদা করব ? এতে তাদের বিরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। (রহমান শব্দটি তাদের মধ্যে কম প্রচলিত ছিল ; কিন্তু জানত না, এমন নয়। তবে ইসলামী শিক্ষার সাথে যে তাদের তীব্র বিরোধ ছিল, তা বাচনভঙ্গি ও কথাবার্তায়ও তারা সযত্নে ফুটিয়ে তুলত। ফলে কোরআনে বহুল ব্যবহৃত এই শব্দটিরও তারা বিরোধিতা করে বসে।) কত মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে বৃহদাকারের নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং (এগুলোর মধ্যে দুইটি বৃহৎ উজ্জ্বল ও উপকারী নক্ষত্র অর্থাৎ) তাতে (আকাশে) এক প্রদীপ (মানে সূর্য) এবং এক আলোকিত চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (সম্ভবত প্রখরতার কারণে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে।) তিনি রাত্রি ও দিনকে একে অপরের পশ্চাৎগামী করে সৃষ্টি করেছেন (তাওহীদের এসব প্রমাণ ও আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের বর্ণনা) সেই ব্যক্তির (বুঝার) জন্য, যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত চায়। কারণ, এতে সমঝদারের দৃষ্টিতে প্রমাণাদি আছে এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে নিয়ামত বর্তমান। নতুবা

اگر صدباب حکمت پیش ناداں
بخوانی آیدش بازیچہ درگوش

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহ্র কুদরতের অধীন ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ রৌদ্র ও ছায়া দুইটি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রোদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজও এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদ্বয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ

করে, তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শাক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অস্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে ; আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও দৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও আল্লাহ্র কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য ঊর্ধ্বে তোলা এবং তীক্ষ্ণকর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে। اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ আয়াতে গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে. এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে দ্বিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, ঊর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এ জন্য অন্তশ্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যুজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল ? যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্রছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত। এবং যেখানে ছায়া, সেখানে

সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا এর অর্থ তাই।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হ্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের ঊর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বময় ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্য নির্ধারণ করার মধ্যেও রহস্য নিহিত আছে ঃ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا আয়াতে রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سبت থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। سبات এমন বস্তু, যদ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়। নিদ্রাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سبات এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম, নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে ; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্নও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হতো। কারণ, যে ব্যক্তির সাথে আপনার কাজ ; তখন তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, তা তদারক করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইন ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোন প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا বাক্যে দিনকে نشور অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাতকে নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁ এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যস্ততার জন্য এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً طَهُوْرًا — طهور শব্দটি আরবী ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طهور বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোন সময় বৃষ্টির আকারে ও কোন সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কোরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

পর্যাপ্ত পানি—যেমন পুকুর হাউস ও নহরের পানিতে কোন অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তফসীর মাযহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাস'আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকাহ্‌র সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাস'আলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا — اناسى শব্দটি انسى-এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, انسان -এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার কারণ কি ? এতে তো বুঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নহরের কিনারায় কূপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ—আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি ; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয় ; বরং বৃষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয় ; তবে আল্লাহ্র নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয় এবং কোন জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আযাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আযাব ও শাস্তি করে দেওয়া হয়।

কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ ঃ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে অর্থ কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কোরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থাৎ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্য হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا — مرج শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مرج বলা হয়, সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। عذب মিঠা পানিকে বলা হয়। فرات এর অর্থ সুপেয় ملح এর অর্থ লোনা এবং اجاج। এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। এক, সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ

বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারের সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা ও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত, এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয়, এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরস্পরে মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا—পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয় তাকে نسب বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয় তাকে صهر বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ, একা মানুষ কোন কাজ করতে পারে না।

قُلْ مَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاۤءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا—অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোন উপকার নেই যে, যার মনে চায়, সে আল্লাহ্র পথ অবলম্বন করবে, বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোন বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও পান কর ও সুখে থাক—এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে পারে যে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন ; যেমন সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজ করে, এই সৎকাজের সওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সেও পাবে।—(মাযহারী)

فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা, অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহ্‌র কাজ। এ বিষয়ের সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং অথবা জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। —(মাযহারী)

قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ — رَحْمٰنُ আরবী শব্দ। এর অর্থ আরবরা সবাই জানত ; কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য শব্দটি তাঁরা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান কে আবার কি।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا - وَهُوَالَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا -

এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগৎ এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তাঁর অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায় ; অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কোরআন পাক এ স্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর এ কথাও বলেছে যে, কোরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর। এখন নভোমণ্ডল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত—এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন মাস'আলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোন অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছতে পারেননি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তফসীরে এর চাইতে বেশি কোন আলোচনায় যাওয়াও কোরআনের জরুরী খেদমত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ,

চন্দ্রে পৌঁছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা এবং গুহা ও পাহাড়ের ফটো সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কোরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে এবং কেউ কোরআন পাকের সমর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নে প্রয়োজনমাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরী মনে করি। সূরা হিজরের وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, সূরা আল ফুরকানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা নিম্নরূপ ঃ والله الموفق

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের বাণী ঃ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا এ বাক্য থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, بروج অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা فى অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূহে আছে ঃ

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا এতে فِيهِن-এর সর্বনাম سبع سماوات-কে বুঝায়। এ থেকে বাহ্যত এটাই বুঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআনে سماء শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سماء শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও سماء বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও سماء শব্দের অর্থের মধ্যে দাখিল। وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ও এমনি ধরনের অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, যেসব মেঘমালার উচ্চতার কোন তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা। থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টত উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ এতে مزن শব্দটি مزنة-এর বহুবচন। এর অর্থ শুভ্র মেঘমালা আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে, وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا এখানে معصرات-এর অর্থ পানিভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে,

সেগুলোতে অধিকাংশ তফসীরবিদ سماء শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল।

সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী سماء শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক—উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে فى السماء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে। বরং কোরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন ঃ এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরী যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরী নয়। বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বুঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডেও দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি—এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুকু বুঝার জন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর প্রতি আহ্বান জানায়নি। কোরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়, হ্যাঁ সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি

করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল ; বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎলীমূসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এ দিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলিমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনযিলে-মকসুদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের ঊর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নব নব আবিষ্কার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোন মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যদ্দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক

তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি ঃ প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থী আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে টানা- হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়। বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেই ; কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে ; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত جعلنا فى السماء بروجا সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে পারে। এতে কিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয় ; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব ; তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরোক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না ; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনিভাবে কোরআন পাকের كل فى فلك يسبحون আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেৎলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয় ; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কোরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বুঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা

করেন। এই উভয় পন্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ক্রটিবশত এগুলোকে কোরআন ও সুন্নাতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলূসী বাগদাদীর তফসীরে রূহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহ্মুদ শুকরী আলূসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম ما دل عليه القران مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان এই গ্রন্থে কোরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলিমের ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন ঃ

رأيت كثيرا من قواعدها لايعارض النصوص الواردة فى الكتاب والسنة على انها لوخالفت شيئا من ذلك لم يلتفت اليها ولم نؤول النصوص لاجلها والتاويل فيها ليس من مذاهب السلف الحرية بالقبول بل لابدان نقول ان المخالف لها مشتمل على خلل فيه فان العقل الصريح لايخالف النقل الصحيح بل كل منهما يصدق الاخر ويؤيده -

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কোরআন ও সুন্নাহ্র বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহ্বিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও সুন্নাহ্র সদর্থ করব না। কেননা, এরূপ সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কোরআন ও সুন্নাহ্বিরোধী, তাতে কোন না কোন ক্রটি আছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না ; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা

দিতেন। তাঁর পর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মুকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবী গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরও শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারী বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত সেখান থেকে প্রত্যেক ভারী বস্তু নিচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাববলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

আধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবূ রায়হান আলবেরুনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নিচে পতিত হয় না, বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি

আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'সায়রবীন'-এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহ্র অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বুঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন ঃ
> এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।
> অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন ঃ
> কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বুঝাতে থাকে যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে।
> অতঃপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন ঃ
> খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মুকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোন মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। একথাটিই পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত

পৌঁছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারকতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্র গ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারিগণও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে ঃ মানুষের চেষ্টা-সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি-অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হতো, তার বহ্নুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতাঁর কি উপকার সাধিত হয়েছে ? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোন সামাধান দিতে পেরেছে কি ? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কি ? অথবা তাদের জন্য অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোন উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি ? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কোরআন ও সুন্নাহ্ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তাঁরই নাম আল্লাহ্। দ্বিতীয়, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য—কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনার এই দু'টি দিকই মানুষের জন্য যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কোরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতী আল্লামা নজীত তাঁর গ্রন্থ 'তওফীফুর রহমান'-এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার আকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কোরআন, সুন্নাহ্ এবং সাধারণভাবে পয়গম্বরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে ঃ

زبان تازه كردن باقرارتو — نينگيختن علت از كارتو
ميندس بسے جويرا زرازشاد — نوانر كچود كردى اغاز شاد

সূফী বুযুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সাদী ব্যক্ত করেছেন ঃ

چه شبها نشستم درين سيرگم — كه حيرت گرفت أستينم كهقم

হাফেয শিরাজী নিজের সুরে বলেছেন ঃ

سخن از مطرب ومى گوئى ورازد هركمترجو
كه كس نكشود ونكشايد بحكمت اين معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে ; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কোরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরও বুঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থী আলিম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কোরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলিম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি। কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোন বুদ্ধিমত্তা নয়।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ
قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا
سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ
يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ
اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۖ ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ
يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ
الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ
الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۙ ﴿٧٥﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ
مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ
كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

(৬৩) 'রহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। (৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে ; (৬৫) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা ! (৬৭) এবং যারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (৬৮) এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্কে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কত উত্তম ! (৭৭) বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

'রহমান'-এর (বিশেষ) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মজ্জায় সব ব্যাপারেই নম্রতা আছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। এখানে শুধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অহংকারসহ নম্র চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয় নম্রতা তাদের নিজেদের কাজেকর্মে) এবং (অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে,) যখন তাদের সাথে অজ্ঞ লোকেরা (অজ্ঞতার) কথাবার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার কথা বলে। (উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের জন্য উক্তিগত অথবা কর্মগত প্রতিশোধ নেয় না। এখানে সেই কঠোরতা না করার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা আদব শিক্ষাদান, সংশোধন, শরীয়তের শাসন এবং আল্লাহ্র কালেমা সমুচ্চে রাখার জন্য করা হয়)। এবং যারা (আল্লাহ্র সাথে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করে যে,) রাত্রিকালে আপন পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদারত ও দণ্ডায়মান (অর্থাৎ

নামাযে রত) থাকে এবং যারা (আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক আদায় করা সত্ত্বেও আল্লাহ্কে ভয় করে) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূরে রাখ। কেননা, এর আযাব সম্পূর্ণ বিনাশ। নিশ্চয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা এবং মন্দ বাসস্থান। দৈহিক আনুগত্যে তাদের এই অবস্থা) এবং (অধিক ইবাদতে তাদের অবস্থা এই যে) তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না (অর্থাৎ গুনাহ্র কাজে ব্যয় করে না) এবং কৃপণতাও করে না (অর্থাৎ জরুরী সৎকর্মেও ব্যয় করতে ক্রটি করে না। বিনা প্রয়োজনে সামর্থ্যের বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসবও অযথা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, এসব বিষয় গুনাহ্। যে বস্তু গুনাহ্র কারণ হয়, তাও গুনাহ্। কাজেই পরিণামে তাও গুনাহ্র কাজে ব্যয় হয়ে যায়। এমনিভাবে জরুরী ইবাদতে মোটেই ব্যয় না করার নিন্দা لَمْ يَقْتُرُوْا থেকে জানা গেল। কারণ কম ব্যয় করা যখন জায়েয নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কাজেই এই সন্দেহ রইল না যে, ব্যয়ে ক্রটি করার তো নিন্দা হয়ে গেছে ; কিন্তু মোটেই ব্যয় না করার কোন নিন্দা ও নিষেধাজ্ঞা হয়নি। মোটকথা তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্রটি ও বাড়া-বাড়ি থেকে পবিত্র।) এবং তাদের ব্যয় করা এতদুভয়ের (অর্থাৎ ক্রটি ও বাড়াবাড়ির) মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। (তাদের এই অবস্থা ইবাদত পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।) এবং যারা (গুনাহ্ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে,) আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না (এটা বিশ্বাস সম্পর্কিত গুনাহ্) আল্লাহ্ যার হত্যা (আইনের দৃষ্টিতে) অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না (অর্থাৎ যখন হত্যা জরুরী কিংবা অনুমোদনের কোন শরীয়তসম্মত কারণ পাওয়া যায়, তখন ভিন্ন কথা) এবং ব্যভিচার করে না। (এই হত্যাও ব্যভিচার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত গুনাহ্)। যারা এ কাজ করে (অর্থাৎ শিরক অথবা শিরকের সাথে অন্যায় হত্যাও করে অথবা ব্যভিচারও করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা করত) তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে (যেমন অন্য আয়াতে আছে زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ এবং তারা তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে (যাতে দৈহিক শাস্তির সাথে সাথে লাঞ্ছনার আত্মিক শাস্তিও হয় এবং শাস্তির কাঠোরতা অর্থাৎ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিমাণ বৃদ্ধি অর্থাৎ চিরকাল বসবাস করাও হয়। وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ বলে কাফির ও মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। এর ইঙ্গিত – امن – مهانا – يخلد – يضاعف ইত্যাদি বাক্য। কেননা, পাপী মু'মিনের শাস্তি বর্ধিত ও চিরস্থায়ী হবে না ; বরং তাকে পাক-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হবে, লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে নয়। এর জন্য ঈমানের নবায়ন জরুরী নয়, শুধু তওবা করা যথেষ্ট। পরবর্তী وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত ইঙ্গিত ছাড়া বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস থেকে শানে নুযুলও তাই বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে) ; কিন্তু যারা (শিরক ও গুনাহ্ থেকে) তওবা করে (তওবা কবূলের শর্ত এই যে) বিশ্বাস (ও) স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে (অর্থাৎ জরুরী ইবাদত পালন করতে থাকে, তাদের জাহান্নামে চিরকাল বাস করা দূরের কথা জাহান্নাম তাদেরকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করবে না ;

বরং) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (অতীত) গুনাহ্‌কে (ভবিষ্যৎ) পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন (অর্থাৎ যেহেতু অতীত কুফর ও গুনাহ্ ইসলামের বরকতে মাফ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে সৎকর্মের কারণে পুণ্য লিখিত হতে থাকবে, তাই জাহান্নামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না) এবং (এই পাপ মোচন ও পুণ্য লিখন এ কারণে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, (তাই পাপ মোচন করে দেন এবং) পরম দয়ালু (তাই পুণ্য স্থাপন করে দেন। এ ছিল কুফর থেকে তওবাকারীর বর্ণনা। অতঃপর গুনাহ্ থেকে তওবাকারী মু'মিনের কথা বলা হচ্ছে, যাতে তওবার বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের অবশিষ্ট গুণাবলীরও এটা বর্ণনা যে, তারা সর্বদা ইবাদত সম্পন্ন করে এবং গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্তু কোন সময় গোনাহ্ হয়ে গেলে তওবা করে নেয়। তাই তওবাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ) যে ব্যক্তি (গুনাহ্ থেকে) তওবা করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ ভবিষ্যতে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে,) সে (ও) আযাব থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে বিশেষরূপে ফিরে আসে (অর্থাৎ ভয় ও আন্তরিকতা সহকারে, যা তওবার শর্ত। অতঃপর আবার রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের এই গুণ যে) তারা অনর্থক কাজে (যেমন খেলাধুলা ও শরীয়ত বিরোধী কাজে) যোগদান করে না এবং যদি (ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায়) অনর্থক ক্রিয়াকর্মের কাছ দিয়ে যায়, তবে গম্ভীর (ও ভদ্র) হয়ে চলে যায় (অর্থাৎ তাতে মশগুল হয় না এবং কার্যকলাপ দ্বারা গুনাহ্‌গারদের নিকৃষ্টতা ও নিজেদের উচ্চতা ও গর্ব প্রকাশ করে না) এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী দ্বারা উপদেশ দান করা হলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে তার (বিধানাবলীর) উপর পতিত হয় না। (কাফিররা যেমন কোরআনকে অভিনব বিষয় মনে করে তামাশা হিসেবে এবং তাতে আপত্তি উত্থাপনের উদ্দেশ্যে এর স্বরূপ ও তত্ত্বকথা থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে এর চারপাশে এলোমেলো ভিড় জমাত। অন্য আয়াতে কোরআন বলে ঃ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا — উল্লিখিত বান্দাগণ এরূপ করে না ; বরং বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে কোরআনে মনোনিবেশ করে, যার ফলে ঈমান ও আমল বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আয়াতে অন্ধ ও বধির না হওয়ার কথা বলা হয়েছে—কোরআনের প্রতি আগ্রহভরে মনোনিবেশ না করা ও তাতে পতিত না হওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, এটাই কাম্য। এতে কাফিরদের কোরআনে পতিত হওয়া তো প্রমাণিত হয় ; কিন্তু তাদের পতিত হওয়ার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের নিয়তে এবং অন্ধ বধিদের পতিত হওয়া অনুরূপ ছিল। তাই এটা নিন্দনীয়) এবং তারা (নিজেরা যেমন দীনের আশেক, তেমনি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও দীনের আশেক করতে চেষ্টিত থাকে। সেমতে কার্যত চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেও) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি) দান কর। (অর্থাৎ তাদেরকে দীনদার কর এবং আমাদেরকে এই প্রচেষ্টায় সফল কর, যাতে তাদেরকে দীনদার দেখে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি।) এবং (তুমি তো আমাদেরকে আমাদের পরিবারের নেতা করেছই, কিন্তু আমাদের দোয়া এই যে, তাদের সবাইকে মুত্তাকী করে) আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা করে দাও। (নেতৃত্বের আবেদন আসল উদ্দেশ্য নয়, যদিও তাতে দোষ নেই ; বরং আসল উদ্দেশ্য নিজ পরিবারের মুত্তাকী হওয়ার আবেদন। অর্থৎ

আমরা এখন শুধু পরিবারের নেতা। এর পরিবর্তে আমাদেরকে মুত্তাকী পরিবারের নেতা করে দাও। এ পর্যন্ত রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছেঃ) তাদেরকে (জান্নাতে বসবাসের জন্য) উপরতলার কক্ষ দেয়া হবে তাদের (ধর্ম ও ইবাদতের উপর) দৃঢ়তর থাকার কারণে এবং তারা তথায় (জান্নাতে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) স্থায়িত্বের দোয়া ও সালাম পাবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। সেটা কত উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান। (যেমন জাহান্নাম সম্পর্কে سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا বলা হয়েছে। হে পয়গম্বর,) আপনি সাধারণভাবে লোকদেরকে বলে দিন, আমার পালনকর্তা তোমাদের সামান্যও পরওয়া করবেন না, যদি তোমরা ইবাদত না কর। অতএব (এ থেকে বুঝা উচিত যে, হে কাফির সম্প্রদায়) তোমরা তো (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীকে) মিথ্যা মনে কর। কাজেই সত্বর এটা (অর্থাৎ মিথ্যা মনে করা তোমাদের জন্য) অনিবার্য বিপদ হয়ে যাবে। (তা দুনিয়াতে হোক, যেমন বদর যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিপদ এসেছে কিংবা পরকালে হোক—এটা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আল-ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং এতসম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফির-মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, দ্বারা রিসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ্ ও রাসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে সুসমঞ্জস।

কোরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান'—(রহমানের দাস) উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না ; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গুনাহ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর নামাবলী ও গুণবাচক বিশ্লেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ,

দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহ্ভীতি, যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ عباد হওয়া। عباد শব্দটি عبد এর বহুবচন। অর্থ বান্দা, দাস ; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ ঃ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নাতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুব ধীরে চলতেন না, বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, كانما الارض تطوى له অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্য কুঞ্চিত হতো।—(ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ্ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত উমর ফারূক (রা) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি অসুস্থ? সে বলল ঃ না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا আয়াতের তফসীরে বলেন, খাঁটি মু'মিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহ্র সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারক ও পঙ্গু মনে করে ; অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয় ; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহ্ভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না । যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্র নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প তার জন্য শাস্তি তৈরি রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় গুণ ঃ وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে جاهلون শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয় ; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়নি, বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহ্হাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে تسليم শব্দটি تسلم থেকে নয় ; বরং سلام থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জওয়াবে তাঁরা নিরাপত্তার

কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গুনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত আছে। —(মাযহারী)

চতুর্থ গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামায ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহ্র সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হযরত আবূ উমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যস্ত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গুনাহ্ থেকে নিবৃত্তকারী।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী بات لله ساجدا وقائما (মাযহারী, বগভী)। হযরত উসমান গনীর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে।—(আহমদ, মুসলিম, মাযহারী)

পঞ্চম গুণ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ— অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না ; বরং সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আখিরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহ্র কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ক্রটিও করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اسراف এবং এর বিপরীতে اقتار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اسراف-এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اسراف তথা অপব্যয় ; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, تبذير তথা অনর্থক ব্যয় কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গুনাহ্। আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ এ দিক দিয়ে এই তফসীরের সারমর্মও হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের তফসীরের অনুরূপ হয়ে যায় ; অর্থাৎ গুনাহ্র কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়।—(মাযহারী)

اقتار শব্দের অর্থ ব্যয়ে ক্রটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেয়, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই

ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে)। এই তফসীরও হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ من فقه الرجل قصده فى معيشته অর্থাৎ ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।—(আহ্‌মদ, ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ماعال من اقتصد অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না।—(আহ্‌মদ, ইবনে কাসীর)

সপ্তম গুণ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ— পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গুনাহ্।

অষ্টম গুণ ঃ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ এখান থেকে কার্যগত গুনাহ্‌সমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গুনাহ্ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা এসব গুনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ্ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا—অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহ্‌সমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবূ উবায়দা اثام শব্দের তফসীর করেছেন গুনাহের শাস্তি। কেউ কেউ বলেন ঃ اثام জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।—(মাযহারী)

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে এ কথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফিরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমে তো يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গুনাহ্‌গারদের জন্য প্রয়োজ্য হতে পারে না। কারণ, তাদের এক গুনাহের জন্য একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মু'মিনদের জন্য হবে না। এটা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফির ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আযাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোন মু'মিন চিরকাল আযাবে থাকবে না। মু'মিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হলো, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে,তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা এই যে,শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেইসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গুনাহ্ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল ; কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গুনাহ্ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

ইবনে কাসীর এর আরও একটি তফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফিররা কুফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোন সময় অতীত পাপের কথা স্মরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর এই তফসীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا বাহ্যত এটা পূর্বোক্ত اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ প্রথমটি ছিল কাফির ও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَاٰمَنَ অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মু'মিনই ছিল; কিন্তু অনবধানতাবশত হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু يَتُوْبُ উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎ কর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গুনাহ্ থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যদ্দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁর মন্দকাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম গুণ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ —অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বুঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়েস বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বুঝানো হয়েছে। যুহ্‌রী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্য পান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত।—(মাযহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُوْنَ শব্দটিকে شهادة অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গুনাহ্, তা কোরআন ও সুন্নাতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তার মুখে চুনকালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।—(মাযহারী)

একাদশ গুণ ঃ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।—(ইবনে কাসীর)

দ্বাদশ গুণ ঃ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্‌র আয়াত ও আখিরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং শ্রবণশক্তি ও

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এক. আল্লাহ্র আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয় কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। দুই.অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয় কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতি অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাব ? হযরত শা'বী বললেন না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মু'মিনের জন্য বৈধ নয় ; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্য জরুরী। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

এ যুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কোরআন পাঠ ও কোরআন বুঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কোরআনের অনুবাদ অথবা কারও তফসীর দেখে কোরআনকে নিজেরা বুঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত। ফলে তারা কোরআনকে বিশুদ্ধরূপে বুঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোন সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কোরআন ও কোরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোন পারদর্শী ওস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতিবিবর্জিত কোরআন পাঠও আল্লাহ্র আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তওফীক দান করুন।

ত্রয়োদশ গুণ ঃ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যে মশগুল

দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না ; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসাবে তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রণিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যত নিজের জন্য জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে ঃ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলিম এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্য কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যদ্দ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই অর্থাৎ যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়—জায়েয। পক্ষান্তরে لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ। এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ কামিল মু'মিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ — غرفة শব্দের আভিধানক অর্থ আলোচনা তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। (বুখারী, মুসলিম-মাযহারী) মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবু মালিক আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে।—(মাযহারী)

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا—অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তাঁরা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ—এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফির ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ অর্থাৎ তোমরা সব কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই।

فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

ونعوذ بالله من حال اهل النار

سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ

সূরা আশ-শু'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ রুকূ, ২২৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

طٰسٓمٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ
اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝٤ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ
اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۝٥ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا
بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٦ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝٧ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٨ وَاِنَّ
رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٩

আল্লাহ্‌র নামে শুরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু।

(১) তা, সীন, মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। (৪) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি ; অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। (৫) যখনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই ; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না ? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ বস্তু কত উদগত করেছি। (৮) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তা, সীন, মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ আপনার প্রতি

অবতীর্ণ বিষয়বস্তুগুলো) সুস্পষ্ট কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত। (তারা এতে বিশ্বাস করে না বলে আপনি এত দুঃখিত কেন যে, মনে হয়) হয়তো আপনি তাদের বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে (দুঃখ করতে করতে) আত্মঘাতী হবেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটা পরীক্ষা জগৎ। এখানে সত্য প্রমাণের জন্য এমন প্রমাণাদিই, কায়েম করা হয়, যার পরেও ঈমান আনা-না আনা বান্দার ইখতিয়ারভুক্ত থাকে। নতুবা) যদি আমি (জোরে-জবরে ও বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে বিশ্বাসী করার) ইচ্ছা করি, তবে তাদের কাছে আকাশ থেকে একটি (এমন) বড় নিদর্শন নাযিল করতে পারি (যাতে তাদের ইখতিয়ারই বিলুপ্ত হয়ে যায়।) অতঃপর তাদের গর্দান এর সামনে নত হয়ে যাবে (এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বাসী হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ করলে পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যাবে। তাই এরূপ করা হয় না এবং ঈমান আনার ব্যাপারটিকে জোর-জবর ও ইখতিয়ারের মাঝখানে রাখা হয়। তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে 'রহমান'-এর পক্ষ থেকে এমন কোন নতুন উপদেশ আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (এই মুখ ফেরানো এতদূর গড়িয়েছে যে,) তারা (সত্য ধর্মকে) মিথ্যা বলে দিয়েছে (যা মুখ ফেরানোর চরম পর্যায়। তারা শুধু প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ দৃষ্টিপাত না করেই ক্ষান্ত থাকেনি। এছাড়া তারা কেবল মিথ্যারোপই করেনি। বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে!) সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতে যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন কোরআন ও কোরআনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ আযাব ইত্যাদির সত্যতা ফুটে উঠবে)। তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি ? (যা তাদের অনেক নিকটবর্তী এবং দৃষ্টির সামনে রয়েছে,) আমি তাতে কত উৎকৃষ্ট ও রকম-রকমের উদ্ভিদ উদগত করেছি। (এগুলো অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, একত্ব ও সর্বব্যাপী ক্ষমতা সপ্রমাণ করে।) এতে (সত্তাগত, গুণগত ও কর্মগত একত্বের) বড় (যুক্তিপূর্ণ) নিদর্শন আছে। (এ বিষয়টিও যুক্তিপূর্ণ যে, আল্লাহ্ হওয়ার জন্য সত্তাগত ও গুণগত উৎকর্ষ শর্ত এবং এ উৎকর্ষতার শর্তাবলীতে অপরিহার্য হলো যে, খোদায়ীতে তিনি একক হবেন। এতদসত্ত্বেও) তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস স্থাপন করে না (এবং শিরক করে। মোটকথা, শিরক করা নবুয়ত অস্বীকার করার চাইতেও গুরুতর। এতে জানা গেল যে, হঠকারিতা তাদের স্বভাবধর্মকে অকেজো করে দিয়েছে। কাজেই এরূপ লোকদের পেছনে নিজের জীবনপাত করার কোন অর্থ হয় না।) আর (শিরক যে আল্লাহ্র কাছে নিন্দনীয়, তাতে যদি তাদের এ কারণে সন্দেহ হয় যে, তাদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব আসে না কেন, তবে এর কারণ এই যে,) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা পরাক্রমশালী (ও পূর্ণ ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও) পরম দয়ালু (ও)। (তাঁর সর্বব্যাপী দয়া দুনিয়াতে কাফিরদের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এর ফলেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। নতুবা কুফর নিশ্চিতই নিন্দনীয় এবং আযাবের যোগ্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ — بَاخِعٌ শব্দটি بخع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ যবেহ্ করতে করতে বিখা' (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে

পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গম্বর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই—কোন কাফির সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকে, তার জন্য অধিক দুঃখ না করা উচিত।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ۔

আল্লামা যামাখশারী বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে فَظَلُّوْا لَهَا خَاضِعِيْنَ অর্থাৎ কাফিররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে اعناق (গর্দান) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তওহীদ ও কুদরতের এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী ও আল্লাহ্‌র স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারও পক্ষে অস্বীকার করার জো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্বল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও আযাব বর্তিত। জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই।—(কুরতুবী)

زَوْجٍ كَرِيْمٍ — زوج এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زوج বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; সেগুলোকে এ দিক দিয়ে زوج বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে বলা যায়। كريم শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰۤى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَاۤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٥﴾ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٧﴾ قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ

الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا
خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا
عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ
اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ
الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ
الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ
فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

(১০) যখন আপনার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও, (১১) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না ? (১২) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে (১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়। সুতরাং হারূনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন। (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ্ বললেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল। (১৭) যাতে তুমি বনী ইসরাইলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। (১৮) ফিরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি ? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। (১৯) তুমি সেই তোমার অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতঘ্ন। (২০) মূসা বলল, আমি সেই অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। (২১) অতঃপর আমি ভীত হয়ে

তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন। এবং আমাকে পয়গম্বর করেছেন। (২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফিরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি ? (২৪) মূসা বলল, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না ? (২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। (২৭) ফিরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। (২৮) মূসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বুঝ। (২৯) ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (৩০) মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি ? (৩১) ফিরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) আর তিনি তার হাত বের করলেন তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (তাদের কাছে তখনকার কাহিনী বর্ণনা করুন,) যখন আপনার পালনকর্তা মূসা (আ)-কে ডাকলেন (এবং আদেশ দিলেন) যে, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে যাও, (এবং হে মূসা দেখ,) তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করে না ? (অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক ও মন্দ, তাই তাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে।) মূসা আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি এ কাজের জন্য হাযির আছি। কিন্তু কাজটি পূর্ণ করার জন্য একজন সাহায্যকারী চাই। কেননা) আমার আশংকা হচ্ছে, তারা আমাকে (বক্তব্য পূর্ণ করার আগেই) মিথ্যাবাদী বলে দেবে এবং (স্বভাবগতভাবে এরূপ ক্ষেত্রে) আমার মন হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং আমার জিহ্বা (ভালরূপ) চলে না। তাই হারূনের কাছে (ও ওহী) প্রেরণ করুন (এবং তাকে নবুয়ত দান করুন, যাতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হলে সে আমার সত্যায়ন করে। এর ফলে আমার মন প্রফুল্ল ও জিহ্বা চালু থাকবে। আমার জিহ্বা কোন সময় বন্ধ হয়ে গেলে সে বক্তব্য পেশ করবে। হারূনকে নবুয়ত দান করা ছাড়াই সাথে রাখলেও এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত ঃ কিন্তু নবুয়ত দান করলে এ উদ্দেশ্য আরও পূর্ণরূপে সাধিত হবে।) আর (ও একটি বিষয় এই যে,) আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগও আছে : (জনৈক কিবতী আমার হাতে নিহত হয়েছিল। সূরা কাসাসে এর কাহিনী বর্ণিত হবে।) অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে (রিসালত প্রচারের পূর্বে) হত্যা করে ফেলবে। (এমতাবস্থায়ও আমি তাবলীগ করতে সক্ষম হব না। সুতরাং এরও কোন বিহিত ব্যবস্থা করে দিন।) আল্লাহ্ বললেন, কি সাধ্য (এরূপ করার ? আমি হারূনকেও পয়গম্বরী দান করলাম। এখন তাবলীগের উভয় বাধা দূর হয়ে গেল)। তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও (কারণ, হারূনও নবী হয়ে গেছে)। আমি (সাহায্য দ্বারা) তোমাদের সাথে আছি (এবং তোমাদের ও তাদের

যে কথাবার্তা হবে, তা) শুনব। অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং (তাকে) বল, আমরা বিশ্বপালনকর্তার রাসূল (এবং তাওহীদের প্রতি দাওয়াতসহ এ নির্দেশও নিয়ে এসেছি) যেন তুমি বনী ইসরাইলকে (বেগার খাটুনি ও উৎপীড়নের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের মাতৃভূমি শাম দেশের দিকে) আমাদের সাথে যেতে দাও। (এই দাওয়াতের সারমর্ম হলো আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকে উৎপীড়ন ও সীমালংঘন বর্জন করা। 'সেমতে তারা গমন করল এবং ফিরাউনকে সব বিষয়বস্তু বলে দিল।) ফিরাউন [এসব কথা শুনে প্রথমে মূসা (আ)-কে চিনতে পেরে তাঁর দিকে মনোযোগ দিল এবং] বলল, (আহা, তুমিই নাকি) আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি ? এবং তুমি আমাদের মধ্যে তোমার সেই জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি তো নিজের সেই অপরাধ যা করবার করেছিলে (অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে)। তুমি হলে বড় কৃতঘ্ন। (আমারই খেয়ে-দেয়ে আমার মানুষকে হত্যা করেছ। এখন আবার আমাকে অধীনস্থ করতে এসেছ। অথচ তোমার কর্তব্য ছিল আমার সামনে নত হয়ে থাকা)। মূসা (আ) জওয়াব দিলেন, (বাস্তবিকই) আমি তখন সেই কাজ করেছিলাম এবং আমার থেকে ভুল হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি। তার অত্যাচার সুলভ আচার-ব্যবহার দেখে তাকে বিরত রাখা আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং ঘটনাক্রমে সে মারা গিয়েছিল।) এরপর যখন আমি শংকিত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমাকে আমার পালনকর্তা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গম্বরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (এই প্রজ্ঞা ছিল নবুয়তের জরুরী অংশবিশেষ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আমি পয়গম্বরের পদমর্যাদা নিয়ে আগমন করেছি। কাজেই নত হওয়ার কোন কারণ নেই। পয়গম্বরী এই হত্যা-ঘটনার পরিপন্থী নয়; কেননা, এই হত্যাকাণ্ড ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। এটা নবুয়তের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পরিপন্থী নয়। এ হচ্ছে হত্যা সম্পর্কিত আপত্তির জওয়াব। এখন রইল লালন-পালনের অনুগ্রহ প্রকাশের ব্যাপার। এর জওয়াব এই যে,) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে কঠোর অপমানে (ও উৎপীড়নে) নিক্ষেপ করে রেখেছিলে। (তাদের ছেলে-সন্তানকে হত্যা করতে, যার ভয়ে আমাকে সিন্দুকে ভরে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তুমি আমাকে পেয়েছিলে। এরপর আমি তোমার লালন-পালনে ছিলাম। অতএব তোমার যুলুমই লালন-পালনের আসল কারণ। এমন লালন-পালনেরও কি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে হয় ? বরং এই অশালীন কাজের কথা স্মরণ করে তোমার লজ্জাবোধ করা উচিত।) ফিরাউন (এতে নিরুত্তর হয়ে গেল এবং কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে) বলল, (যাকে তুমি) 'রাব্বুল আলামীন (বল, যেমন বলেছ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ) আবার কি ? মূসা (আ) বললেন, তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তুমি এর বিশ্বাস (অর্জন) করতে চাও, (তবে এতটুকু সন্ধান যথেষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন হলে-গুণাবলীর মাধ্যমেই জওয়াব দেওয়া হবে।) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কিছু শুনছ ? (প্রশ্ন কিছু, জওয়াব অন্য কিছু) মূসা (আ) বললেন, তিনি পালনকর্তা তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের। (এই জওয়াবে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পুনরুক্তি আছে : কিন্তু) ফিরাউন (বুঝল না এবং) বলল, তোমাদের

এই রাসূল যে (নিজ ধারণা অনুযায়ী) তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, বদ্ধ পাগল (মনে হয়)। মূসা (আ) বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের পালনকর্তা এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আছে, তারও যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তবে এ কথা মেনে নাও)। ফিরাউন (অবশেষে বাধ্য হয়ে) বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষেপ করব। মূসা (আ) বললেন, যদি আমি প্রকাশ্য প্রমাণ পেশ করি, তবুও (মানবে না) ? ফিরাউন বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে সেই প্রমাণ পেশ কর। তখন মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করলে তা মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেল এবং (দ্বিতীয় মু'জিযা প্রদর্শনের জন্য) নিজের হাত (বুকের কলারে দিয়ে) বের করতেই তা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের সামনে সুশুভ্র হয়ে গেল। (অর্থাৎ একেও সবাই চর্মচক্ষে দেখল।)

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয় ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یُّكَذِّبُوْنِ - وَیَضِیْقُ صَدْرِیْ وَلَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ
ـــ فَاَرْسِلْ اِلٰی هٰرُوْنَ - وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنَ -

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়, বরং বৈধ। যেমন মূসা (আ) আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে এ কথা বলা ভূল হবে যে, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র আদেশকে নির্দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন ? কারণ, মূসা (আ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হযরত মূসা (আ)-এর জন্য ضلال শব্দের অর্থ ঃ قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّیْنَ তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে ঃ ফিরাউনের এই অভিযোগের জওয়াবে মূসা (আ) বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থী। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضلال শব্দের অর্থ অজ্ঞাতে তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া হযরত কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় ضـــلال শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

মহিমান্বিত আল্লাহ্র সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্য সম্ভবপর নয় ঃ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ—এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহ্র স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ, ফিরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ্র স্বরূপ সম্পর্কে। মূসা (আ) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা। (রূহুল মা'আনী)

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ —বনী ইসরাইল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফিরাউন বাধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফিরাউনের বন্দীশালায় গোলামির জীবন-যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। মূসা (আ) ফিরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাইলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।—(কুরতুবী)

পয়গম্বরসুলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি ঃ দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হারজিতের খেলায়-পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খণ্ডনই করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা ও হারূন (আ) যখন ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌঁছালেন, তখন সে মূসা (আ)-এর ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল; যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল বিষয়ের জওয়াব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুন্ন হয়। এখানেও ফিরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। এক. তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল ? দুই. তুমি একজন কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন যুলুম, তেমনি নিমকহারামি ও কৃতঘ্নতা। যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ)-এর পয়গম্বরসুলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমত তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে দিলেন; যা ফিরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফিরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজকালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন

এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি।

হযরত মূসা (আ) জওয়াবে এ কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাইলীর প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন মূসা (আ)-এর সোজা ও পরিষ্কার জওয়াব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতও কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তাই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ্ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জওয়াব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াব প্রদানে প্রবৃত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফিরাউনের দরবার কোথায়। যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাইলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই যুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশংকা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গম্বরসুলভ জওয়াব থেকে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মু'জিযা দেখে এ কথার সত্যতা আরও পরিস্ফুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুইজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে

দরবার ফিরাউনের, শহর ও দেশ ফিরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশংকা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে।

এ হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গম্বরগণের বাকবিতণ্ডা ও বিতর্ক এবং সততা ও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿৩৪﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ
فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿৩৫﴾ قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿৩৬﴾ يَأْتُوكَ
بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿৩৭﴾ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿৩৮﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ
هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿৩৯﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿৪০﴾
فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿৪১﴾
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿৪২﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم
مُّلْقُونَ ﴿৪৩﴾ فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿৪৪﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿৪৫﴾ فَأُلْقِىَ
ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿৪৬﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿৪৭﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿৪৮﴾ قَالَ
ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿৪৯﴾ قَالُوا۟ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿৫০﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ
لَنَا رَبُّنَا خَطَٰيَٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿৫১﴾

(৩৪) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর। (৩৫) সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি ? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে। (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হলো, তোমরাও সমবেত হও, (৪০) যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি—যদি তারাই বিজয়ী হয়। (৪১) যখন জাদুকররা আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো ? (৪২) ফিরাউন বলল, হ্যাঁ এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪৩) মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফিরাউনের ইযযতের শপথ, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। (৪৬) তখন জাদুকররা সিজদায় নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (৪৮) যিনি মূসা ও হারুনের রব। (৪৯) ফিরাউন বলল, আমার অনুমতিদানের পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে ? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালন-কর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হযরত মূসা (আ) কর্তৃক এসব মু'জিযা প্রদর্শিত হলে] ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইনি একজন সুদক্ষ জাদুকর। তার (আসল) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর জাদু বলে (নিজে শাসক হয়ে যাবেন এবং) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবেন, (যাতে বিনা প্রতিবন্ধকতায় স্বগোত্রকে নিয়ে রাজ্য শাসন করতে পারে,) অতএব তোমরা কি পরামর্শ দাও? পারিষদবর্গ বলল, আপনি তাঁকে ও তাঁর ভাইকে (কিঞ্চিৎ) অবকাশ দেন এবং (নিজ দেশের) শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে (হুকুমনামা দিয়ে) প্রেরণ করুন, যাতে তারা (সব শহর থেকে) সব সুদক্ষ জাদুকরকে (একত্র করে) আপনার কাছে উপস্থিত করে। অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। (নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ সাজসজ্জার দিন এবং বিশেষ সময় অর্থাৎ চাশ্তের সময়; যেমন সূরা তোয়াহার তৃতীয় রুকুর শুরুতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত সবাইকে সমবেত করা হলো এবং ফিরাউনকে এর সংবাদ জানিয়ে দেয়া হলো।) এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ঘোষণার মাধ্যমে) জনগণকে বলে দেওয়া হলো যে,

তোমরাও কি (অমুক স্থানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য) একত্র হবে ? (অর্থাৎ একত্র হয়ে যাও।) যাতে জাদুকররা জয়ী হলে (যেমন প্রবল ধারণা তাই) আমরা তাদেরই পথ অনুসরণ করি। (ফিরাউন এ পথে ছিল এবং অপরকেও এ পথে রাখতে চাইত। উদ্দেশ্য এই যে, একত্র হয়ে দেখ। আশা করা যায় যে, জাদুকররাই বিজয়ী হবে। তখন আমাদের পথ যে সত্য তা সপ্রমাণ হয়ে যাবে।) অতঃপর যখন জাদুকররা (ফিরাউনের সামনে) আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল যদি আমরা [মূসা (আ)-এর বিপক্ষে] বিজয়ী হই, তবে আমরা কোন বড় পুরস্কার পাব তো ? ফিরাউন, বলল, হ্যাঁ, (আর্থিক পুরস্কারও বড় পাবে) এবং (তদুপরি এই মর্যাদাও লাভ করবে যে) তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [এইরূপ কথাবার্তার পর তারা প্রতিযোগিতার স্থানে আগমন করল এবং অপরদিকে মূসা (আ) আগমন করলেন। প্রতিযোগিতা শুরু হলো। জাদুকররা বলল, আপনি প্রথমে লাঠি নিক্ষেপ করবেন, না আমরা নিক্ষেপ করব] মূসা (আ) বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করবার, (ময়দানে) নিক্ষেপ কর। অতএব তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, (যা জাদুর প্রভাবে সর্প মনে হচ্ছিল) এবং বলল, ফিরাউনের ইয্‌যতের কসম, নিশ্চয় আমরাই জয়ী হব। অতঃপর মূসা (আ) আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা (অজগর হয়ে) তাদের সব অলীক কীর্তিকে গ্রাস করতে লাগল। অতঃপর (এ দৃশ্য দেখে) জাদুকররা (এমন মুগ্ধ হলো যে,) সবাই সিজদাবনত হয়ে গেল এবং (চিৎকার করে) বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যিনি মূসা ও হারূন (আ)-এরও রব। ফিরাউন (অত্যন্ত বিচলিত হলো যে, কোথাও সমস্ত প্রজাসাধারণই মুসলমান না হয়ে যায়। সে একটি বিষয়বস্তু চিন্তা করে শাসানির সুরে জাদুকরদেরকে) বলল, তোমরা কি আমার অনুমতিদানের পূর্বেই মূসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে ? নিশ্চয় (মনে হয়) সে (জাদুবিদ্যায়) তোমাদের সবার ওস্তাদ, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। (আর তোমরা তার শিষ্য। তাই পরস্পর গোপনে চক্রান্ত করেছ যে, তুমি এমন করলে আমরা এমন করব এবং এভাবে হারজিত প্রকাশ করব, যাতে কিবতীদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে স্বাচ্ছন্দে রাজত্ব করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا অতএব) শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। (তা এই যে) আমি তোমাদের একদিকের হাত ও অন্যদিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদেরকে শূলে চড়াব (যাতে আরও শিক্ষা হয়)। তারা জওয়াব দিল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব (সেখানে সব রকমের শান্তি ও সুখ আছে)। সুতরাং এরূপ মৃত্যুতে ক্ষতি কি ?) আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা (এ স্থলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে) সর্বাগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি (সুতরাং এতে এরূপ সন্দেহ হতে পারে না যে, তাদের পূর্বে 'আসিয়া' ফিরাউন বংশের মু'মিন ও বনী ইসরাইল বিশ্বাস স্থাপন করেছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ—অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে মূসা (আ) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে ? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এটা মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না। বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন কোন আল্লাহ্দ্রোহিকে বলা হয় যে, তুমি তোমাদের আল্লাহ্দ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলা বাহুল্য, একে আল্লাহ্ দ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না।

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্খতা যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয় ! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণত বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। বরং এগুলো সম্পর্কে এ কথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়। (রূহুল মা'আনী)

قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ—অর্থাৎ যখন ফিরাউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার, কর। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফিরাউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফিরাউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা মূসা (আ)-এর মু'জিযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে ? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ তোমার যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে মূসা (আ)-রই মু'জিযা যা লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মু'জিযার চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফিরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মু'মিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿৫২﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي
الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿৫৩﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿৫৪﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا
لَغَائِظُونَ ﴿৫৫﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿৫৬﴾ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿৫৭﴾
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿৫৮﴾ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿৫৯﴾ فَأَتْبَعُوهُم
مُّشْرِقِينَ ﴿৬০﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿৬১﴾
قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿৬২﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ
الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿৬৩﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿৬৪﴾
وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿৬৫﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿৬৬﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿৬৭﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿৬৮﴾

(৫২) আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, (৫৪) নিশ্চয় এরা (বনী ইসরাইল) ক্ষুদ্র একটি দল। (৫৫) এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (৫৬) এবং আমরা সবাই সদা শঙ্কিত। (৫৭) অতঃপর আমি ফিরাউনের দলকে তাদের বাগবাগিচা ও ঝরনাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম। (৫৮) এবং ধনভাণ্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। (৫৯) এরূপই হয়েছিল এবং বনী ইসরাইলকে করে দিলাম এ সবের মালিক। (৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (৬১) যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। (৬২) মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। (৬৫) এবং মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। (৬৬) অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (৬৭) নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। (৬৮) আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন ফিরাউন এ ঘটনা থেকেও হিদায়াত লাভ করল না এবং বনী ইসরাইলের উৎপীড়ন পরিত্যাগ করল না, তখন) আমি মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাগণকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) রাত্রিযোগে (মিসর থেকে) বাইরে নিয়ে যাও এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (সেমতে তিনি আদেশ মত বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে রাত্রিযোগে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সকালে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে) ফিরাউন (পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আশেপাশের) শহরে শহরে সংগ্রাহক দৌড়িয়ে দিল এবং বলে পাঠাল) যে, তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাইল আমাদের তুলনায়) একটি ক্ষুদ্র দল। (তাদের মুকাবিলা করতে কেউ যেন ভয় না করে) তারা (নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা) আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (কার্যকলাপ এই যে, গোপনে চাতুরী করে বের হয়ে গেছে অথবা ধারের বাহানায় আমাদের অনেক অলংকারও সাথে নিয়ে গেছে। মোটকথা, তারা আমাদেরকে বোকা বানিয়ে গেছে। এর প্রতিকার অবশ্যই করা উচিত। আমরা সবাই একটি সশস্ত্র দল (এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী)। মোটকথা, (দু'চার দিনে সাজ-সরঞ্জাম ও সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়ে গেল। তারা যে ফিরে আসতে পারবে না, এ কল্পনাও তাদের ছিল না। এ দিক দিয়ে যেন) আমি তাদেরকে বাগ-বাগিচা, ঝরণাসমূহ থেকে, ধনভাণ্ডার এবং সুরম্য অট্টালিকাসমূহ থেকে বহিষ্কার করে দিলাম। (আমি তাদের সাথে) এরূপই করেছি এবং তাদের পরে বনী ইসরাইলকে এগুলোর মালিক করে দিয়েছি। (এ ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। অতঃপর আবার কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে ঃ) মোটকথা, (একদিন) সূর্যোদয়ের সময় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল (অর্থাৎ কাছাকাছি পৌছে গেল। বনী ইসরাইল তখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার ফিকিরে ছিল)। অতঃপর যখন উভয় দল (এমন নিকটবর্তী হলো যে,) পরস্পরকে দেখল, তখন মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা (অস্থির হয়ে) বলল, (হে মূসা,) আমরা তো তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই নয়; কারণ, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি এখনই আমাকে (সাগর পাড়ি দেয়ার) পথ বলে দেবেন। (কেননা, রওয়ানা হওয়ার সময়ই মূসা (আ)-কে বলে দেয়া হয়েছিল যে, সমুদ্রে শুষ্ক পথ সৃষ্টি হবে فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى তবে শুষ্ক কিরূপে হবে, তা তখন বলা হয়নি। সুতরাং মূসা (আ) এই ওয়াদার কারণে নিশ্চিত ছিলেন এবং বনী ইসরাইল উপায় জানা না থাকার কারণে অস্থির ছিল।) অতঃপর আমি মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম, লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। সেমতে (তিনি আঘাত করলেন। ফলে) তা বিদীর্ণ হয়ে (কয়েক অংশ হয়ে) গেল। (অর্থাৎ কয়েক জায়গা থেকে পানি সরে গিয়ে মাঝখানে একাধিক সড়ক খুলে গেল।) প্রত্যেক অংশ বিশাল পর্বতসদৃশ (বড়) ছিল। (তারা নিরাপদে ও শান্তিতে সমুদ্র পার হয়ে গেল।) আমি অপর দলকেও তথায় পৌছিয়ে দিলাম (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার দলবলও সমুদ্রের কাছে পৌছে গেল এবং وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا এই সাবেক ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সমুদ্র তখন পর্যন্ত তদবস্থায়ই ছিল। তারা খোলা পথকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে গোটা বাহিনীকে পথে নামিয়ে দিল। সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে পানি নেমে আসতে লাগল এবং সমগ্র বাহিনী সলিল সমাধি লাভ করল। বাহিনীর

পরিণাম হলো এই যে,) আমি মূসা (আ)-কে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে (নিমজ্জিত হওয়া থেকে) উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে (অর্থাৎ তাদের প্রতিপক্ষকে) নিমজ্জিত করে দিলাম। এ ঘটনায়ও বড় শিক্ষা আছে (অর্থাৎ কাফিররা এর দ্বারা যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী ও পয়গম্বরদের বিরোধিতা আযাবের কারণ। একথা বুঝে তারা বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।) কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত পরাক্রমশালী (ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই আযাব দিতেন; কিন্তু) পরম দয়ালু। (তাই ব্যাপক দয়ার কারণে আযাবের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং আযাবের বিলম্ব দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ—এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফিরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাইলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফিরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাইল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফির জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাইল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আযাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ্ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাইল কোন সময় দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফিরাউন সম্প্রদায়ের বিষয় সম্পত্তি ও ধনভাণ্ডারের উপর বনী ইসরাইলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ? তফসীর রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুইটি জওয়াব তফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাইলকে ফিরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু এ কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফিরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ্ প্রান্তরে ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও খ্রিস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কোরআনের আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব

আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, বনী ইসরাইলকে বিশেষভাবে ফিরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাইলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, নবী ইসরাঈলকে ফিরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়। বরং অনুরূপ বাগবাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াত الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا শব্দ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, শামদেশই বুঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে بَارَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাইল কোন সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহ্র তফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত শামদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভাণ্ডারের মালিক হওয়া বুঝানো যেতে পারে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ - قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ—পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাইল চীৎকার করে উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি মূসা (আ)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন كَلَّا আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। মূসা (আ)-এর চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় আমাদের রাসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলেছিলেন ঃ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে مَعَنَا বলেছেন অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ্ আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রাসূলের সাথে আল্লাহ্র সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿৬৯﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿৭০﴾ قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿৭১﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿৭২﴾ أَوْ يَنْفَعُو
نَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿৭৩﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿৭৪﴾ قَالَ
أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿৭৫﴾ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿৭৬﴾ فَإِنَّهُمْ
عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿৭৭﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿৭৮﴾ وَالَّذِي
هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿৭৯﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿৮০﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي
ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿৮১﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿৮২﴾
رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿৮৩﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْآخِرِينَ ﴿৮৪﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿৮৫﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ
كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿৮৬﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿৮৭﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا
بَنُونَ ﴿৮৮﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿৮৯﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿৯০﴾
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿৯১﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿৯২﴾ مِنْ دُونِ
اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿৯৩﴾ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿৯৪﴾
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿৯৫﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿৯৬﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿৯৭﴾ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿৯৮﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿৯৯﴾
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿১০০﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿১০১﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

(৬৯) আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। (৭০) যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর ? (৭১) তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। (৭২) ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি ? (৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করে কিংবা ক্ষতি করতে পারে ? (৭৪) তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি তারা এরূপই করত। (৭৫) ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা ? (৭৭) বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু, (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, (৭৯) যিনি আমাকে আহার দেন এবং পানীয় দান করেন, (৮০) যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, (৮১) যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। (৮২) আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। (৮৩) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর (৮৪) এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর (৮৫) এবং আমাকে নিয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। (৮৭) এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, (৮৮) যে দিবসে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, (৮৯) কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসবে। (৯০) জান্নাত আল্লাহ্ভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে। (৯১) এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। (৯২) তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে (৯৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে ? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে ? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে (৯৫) এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। (৯৬) তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে, (৯৭) আল্লাহ্র কসম আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। (৯৯) আমাদেরকে দুষ্কর্মীরাই গোমরাহ্ করেছিল। (১০০) অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা

বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (১০৩) নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে, এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি তাদের সামনে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন (যাতে তারা শিরক নিন্দনীয় হওয়ার প্রমাণাদি জানতে পারে বিশেষত ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত প্রমাণাদি। কেননা, আরবের এই মুশরিকরা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী বলে দাবি করে। এই বৃত্তান্ত তখনকার) যখন তিনি তাঁর পিতাকে এবং তাঁর (প্রতিমাপূজারী) সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি (অলীক) বস্তুর পূজা কর ? তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের পূজা করি এবং তাদের (পূজা)-কেই আঁকড়ে থাকি। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যখন (তোমাদের অভাব-অনটন দূর করার জন্য) তাদেরকে আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি অথবা (তোমরা যে তাদের পূজা কর,) তারা কি তোমাদের কোন উপকার করে কিংবা (যদি তোমরা তাদের পূজা বর্জন কর, তবে কি) ক্ষতি করতে পারে ? (অর্থাৎ পূজনীয় হওয়ার জন্য পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতা থাকা জরুরী। তারা বলল, (তা তো নয়। তারা কিছুই শোনে না এবং কোন লাভ ক্ষতি করতে পারে না। তাদের পূজা করার কারণ এটা নয়,) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। (তাই আমরাও এই পূজা করি)। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা কি তাদের (অবস্থা) সম্পর্কে ভেবে দেখেছ; যাদের পূজা করতে তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা ? তারা (উপাস্যরা) আমার (অর্থাৎ তোমাদের) জন্য ক্ষতিকারক (অর্থাৎ তাদের পূজা করলে; আমি করি কিংবা তোমরা কর। তাদের ইবাদতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই।) কিন্তু হ্যাঁ, বিশ্বপালনকর্তা (এমন যে, তিনি তাঁর উপাসনাকারীদের বন্ধু। তাঁর ইবাদত আদ্যোপান্ত উপকারী।) যিনি আমাকে (এমনিভাবে সবাইকে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আমাকে (আমার উপকারিতার দিকে) পথপ্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি দান করেন, যদ্দ্বারা লাভ-লোকসান বুঝি। এবং যিনি আমাকে পানাহার করান। আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন এবং তিনি আমাকে (যথাসময়ে) মৃত্যু দেবেন, অতঃপর (কিয়ামতের দিন) আমাকে জীবিত করবেন এবং যিনি কিয়ামতের দিন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন বলে আমি আশা করি। (আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে উৎসুক করার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ) এসব গুণের কথা বর্ণনা করলেন। এরপর আল্লাহ্র ধ্যান প্রবল হয়ে যাওয়ার কারণে মুনাজাত শুরু করে দিলেন ঃ) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা (অর্থাৎ ইল্‌ম ও আমলে পূর্ণতা) দান কর। (কেননা, মূল প্রজ্ঞা তো দোয়ার সময়ও অর্জিত ছিল)। এবং (নৈকট্যের স্তরে) আমাকে (উচ্চ স্তরের) সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর (অর্থাৎ মহান পয়গম্বরদের অন্তর্ভুক্ত কর।) এবং আমার আলোচনা ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে অব্যাহত রাখ (যাতে তারা আমার পথে চলে। ফলে আমি বেশি সওয়াব পাব।) এবং আমাকে নিয়ামত উদ্যানের অধিকারিগণের শামিল কর এবং আমার পিতাকে (ঈমানের তওফীক দিয়ে) ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। যেদিন সবাই পুনরুত্থিত হবে, সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (অতঃপর সেদিনের কিছু লোমহর্ষক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যাতে

সম্প্রদায়ের লোকেরা শোনে এবং সাবধান হয়। এবং সেই দিনগুলো এমন হবে যে,) সেদিন (মুক্তির জন্য) অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে (সে মুক্তি পাবে,) যে (কুফর ও শিরক থেকে) পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে এবং (সেদিন) আল্লাহ্‌ভীরুদের (অর্থাৎ ঈমানদারগণের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে (যাতে তারা দেখে এবং তারা তথায় যাবে জেনে আনন্দিত হয়।) এবং পথভ্রষ্টদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য দোযখ সম্মুখে প্রকাশ করা হবে (যাতে তারা তাদের অবস্থানস্থল দেখে দুঃখিত হয়) এবং (সেদিন) তাদেরকে (পথভ্রষ্টদেরকে) বলা হবে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায় ? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা আত্মরক্ষা করতে পারে ? অতঃপর (একথা বলে) তাদেরকে (উপাসকগণকে) ও পথভ্রষ্ট লোক এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (সুতরাং প্রতিমা ও শয়তানরা নিজেদেরকে এবং উপাসকদেরকে বাঁচাতে পারবে না)। কাফিররা জাহান্নামে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে (উপাস্যদেরকে) বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে (ইবাদতে) বিশ্ব পালনকর্তার সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে তো (গোমরাহীর প্রতিষ্ঠাতা) বড় দুষ্কর্মীরাই গোমরাহ্ করেছিল। অতএব (এখন) আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (যে ছাড়িয়ে নেবে) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই (যে কেবল মর্মবেদনাই প্রকাশ করবে।) যদি আমরা (পৃথিবীতে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম। [এ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য সমাপ্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ] নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ ইবরাহীমের বিতর্কে ও কিয়ামতের ঘটনায় সত্যান্বেষী ও পরিণামদর্শীদের জন্য) শিক্ষা রয়েছে। (বিতর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে তাওহীদের বিশ্বাস লাভ হয় এবং কিয়ামতের ঘটনাবলী থেকে ভয় অর্জিত হয় এবং ঈমানের পথ প্রশস্ত হয়।) কিন্তু তাদের (অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (তিনি আযাব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া ঃ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ। এই আয়াতে لِسَان বলে আলোচনা বুঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ্ আমাকে এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে। —(ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী) আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদী, খ্রিস্টান এমনকি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ, তথাপি তাদের দাবি এই যে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহিমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

খ্যাতি ও যশপ্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধ ঃ যশপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশোপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا —আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যত যশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দান করুন, যা আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়া দ্বারা কোন সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত কা'ব ইবনে মালেকের জবানী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগপালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। এক. অর্থসম্পদের ভালবাসা এবং দুই. সম্মান ও যশ অন্বেষণ। দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অন্বেষণ বুঝানো হয়েছে, যা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য অথবা কোন গুনাহ্ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে ঃ اللهم اجعلنى فى عينى صغيرا وفى اعين الناس كبيرا হে আল্লাহ্, আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সৎকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন রিয়াকারী না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয। ইমাম গাযযালী বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। এক. যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়,; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। দুই. মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই। তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। তিন. যদি তা অর্জন করার জন্য কোন গুনাহ্ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয় ঃ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ অন্যত্র কোরআন পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মু'মিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফিরাতের দোয়া কামনা করা দ্ব্যর্থহীনরূপে নাজায়েয; যদিও তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব ঃ وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ —এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন ? আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ -

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবূল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পেরেছিলেন; না তার মৃত্যুর পর, না কিয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লিখিত হয়েছে।

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَبَنُوْنَ - اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ —অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারও কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছবে। এই আয়াতের استثناء কে استثناء منقطع সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন কারও অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারও কাছে জিজ্ঞেস করে যে, যায়দের কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও আছে কি ? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থ–সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ–সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের استثناء টি متصل এবং

অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যই উপকারী হবে—কাফিরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে ولابنون বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা সন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এঁদের কাছ থেকে উপকারের আশা হতো।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قلب سليم এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বুঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফিরের অন্তঃকরণ রুগ্ন হয়ে থাকে; যেমন কোরআন বলে فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে ঃ আলোচ্য আয়াতের বহুলপ্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মু'মিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের ময়দান ও হিসাবের দাঁড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌঁছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে যেমন কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবূল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে; বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা বাপ দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, অর্থাৎ আমি আমার সৎ

বান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মু'মিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মু'মিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না; যেমন হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র, লূত (আ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ — إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ এবং لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ — وَاللَّهُ أَعْلَمُ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

(১০৫) নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের কি ভয় নেই ? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার

আনুগত্য কর। (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা ? (১১২) নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার ? (১১৩) তাদের হিসাব নেওয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! (১১৪) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেওয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' (১১৬) তারা বলল, হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।' (১১৭) নূহ বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (১১৮) অতএব আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মু'মিনগণকে রক্ষা করুন।' (১১৯) অতঃপর আমি তাঁকে ও তার সঙ্গীগণকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (কেননা একজনকে মিথ্যারোপ করা সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল)। যখন তাদের জ্ঞাতিভাই নূহ (আ) তাদেরকে বলল, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (আল্লাহ্‌র পয়গাম কম-বেশি না করে হুবহু তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেই)। অতএব (এর পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে কোন (পার্থিব) প্রতিদান (ও) চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। অতএব (আমার এই নিঃস্বার্থপরতার পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব, অথচ ইতরজনেরা তোমার সঙ্গী হয়ে আছে। (তাদের সাথে একাত্মতায় ভদ্রজনেরা লজ্জাবোধ করে। এছাড়া এমন হীনবল লোকেরা অর্থ-সম্পদ অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের লক্ষ্যেই কারও সঙ্গী হয়ে থাকে। অতএব তাদের ঈমানের দাবি ধর্তব্য নয়।) নূহ (আ) বললেন, তারা (পেশাগতভাবে) কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (ভদ্র হোক কিংবা ইতর, ধর্মের কাজে এ তফাতের কি প্রতিক্রিয়া ? তাদের ঈমান আন্তরিক কি না, সে সম্পর্কে) তাদের হিসাব গ্রহণ করা আমার পালনকর্তারই কাজ। কি চমৎকার হতো, যদি তোমরা তা বুঝতে! (নীচ-পেশা লোকদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা সাব্যস্ত করার কারণে ইঙ্গিতে এই আবেদন বুঝা যায় যে, আমি তাদেরকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেই। এর জওয়াব এই যে) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (তোমরা ঈমান আন বা না আন, আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আমি কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (প্রচারকার্য দ্বারা আমার কর্তব্য সমাধা হয়ে যায়। নিজেদের লাভ-লোকসান তোমরা দেখে নাও।) তারা বলল, হে নূহ, যদি তুমি (এই বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে। (মোটকথা, যখন বছরের পর বছর এভাবে অতিবাহিত হয়ে

গেল, তখন) নূহ (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে (সর্বদা) মিথ্যাবাদী বলেছে। অতএব আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটি (কার্যগত) মীমাংসা করে দিন (অর্থাৎ তাদেরকে নিপাত করুন।) এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মু'মিনগণকে রক্ষা করুন। আমি (তাঁর দোয়া কবূল করলাম এবং) তাকে ও তাঁর সাথে যারা বোঝাই করা নৌকায় ছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম। এরপর অবশিষ্ট লোকগণকে আমি নিমজ্জিত করলাম। এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়ও) বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আযাব দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান ঃ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি ও চরিত্র—পরিবার ও জাঁকজমক নয় ঃ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ - قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ—এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একাত্ম হতে পারি? নূহ (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। নূহ (আ) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। এটা ভুল, বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না।—(কুরতুবী)

كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُوْدٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾
أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾
إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

(১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের কি ভয় নেই ? (১২৫) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। (১২৬) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ ? (১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে ? (১৩০) যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালিম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেই সব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঝরনা। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করি।' (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ না-ই দাও উভয়ই আমাদের জন্য সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদেরকে তাদের (জ্ঞাতি) ভাই হুদ (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ প্রচারকাজের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে। তোমরা কি (শিরক ছাড়াও অহংকার ও গর্বে এতটুকু লিপ্ত যে) প্রতিটি উচ্চ স্থানে অযথা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছ (যাতে খুব উঁচু দৃষ্টিগোচর হয়)। যাকে শুধুমাত্র অযথা (অপ্রয়োজনে) তৈরি করে থাক এবং (এ ছাড়া প্রয়োজনীয় বসবাসের গৃহেও এতটুকু বাড়াবাড়ি কর যে) বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ (অথচ এর চাইতে নিম্নস্তরের গৃহেও আরাম পেতে পার) এই ভেবে যে, দুনিয়াতে তোমরা চিরকাল থাকবে (অর্থাৎ সুবিশাল গৃহ, সুউচ্চ প্রাসাদ ও সুরম্য স্মৃতিসৌধ তখনই উপযুক্ত হতো, যখন দুনিয়াতে তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হতো। তখন তোমরা ভাবতে পারতে যে, প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা সংকীর্ণতা অনুভব না করে। কেননা, তারাও আমাদের সাথে এখানে থাকবে এবং এগুলো উচ্চতা বিশিষ্টভাবেও নির্মাণ করতে হবে, যাতে নিচে স্থান সংকুলান না হলে উপরে বসবাস করা যায় এবং মজবুতও করতে হবে, যাতে আমাদের দীর্ঘ জীবনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করতে হবে, যাতে আমাদের চর্চা চিরকাল অব্যাহত থাকে। এখন তো সবাই অযথা। সুরম্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে, অথচ নির্মাণকারীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। মৃত্যু সবাইকে গ্রাস করে ফেলেছে। কেউ ত্বরায় এবং কেউ বিলম্বে মৃত্যুবরণ করেছে। এই অহংকারের কারণে তোমরা মনে এত কঠোরতা ও নির্দয়তা পোষণ কর যে) যখন কাউকে আঘাত হান, তখন স্বৈরাচারী (ও জালিম) হয়ে আঘাত হান। (এসব মন্দ চরিত্র বর্ণনা করার কারণ এই যে, মন্দ চরিত্র অনেক সময় ঈমান ও আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।) অতএব (শিরক ও মন্দ চরিত্র যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি এবং শাস্তির কারণ, তাই) আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (যেহেতু আমি রাসূল, তাই) আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান (অর্থাৎ) চতুষ্পদ জন্তু, পুত্রসন্তান, উদ্যান ও ঝরনা তোমাদেরকে দিয়েছেন (সুতরাং অনুগ্রহদাতার নির্দেশাবলী লংঘন করা মোটেই সমীচীন নয়)। আমি তোমাদের জন্য (যদি তোমরা এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হও, তবে) এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি (এ হচ্ছে ভীতি প্রদান এবং أَمَدَّكُمْ এ উৎসাহ প্রদান ছিল)। তারা বলল, আমাদের জন্য তো উভয় বিষয় সমান—তুমি উপদেশ দান কর অথবা উপদেশ দান না-ই কর। (অর্থাৎ আমরা উভয় অবস্থাতেই আমাদের কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করব না। তুমি যা কিছু বলছ) এ তো পূর্বপুরুষদের একটি (সাধারণ) অভ্যাস (ও প্রথা। প্রতি যুগেই মানুষ নবুয়ত দাবি করে অন্যদেরকে এসব কথা বলে।) এবং (তুমি যে আমাদেরকে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, শোন) আমরা কখনও আযাবপ্রাপ্ত হব না। মোটকথা, তারা হুদ (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং আমি তাদেরকে (ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝার আযাব দ্বারা) নিপাত করে দিলাম। নিশ্চয় এতে (ও) বড় নিদর্শন আছে (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী অমান্য করার কি পরিণতি হতে পারে) এবং

(এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয়, আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (তিনি আযাব দিতে সক্ষম; কিন্তু দয়াবশত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ— ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে ريع দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ريع উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই ريع النبات উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। اية এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বুঝানো হয়েছে। تَعْبَثُونَ শব্দটি عبث থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مصانع শব্দটি مصنع-এর বহুবচন। হযরত কাতাদাহ বলেন مصانع বলে পানির চৌবাচ্চা বুঝানো হয়েছে; কিন্তু হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বুঝানো হয়েছে। لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لَعَلَّ শব্দটি تشبيه অর্থাৎ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস এর অনুবাদে বলেন كَأَنَّكُمْ تَخْلُدُونَ—অর্থাৎ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে।—(রূহুল মা'আনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাসের জবানী ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই النفقة كلها فى سبيل الله الا البناء فلا خير فيه অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় ان كل بناء وبال على صاحبه الا ما لايعنى الا ما لابد منه অর্থাৎ প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদ; কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هٰهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي

جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿১৪৭﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿১৪৮﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ

بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿১৪৯﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿১৫০﴾ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿১৫১﴾

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿১৫২﴾ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ

الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿১৫৩﴾ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ

الصّٰدِقِيْنَ ﴿১৫৪﴾ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿১৫৫﴾

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿১৫৬﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا

نٰدِمِيْنَ ﴿১৫৭﴾ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿১৫৮﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿১৫৯﴾

(১৪১) সামূদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ্ তাদেরকে বলছেন, 'তোমরা কি ভয় কর না ? (১৪৩) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৪৪) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে ? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরনাসমূহের মধ্যে ? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।" (১৫৩) তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।' (১৫৫) সালেহ্ বললেন, 'এই উষ্ট্রী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা-নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। (১৫৬) তোমরা একে কেন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু

তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৫৯) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সামূদ সম্প্রদায় (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্কে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদেরকে কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে। (তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে আল্লাহ্ থেকে অত্যন্ত গাফিল, অতএব) তোমাদের কি এসব বস্তুর মধ্যেই নির্বিঘ্নে থাকতে দেয়া হবে ? অর্থাৎ উদ্যানসমূহের মধ্যে, ঝরনাসমূহের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? (অর্থাৎ যে খেজুর বাগানে প্রচুর ফল আসে।) এবং (এই গাফিলতির কারণেই) তোমরা কি পাহাড় কেটে কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ ? অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না (এখানে কাফির সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করত। 'অনর্থ করা ও শান্তি স্থাপন না করা' বলে তাই বুঝানো হয়েছে।) তারা বলল তোমার উপর কেউ জাদু করেছে। (ফলে বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং নবুয়ত দাবি করছ। অথচ) তুমি তো আমাদের মত একজন (সাধারণ) মানুষ। (মানুষ নবী হয় না।) অতএব তুমি যদি (নবুয়তের দাবিতে) সত্যবাদী হও তবে কোন মু'জিযা উপস্থিত কর। সালেহ্ (আ) বললেন, এই যে উষ্ট্রী (অস্বাভাবিক পন্থায় জন্মগ্রহণের কারণে এটা মু'জিযা, যেমন অষ্টম পারার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। এটা আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও এর কিছু প্রাপ্য আছে। এক এই যে) পানি পান করার নির্ধারিত এক পালা এর এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে এক পালা তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের জন্তুদের। দুই-এই যে), (তোমরা এর অনিষ্ট (এবং কষ্ট প্রদানের) উদ্দেশ্যে হাতও লাগাবে না। তাহলে তোমাদের মহাদিবসে আযাব পাকড়াও করবে। অতঃপর তারা (রিসালতও মানল না এবং উষ্ট্রীর প্রাপ্যও আদায় করল না; বরং) উষ্ট্রীকে বধ করল। এরপর (যখন আযাবের চিহ্ন প্রকাশ পেল, তখন দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো। (কিন্তু প্রথমত, আযাব দেখার পর অনুতাপ নিষ্ফল, দ্বিতীয়ত, নিছক অনুতাপে কিছু হয় না, যে পর্যন্ত ইচ্ছাধীন প্রতিকার অর্থাৎ তওবা ও ঈমান না হয়।) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (ফলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অবকাশ দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ — হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে فَارِهِيْنَ -এর তফসীরে বলা হয়েছে অহংকারী। আবূ সালেহ ও ইমাম রাগিবের মতে فَارِهِيْنَ -এর তফসীর حَاذِقِيْنَ অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন

যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহ্র নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং তদ্দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয। কিন্তু তা দ্বারা যদি গুনাহ্, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েয; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا
لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ
الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ
فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

(১৬০) লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না ? (১৬২) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৬৩) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' (১৬৭) তারা বলল, 'হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।' (১৬৮) লূত বললেন,

'আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।' (১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৭৫) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

লূতের সম্প্রদায় (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদেরকে তাদের ভাই লূত (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে। সারাজাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি শুধু এ আচরণ কর যে, পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর ? (অর্থাৎ তোমরা ছাড়া এই কুকাণ্ড আর কেউ করে না। এরূপ নয় যে, এটা মন্দ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে;) বরং (আসল কথা এই যে,) তোমরা (মানবতার) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তারা বলল, হে লূত, তুমি যদি (আমাদেরকে এসব বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে (জনপদ থেকে) বহিষ্কার করা হবে। লূত (আ) বললেন, (আমি এই হুমকিতে বিরত হব না। কেননা) আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি (কাজেই বলা-কওয়া কিরূপে ত্যাগ করব? তারা যখন কিছুতেই মানল না এবং আযাব আসবে বলে মনে হলো তখন) লূত (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার(বিশেষ) পরিবারবর্গকে তাদের এই কাজ (অর্থাৎ কাজের বিপদ) থেকে রক্ষা কর। অতঃপর আমি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম একজন বৃদ্ধা ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়ে গেল। এরপর আমি [লূত (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ছাড়া] অন্য সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম। আমি তাদের উপর বিশেষ প্রকারের (অর্থাৎ প্রস্তরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং কত নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হলো তাদের উপর, যাদেরকে (আল্লাহ্‌র আযাবের) ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল! নিশ্চয় এতে (ও) শিক্ষা আছে। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের), অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী পরম দয়ালু (আযাব দিতে পারতেন; কিন্তু এখনও দেননি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম ঃ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ **আয়াতের** مِنْ **অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে**

যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা হীনম্মন্যতার পরিচায়ক। مِنْ অব্যয়টি এখানে تبعيض এর জন্যও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نعوذ بالله منه (রূহুল মা'আনী)

اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ এখানে عجوز বলে লূত (আ)-এর স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফির ছিল। লূত (আ)-এর এই কাফির স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধা হলে তার জন্য عجوز শব্দের ব্যবহার যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে, তবে তাকে عجوز শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পয়গম্বরের স্ত্রী উম্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহিত করা অসঙ্গত নয়।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ—এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নিচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েয। হানাফী আলিমদের মাযহাব তাই। কেননা লূত-সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।—(শামীঃ কিতাবুল হুদূদ)

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾
اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ
الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَ
هُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَ
وَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ

يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

(১৭৬) বনের অধিবাসীরা পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন শু'আয়ব তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না ? (১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৭৯) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৮১) মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১৮২) সোজা দাঁড়িপাল্লায় ওযন কর। (১৮৩) মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম। (১৮৬) তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমাদের ধারণা—তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৭) অতএব যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। (১৮৮) শু'আয়ব বললেন, 'তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত। (১৮৯) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব। (১৯০) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১৯১) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আসহাবে আইকা (ও যাদের কথা সূরা হিজরের শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে) পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন শু'আয়ব (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। তোমরা পুরোপুরি পরিমাপ করবে এবং (প্রাপকের) ক্ষতি করবে না। (এমনিভাবে ওযনের বস্তুসমূহে) সোজা দাঁড়িপাল্লায় ওযন করবে এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে না। তোমরা তাঁকে (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে) ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, তোমার উপর তো কেউ বড় আকারের জাদু করেছে (ফলে তোমার মতিভ্রম হয়ে গেছে এবং তুমি নবুয়ত দাবি করতে শুরু করেছ)। তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমরা মনে করি যে, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত । যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের উপর আসমানের কোন টুকরা ফেলে দাও (যাতে আমরা জানতে পারি যে, তুমি বাস্তবিকই পয়গম্বর ছিলে

এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে আমাদের এই শাস্তি হয়েছে।) শু'আয়ব (আ) বললেন, (আমি আযাব আনয়নকারী অথবা তার অবস্থা নির্ধারণকারী নই,) তোমাদের কিয়াকর্ম আমার পালনকর্তা (ই) ভাল জানেন। (এই ক্রিয়াকর্মের কারণে কি আযাব হওয়া দরকার, কবে হওয়া দরকার, তাও তিনিই জানেন। সব তাঁরই ইচ্ছা।) অতঃপর তারা (হরহামেশাই) তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল। এরপর তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চিতই সেটা ভীষণ দিবসের আযাব ছিল। এতে (ও) বড় শিক্ষা আছে। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আযাব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ কারও কারও মতে قسط গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ قسط থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওযনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে। وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ—অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চাইতে কম দেওয়া হারাম; তা কোন মাপ ও ওযনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত উমর ফারূক (রা) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করল। হযরত উমর (রা) বললেন, طففت অর্থাৎ তুমি ওযনে কম করেছে। যেহেতু নামায ওযনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালিক বলেন ঃ وفاء وتطفيف অর্থাৎ প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে; শুধু মাপ ও ওযনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়। বরং কারও হক কম দেওয়া তা যেভাবেই হোক না কেন--হারাম। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র অপরাধী নিজ পায়ে হেঁটে আসে—গ্রেফতারী পরোয়ানা দরকার হয় না ঃ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ — এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল।—(রূহুল মা'আনী)

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿১৯৪﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿১৯৫﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿১৯৬﴾
أَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ آيَةً أَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿১৯৭﴾ وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ
الْأَعْجَمِينَ ﴿১৯৮﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿১৯৯﴾ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِي
قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿২০০﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿২০১﴾ فَيَأْتِيَهُمْ
بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿২০২﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿২০৩﴾ أَفَبِعَذَابِنَا
يَسْتَعْجِلُونَ ﴿২০৪﴾ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِينَ ﴿২০৫﴾ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوا
يُوعَدُونَ ﴿২০৬﴾ مَآ أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿২০৭﴾ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿২০৮﴾ ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِينَ ﴿২০৯﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِينُ ﴿২১০﴾
وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿২১১﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿২১২﴾ فَلَا
تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿২১৩﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ ﴿২১৪﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿২১৫﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ
فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿২১৬﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿২১৭﴾ الَّذِي يَرٰىكَ
حِينَ تَقُومُ ﴿২১৮﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِينَ ﴿২১৯﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿২২০﴾ هَلْ
أُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِينُ ﴿২২১﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿২২২﴾ يُّلْقُونَ
السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كٰذِبُونَ ﴿২২৩﴾ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿২২৪﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ
فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيمُونَ ﴿২২৫﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿২২৬﴾ إِلَّا الَّذِينَ

آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

(১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্য এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাইলের আলিমগণ এটা অবগত আছে ? (১৯৮) যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি গুনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্তুদ আযাব; (২০২) অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না ? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে ? (২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হতো, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে ? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী ছিল (২০৯) স্মরণ করানোর জন্য, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয়। (২১০) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করে নি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (২১৩) অতএব আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদয় হোন। (২১৬) যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (২১৭) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন। (২১৯) এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। (২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে ? (২২২) তারা অবতীর্ন হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গুনাহ্গারের উপর। (২২৩) তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে ? (২২৬) এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্কে খুব স্মরণ

করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কোরআন বিশ্বপালনকর্তা প্রেরিত। একে বিশ্বস্ত ফেরেশতা নিয়ে আগমন করেছে আপনার অন্তরে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়, যাতে আপনি (ও) সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্বর যেমন তাঁদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পৌছিয়েছেন, আপনিও তেমন পৌছান।) এবং এর (কোরআনের) উল্লেখ পূর্ববর্তীগণের (আসমানী) কিতাবে (ও) আছে (যে, এরূপ গুণসম্পন্ন পয়গম্বর হবেন, তাঁর প্রতি এরূপ কালাম নাযিল হবে। এ স্থলে তফসীরে হাক্কানীর টীকায় পূর্ববর্তী কিতাব তওরাত ও ইনজীলের কতিপয় সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এই বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা আছে। অর্থাৎ) তাদের জন্য এটা কি প্রমাণ নয় যে, একে (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীকে) বনী ইসরাইলের পণ্ডিতরা জানে। (সেমতে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও বিশেষ লোকদের সামনে এর স্বীকারোক্তি করে। প্রথম পারার চতুর্থাংশ اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ আয়াতের তফসীরে একথা বিবৃত হয়েছে। এই প্রমাণটি অশিক্ষিত আরবদের জন্য। নতুবা শিক্ষিত লোকেরা আসল কিতাবেই তা দেখে নিতে পারত। এতে জরুরী নয় যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন হয়নি। কেননা, পরিবর্তন সত্ত্বেও এরূপ বিষয়বস্তু বাকি থেকে যাওয়া আরও অধিকতর প্রমাণ। পরিবর্তনের ফলেই এসব বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে একথা বলা ভুল। কেননা, নিজের ক্ষতির জন্য কেউ পরিবর্তন করে না। এসব বিষয়বস্তু পরিবর্তনকারীদের জন্য যে ক্ষতিকর তা তো স্পষ্ট। এ পর্যন্ত وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ দাবির দুইটি ইতিহাসগত প্রমাণ বর্ণিত হলো অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উল্লেখ এবং বনী ইসরাইলের জানা থাকা। এগুলোর মধ্যেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির দলীল। অতঃপর অবিশ্বাসকারীদের হঠকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই দাবির যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের অলৌকিকতা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা এমন হঠকারী যে,) যদি (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে) আমি এই কোরআন কোন আজমী (অনারব) ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তিনি তাদের সামনে তা পাঠ করতেন, (এতে এর মু'জিযা হওয়া আরও বেশি প্রকাশ পায়; কেননা, যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ)। তখনও তারা (চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে) তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। [অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্ত্বনার জন্য তাদের বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে নৈরাশ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ] এমনিভাবে আমি অবাধ্যদের অন্তরে (এই তীব্র) অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (এই তীব্রতার কারণে) তারা এর (কোরআনের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (মৃত্যুর সময় অথবা বরযখে অথবা পরকালে) প্রত্যক্ষ না করে, যা আকস্মিকভাবে তাদের সামনে উপস্থিত হবে এবং তারা (পূর্বে) টেরও পাবে না। (তখন মৃত্যুর আশংকা দেখে) তারা বলবে, আমরা কি (কোনরূপে) অবকাশ পেতে পারি ? কিন্তু সেটা অবকাশ ও ঈমান কবূল হওয়ার সময় নয়। কাফিররা আযাবের বিষয়বস্তু শুনে অবিশ্বাসের ছলে

আযাব চাইত এবং বলত, وَاِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا এবং رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا حِجَارَةً অর্থাৎ হে আল্লাহ্, এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ কর। তারা অবকাশকে আযাব না হওয়ার প্রমাণ ঠাওরাত। পরবর্তী আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে ঃ তারা কি (আমার সতর্কবাণী শুনে) আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায় ? (এর আসল কারণ অবিশ্বাস। অর্থাৎ একজন মহৎ ব্যক্তির খবর সত্ত্বেও তারা অবিশ্বাস করে ? অবকাশকে এই অবিশ্বাসের ভিত্তি করা নেহায়েত ভুল। (কেননা) হে সম্বোধিত ব্যক্তি, বলুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে দেই, অতঃপর তাদেরকে যার (অর্থাৎ যে আযাবের) ওয়াদা দেওয়া হতো, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগবিলাস তাদের কি উপকারে আসবে ? অর্থাৎ ভোগবিলাসের এই অবকাশের কারণে তাদের আযাব কোনরূপ হালকা অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না)। আর (হেকমতের কারণে কমবেশি কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া তাদের জন্যই নয়; বরং পূর্ববর্তী উম্মতরাও অবকাশ পেয়েছে। সেমতে অবিশ্বাসীদের) যত জনপদ আমি (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি, সবগুলোর মধ্যে উপদেশের জন্য সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছেন। (যখন তারা মান্য করেনি, তখন আযাব নাযিল হয়েছে।) আমি (দৃশ্যতও) যুলুমকারী নই। (উদ্দেশ্য এই যে, দলীল সম্পূর্ণ করা এবং ওযরের পথ বন্ধ করার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়। এই অবকাশ সবার জন্যই ছিল। পয়গম্বরদের আগমনও এক প্রকার অবকাশ দেওয়াই। কিন্তু এরপরও ধ্বংসের আযাব এসেছেই। এসব ঘটনা থেকে অবকাশ দানের রহস্যও জানা গেল এবং অবকাশ ও আযাবের মধ্যে বৈপরীত্য না থাকাও প্রমাণিত হলো। 'দৃশ্যত' বলার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থাতেই যুলুম হয় না। অতঃপর আবার وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ-এর বিষয়বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু অবিশ্বাসীদের অবস্থার উপযোগী হওয়ার কারণে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহের সারমর্ম কোরআনের সত্যতা সম্পর্কিত সন্দেহ নিরসন করা। প্রথমত কোরআন আল্লাহ্র কালাম এবং তাঁর প্রেরিত—এ সম্পর্কে কাফিরদের মনে সন্দেহ ছিল। এই সন্দেহের কারণ ছিল এই যে, আরবে পূর্ব থেকেই অতীন্দ্রিয়বাদী লোক বিদ্যমান ছিল। তারাও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলত। নাউযুবিল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কেও কোন কোন কাফির অতীন্দ্রিয়বাদী হওয়ার কথা বলত। (দুররে মনসুর-ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত) বুখারীতে জনৈকা মহিলার উক্তি বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহীর আগমনে বিলম্ব দেখে সে বলল, তাঁকে তাঁর শয়তান পরিত্যাগ করেছে। কারণ, অতীন্দ্রিয়বাদীরা যা কিছু বলত, তা শয়তানেরই শিক্ষার ফল ছিল। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এই কোরআন বিশ্বজাহানের পালনকর্তার অবতীর্ণ) একে শয়তানরা (যারা অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে আগমন করে) অবতীর্ণ করেনি। (কেননা, শয়তানের দুইটি শক্তিশালী অন্তরায় বিদ্যমান আছে। প্রথমত তার শয়তানী গুণ, যার কারণে) এটা (অর্থাৎ কোরআন) তাদের উপযুক্তই নয়। (কেননা, কোরআন পুরোপুরিই হিদায়াত এবং শয়তান পুরোপুরিই পথভ্রষ্টতা। শয়তানের মস্তিষ্কে এ ধরনের বিষয়বস্তু আসতেই পারে না এবং এ ধরনের বিষয়বস্তু প্রচার করে শয়তান তার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে) সফল হতে পারে না। দ্বিতীয় অন্তরায় এই যে,) তারা (শয়তানরা) এর সামর্থ্যও রাখে না।

তাদেরকে (ওহী) শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (সেমতে অতীন্দ্রিয়বাদী ও মুশরিকদের কাছে তাদের শয়তানরা তাদের ব্যর্থতার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে। এরপর মুশরিকরা অন্যদেরকেও একথা জানিয়েছে। বুখারীতে হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়ে এ ধরনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং শয়তানদের শিক্ষা দেয়ার কোন সম্ভাবনাই রইল না। এই জওয়াবের অবশিষ্টাংশ এবং অপর একটি সন্দেহের জওয়াব সূরার শেষভাগে বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার শাখা হিসেবে একটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, যখন প্রমাণিত হলো এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তখন শিক্ষা ওয়াজিব হয়ে গেল। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ) অতএব (হে পয়গম্বর, আমি এক বিশেষ পদ্ধতিতে আপনার কাছে তাওহীদের অপরিহার্যতা প্রকাশ করছি এবং আপনাকে সম্বোধন করে বলছি,) আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করবেন না। করলে শাস্তি ভোগ করবেন। (অথচ নাউযুবিল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে শিরক ও শাস্তির কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে এর মাধ্যমে অন্যদেরকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, যখন অন্য উপাস্যের ইবাদত করার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যও শাস্তির বিধান আছে, তখন অন্যদের কোন কথাই নেই। তাদেরকে শিরক করতে নিষেধ কেন করা হবে না এবং তারা শিরক করে শাস্তির কবল থেকে কিরূপে বাঁচতে পারবে ? (এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে) আপনি (সর্বপ্রথম) আপনার নিকটতম পরিবারবর্গকে সতর্ক করুন। (সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং শিরকের কারণে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিলেন। অতঃপর নবুয়তের দাওয়াত গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে) যারা আপনার অনুসারী মু'মিন তাদের প্রতি বিনম্রী হোন (তারা পরিবারভুক্ত হোক কিংবা পরিবারবহির্ভূত) যদি তারা (যাদেরকে আপনি সতর্ক করেছেন) আপনার অবাধ্যতা করে (কুফরকে আঁকড়ে থাকে), তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তার জন্য আমি দায়ী নই। اخفض ও قل —এই দুইটি আদেশসূচক বাক্যে) 'আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' এবং 'আল্লাহ্র জন্য শত্রুতার পূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। কোন সময় এই শত্রুদের পক্ষ থেকে কষ্ট ও ক্ষতি সাধনের আশংকা করবেন না।) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দণ্ডায়মান হন এবং (নামায শুরুর পর) নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। (নামায ছাড়াও তিনি আপনার দেখাশোনা করেন। (কেননা,) তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সুতরাং আল্লাহ্র জ্ঞানও পূর্ণ, যেমন يَرَاكَ এবং سَمِيعٌ ও عَلِيمٌ থেকে জানা যায়। তিনি আপনার প্রতি দয়ালুও, যেমন اَلرَّحِيمُ থেকে বুঝা যায় এবং তিনি সব কিছুর উপর সামর্থ্যবানও, যেমন اَلْعَزِيزُ থেকে অনুমিত হয়। এমতাবস্থায় তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। তিনি আপনাকে অবশ্যই সত্যিকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ভরসাকারীর ক্ষতি হয়, তা বাহ্যত। এর অধীনে হাজারো উপকার নিহিত থাকে, যেগুলো কোন সময় দুনিয়াতে এবং কোন সময় পরকালে প্রকাশ পায়। এরপর অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াবের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যে পয়গম্বর, লোকদেরকে বলে দিন,) আমি তোমাকে বলব কি, কার উপর শয়তানরা অবতরণ করে? (শোন,) তারা অবতীর্ণ হয় এমন লোকদের উপর, যারা (পূর্ব

থেকে) মিথ্যাবাদী, দুশ্চরিত্র এবং যারা (শয়তানদের বলার সময় তাদের দিকে) কান পাতে এবং (মানুষের কাছে সেসব বিষয় বর্ণনা করার সময়) তারা প্রচুর মিথ্যা বলে। (সেমতে নিম্ন স্তরের আলিমদেরকে এখনও এরূপ দেখা যায়। এর কারণ এই যে, উপকারগ্রহিতা ও উপকারদাতার মধ্যে মিল থাকা অত্যাবশ্যক। সেমতে শয়তানের শিষ্যও এমন ব্যক্তি হবে, যে মিথ্যাবাদী ও গুনাহ্গার। এছাড়া শয়তানের দিকে সর্বান্তঃকরণে মনোনিবেশও করতে হবে। কারণ, মনোনিবেশ ব্যতীত উপকার লাভ করা যায় না। শয়তানের অধিকাংশ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই এগুলোকে চটকদার ও ভাবপূর্ণ করার জন্য কিছু প্রান্তস্থিত টীকা-টিপ্পনীও অনুমান দ্বারা সংযোজিত করতে হয়। অতীন্দ্রিয়বাদী কার্যকলাপের জন্য স্বভাবতই এটা জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে এসব বিষয়ের উপস্থিতির কোন দূরবর্তী সম্ভবনাও নেই। কেননা, তিনি যে সত্যবাদী, তা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবারই জানা ছিল। তিনি যে পরহিযগার ও শয়তানের দুশমন ছিলেন, তা শত্রুরাও স্বীকার করত। অতএব তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী হতে পারেন কিরূপে ? এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবি হওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব দেয়া হচ্ছে যে, তিনি কবিও নন যেমন কাফিররা বলত, "بَلْ هُوَ شَاعِرٌ" অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছন্দযুক্ত না হলেও কাল্পনিক ও অবাস্তব। এ ধারণা এ জন্য ভ্রান্ত যে) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের পথ অনুসরণ করে। ('পথ' বলে কাব্যচর্চা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কবিসুলভ কাল্পনিক বিষয়বস্তুর গদ্যে অথবা পদ্যে বলা তাদের কাজ, যারা সত্যানুসন্ধানের পথ থেকে দূরে অবস্থান করে। এরপর এই দাবির ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে,) তুমি কি জান না যে, তারা (কবিরা কাল্পনিক বিষয়বস্তুর প্রতি) ময়দানে উদভ্রান্ত হয়ে (বিষয়বস্তুর খোঁজে) ঘোরাফেরা করে এবং (যখন বিষয়বস্তু পেয়ে যায়, তখন অধিকাংশই বাস্তবতাবর্জিত হওয়ার কারণে) এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (সেমতে কবিদের প্রলাপোক্তির একটি নমুনা লেখা হলো ঃ

اے رشك مسيحا تری رفتار کے قربان
تھو کر سے مری الاش کئی بار جلادی
اے باد صبا ھم تجھے کیا یاد کرینکے
اس گل کی خبر تونے کبھی ھم کونہ لادمی

আরও—

صبانے اسکے کوچے سے اراکر
خدا جانے ہماری خاك کیا کی

এমনকি, তারা মাঝে মাঝে কুফরী কথাবার্তা বকতেও শুরু করে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, কবিতার বিষয়বস্তু কাল্পনিক ও অবাস্তব হওয়া অপরিহার্য। পক্ষান্তরে কোরআনের বিষয়বস্তু যে কোন অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক-সবই বাস্তবসম্মত ও অকল্পিত। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলা কবিসুলভ উন্মাদনা বৈ কিছু নয়। পদ্যে যেহেতু অধিকাংশই এ ধরনের বিষয়বস্তু স্থান পায়, তাই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছন্দ রচনার সামর্থ্য দান করেন নি। কিন্তু সব কবিই এক রকম নয়। কোন কোন কবিতায় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও সত্যানুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে কবিদের নিন্দার আওতায়

সব কবিই এসে গেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে সুধী কবিদের ব্যতিক্রমী বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ) তবে তাদের কথা ভিন্ন, (কবিদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ শরীয়তের বিরুদ্ধে কথাও বলে না, কাজও করে না। তাদের কবিতায় বাজে বিষয়বস্তু স্থান পায় না)। এবং তারা (তাদের কবিতায়) আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করে (অর্থাৎ তাদের কবিতা ধর্মের সমর্থন ও জ্ঞান প্রচারে নিবেদিত। এসব কাজ আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত)। এবং (যদি কোন কবিতায় কারও কুৎসার মত বাহ্যত চরিত্রবিরোধী কোন অশালীন বিষয়বস্তু থাকে, তবে তার কারণও এই যে,) তারা উৎপীড়িত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ কাফির ও পাপাচারীরা প্রথমে তাদেরকে মৌখিক কষ্ট দিয়েছে, যেমন তাদের কুৎসা রটনা করেছে অথবা ধর্মের অবমাননা করেছে, যা ব্যক্তিগত কুৎসার চাইতেও অধিক কষ্টদায়ক অথবা তাদের জান কিংবা সম্পদের ক্ষতিসাধন করেছে। এ ধরনের কবিগণ ব্যতিক্রমভুক্ত। কেননা, প্রতিশোধমূলক কবিতার মধ্যে কতক বৈধ এবং কতক আনুগত্য ও জওয়াবের কাজ। এ পর্যন্ত রিসালাত সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব পূর্ণ হলো। এর আগে বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা রিসালাত প্রমাণিত হয়েছিল। অতঃপর এতদসত্ত্বেও যারা নুবয়ত অস্বীকার করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেয়, তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। অর্থাৎ) যারা (আল্লাহ্‌র হক, রাসূলের হক অথবা বান্দার হকে) যুলুম করেছে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে যে, কিরূপ (মন্দ ও বিপদের) জায়গায় তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (অর্থাৎ জাহান্নামে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ - عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ - وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ -

শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন ঃ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না। وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে এ কথা জানা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। কেননা اِنَّهٗ এর সর্বনামটি বাহ্যত কোরআনকে বুঝায়। زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলা বাহুল্য, তওরাত, ইনজীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবী ভাষায় ছিল না। কেবল কোরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোন সময় শুধু কোরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেওয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কোরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাক হাকিমে বর্ণিত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে সূরা বাকারা "প্রথম আলোচনা" থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طس দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حم দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আ)-এর থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নিচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুল্‌ক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে যে, اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ)-এর সহিফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারের নাম নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে, خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোরআন বলা যায় না।

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ ঃ এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফরয তিলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলী অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কোরআনের উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন' বলা জায়েয নয় ঃ এমনিভাবে আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েয নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন' ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজী কোরআন' বলে দেয়। এটি নাজায়েয ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার 'কোরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয।

اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ—এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রতিদিন সকালে তার শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ —এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন এবং এই কবিতা পাঠ করতেন —

نهارك بالغرور سهو وغفلة
وليلك نوم والردى لك لازم

فلا انت فى الايقاظ يقظان حازم
ولا انت فى النوم ناج وسالم
وتسعى الى ما سوف تكره غبة
كذلك فى الدنيا تعيش البهائم

অর্থাৎ—তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্নদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ — عشيرة শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। اَقْرَبِيْنَ বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবূল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা ও সাহায্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায়। এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا — অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামায পড়তে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠি

যে ক্ষেত্রে গুনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতৃব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফলে।

কবিতার সংজ্ঞা ঃ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ—অভিধানে এমন বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্য ছন্দ, ওযন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে "কবিতাধর্মী প্রমাণ" এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গযলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন কোন তফসীরকারক কোরআনের "شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ — شَاعِرٌ" "مَّجْنُوْنٌ — بَلْ هُوَ شَاعِرٌ"—ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওযনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফিরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য, কোরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফিররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, شعر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كاذب তথা মিথ্যাবাদীকে شاعر বলা হয়। তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ—আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওযরবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রষ্ট

লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত—(ফতহুল বারী)।

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান ঃ উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয় ; বরং যে কবিতায় আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গুনাহ্ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা الاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ। আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোন কোন কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়ায ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে ঃ ان من الشعر حكمة। অর্থাৎ কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।--(বুখারী) হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এই রেওয়ায়েতে 'হিকমত' বলে সত্য ভাষণ বুঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবূ সলতের একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) মুতারিক বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শুনাতেন। (৪) ইমাম বুখারী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) কবিতা বলতেন। (৫) আবূ ইয়ালা ইবনে উমর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গুনাহের হলে কবিতা মন্দ।--(ফতহুল বারী)

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশজন জ্ঞান-গরিমায় সেরা ফিকাহ্‌বিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়র ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী আবূ আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ, ইবাদত ও কোরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়।

ইমাম বুখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবূ হুরায়রার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন ঃ

لان يمتلى جوف رجل قيحا يريه خير من ان يمتلى شعرا — অর্থাৎ পুঁজ দ্বারা পেটভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বুখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহ্র স্মরণ, কোরআন ও জ্ঞান চর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েয। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম।—(কুরতুবী)

খলীফা হযরত উমর (রা) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়।—(কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয়, তা নিন্দনীয় ঃ ইবনে আবী জমরাহ্ বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

প্রায় ক্ষেত্রেই অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হয়ে যায় ঃ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ — এই আয়াতে কবিদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে যে, তাদের অনুসারীরা পথভ্রষ্ট। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পথভ্রষ্ট হলো অনুসারীরা, তাদের কর্মের দোষ অনুসৃত অর্থাৎ কবিদের প্রতি কিরূপে আরোপ করা হলো ? এর কারণ এই যে, সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতদের পথভ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ন হয়ে থাকে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনুসৃতের অনুসরণের দখল থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর প্রতি যত্নবান নয়। তার মজলিসে এ ধরনের কথাবার্তা হয়। সে বাধা-নিষেধ করে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিথ্যা ও পরনিন্দার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অনুসারীর গুনাহ্ স্বয়ং অনুসৃতের গুনাহ্র আলামত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার যে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি বিশ্বাস ও মাস'আলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোন আলিমের অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলিমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। এক্ষেত্রে তার কর্মগত ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলিমের পথভ্রষ্টতার দলীল হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

سُوْرَةُ النَّمْلِ

সূরা আন-নাম্‌ল

মক্কায় অবতীর্ণ, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

طٰسٓ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝١ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٣

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ

يَعْمَهُوْنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝٥ وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝٦

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু।

(১) ত্বা-সীন ; এগুলো আল- কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের; (২) মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ, (৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে, (৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) তাদের জন্য রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ত্বা-সীন (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন), এগুলো কোরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশক ও (এই পথপ্রাপ্তির ফলে) সুপ্রতিদানের সুসংবাদদাতা; যারা (মুসলমান) এমন যে, (কার্যক্ষেত্রেও হিদায়াত অনুসরণ করে চলে। সেমতে) নামায কায়েম করে (যা দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সেরা এবং বিশ্বাসের দিক দিয়েও হিদায়াতপ্রাপ্ত।

সেমতে) পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (এ হচ্ছে মু'মিনদের গুণাবলী এবং) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা (মূর্খতাবশত সত্য থেকে দূরে) উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (তাদের বিশ্বাস ও কর্ম কিছুই সঠিক নয়। ফলে তারা কোরআনও মানে না। কোরআন মু'মিনদেরকে যেমন সুসংবাদ শুনায়, তেমনি অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে যে,) তাদের জন্যই রয়েছে (দুনিয়াতে মৃত্যুর সময়ও) কঠিন শাস্তি এবং তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত (কোন সময় মুক্তি পাবে না। অবিশ্বাসীরা কোরআন না মানলেও) নিশ্চয়ই আপনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোরআন লাভ করেন (এই নিয়ামতের আনন্দে আপনি তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখিত হবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ—অর্থাৎ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে أَعْمَالَهُمْ বলে তাদের সৎকর্ম বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু জালিমরা এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি ; বরং কুফর ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ, প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যেমন زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا - زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম ; যেমন زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ। দ্বিতীয়ত আয়াতে উল্লিখিত أَعْمَالَهُمْ (তাদের কর্ম) শব্দও এ কথা বুঝায় যে, এর অর্থ কুকর্ম—সৎকর্ম নয়।

إِذْ قَالَ مُوْسٰى لِأَهْلِهٖٓ إِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۖ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ أَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۖ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ يٰمُوْسٰٓى إِنَّهٗٓ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۖ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۖ إِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۞ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ

بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَاِنِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۱﴾ وَاَدْخِلْ یَدَكَ فِیْ جَیْبِكَ

تَخْرُجْ بَیْضَآءَ مِنْ غَیْرِ سُوٓءٍ فِیْ تِسْعِ اٰیٰتٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ

كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ ﴿۱۲﴾ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰیٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ

مُّبِیْنٌ ﴿۱۳﴾ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ؕ فَانْظُرْ كَیْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۱۴﴾

(৭) যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন ঃ আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হলো, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (৯) হে মূসা, আমি আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি।' অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। ' হে মূসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না। (১১) তবে সে বাড়াবাড়ি করে, এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে ; নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুশুভ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়।' এগুলো ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল--এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। (১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন) যখন (মাদইয়ান থেকে ফিরার পথে রাত্রিকালে তূর পাহাড়ের নিকটে পৌঁছেন এবং মিসরের পথও ভুলে যান, তখন) মূসা (আ) তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, আমি (তূর পাহাড়ের দিকে) আগুন দেখেছি। আমি এখনই (যেয়ে) সেখান থেকে (হয় পথের) কোন খবর আনব, না হয় তোমাদের কাছে (সেখান থেকে) আগুনের জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। অতঃপর

যখন তার (আগুনের) কাছে পৌঁছলেন, তখন তাকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আওয়াজ দেওয়া হলো, যারা এই আগুনের মধ্যে আছে (অর্থাৎ ফেরেশতা) এবং যারা এই আগুনের পার্শ্বে আছে [অর্থাৎ মূসা (আ)] তাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ হোক। [অভিবাদন ও সালামের স্থলে এই দোয়া করা হয়েছে : যেমন সাক্ষাৎকারীরা পরস্পরে সালাম করে। মূসা (আ) জানতেন না যে, এটা আল্লাহ্র নূর, তাই তিনি সালাম করেননি। তাঁর মনসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম করা হলো। ফেরেশতাগণকে যুক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, ফেরেশতাগণকে সালাম যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যের আলামত হয়ে থাকে, তেমনি এই সালামও মূসা (আ)-এর বিশেষ নৈকট্যের সুসংবাদ হয়ে গেছে। আগুনাকারের এই নূর যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা নয়, এ কথা ব্যক্ত করার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে,] বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্ (বর্ণ, দিক, পরিমাণ ও সীমিত হওয়া থেকে) পবিত্র। [এই নূরের মধ্যে এসব বিষয় আছে। সুতরাং এই নূর আল্লাহ্র সত্তা নয়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে মূসা (আ) পূর্বে অজ্ঞাত থাকলে এটা তাঁর জন্য শিক্ষা। আর যদি যুক্তি ও বিশুদ্ধ স্বভাবধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই জানা ছিল, তবে এটা অতিরিক্ত বুঝানো। এরপর বলা হয়েছে,] হে মূসা, (আমি যে নিরাকার অবস্থায় কথা বলছি) আমি আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (হে মূসা) তুমি তোমার লাঠি (মাটিতে) নিক্ষেপ কর (তিনি লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর হয়ে দুলতে লাগল)। অতঃপর যখন সে তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগল এবং পিছন ফিরে দেখল না। (বলা হলো,) হে মূসা, ভয় করো না (কেননা আমি তোমাকে পয়গম্বরী দিয়েছি)। আমার কাছে পয়গম্বরগণ (পয়গম্বরীর প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা দেখে) ভয় করে না, (কাজেই তুমিও ভয় করো না)। তবে যার দ্বারা কোন ত্রুটি (পদস্খলন) হয়ে যায় (এবং সে এই পদস্খলন স্মরণ করে ভয় করে, তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু তার ব্যাপারেও এই নীতি আছে যে, যদি ত্রুটি হয়ে যায়) এবং ত্রুটি হয়ে যাওয়ার পর ত্রুটির পরিবর্তে সৎকর্ম করে (তওবা করে,) তবে আমি (তাকেও ক্ষমা করে দেই কেননা, আমি) ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (এটা এজন্য বলেছেন, যাতে লাঠির মু'জিযার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আবার কোন সময় কিবতী হত্যার ঘটনা স্মরণ করে পেরেশান না হয়। হে মূসা, লাঠির এই মু'জিযা ছাড়া আরও একটি মু'জিযা দেওয়া হচ্ছে, তা এই যে,) তুমি তোমার হাত বগলে লুকিয়ে দাও(অতপর বের কর, তা হলে) তা দোষত্রুটি ছাড়াই (অর্থাৎ ধবল কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই অত্যন্ত) সুশুভ্র বের হয়ে আসবে। এগুলো (এই উভয় মু'জিযা) সেই নয়টি মু'জিযার অন্যতম, যেগুলো (দিয়ে) ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি (তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে)। তারা বড়ই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। যখন তাদের কাছে আমার (দেওয়া) উজ্জ্বল মু'জিযা পৌঁছল (অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় দুই মু'জিযা দেখানো হয়। এরপর সময়ে সময়ে অন্যান্য মু'জিযাও দেখানো হয়।) তখন তারা (এগুলো দেখে) বলল, এ তো প্রকাশ্য জাদু। (সর্বনাশের কথা এই যে,) তারা অন্যায় ও অহংকার করে মু'জিযাগুলোকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল, অথচ (ভিতর থেকে) তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের কি (মন্দ) পরিণাম হয়েছে (দুনিয়াতে সলিল সমাধি লাভ করেছে এবং পরকালে আগুনে পোড়ার শাস্তি পেয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِذْقَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ -

মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ঃ মূসা (আ) এ স্থলে দুইটি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। এক. বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। দুই. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত—পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। —(রূহুল মা'আনী)।

এ স্থলে হযরত মূসা (আ) تَصْطَلُوْنَ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শোয়ায়ব (আ)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে ; যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পত্নীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম ঃ আয়াতে قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖ বলা হয়েছে। اهل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এ স্থলে মূসা (আ)-এর একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না ; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে এ কথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক এ কথা বলে।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

মূসা (আ)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ ঃ মূসা (আ)-এর এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তা সাপেক্ষ—প্রথম بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ এবং দ্বিতীয় اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে اِذْ رَاٰ نَارًا থেকে

نُوْدِيَ يَامُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى - وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ -

এ সব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তা সাপেক্ষ প্রথম اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ এবং দ্বিতীয় اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَّامُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ -

এই সূরাত্রয়ে বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আ)-এর অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তূর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শুনা গেল اِنَّهُ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ — اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا—এটা সম্ভবপর যে,এই আওয়াজ বারবার হয়েছে--একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তফসীরে বাহ্‌রে মুহীতে আবূ হাইয়ান এবং রূহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলূসী এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোন বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে--শুধু কর্ণ নয় ; বরং হাত পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা মু'জিযা বিশেষ।

এই গায়েবী আওয়াজ নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো। কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে سُبْحَانَ اللّٰهِ শব্দ এই হুশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا এবং সূরা কাসাসে اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্‌র সত্তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ্ তা'আলার একটি সৃষ্ট বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারণেই এর তফসীরে তফসীরকারকদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, مَنْ فِى النَّارِ বলে হযরত মূসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মূসা (আ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ

অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মূসা (আ) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, مَنْ فِي النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا বলে হযরত মূসা (আ)- কে বুঝানো হয়েছে। সার-সংক্ষেপে এই উক্তিই বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (রা)-এর একটি রেওয়ায়েত ও তার পর্যালোচনা ঃ ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে مَنْ فِي النَّارِ-এর তফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, مَنْ فِي النَّارِ বলে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ও মহান সত্তা বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্ট বস্তু এবং কোন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মুশরিক প্রতিমার অস্তিত্বে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে। এটা তাওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী। বরং রেওয়ায়েতের অর্থ আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না--তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে 'তজল্লী' তথা জ্যোতিবিকীরণও বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই তজল্লী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার তজল্লী ছিল না। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা মূসা (আ) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে لَنْ تَرَانِيْ বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বুঝা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অগ্নির আকারে জ্যোতিবিকীরণ বুঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমন সত্তার তজল্লীও ছিল না। বরং لَنْ تَرَانِيْ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাগত তজল্লী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তজল্লীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে,, এটা 'মিছালী' তথা দৃষ্টান্তগত তজল্লী ছিল, যা সূফী—বুযুর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বুঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্য আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَإِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-এর পূর্বের আয়াতে মূসা (আ)-এর লাঠির মু'জিযা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মূসা (আ) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মূসা (আ)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা সুশুভ্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হলো এবং এটা استثناء منقطع না متصل এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কেউ একে منقطع সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে

এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু ক্ষমার পরেও গুনাহের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে استثناء متصل সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্র রাসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ সগিরা গুনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগিরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গম্বরগণের যেসব পদস্খলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগিরা বা কবিরা কোন প্রকার গুনাহ্ নয়। তবে আকার থাকে গুনাহের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী ভ্রান্তি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা (আ)-এর দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদস্খলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আ)-এর মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্খলন না ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও হতো না।—(কুরতুবী)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى
كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾
وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾ حَتّٰٓى اِذَآ
اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ
لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ
وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ
فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

(১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান

করেছেন।' (১৬) সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। (১৭) সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো—জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হলো। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি দাঊদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-কে (শরীয়ত ও দেশ শাসনের) জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা উভয়ই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। [দাঊদ (আ)-এর ওফাতের পর] সুলায়মান তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। (অর্থাৎ তিনি রাজত্ব লাভ করেন)। তিনি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশেন জন্যে) বললেন, হে লোকসকল। আমাকে বিহংগকুলের বুলি শিক্ষা দেয়া হয়েছে (যা অন্যান্য রাজা-বাদশাহকে শিক্ষা দেয়া হয়নি) এবং আমাকে (রাজ্য শাসনের আসবাবপত্র সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়) সবকিছুই দেয়া হয়েছে (যেমন সেনাবাহিনী, অর্থসম্পদ, সমরাস্ত্র ইত্যাদি)। নিশ্চয় এটা (আল্লাহ্ তা'আলার) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলায়মানের (কাছে রাজ্য শাসনের সরঞ্জামাদিও আশ্চর্য ধরনের ছিল। সেমতে তাঁর) সামনে তাঁর (যে) বাহিনী সমবেত করা হলো—(হয়েছিল, যাদের মধ্যে) জিন, মানব ও বিহংগকুল (ও ছিল, যারা অন্য কোন রাজা-বাদশাহ্‌র অনুগত হয় না। তারা ছিলও এমন প্রচুর সংখ্যক যে) তাদেরকে (চলার সময়) আগলিয়ে রাখা হতো (যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। প্রচুর সংখ্যক লোকের মধ্যেই স্বভাবত এরূপ করা হয়। কেননা, অল্প সংখ্যকের মধ্যে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বড় সমাবেশ আগের লোকেরা পেছনের লোকদের খবরও রাখে না। তাই এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। একবার তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা (অন্য পিপীলিকাদেরকে) বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। সুলায়মান (আ) তার কথা শুনে (আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এই ক্ষুদ্র পিপীলিকারও এত সতর্কতা। তিনি) মুচকি হাসলেন এবং (পিপীলিকার বুলি বুঝে ফেলার নিয়ামত দেখে অন্যান্য নিয়ামতও স্মরণ হয়ে গেল। তাই তিনি) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক সামর্থ্য

দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন [অর্থাৎ ঈমান ও জ্ঞান সবাইকে এবং নবুয়ত আমাকে ও আমার পিতা দাউদ (আ)-কে।] এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি (অর্থাৎ আমার কর্ম যেন মকবুল হয়। কেননা, কর্ম সৎ হওয়ার পর যদি আদব ও শর্তের অভাবে মকবুল না হয়, তবে সেরূপ কর্ম উদ্দিষ্ট নয়।) এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে (উচ্চস্তরের) সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) অন্তর্ভুক্ত করুন (অর্থাৎ নৈকট্যকে দূরত্বে পর্যবসিত না করুন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا—বলা বাহুল্য, এখানে পয়গম্বরগণের নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয় ; যেমন দাউদ (আ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুয়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়—জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের ঊর্ধ্বে।—(কুরতুবী)

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না ঃ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوٗدَ— وَرِثَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে—আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ نحن معاشر الا نبياء لا نرث ولا نورث অর্থাৎ পয়গম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবূদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে العلماء ورثة الانبياء وان الا نبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر—অর্থাৎ আলিমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী ; কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে—আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবূ আবদুল্লাহ্র রেওয়ায়েতে এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সুলায়মান (আ)-এর উত্তরাধিকারী।--(রূহুল মা'আনী)। যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আ)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বুঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না ; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু-জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব

প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের কোন কোন ইমামের বরাত দিতে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝাতে চেয়েছেন।—(রূহুল মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান (আ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল।—(কুরতুবী)

অহংকারবশত না হলে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়েয ঃ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا الخ—হযরত সুলায়মান (আ) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্র আনুগত্যে ও সুলায়মান (আ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়—অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান ঃ এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশুপক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, পাখিদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, তা অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে। —(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنْطِقَ الطَّيْرِ অর্থাৎ বিহংগকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখি জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সুলায়মান (আ)-কে সমস্ত পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বুঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন-না কোন উপদেশ বাক্য।

وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ—আভিধানিক দিক দিয়ে كُلّ শব্দের মধ্যে কোন বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বুঝানো হয় না : বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বুঝানো হয় ; যেমন এখানে সেই সব বস্তুর ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে ছিল না।

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ এটা وزع থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের আয়াতে فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ—এখানে রেযার অর্থ কবূল। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবূল হয়। রুহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবূল হওয়াই জরুরী নয় ; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ কবূল হওয়ার জন্যও দোয়া করতেন ; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا এতে বুঝা গেল যে, কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয় : বরং তা কবূল হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

সৎকর্ম মকবূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না ঃ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ—সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আপনিও কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও। কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহ্র অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে।—(রূহুল মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আ)-ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ্র কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন ; অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যদদ্বারা জান্নাতের উপযুক্ত হই।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ

يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا

عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

সিজদা

تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ

اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২০) সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, 'কি হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেন ? না কি সে অনুপস্থিত ? (২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।' (২২) কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎ পথ পায় না। (২৫) তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন। যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর ? (২৬) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ; তিনি মহা-আরশের মালিক।' (২৭) সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী ? (২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(একবার এই ঘটনা সংঘটিত হয় যে,) সুলায়মান (আ) পক্ষীদের খোঁজ নিলেন, অতঃপর (হুদহুদকে না দেখে) বললেন, কি হলো, আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন ? সে অনুপস্থিত নাকি ? যখন বাস্তবিকই অনুপস্থিত জানতে পারলেন, তখন বললেন) আমি তাকে (অনুপস্থিতির কারণে) কঠোর শাস্তি দেব কিংবা তাকে হত্যা করব অথবা সে কোন পরিষ্কার প্রমাণ (এবং অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত অজুহাত) পেশ করবে (এরূপ করলে তাকে ছেড়ে দেব)। অল্পক্ষণ পরে হুদহুদ এসে গেল এবং সুলায়মান (আ)-কে বলল, আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত নন। (সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে,)

আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে (রাজত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের মধ্য থেকে) সবকিছু দেয়া হয়েছে। তার কাছে একটি বিরাট সিংহাসন আছে। (তাদের ধর্মীয় অবস্থা এই যে,) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি যে, তারা আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতকে) পরিত্যাগ করে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের (এই) কার্যাবলী সুশোভিত করে রেখেছে। অতএব (এই কুকর্মকে সুশোভিত করার কারণে) তাদেরকে (সত্য) পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা (সত্য) পথে চলে না অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে না, যিনি (এমন সামর্থ্যবান যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তুসমূহ (যেগুলোর মধ্যে বৃষ্টি ও মৃত্তিকার উদ্ভিদও আছে) প্রকাশ করেন এবং (এমন জ্ঞানী যে) তোমরা অর্থাৎ সব সৃষ্ট জীব) যা (অন্তরে) গোপন রাখ, এবং যা (মুখে) প্রকাশ কর, তা সবই তিনি জানেন। (তাই) আল্লাহ্-ই—এমন যে, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি মহা-আরশের অধিপতি। হযরত সুলায়মান (আ) একথা শুনে] বললেন, আমি এখন দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী ? (আচ্ছা) আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর (সেখান থেকে কিছুটা ব্যবধানে)) সরে পড় এবং দেখ, তারা পরস্পরে কি সওয়াল-জওয়াব করে। (এরপর তুমি চলে এস। তারা যা করবে, তাতে তোমার সত্যমিথ্যা জানা যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ — تفقد-এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার মানব, জিন, জন্তু ও পশুপক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজখবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রুষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজ-খবর নেওয়া জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমনকি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখির তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কমসংখ্যাক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁর

খিলাফতের আমলে পয়গম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও উমরকে প্রশ্ন করা হবে।—(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনের রীতিনীতি, যা পয়গম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ—সুলায়মান (আ) বললেন, আমার কি হলো যে আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না?

আত্মসমালোচনা ঃ এখানে স্থান ছিল একথা বলার—"হুদহুদের কি হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই?" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীর অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবত আমার কোন ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখি অর্থাৎ হুদহুদ গায়েব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো? সূফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোন নিয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্য বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোন ত্রুটি হলো যদ্দরুন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, اذا فقدوا امالهم تفقدوا اعمالهم অর্থাৎ তাঁর যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ত্রুটি হয়ে গেছে।

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তাভাবনার পর সুলায়মান (আ) বললেন, أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ এখানে ام শব্দটি بل এর সমার্থবোধক। —(কুরতুবী) অর্থাৎ হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি ; বরং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান (আ) তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি

পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন قف ياوقاف كيف يرى الهدهد باطن الارض وهو لايرى الفخ حين يقع فيه জ্ঞানীগণ, এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কারও জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْلَاَاذْبَحَنَّهٗ—প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েয ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উম্মতের জন্য জন্তুদেরকে যবাই করে তাদের গোশ্ত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনও হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেওয়া এখনও জায়েয। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ।—(কুরতুবী)

اَوْلَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ— অর্থাৎ হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ—অর্থাৎ হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গম্বরগণ 'আলিমুল গায়ব' নন ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পয়গম্বরগণ আলিমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ—'সাবা' ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশি? ঃ হুদহুদের উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোন শাগরিদ তার ওস্তাদকে এবং আলিম নয় এমন কোন ব্যক্তি আলিমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশি—যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুব্বিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওযরকে জোরদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন কথা বললে তাতে দোষ নেই।

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ —অর্থাৎ আমি এক নারীকে পেয়েছি সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী অর্থাৎ তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান।—(কুরতুবী) তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলেকৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তাঁর বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। (কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবত এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ্ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি ? ঃ এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কি না? এতে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান" কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানবনন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান (আ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সুলায়মান (আ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্য বাদশাহ্ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয কি না ? সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة অর্থাৎ যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ

করতে পারবে না। এ কারণেই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খিলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না ; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসনকর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। একথা কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ— অর্থাৎ কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়।

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ—আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকূত ও মণিমানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ—এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল।—(কুরতুবী)

أَلَّا يَسْجُدُوا এর সম্পর্ক زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ অথবা صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ এর সাথে। অর্থাৎ আল্লাহ্কে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আল্লাহ্কে সিজদা করবে না।

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজকারবারে শরীয়তসম্মত দলীল ঃ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هٰذَا হযরত সুলায়মান (আ) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলীল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বুঝা গেল যে, সাধারণ কাজকারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরী, ফিকাহ্‌বিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা, পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েয ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্র দ্বারা দ্বিতীয় মাস'আলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাফিরদের কাছে পত্র লেখা জায়েয। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কাফিরদের কাছে পত্র লেখা প্রমাণিত আছে।

কাফিরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত ঃ فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ—হযরত সুলায়মান (আ) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার

হয়ে থাকবে না, বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ
يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى
تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ
فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا
وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ
اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ
اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ
مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

---

(২৯) বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। (৩০) সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই ঃ অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু ; (৩১) আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' (৩৪) সে বলল, 'রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। (৩৫) আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি ; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।' (৩৬) অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন,

তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখী থাক। (৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[সুলায়মান (আ) হুদহুদের সাথে এই কথাবার্তার পর একখানা পত্র লিখলেন, যার বিষয়বস্তু কোরআনেই উল্লিখিত আছে। পত্রটি তিনি হুদহুদের কাছে সমর্পণ করলেন। হুদহুদ পত্রটিকে চঞ্চুতে নিয়ে রওয়ানা হলো এবং একাকিনী বিলকীসের কাছে অথবা মজলিসে অর্পণ করল।] বিলকীস (পত্র পাঠ করে পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য ডাকল এবং) বলল, হে পারিষদবর্গ, আমার কাছে একটি পত্র (যার বিষয়বস্তু খুবই) সম্মানিত (এবং মহান) অর্পণ করা হয়েছে। (শাসকসুলভ বিষয়বস্তুর কারণে সম্মানিত বলা হয়েছে। পত্রটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অলংকারপূর্ণ ছিল।) এই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই, (প্রথমে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, (এরপর বলা হয়েছে) তোমরা (অর্থাৎ বিলকীস এবং জনগণসহ পারিষদবর্গ) আমার মুকাবিলায় অহমিকা করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে আস। [উদ্দেশ্য সবাইকে দাওয়াত প্রদান। তারা হয়তো সুলায়মান (আ)-এর অবস্থা পূর্বেই অবগত ছিল, যদিও সুলায়মান (আ) তাদের অবস্থা জানতেন না। প্রায়ই এমন হয় যে, বড়রা ছোটদেরকে চেনে না এবং ছোটরা বড়দেরকে চেনে। কিংবা পত্র আসার পর জেনে থাকবে। পত্রের বিষয়বস্তু অবগত করার পর] বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও (যে, সুলায়মানের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত) আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে (কখনও) কোন কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা (সর্বান্তকরণে উপস্থিত আছি। যদি যুদ্ধ করা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তবে আমরা) বিরাট শক্তিধর এবং কঠোর যোদ্ধা। অতঃপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনিই ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন। বিলকীস বলল, (আমার মতে যুদ্ধ করা উপযোগী নয়। কেননা সুলায়মান একজন বাদশাহ্। আর) রাজা-বাদশাহ্গণ যখন কোন জনপদে (বিরোধী মনোভাব নিয়ে) প্রবেশ করেন, তখন বিপর্যস্ত করে দেন এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে (তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য) অপদস্থ করেন। (তাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে সম্ভবত তাঁরা জয়লাভ করবে। তখন) তারাও এরূপই করবে। (অতএব অনর্থক পেরেশানী ভোগ করা উপযুক্ত নয়। কাজেই যুদ্ধ তো আপাতত মুলতবী থাকবে এবং সমীচীন এই যে,) আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন (কোন ব্যক্তির হাতে) পাঠাচ্ছি, অতঃপর দেখব, প্রেরিত লোক (সেখান থেকে) কি জওয়াব নিয়ে আসে। (তখন যুদ্ধের বিষয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা হবে। সেমতে উপঢৌকন প্রস্তুত করা হলে দূত তা নিয়ে রওয়ানা হলো)। যখন দূত সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌঁছল, (এবং উপঢৌকন পেশ করল) তখন সুলায়মান (আ) বললেন, তোমরা কি (অর্থাৎ বিলকীস ও পারিষদবর্গ) ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য

করতে চাও? (তাই উপঢৌকন এনেছ? মনে রেখ,) আল্লাহ্‌ আমাকে যা দিয়েছেন, তা শতগুনে উত্তম, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। (কেননা, তোমাদের কাছে কেবল দুনিয়া আছে, আর আমার কাছে দীন ও দুনিয়া উভয়টিই আছে এবং দুনিয়া তোমাদের চাইতে অনেক অধিক আছে। কাজেই আমি এগুলোর প্রতি লোভ করি না।) তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ কর (সুতরাং এই উপঢৌকন আমি গ্রহণ করব না)। তোমরা (এগুলো নিয়ে) তাদের কাছে ফিরে যাও। (তারা এখনও ঈমান আনলে সবই ঠিক। নতুবা) আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই।আমি তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দেব এবং তারা (লাঞ্ছনা সহকারে চিরতরে) পদানত (ও প্রজা) হয়ে যাবে (এরূপ নয় যে, বের করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে। বরং চিরকাল লাঞ্ছনা তাদের কণ্ঠহার হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ — كَرِيم এর শাব্দিক অর্থ সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পত্রকে তখনই সম্ভ্রান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كِتَابٌ كَرِيمٌ এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্‌, যুহায়র প্রমুখ كِتَابٌ مَخْتُومٌ তথা 'মোহরাঙ্কিত পত্র,' দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল (সা) যখন অনারব বাদশাহ্‌দের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহ্‌দের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সর ও কিসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বুঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভিলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভিলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল ঃ হযরত সুলায়মান (আ) আরব ছিলেন না ; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বুঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি বিহংগকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটে অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে সুলায়মান (আ) আরবী ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভূত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উরিয়ে দেয়া যায় না যে, সুলায়মান (আ) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দোভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। —(রূহুল মা'আনী)

পত্র লেখার কতিপয় আদব إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ কোরআন পাক মানবজীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গম্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত

করেছে। তাই এই পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি সুলায়মান (আ) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে—এরূপ খোঁজাখুঁজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি من محمد عبد الله ورسوله এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, উস্তাদ, পীর অথবা কোন মুরুব্বির কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি ? তার এরূপ করা উচিত কি না ? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম ধারা বিভিন্ন রূপ। অধিকাংশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রুহুল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রা)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে :

ما كان احد اعظم حرمة من رسول الله ﷺ وكان اصحابه اذا كتبوا اليه كتابا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمى يشهد له على ماروى –

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না ; কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে আলামী হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রূহুল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে-বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয। ফকীহ্ আবুল লাইস 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গম্বরগণের সুন্নত : তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেওয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন।—(কুরতুবী)

চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ্ লেখা ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এখন বিস্‌মিল্লাহ্ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে, না পরে, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিস্‌মিল্লাহ্ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কোরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্‌মিল্লাহ্‌র পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিস্‌মিল্লাহ্ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدُ اِلٰى بِلْقِيْسِ ابنة ذى شرح وقومها - ان لاتعلوا الخ

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আ)-এর আসল পত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ আগে ছিল, না পরে, কোরআনে ঐ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিস্‌মিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সুলায়মান (আ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

মাস'আলা ঃ প্রত্যেক পত্রের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ লেখাই পত্র-লিখনের আসল সুন্নত। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে ফিকাহ্‌বিদগণ এই সামগ্রিক নীতি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিস্‌মিল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম লিখিত কাগজকে বেয়াদবি থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই, বরং পাঠান্তে যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়, সেখানকার পত্রে বিস্‌মিল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম লেখা জায়েয নয়। লিখলে লেখক বেআদবীর গুনাহে্ শরীক হয়ে যাবে। আজকাল মানুষ একে অপরকে যেসব চিঠিপত্র লেখে, সেগুলোকে সাধারণত আবর্জনায় ও নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই সুন্নত আদায় করণার্থে মুখে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে নেওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ না করা সমীচীন।

কোরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোন কাফির ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েয কি ? উপরোক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিত ছিল। এতে বুঝা গেল, এরূপ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব অনারব বাদশাহ্‌র নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কোরআনের কোন কোন আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কোরআন পাক কোন কাফিরের হাতে দেওয়া জায়েয নয়; কিন্তু যে গ্রন্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোন আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কোরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কোরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ গ্রন্থ কাফিরের হাতেও দেওয়া যায় এবং ওযু ছাড়াও স্পর্শ করা যায়।—(আলমগিরী)

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েক লাইনের মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফিরের মুকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলী ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কোরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদাহ্ বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গম্বরের সুন্নতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই।—(রূহুল মা'আনী)

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত। এতে অপরের অভিমত দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অপরের মনোরঞ্জনও হয় ঃ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي افتونى ــــ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ শব্দটি فتونى থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বুঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আ)-এর পত্র পৌছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত ! সে তাদের অভিমত জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল ঃ نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ—হযরত কাতাদাহ্ বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ-সভার সদস্য তিন'শ তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না ; কিন্তু উম্মতের জন্য সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ —অর্থাৎ আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কিরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়, অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকীদও হয়ে যায়।

সুলায়মান (আ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া ঃ রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগীতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল ঃ হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্র পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহ্র আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা

বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদের দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মুকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইরূপ স্থির করল যে, সুলায়মান (আ)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বুঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জরীর একাধিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ. ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ اِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ।—অর্থাৎ আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এরূপর দেখব যেসব দূত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীসের দূতদের উপস্থিতি ঃ ঐতিহাসিক ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপঢৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য, একশ' ক্রীতদাস এবং একশ বাঁদী ছিল। কিন্তু বাঁদীদেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। উপঢৌকন নির্বাচনেও তাঁর পরীক্ষা কাম্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা দূতদের পৌঁছার পূর্বেই উপঢৌকনসমূহের পূর্ণ বিবরণ বলে দিয়েছিলেন। সুলায়মান (আ) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর হয়। এমনিভাবে তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্ন সহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দ্বারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তুদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপঢৌকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানেই ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহংগকুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা দরবারে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সামনে হাযির হলো, তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।—(কুরতুবী—সংক্ষেপিত)

সুলায়মান (আ) বিলকীসের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না ঃ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ —অর্থাৎ যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আমাকে আল্লাহ্ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপঢৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোন কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কি না ? ঃ হযরত সুলায়মান (আ) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবূল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরের উপঢৌকন কবূল করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয়। মাস'আলা এই যে, কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয়।—(রূহুল মা'আনী) হ্যাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফির ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবূল করার অবকাশ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফিরের উপঢৌকন কবূল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক কাফির মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসাবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মুসলমান ? সে বলল, না। তিনি তার উপঢৌকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন মুশরিকের উপঢৌকন কবূল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবূল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারও কারও উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবূল করেছেন। —(উমদাতুল কারী)

বিলকীস উপঢৌকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপঢৌকন কবূল করা জায়েয নয় ; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসাবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ
عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ
لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ
قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ
هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۣ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۭ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوْا
لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

(৩৮) সুলায়মান বললেন, হে পারিষদবর্গ 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ?' (৩৯) জনৈক দৈত্য জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। (৪১) সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই ?

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোটকথা, দূতরা তাদের উপঢৌকন নিয়ে ফিরে গেল এবং আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বিলকীসের কাছে বর্ণনা করল। অবস্থা শুনে বিলকীসের পূর্ন বিশ্বাস হলো যে, তিনি একজন জ্ঞানী-গুণী পয়গম্বর। সেমতে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার জন্য সে দেশ থেকে রওয়ানা হলো।) সুলায়মান (আ) ওহীর মাধ্যমে কিংবা কোন পরীক্ষার সাহায্যে তার রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পেরে) বললেন, হে পারিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে তার (বিলকীসের) সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ? (আত্মসমর্পণের কথাটি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। কেননা তারা এই

উদ্দেশ্যেই আগমন করছিল। সিংহাসন আনার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, তারা তাঁর মু'জিযাও দেখে নিক। কেননা এত বিরাট সিংহাসন এত কঠোর পাহারার মধ্য থেকে নিশ্চুপে নিয়ে আসা মানবশক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। এটা জিন অনুগত হওয়ার কারণে হয়ে থাকলে জিন অনুগত হওয়াও তো একটি মু'জিযাই। যদি উম্মতের কোন ওলীর কারামতের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে ওলীর কারামতও পয়গম্বরের একটি মু'জিযা। কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে হয়ে থাকলে সেটা যে মু'জিযা, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। মোটকথা, সর্বাবস্থায় এটা মু'জিযা ও নবুয়তের প্রমাণ। উদ্দেশ্য এই হবে যে, তারা অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সাথে সাথে এই এই মু'জিযার গুণাবলীও দেখুক, যাতে ঈমান ও বিশ্বাস গাঢ় হয়।) জনৈক দৈত্য জিন (জওয়াবে) আরয করল, আপনি আপনার এজলাস থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং (যদিও তা খুব ভারী ; কিন্তু) আমি এ কাজের (অর্থাৎ তা এনে দেওয়ার) শক্তি রাখি (এবং যদিও তা মূল্যবান ও মোতি দ্বারা সজ্জিত ; কিন্তু আমি) বিশ্বস্ত (এতে কোনরূপ খিয়ানত করব না।) যার কাছে কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের কিংবা কোন ঐশী গ্রন্থের, যাতে আল্লাহ্‌র নামের প্রভাবাদি ছিল) জ্ঞান ছিল [অধিক সঙ্গত এই যে, এখানে স্বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে।] সে (সেই জিনকে) বলল, (তোর শক্তি তো এতটুকুই) আমি চোখের পলক মারতে মারতে তা তোর সামনে এনে হাযির করতে পারি। (কেননা মু'জিযার শক্তি বলে আনব। যে মতে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন। এমনিতেই কিংবা কোন "ইসমে ইলাহী"র মাধ্যমে সিংহাসন তৎক্ষণাৎ সামনে বিদ্যমান হয়ে গেল)। সুলায়মান (আ) যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন (আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ (যে, আমার হাতে এই মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে), যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না (আল্লাহ্ না করুন) অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাতে (আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকার নেই) এবং (এমনিভাবে) যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (সে-ও নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। (এরপর) সুলায়মান (আ) বিলকীসের বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) আদেশ দিলেন, তার জন্য (অর্থাৎ তার বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও (এর উপায় অনেক হতে পারে। উদাহরণত মোতির জায়গা পরিবর্তন করে দাও কিংবা অন্য কোন ভাবে) দেখব, সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের (এ ব্যাপারে) দিশা নেই। (প্রথমাবস্থায় জানা যাবে যে, সে বুদ্ধিমতী। ফলে সত্য কথা বুঝবে বলে অধিক আশা করা যায়। তার সত্য বুঝবার প্রভাব দূর পর্যন্ত পৌঁছিবে। শেষোক্ত অবস্থায় তার কাছ থেকে সত্য বুঝার আশা কমই করা যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি ঃ কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আ)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন;

বরং তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌র পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ? তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদলবলে আগমন করছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে সুলায়মান (আ)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ

সুলায়মান (আ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গম্বরসুলভ মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জিযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনরূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়া আল্লাহ্ তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, সুলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

قَبْلَ اَنْ يَّأْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ — مسلمين শব্দটি مسلم এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষা থেকে তাই বুঝা যায়।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ — অর্থাৎ যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে ? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

স্বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিযা এবং বিলকীসকে পয়গম্বরসুলভ মু'জিযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদাহ্ প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সুলায়মান (আ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তাঁর নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম' জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় যে, সুলায়মান (আ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, সুলায়মান (আ) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশি প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন أَيُّكُمْ يَأْتِينِي (ফুসূসুল হিকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য ঃ প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জিযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ—কারামতের অবস্থাও হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জিযা ও কারামত—এ উভয়টিও মু'জিযা ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গম্বরের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জিযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ্ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সুলায়মান (আ)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তাঁর পয়গম্বরের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গম্বরের মু'জিযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত, না তাসাররুফ ? ঃ শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এই জন্য নবী, ওলী এমনকি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আ) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক এই তাসাররুফকে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ (কিতাবের জ্ঞান)-এর

ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সমঅর্থবোধক।

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ—আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব—আসিফের এই উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজ এত দ্রুত করে দেব।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا
الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿۴۳﴾ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي
الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ
صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۴﴾

(৪২) অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই ? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার ইবাদত করত, সে-ই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[সুলায়মান (আ) সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রেখেছিলেন] অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে (সিংহাসন দেখিয়ে) বলা হলো, [সুলায়মান (আ) নিজে বলেছেন কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে বলিয়েছেন,] তোমার সিংহাসন কি এরূপই ? সে বলল, হ্যাঁ

এরূপই তো। (বিলকীসকে এরূপ প্রশ্ন করার কারণ এই যে, আসলের দিক দিয়ে তো এটা সেই সিংহাসনই ছিল, কিন্তু আকৃতি বদলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই এরূপ বলা হয়নি যে, এটা কি তোমার সিংহাসন? বরং বলা হয়েছে, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? বিলকীস সিংহাসনটি চিনে ফেলে এবং আকার বদলিয়ে দেওয়ার বিষয়ও অবগত হয়ে যায়। তাই জওয়াবও জিজ্ঞাসার অনুরূপ দিয়েছে। সে এ কথাই বলল,) আমরা এ ঘটনার পূর্বেই (আপনার নবুয়তের বিষয়) অবগত হয়েছি এবং আমরা (তখন থেকেই মনেপ্রাণে) আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি, যখন দূতের মুখে আপনার গুণাবলী জ্ঞাত হয়েছিলাম। সুতারাং মু'জিযার মোটেই প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু মু'জিযার পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করা চূড়ান্ত বুদ্ধির পরিচায়ক, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার বুদ্ধিমত্তা ফুটিয়ে তুলেছেন যে, সে বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী নারী ছিল। তবে কিছুকাল সে বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্র পরিবর্তে যার পূজা সে করত, সেই তাকে (ঈমান থেকে) নিবৃত্ত করেছিল। (পূজার এই অভ্যাসের কারণ এই যে,) সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [সুতরাং সবাইকে যা করতে দেখেছে, সে তাই করেছে। জাতীয় অভ্যাস অনেক সময় মানুষের চিন্তা-ভাবনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বুদ্ধিমতী হওয়ার কারণে সতর্ক করা মাত্রই সে বুঝে ফেলেছে। এরপর সুলায়মান (আ) ইচ্ছা করলেন যে, মু'জিযা ও নবুয়তের শান দেখানোর সাথে সাথে তাকে সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শান-শওকতও দেখানো দরকার, যাতে সে নিজেকে পার্থিব দিক দিয়েও মহান মনে না করে। তাই তিনি একটি স্ফটিকের প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং তার বারান্দায় চৌবাচ্চা তৈরি করালেন। তাতে পানি ও মাছ দিয়ে ভর্তি করে স্ফটিক দ্বারা আবৃত করে দিলেন। স্ফটিক এত স্বচ্ছ ছিল যে, বাহ্যত দৃষ্টিগোচর হতো না। চৌবাচ্চাটি এমন স্থানে নির্মিত ছিল যে, প্রাসাদে যেতে হলে একে অতিক্রম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এসব বন্দোবস্তের পর) বিলকীসকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর (সম্ভবত এই প্রসাদই অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিলকীস চলল। পথিমধ্যে চৌবাচ্চা পড়ল।) যখন সে তার বারান্দা দেখল, তখন সে তাকে পানিভর্তি (জলাশয়) মনে করল এবং (এর ভেতরে যাওয়ার জন্য কাপড় টেনে উপরে তুলল এবং) সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। (তখন) সুলায়মান (আ) বললেন, এ তো (বারান্দাসহ সম্পূর্ণটুকু) স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। চৌবাচ্চাটিও স্ফটিক দ্বারা আবৃত। কাজেই কাপড়ের আঁচল টেনে উপরে তোলার প্রয়োজন নেই।) বিলকীস [জেনে গেল যে, এখানে পার্থিব কারিগরির অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহও এমন রয়েছে, যা সে আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখেনি। ফলে, তার মনে সবদিক দিয়েই সুলায়মান (আ)-এর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে] বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি (এ পর্যন্ত) নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম (যে, শিরকে লিপ্ত ছিলাম)। আমি (এখন) সুলায়মান (আ)-এর সাথে (অর্থাৎ তাঁর অনুসৃত পথে) বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি ? ঃ এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে

কোরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞেস করল, সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি ? তিনি বললেন, তার ব্যাপার أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিমাসে হযরত সুলায়মান (আ) সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের জন্য ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ
فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (৪৫) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (৪৬) قَالُوا اطَّيَّرْنَا
بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (৪৭)
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (৪৮)
قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ
أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (৪৯) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (৫০)
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (৫১)
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (৫২)
وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (৫৩)

(৪৫) আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হলো। (৪৬) সালেহ্ বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ

কামনা করছ কেন ? তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন ? সম্ভবত তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।' (৪৭) তারা বলল, 'তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।' সালেহ্ বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্র কাছে ; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, 'তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (৫১) অতএব দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়িঘর—তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে। (৫৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহিযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের (জ্ঞাতি) ভাই সালেহকে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা (শিরক ত্যাগ করে) আল্লাহ্র ইবাদত কর। (এমতাবস্থায় তাদের সবারই ঈমান আনা উচিত ছিল : কিন্তু এ প্রত্যাশার বিপরীতে) অতঃপর দেখতে দেখতে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্ক করতে লাগল। [অর্থাৎ একদল ঈমান আনল এবং একদল ঈমান আনল না। তাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা ও আলোচনা হয়, তার কিয়দংশ সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে— قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ এবং কিয়দংশ এই সূরারই পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে— قَالُوْا اطَّيَّرْنَا بِكَ তারা যখন কুফর ত্যাগ করতে সম্মত হলো না, তখন সালেহ্ (আ) পয়গম্বরগণের রীতি অনুযায়ী তাদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন ; যেমন সূরা আ'রাফে আছে "فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ" তখন তারা বলল, সেই আযাব কোথায় আছে নিয়ে আস, যেমন সূরা আ'রাফে আছে قَالُوْا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ —এর পরিপ্রেক্ষিতে] সালেহ্ (আ) বললেন, ভাই সকল, তোমরা সৎকর্ম (অর্থাৎ তওবা ও ঈমান)-এর পূর্বে দ্রুত আযাব কামনা করছ কেন ? (অর্থাৎ আযাবের কথা শুনে ঈমান আনা উচিত ছিল ; কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে উল্টা আযাবই কামনা করে চলেছ। এটা খুবই ধৃষ্টতার কাজ। দ্রুত আযাব চাওয়ার পরিবর্তে) তোমরা আল্লাহ্র কাছে (কুফর থেকে) ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন ? যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (অর্থাৎ আযাব থেকে নিরাপদ থাক)। তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করি। (কারণ, যখন থেকে তোমরা এই ধর্ম বের করেছ এবং তোমাদের এই দল সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং অনৈক্যের ক্ষতিকারিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব অনিষ্টের কারণ তোমরা)। সালেহ্ (আ) জওয়াবে বললেন, তোমাদের এই অমঙ্গল (অর্থাৎ অমঙ্গলের

কারণ) আল্লাহ্‌র গোচরীভূত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কুফরী কাজকর্ম আল্লাহ্ জানেন। এসব কাজকর্মের ফলেই অনিষ্ট দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সেই অনৈক্যই নিন্দনীয়, যা সত্যের বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং ঈমানদারগণ এ জন্য অভিযুক্ত হতে পারে না, বরং কাফিররা দোষী হবে। কোন কোন তফসীরে আছে যে, তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। তোমাদের কুফরের অনিষ্ট এখানেই শেষ হয়ে যায়নি,) বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যারা (এই কুফরের কারণে) আযাবে পতিত হয়ে গিয়েছ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাফির তো অনেকেই ছিল ; কিন্তু দলপতি সেই শহরে (অর্থাৎ হিজরে) ছিল নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় (অর্থাৎ জনপদের বাইরে পর্যন্তও) অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং (সামান্যও) সংশোধন করত না। (অর্থাৎ কোন কোন দুষ্কৃতিকারী তো এমন যে, কিছু দুষ্কৃতিও করে এবং কিছু সংশোধনও করে ; কিন্তু তারা বিশেষ দুষ্কৃতিকারীই ছিল। তারা একবার এই অনর্থ করল যে) তারা (একে অপরকে) বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে সালেহ্ (আ) ও তাঁর সংশ্লিষ্টবর্গের (অর্থাৎ মু'মিনগণের) উপর হানা দেব। অতঃপর (তদন্ত হলে) তার দাবিদারকে বলব যে, তার সংশ্লিষ্টদের (এবং স্বয়ং তার) হত্যাকাণ্ডে আমরা উপস্থিতও ছিলাম না। (হত্যা করা দূরের কথা। এবং তাকীদের জন্য আরও বলে দেব)আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। (চাক্ষুষ সাক্ষ্যদাতা তো কেউ থাকবে না। ফলে বিষয়টি চাপা পড়ে যাবে।) তারা এক গোপন চক্রান্ত করেছিল (যে, রাত্রিবেলায় এ কাজের জন্য রওয়ানা হবে) এবং আমিও এক গোপন ব্যবস্থা করেছিলাম ; কিন্তু তারা টের পায়নি। (তা এই যে, পাহাড়ের উপর থেকে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাদের উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তারা সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। দুররে মনসূর) অতএব দেখুন তাদের চক্রান্তের পরিণাম। আমি তাদেরকে (উল্লিখিত উপায়ে) এবং তাদের (অবশিষ্ট) সম্প্রদায়কে (আসমানী আযাব দ্বারা) নাস্তানাবুধ করে দিয়েছি।) অন্য আয়াতে এ ঘটনা বর্ণিত আছে فَعَقَرُوا النَّاقَةَ থেকে فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ পর্যন্ত।) এই তো তাদের বাড়িঘর জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের কুফরের কারণে (মক্কাবাসীরা শামের সফরে সেগুলো দেখতে পায়)। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। আমি ঈমানদার ও পরহিযগারদেরকে (পরিকল্পিত হত্যা থেকে এবং আল্লাহ্‌র আযাব থেকে) রক্ষা করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تِسْعَةُ رَهْطٍ — رهط শব্দের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رَهْط বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থসম্পদ, জাঁকজমক ও প্রভাব-পতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হতো এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জাতিগোষ্ঠির উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে

আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফিরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশেরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই ; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গুনাহ্। বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ্ (আ)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো সালেহ্ (আ)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যাতালিকার বাইরে কেন রাখল ? জওয়াব এই যে, সম্ভবত সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফির ছিল এবং কাফিরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ্ (আ) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن
قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ
قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ
ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ
ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

(৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ। (৫৫) তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে ? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, 'লূত পারিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা শুধু পাক পবিত্র সাজতে চায়।

(৫৭) অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পারিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে বৃষ্টি। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি। (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে ! আল্লাহ্ না ওরা—তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (আমি) লূত (আ)-কে (পয়গম্বর করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম।) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি জেনে-শুনে অশ্লীল কাজ কর ? (তোমরা এর অনিষ্ট বুঝ না। অতঃপর এই অশ্লীল কাজ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) তোমরা কি পুরুষদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর নারীদেরকে ছেড়ে ? (এর কোন কারণ নেই;) বরং (এ ব্যাপারে) তোমরা (নিছক) মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছ। তাঁর সম্প্রদায় (এই বক্তব্যের) কোন (যুক্তিসঙ্গত) জওয়াব দিতে পারল না—এ কথা ছাড়া যে, তারা পরস্পরে বলল লূত (আ)-এর লোকদেরকে (অর্থাৎ তাঁকে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীগণকে) তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত কর। (কেননা) তারা বড় পাক-পবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর (যখন ব্যাপার এতদূর গড়াল তখন) আমি (তাদের প্রতি আযাব নাযিল করলাম এবং লূতকে ও তাঁর জনদেরকে (এই আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। তাকে (ঈমান না আনার কারণে (আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে অবধারিত করে রেখেছিলাম। (তাদের আযাব ছিল এই যে) আমি তাদের উপর নতুন এক প্রকার বৃষ্টি বর্ষণ করলাম (অর্থাৎ প্রস্তর বৃষ্টি)। অতঃপর তাদের প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি কত মন্দ ছিল, যাদেরকে (পূর্বে আযাব থেকে) ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। আপনি (তাওহীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমিকাস্বরূপ) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য (উপযোগী), এবং তাঁর সেই বান্দাগণের প্রতি শান্তি (অবতীর্ণ) হোক, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (অর্থাৎ নবী ও নেককার বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর তাওহীদের বিষয় বর্ণিত হচ্ছে ঃ আপনি আমার তরফ থেকে বর্ণনা করুন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরাই বল তো, মহিমা মাহাত্ম্যে এবং অনুগ্রহে) আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তম—না সে সকল পদার্থ (উত্তম) যাদেরকে (ইবাদতের যোগ্য মনে করে) আল্লাহ্ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করছ। (মোটকথা, এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তম। সেমতে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একমাত্র তিনিই। অধিকন্তু দয়া ও ক্ষমতায় আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব কাফিররাও স্বীকার করতো। সুতরাং সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার কারণে যে তিনিই ইবাদত-আরাধনা করার একমাত্র যোগ্য সত্তা, তা সাধারণ জ্ঞানেও ধরা পড়ে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই কাহিনী সম্পর্কে কোরআনের একাধিক জায়গায় বিশেষ করে সূরা আ'রাফে জরুরী বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলে করীম

(সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও লূত (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَىٰ বাক্যে বাহ্যত পয়গম্বরগণকেই বুঝানো হয়েছে ; যেমন অন্য আয়াতে وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَىٰ বলে সাহাবায়ে-কিরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্য 'আলায়হিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

মাস'আলা : এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও পয়গম্বরগণের প্রতি দরূদ ও সালাম দ্বারা খোতবা শুরু হওয়া উচিত। রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের সকল খোতবা এভাবেই শুরু হয়েছে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহ্র হাম্‌দ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম সুন্নাত ও মোস্তাহাব।—(রূহুল মা'আনী)

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ

يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ

هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

(৬০) বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি ; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়। (৬১) বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদনদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (৬২) বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন, সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। (৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন ? অতএব আল্লাহ্‌র অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। (৬৪) বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, آللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ, না সেইসব প্রতিমা ইত্যাদি, যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে ? এটা মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা বরং বক্রবুদ্ধিতার সমালোচনা ছিল। এরপর তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হচ্ছে ঃ লোকসকল তোমরা বল,) না তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি, (নতুবা) তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কিন্তু মুশরিকরা এর পরও মানে না,) বরং তারা এমন সম্প্রদায়, যারা (অপরকে) আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে। (আচ্ছা, এরপর আরও গুণাবলী শুনে বলল যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি পৃথিবীকে (সৃষ্ট জীবের) বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে

মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তার (অর্থাৎ তাকে স্থির রাখার) জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন (যেমন সূরা ফুরকানে مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ বলা হয়েছে। এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কিন্তু মুশরিকরা মানে না,) বরং তাদের অধিকাংশই (ভালরূপে) বুঝে না। (আচ্ছা, আরও গুণাবলী শুনে বল যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি নিঃসহায়ের দোয়া শ্রবণ করেন যখন সে তার কাছে দোয়া করে এবং (তার) কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কিন্তু) তোমরা অতি সামান্যই স্মরণ রাখ। (আচ্ছা, আরও গুণাবলী শুনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি বৃষ্টির প্রাক্কালে বায়ু প্রেরণ করেন, যে (বৃষ্টির আশা দিয়ে মনকে) আনন্দিত করে। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার জন্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কখনই নয়,) বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শিরক থেকে উর্ধ্বে। (আচ্ছা, আরও গুণ ও অনুগ্রহ শুনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি সৃষ্ট জীবকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আকাশ ও মর্ত্য থেকে (বৃষ্টি বর্ষণ করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) তোমাদেরকে রিযিক দান করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (যদি তারা একথা শুনেও বলে যে, অন্য কোন উপাস্য ও ইবাদতের যোগ্য আছে, তবে) আপনি বলুন, (আচ্ছা) তোমরা (তাদের ইবাদতের যোগ্যতার উপর) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যদি তোমরা এ (দাবিতে) সত্যবাদী হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ — مُضْطَرٌّ শব্দটি اِضْطِرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন অভাব হেতু অপারক ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مُضْطَرٌّ বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তফসীর সুদ্দী, যুন্নুন মিসরী, সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। (কুরতুবী) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ইয়া আল্লাহ্, আমি আপনার রহমত আশা করি। অতএব আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।—(কুরতুবী)

নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবূল হয় ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসহায়ের দোয়া কবূল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী

মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। মু'মিন, কাফির, পরহিযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহ্র রহমত নির্দিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দোয়া কবূল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। (دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ থেকে فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ পর্যন্ত আয়াত) এক সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবূল হয়—এতে কোন সন্দেহ নেই। এক. উৎপীড়িতের দোয়া, দুই. মুসাফিরের দোয়া এবং তিন. সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবূল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহ্‌কে ডাকে, তখন সেও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্‌কে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবূ যর (রা)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফির হয়। (কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম ; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবূল হয়নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবূল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগে কোন ত্রুটি আছে কি না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ

مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا

تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ

وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ
سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى
هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ
بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ
اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

(৬৫) বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। (৬৬) বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। (৬৭) কাফিররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাবে, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে ? (৬৮) এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুন্ন হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে ? (৭২) বলুন অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ নবুয়তের পর তাওহীদের বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত ও পরকালের কথা বলা হচ্ছে। তাওহীদের প্রমাণাদিতে ثُمَّ يُعِيدُهُ বলে এর প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতও করা হয়েছিল। যে যে কারণবশত কাফিররা কিয়ামতকে অবাস্তব বলত, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় জিজ্ঞাসা করলেও বলা হয় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা কোন কিছুই না। অর্থাৎ তারা অনির্ধারণকে অবাস্তবতার প্রমাণ মনে করত। তাই এই বিষয়বস্তুকে এভাবে শুরু করা হয়েছে যে, গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন قُلْ لَا يَعْلَمُ الخ (এতে তাদের সন্দেহের জওয়াবও হয়ে গেছে।) কিয়ামত কবে হবে, এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এরপর بَلِ ادّٰرَكَ বলে তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে (وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) অতঃপর قُلْ سِيْرُوْا বলে অস্বীকারের কারণে শাসানো হয়েছে এবং এই অস্বীকারের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে لَا تَحْزَنْ বলে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। অতঃপর وَيَقُوْلُوْنَ বলে শাসানো সম্পর্কে তাদের একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ বলে শাসানোর তাকীদ করা হয়েছে।

(তারা কিয়ামতের সময় নির্ধারণ না করাকে কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। এর জওয়াবে) আপনি বলুন, (এই প্রমাণ ভ্রান্ত। কেননা, এ থেকে অধিক পক্ষে এতটুকু জরুরী যে, আমার ও তোমাদের কাছে এর নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান অনুপস্থিত। সুতরাং এ ব্যাপারে এরই কি বিশেষত্ব ? অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে তো সামগ্রিক নীতি এই যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের (অর্থাৎ বিশ্ব জগতের) কেউ গায়েবের খবর জানে না আল্লাহ্ ব্যতীত এবং (এ কারণেই) তারা (ঐ খবরও) জানে না যে, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তো বলা ছাড়াই সব কিছু জানেন এবং অন্য কেউ বলা ছাড়া কিছুই জানে না। কিন্তু দেখা যায় যে, অনেক বিষয় পূর্বে জানা না থাকলেও সেগুলো বাস্তবে পরিণত হয়। এতে জানা গেল যে, কোন বিষয় জানা না থাকলে তার অস্তিত্বহীনতা জরুরী হয়ে পড়ে না। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্যের কারণে কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান যবনিকার অন্তরালে রাখতে চান। কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ও এসব বিষয়ের অন্যতম। তাই মানুষকে এর জ্ঞান দান করা হয়নি। এতে এর অবাস্তবতা কিরূপে জরুরী হয় ? সঠিক সময়ের জ্ঞান না থাকা সবার পক্ষেই অভিন্ন বিষয়। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিররা শুধু নির্দিষ্টভাবে কিয়ামতকেই অমান্য করে না) বরং (তদুপরি) পরকাল সম্পর্কে তাদের (মূল) জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ স্বয়ং পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কেই তারা জ্ঞান রাখে না, যা নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকার চাইতেও গুরুতর) বরং (তদুপরি) তারা এ বিষয়ে (অর্থাৎ বাস্তবতা সম্পর্কে) সন্দিগ্ধ। বরং (তদুপরি) এ বিষয়ে তারা অন্ধ। (অর্থাৎ অন্ধ যেমন পথ দেখে না, ফলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা অসম্ভব হয়, তেমনি তারা চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে পরকালের সত্যতায় বিশুদ্ধ প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করে না, ফলে প্রমাণাদি তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যদ্দারা উদ্দিষ্ট বিষয় পর্যন্ত পৌঁছার আশা করা যেত। সুতরাং এটা সন্দেহের চাইতেও গুরুতর। কারণ, সন্দিগ্ধ

ব্যক্তি মাঝে মাঝে প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সন্দেহ দূর করে নেয়। তারা চিন্তাভাবনাই করে না। কাফিরদের এই বিরূপ সমালোচনার পর সম্মুখে তাদের একটি অবিশ্বাসমূলক উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে) কাফিররা বলে, যখন আমরা (মরে) মৃত্তিকা হয়ে যাব এবং (এমনিভাবে) আমাদের পিতৃপুরুষরাও, তখনও কি আমাদেরকে (কবর থেকে) পুনরুত্থিত করা হবে? এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং (মুহাম্মাদের) পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। (কারণ, সব পয়গম্বরের এই উক্তি সুবিদিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়নি এবং কবে হবে তাও কেউ বলেনি। এ থেকে জানা যায় যে,) এগুলো পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত ভিত্তিহীন কথাবার্তা। আপনি বলে দিন, (যখন এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ইতিহাসগত প্রমাণাদি স্থানে স্থানে বারবার তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে, তখন একে মিথ্যারোপ করা থেকে তোমাদের বিরত হওয়া উচিত। নতুবা অন্য মিথ্যারোপকারীদের যে অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ আযাবে পতিত হয়েছে, তোমাদেরও তাই হবে। যদি তাদের দুরবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ হয়ে থাকে তবে) তোমাদের পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছে। (কারণ তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া এবং আযাব আসার চিহ্ন এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। এ সব সারগর্ভ উপদেশ সত্ত্বেও যদি তারা বিরোধিতাই করে যায়, তবে) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে, তজ্জন্যে মনঃক্ষুন্ন হবেন না। (কারণ, অন্যান্য পয়গম্বরের সাথেও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। قُلْ سِيرُوا আয়াতে এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে তাদেরকে যে শাস্তিবাণী শোনানো হয়, এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তরে ঈমান থাকার কারণে) তারা (নির্ভীকভাবে) বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এই (আযাব ও গযবের) ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? আপনি বলুন, অসম্ভব কি, তোমরা যে আযাব দ্রুত কামনা করছ, তার কিয়দংশ তোমাদের নিকটেই পৌঁছে গেছে। (তবে এখন পর্যন্ত দেরি হওয়ার কারণ এই যে,) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল (এই ব্যাপক অনুগ্রহের কারণে কিছুটা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন) কিন্তু তাদের অধিকাংশই (এ জন্যে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (যে, বিলম্বকে সুযোগ মনে করে এতে সত্য অন্বেষণ করবে। এভাবে তারা আযাব থেকে চিরমুক্তি পেতে পারত। বরং তারা উল্টা অবিশ্বাস ও পরিহাসের ভঙ্গিতে দ্রুত আযাব কামনা করছে। এই বিলম্ব যেহেতু উপকারিতাবশত তাই এরূপ বুঝা উচিত নয় যে, এসব কর্মের শাস্তিই হবে না। কেননা) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা অবশ্যই জানেন। (এটা শুধু আল্লাহর জানাই নয়, বরং আল্লাহর দফতরে লিখিত আছে। তাতে শুধু তাদের ক্রিয়া কর্মই নয়, বরং) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, লওহে মাহফুযে যা আছে। (এই লওহে মাহফুয আল্লাহ্ তা'আলার দফতর। কেউ জানে না, এমন সব গোপনভেদ যখন তাতে বিদ্যমান আছে, তখন বাহ্যিক বিষয়সমূহ আরও উত্তমরূপে বিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কুকর্ম অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দফতরেও সংরক্ষিত আছে। এসব কুকর্ম সাজার দাবিদারও। সাজা যে বাস্তবরূপ লাভ করবে এ সম্পর্কে পয়গম্বরগণ প্রদত্ত সত্য সংবাদগুলোও একমত ও অভিন্ন। এমতাবস্থায় সাজা হবে না—এরূপ বুঝার অবকাশ আছে কি? তবে বিলম্ব হওয়া সম্ভবপর। সেমতে অবিশ্বাসীদের কতক

শাস্তি দুনিয়াতেও হয়েছে; যেমন দুর্ভিক্ষ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। কিছু কবরে ও বরযখে হবে, যা বেশি দূরে নয় এবং কিছু পরকালে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে। যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি—তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ্ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ–এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও শরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আন-'আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ — ادارك শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাআতও আছে এবং এর অর্থ সম্পর্কেও নানাজনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন কোন তফসীরকারক ادارك শব্দের অর্থ নিয়েছেন تكامل অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং فى الاخـرة কে ادارك এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালের এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোন কোন তফসীরকারকের মতে ادارك শব্দের অর্থ ضل ও غـاب এবং فى الاخـرة শব্দটি علمـهم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾

---

(৭৬) এই কোরআন বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৭) এবং নিশ্চিতই এটা মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত। (৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা

করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭৯) অতএব আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় এই কোরআন বনী ইসরাইল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশ (অর্থাৎ অধিকাংশের স্বরূপ) তাদের কাছে বিবৃত করে এবং এটা মু'মিনদের জন্য (বিশেষ) হিদায়াত ও (বিশেষ) রহমত। (ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে হিদায়াত এবং ফলাফলও পরিণামের ক্ষেত্রে রহমত)। নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা নিজ বিচার অনুযায়ী (কার্যত) ফয়সালা তাদের মধ্যে (কিয়ামতের দিন) করবেন। (তখন জানা যাবে কোনটি সত্য ধর্ম এবং কোনটি মিথ্যা ধর্ম ছিল। অতএব তাদের জন্য পরিতাপ কিসের) তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে না।) অতএব আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন (আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন। কেননা) আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোন যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারী সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং কোরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমনকি, বনী ইসরাইলের আলিমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত কোরআন পাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলিমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বুঝা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুন্ন হবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তা নিশ্চিত।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

(৮০) আপনি আহবান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব তারাই আজ্ঞাবহ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি মৃতদেরকে ও বধিরদেরকে আপনার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে (ফিরিয়ে) সৎপথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস রাখে (এবং) এরপর তারা মান্য (ও) করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র মানব জাতির প্রতি আমাদের রাসূলে করীম (সা)-এর স্নেহ মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহ্র পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবূল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে وَلَاتَحْزَنْ এবং وَلَاتَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ বাক্যসমূহ এই সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবূল করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবূল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক. তারা সত্য কবূল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। দুই. তাদের উদাহরণ বধিরের মত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তিন. তারা অন্ধের মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ تُسْمِعُ اِلاَّ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ —অর্থাৎ আপনি তো কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌঁছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে—আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌঁছানোই হতো, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও

বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা, কাফিরদের কানে আওয়াজ পৌঁছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবূলও করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফিরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে। কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কি না, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) যেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নামল এবং দ্বিতীয়ত সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ — অর্থাৎ যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

এই আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য—সাধারণ মৃতদের জন্য নয়—তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি

থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃতদের শ্রবণের মত দানের প্রবক্তা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের উক্তিও একটি সহীহ্ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীস এই ঃ

ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো। এক. মৃতরা শুনতে পারে এবং দুই তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্ তা'আলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেওয়ারও শক্তি দান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শুনবে কি না। তাই ইমাম গাযযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ্ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শোনে; কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শুনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নামল, সূরা রূম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ্ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে—অকাট্য রূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

---

(৮২) যখন ওয়াদা তাদের কাছে এসে যাবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন (কিয়ামতের) ওয়াদা তাদের প্রতি পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে) তখন আমি তাদের জন্য ভূগর্ভ থেকে এক (অদ্ভুত) জীব নির্গত করব। সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে। কেননা, (কাফির) মানুষ আমার (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার) আয়াতসমূহে (বিশেষ করে কিয়ামত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে) বিশ্বাস করতো না। (কিন্তু এখন কিয়ামত এসে গেছে। তার আলামতসমূহের মধ্যে জন্তুর আবির্ভাবও একটি আলামত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে ? মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ২. ধূম্র নির্গত হওয়া, ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ৫. ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ৬. দাজ্জাল, ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ—এক. পশ্চিমে, দুই. পূর্বে এবং তিন. আরব উপদ্বীপে, ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। دابة শব্দের تنوين-এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবিক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর, আবূ দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফিরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন এঁকে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে চিনবে।—(ইবনে কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে

উদিত হবে। সূর্য উপরে ওঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রথমে হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর)

শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।—(মাযহারী) এ স্থলে ইবনে কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর এ সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফির ও মু'মিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি ? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লিখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ এই বাক্যটিই সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই ঃ অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনত ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আলী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। —(ইবনে কাসীর)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ

فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى
الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ
الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

(৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেইসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে ? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করছিলে ? (৮৫) যুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সে-দিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্র কারিগরি, যিনি সব কিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন। (৮৯) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেইদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (৯০) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেদিন (কবর থেকে জীবিত করার পর) আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ থেকে এবং এই উম্মত থেকেও) তাদের একটি দল সমবেত করব, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত (অতঃপর তাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হিসাবের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। যেহেতু তারা প্রচুর সংখ্যক হবে, তাই) তাদেরকে (চলার পথে পেছনের লোকদের সাথে মিলিত থাকার জন্য) বিরত রাখা হবে, যাতে আগে-পিছে না থাকে—সবাই একসাথে হয়ে হিসাবের মাঠের দিকে চলে। এতে আধিক্য বর্ণনা করা

উদ্দেশ্য। কেননা, বড় সমাবেশে স্বভাবতই এরূপ হয়—বাধা প্রদান করা হোক বা না হোক।) যখন (চলতে চলতে তারা হাশরের মাঠে) উপস্থিত হবে, তখন (হিসাব শুরু হয়ে যাবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে ? অথচ তোমরা এগুলোকে তোমাদের জ্ঞানের পরিধিতে আনতে না (যার ফলে চিন্তা করার সুযোগ হতো এবং চিন্তা করার পর কোন মতামত কায়েম করতে পারতে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা না করেই শোনামাত্র সেগুলোকে মিথ্যা বলে দিয়েছিলে এবং শুধু মিথ্যা বলাই নয়;) বরং (স্মরণ করে দেখ, এছাড়া) তোমরা আরও কত কিছু করছিলে। (উদাহরণত পয়গম্বরগণকে ও মু'মিনগণকে কষ্ট দিয়েছ, যা মিথ্যা বলার চাইতেও গুরুতর অন্যায়। এমনিভাবে আরও অনেক কুফরী বিশ্বাস ও পাপাচারে লিপ্ত ছিলে। এখন) তাদের উপর (অপরাধ কায়েম হয়ে যাওয়ার কারণে আযাবের) ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেছে (অর্থাৎ শাস্তির যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে)। এ কারণে যে, (দুনিয়াতে) তারা (গুরুতর) সীমালংঘন করেছিল (যা আজ প্রকাশ হয়ে গেছে)। অতএব (যেহেতু প্রমাণ শক্তিশালী, তাই) তারা (ওযর সম্পর্কে) কোন কিছু বলতেও পারবে না। (কোন কোন আয়াতে তাদের ওযর পেশ করার কথা আছে, সেটা প্রথমাবস্থায় হবে। এরপর প্রমাণ কায়েম হয়ে গেলে কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের কিয়ামত অস্বীকার করাটা নিরেট নির্বুদ্ধিতা। কেননা, ইতিহাসগত প্রমাণাদি ছাড়াও এর পক্ষে যুক্তিগত প্রমাণ কায়েম আছে। যেমন) তারা কি দেখে না যে, আমি বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছি। (এই বিশ্রাম মৃত্যুর সমতুল্য) এবং দিনকে করেছি আলোকময়। (এটা জাগরণের উপর নির্ভরশীল। জাগরণ মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের সমতুল্য। সুতরাং) নিশ্চয়ই এতে (অর্থাৎ দৈনন্দিন নিদ্রা ও জাগরণে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা এবং আয়াতসমূহের সত্যতার উপর) বড় বড় প্রমাণ রয়েছে। (কেননা, মৃত্যুর স্বরূপ হচ্ছে আত্মার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পুনরুজ্জীবনের স্বরূপ হচ্ছে এই সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হওয়া। নিদ্রাও এক দিক দিয়ে এই সম্পর্কের ছিন্নতা। কারণ, নিদ্রায় এই সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার অস্তিত্বের স্তরসমূহের মধ্যে কোন একটি স্তরের বিলুপ্তির ফলেই সম্পর্ক দুর্বল হয়। এই বিলুপ্ত স্তরের পুনরাবর্তনকেই জাগরণ বলা হয়। কাজেই উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। নিদ্রার পর জাগ্রত করতে যে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম, তা প্রত্যহ আমরা দেখতে পাই। মৃত্যুর পর জীবন দানও এরই নজির। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম হবেন না কেন ? এই যুক্তি প্রত্যেকের জন্যই। কিন্তু এর দ্বারা উপকার লাভের দিক) তাদের জন্য (ই), যারা ঈমানদার। (কেননা, তারা চিন্তা-ভাবনা করে, অন্যরা করে না। কোন ফল লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী। তাই অন্যরা এর দ্বারা উপকৃত হয় না। হাশরের পূর্বে একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটবে। পরবর্তী আয়াতে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ভয়াবহতাও স্মর্তব্য ঃ) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে (এটা প্রথম ফুৎকার। দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হাশর হবে।) অতঃপর আকাশে ও পৃথিবীতে যারা (ফেরেশতা, মানুষ ইত্যাদি) আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে (অতঃপর মৃত্যুবরণ করবে। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদের আত্মা অজ্ঞান হয়ে যাবে) কিন্তু যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন (সে এই ভীতি ও মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে। সহীহ্ হাদীস দৃষ্টে এরা হবেন জিবরাঈল, মীকাঈল, ঈসরাফীল, আযরাঈল এবং আরশ বহনকারীগণ। এরপর

ফুৎকারের প্রভাব ছাড়াই তাদেরও ওফাত হয়ে যাবে।—(দুররে মনসুর) আর (দুনিয়াতে ভয়ের বস্তু থেকে পলায়নের অভ্যাস আছে। সেখানে আল্লাহ্র কাছ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না; বরং) সকলেই তাঁর কাছে অবনত মস্তকে হাযির থাকবে; (এমনকি জীবিতরা মৃত এবং মৃতরা অজ্ঞান হয়ে যাবে। ফুৎকারের এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রাণীদের মধ্যে হবে। অতঃপর অপ্রাণীদের উপর এর কি প্রভাব পড়বে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি (তখন) পর্বতমালাকে (বাহ্যিক দৃঢ়তার কারণে বাহ্যদৃষ্টে) অচল (অর্থাৎ সর্বদা এরূপই থাকবে এবং স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হবে না) মনে কর। অথচ সেইদিন এদের অবস্থা হবে এই যে,) এগুলো মেঘমালার মত (শূন্যগর্ভ, হালকা ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্য পরিমণ্ডলে) চলমান হবে। (যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا। এজন্য আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয় যে, এরূপ ভারী ও কঠোর বস্তুর অবস্থা এরূপ হবে কেমন করে ? কারণ এই যে,) এটা আল্লাহ্র কাজ, যিনি সব কিছুকে (উপযুক্ত পরিমাণে) সুসংহত করেছেন। প্রথমাবস্থায় কোন বস্তুর মধ্যে মজবুতি ছিল না। কারণ কোন বস্তুই ছিল না। সুতরাং মজবুতি না থাকা আরও উত্তমরূপে বুঝা যায়। তিনি অনস্তিত্বকে যেমন অস্তিত্ব এবং দুর্বলকে শক্তিদান করেছেন, তেমনি এর বিপরীত কর্মও তিনি করতে পারেন। কেননা, আল্লাহ্র শক্তিসামর্থ্য সবকিছুর সাথে সমান সম্বন্ধশীল; বিশেষত যেসব বস্তু একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যশীল, সেগুলোতে এটা অধিক সুস্পষ্ট। এমনিভাবে আকাশ ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হওয়ার কথা অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ الخ — এরপর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে। এর ফলে আত্মাসমূহ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং সমগ্র জগৎ যথাযথ ও নতুনভাবে ঠিকঠাক হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী আয়াতে যে হাশরের কথা বলা হয়েছিল, তা দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। অতঃপর আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কিয়ামতে প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ) নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ্ তা'আলা তা অবগত আছেন। (প্রতিদান ও শাস্তির এটাই প্রথম শর্ত। অন্যান্য শর্ত যেমন ক্ষমতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। ভূমিকার পর এর বাস্তবতা আইন ও পদ্ধতি সহ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যে ব্যক্তি সৎকর্ম (অর্থাৎ ঈমান) নিয়ে আসবে (ঈমানের কারণে যে প্রতিদান সে পেতে পারে) সে (তার চাইতেও) উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (যেমন সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ الخ এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (অর্থাৎ কুফর ও শিরক), তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে ঃ) তোমাদেরকে তো সেসব কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যেগুলো তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। (এই শাস্তি অহেতুক নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَهُمْ يُوزَعُونَ শব্দটি وزع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া। অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ وزع

শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ; বিশেষত যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বুঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তাভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ الخ — فزع শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صَعِقَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে শিংগার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিংগা ফুঁক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীত-বিহবল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।-(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। —(কুরতুবী)

إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত-বিহবল হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না।—(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গম্বরগণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ, তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুয়তের মর্যাদাও।—(কুরতুবী)

সূরা যুমারে আছে وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ এখানে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানেও إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। তাঁরা শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে

পতিত হবেন। যে সকল তফসীরবিদ فزع ও صعق কে একই অর্থ ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই ব্যক্ত হয়েছে। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন তাঁদের মতে শহীদগণ فزع তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ—উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনও টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। এবং تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ কথাটি কিয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোন কোন আলিম বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কোরআন পাকে বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা।

اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا এবং اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

(২) পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ এটা তখন হবে, যখন উপর থেকে আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে উঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নিচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (৩) পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার মত একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا (৪) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া (৫) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ তন্মধ্যে কতক অবস্থা শিংগায় প্রথম ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। তখন ভূপৃষ্ঠকে সমতল স্তরের মত করে দেওয়া হবে। তাতে কোন গুহা, পাহাড়, দালান কোঠা ও বৃক্ষ থাকবে না। قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّاتَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا (কুরতুবী-রূহুল মা'আনী। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ — صنع শব্দের অর্থ কারিগরি বিদ্যা, শিল্প। اَتْقَنَ শব্দটি اِتْقَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যত এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত ; অর্থাৎ দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এবং শিংগায় ফুৎকার থেকে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয় ; বরং বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল ; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা, এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা। حَسَنَةٌ বলে এখানে কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বুঝানো হয়েছে (কাতাদাহ্র উক্তি)। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলা বাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত এবং আযাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতাশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। —(মাযহারী)

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ — فزع বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহ্ভীরু পরহিযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয় : যেমন কোরআন পাক বলে اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ অর্থাৎ পালনকর্তার আযাব থেকে কেউ নিশ্চিত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গম্বরগণ, সাহাবায়ে কিরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেইদিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ

وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ

لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

(৯১) আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। এবং সবকিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আজ্ঞাবহদের একজন হই। (৯২) এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, 'আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী।' (৯৩) এবং আরও বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফিল নন।'

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে পয়গম্বর (সা), মানুষকে বলে দিন,] আমি তো কেবল এই (মক্কা) নগরীর (সত্যিকার) প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে (নগরীকে) সম্মানিত করেছেন। (এই সম্মানের কারণেই একে হেরেম করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন ইবাদতে কাউকে শরীক না করি) এবং (তাঁর ইবাদত কেন করা হবে না, যখন) সবকিছু তাঁরই (মালিকানাধীন)। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি (বিশ্বাস ও কর্ম সবকিছুতে) তাঁর আজ্ঞাবহদের একজন হই। (এ হচ্ছে তাওহীদের আদেশ) এবং (আরও আদেশ এই যে,) যেন আমি (তোমাদেরকে) কোরআন পাঠ করে শুনাই (অর্থাৎ বিধানাবলী প্রচার করি, যা নবুয়তের জরুরী অঙ্গ)। অতঃপর (আমার প্রচারের পর) যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে (অর্থাৎ সে আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত লাভ করবে। আমি তার কাছে কোন আর্থিক অথবা প্রভাবগত উপকার চাই না) এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, (আমার কোন ক্ষতি নেই। কারণ,) আমি তো কেবল সতর্ককারী (অর্থাৎ আদেশ প্রচারকারী) পয়গম্বর। (অর্থাৎ আমার কাজ আদেশ পৌঁছিয়ে দেওয়া। এরপর আমার দায়িত্ব শেষ। না মানলে তোমাদেরকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।) আপনি (আরও) বলে দিন, (তোমরা যে কিয়ামতের বিলম্বকে আর না হওয়ার প্রমাণ মনে করে কিয়ামতকে অস্বীকার করছ, এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা। বিলম্ব কখনও প্রমাণ হতে পারে না যে, কিয়ামত কোনদিন হবেই না। এ ছাড়া তোমরা যে আমাকে দ্রুত কিয়ামত আনার কথা বলছ, এটা তোমাদের দ্বিতীয় ভ্রান্তি। কেননা আমি কোনদিন দাবি করিনি যে, কিয়ামত আনা আমার ক্ষমতাধীন। বরং) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। (ক্ষমতা, জ্ঞান, হিকমত সবই তাঁর। তাঁর হিকমত যখন চাইবে, তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন। হ্যাঁ এতটুকু আমাকেও জানানো হয়েছে যে, কিয়ামতের বেশি বিলম্ব নেই। বরং) সত্বরই তিনি নিদর্শনসমূহ (অর্থাৎ কিয়ামতের ঘটনাবলী) তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা সেগুলোকে চিনবে। (তবে চিনলেও কোন উপকার হবে না) আর (শুধু নিদর্শনাবলী দেখানোই হবে না; বরং তোমাদেরকে মন্দ কর্মের শাস্তিও ভোগ করতে হবে। কেননা) আপনার পালনকর্তা সে সম্পর্কে গাফিল নন, যা তোমরা কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে بلدة বলে মক্কা মুকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। حرم শব্দটি تحريم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ; যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েয নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। এসব বিধানের কতকাংশ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়িদার শুরুতে এবং কতকাংশ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

سُوْرَةُ الْقَصَصِ

সূরা আল-কাসাস

মক্কা অবতীর্ণ, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

طٰسٓمٓ ۝১ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝২ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝৩ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ

وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ

وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝৪ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ

عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ

الْوٰرِثِيْنَ ۙ ۝৫ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ

وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝৬ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ

اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ

اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝৭ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ

لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا

كَانُوْا خٰطِـِٔيْنَ ۝৮ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ؕ

لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ۝٩ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي
بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝١٠ وَقَالَتْ
لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝١١
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝١٢ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٣

দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) তা-সীন-মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার কাছে মূসা ও ফিরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। (৪) ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। (৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। (৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেওয়ার যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত। (৭) আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্য তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (৮) অতঃপর ফিরাউন-পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) ফিরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। (১০) সকালে মূসা-জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা-জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই

দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসিগণের মধ্যে। (১১) তিনি মূসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছনে পেছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। (১২)পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্য একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী ? (১৩) অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য ; কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ত্বা-সীন-মীম—(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ যেসব বিষয়বস্তু আপনার প্রতি ওহী করা হয়) সুস্পষ্ট কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত। (তন্মধ্যে এ স্থলে) আমি মূসা (আ) ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত আপনার কাছে সত্য সহকারে পাঠ করে (অর্থাৎ নাযিল করে) শুনাচ্ছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের (উপকারের) জন্য। (কেননা বৃত্তান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা, নবুয়তের প্রমাণ সংগ্রহ ইত্যাদি। এগুলো বিশেষত ঈমানদারদের সাথেই সম্পর্ক রাখে—কার্যত ঈমানদার হোক কিংবা ঈমান আনতে ইচ্ছুক হোক। সংক্ষেপে বৃত্তান্ত এই যে,) ফিরাউন তার দেশে (মিসরে) খুবই উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। (এভাবে সে কিবতী অর্থাৎ মিসরীয়দেরকে সম্মানিত করে রেখেছিল এবং কিবতী অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে হেয় ও লাঞ্ছিত করে রেখেছিল।) সে তাদের (দেশের বাসিন্দাদের) এক দলকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) দুর্বল করে রেখেছিল (এভাবে যে,) তাদের পুত্র-সন্তানকে (যারা নতুন জন্মগ্রহণ করত, জল্লাদের হাতে) হত্যা করত এবং তাদের নারীদেরকে (অর্থাৎ কন্যা-সন্তানদেরকে) জীবিত রাখত (যাতে তাদেরকে কাজে লাগানো যায়। এছাড়া তাদের তরফ থেকে বিপদাশংকাও ছিল না,) নিশ্চিতই সে ছিল বড় দুষ্কৃতকারী। (মোটকথা, ফিরাউন তো ছিল এই ধারণার বশবর্তী।) আর আমার ইচ্ছা ছিল দেশে (মিসরে) যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি (পার্থিব ও ধর্মীয়) অনুগ্রহ করার। (এ অনুগ্রহ এই যে,) তাদের (ধর্মীয়) নেতা করা এবং (দুনিয়াতে) তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করা এবং (মালিক হওয়ার সাথে সাথে) তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করা এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে সেইসব (অবাঞ্ছিত) ঘটনা দেখিয়ে দেওয়া, যা তারা তাদের (বনী ইসরাইলের) তরফ থেকে আশংকা করত [অর্থাৎ সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস। এই আশংকায়ই বনী-ইসরাইলের ছেলেদেরকে ফিরাউনের দেখা একটি স্বপ্ন ও জ্যোতিষীদের দেওয়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা হত্যা করে যাচ্ছিল।—(দুররে মনসুর) সুতরাং আমার ফয়সালা ও তকদীরের সামনে তাদের সকল কৌশল ব্যর্থ হলো। এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এর বিশদ বিবরণ এই যে, মূসা (আ) যখন এমনি সংকটময় যমানায় জন্মগ্রহণ করলেন, তখন] আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, (যে পর্যন্ত তাকে গোপন রাখা সম্ভবপর হয়,) তুমি তাকে স্তন্যদান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে (গুপ্তচরদের অবগত হওয়ার) আশংকা কর, তখন (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তাকে (সিন্দুকে ভর্তি করে) দরিয়াতে (নীল নদে) নিক্ষেপ

কর এবং (নিমজ্জিত হওয়ার) ভয় করো না, (বিচ্ছেদের কারণে) দুঃখও করো না। (কেননা) আমি অবশ্যই তাকে পুনরায় তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দেব এবং (সময় এলে) তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (মোটকথা, তিনি এমনিভাবে স্তন্যদান করতে লাগলেন। এরপর যখন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকা হলো, তখন সিন্দুকে ভরে আল্লাহ্র নামে নীলনদে নিক্ষেপ করে দিলেন। নীলনদের কোন শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিংবা ফিরাউনের স্বজনরা নদীভ্রমণে বের হয়েছিল। সিন্দুকটি কিনারায় এসে ভিড়ল।) তখন ফিরাউনের লোকেরা মূসা (আ)-কে সিন্দুকসহ কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রুতা ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী (এ ব্যাপারে) ভুলকারী ছিল। (কারণ, তারা তাদের শত্রুকে কোলে তুলে নিয়েছিল। যখন তাকে সিন্দুক থেকে বের করে ফিরাউনের সামনে পেশ করা হলো, তখন) ফিরাউনের স্ত্রী (হযরত আসিয়া ফিরাউনকে) বলল, এ (এই ছেলে) আমার ও তোমার নয়নমণি (অর্থাৎ তাকে দেখে মন প্রফুল্ল হবে। অতএব) তাকে হত্যা করো না। (বড় হয়ে) এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। তাদের (পরিণামের) কোন খবরই ছিল না (যে, এ সেই বালক, যার হাতে ফিরাউন-সাম্রাজ্যের পতন হবে। এদিকে এ ঘটনা হলো যে,) মূসা-জননীর অন্তর (বিভিন্ন চিন্তার কারণে) অস্থির হয়ে পড়ল। (অস্থিরতা যেনতেন নয়। বরং এমন নিদারুণ অস্থিরতা যে, যদি আমি তাকে (আমার ওয়াদার প্রতি) বিশ্বাসী রাখার উদ্দেশ্যে তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা (আ)-এর অবস্থা (সবার সামনে) প্রকাশ করেই দিতেন। (মোটকথা, তিনি কোনরূপে অন্তরকে সামলিয়ে নিলেন এবং কৌশল শুরু করলেন। তা এই যে,) তিনি মূসা (আ)-এর ভগিনী (অর্থাৎ আপন কন্যা)-কে বললেন, তার পেছনে পেছনে যাও। (সে চলল এবং রাজপ্রাসাদে সিন্দুক খোলা হয়েছে জেনে সেখানে পৌঁছল। হয় পূর্বেও যাতায়াত ছিল, না হয় কোন কৌশলে সেখানে পৌঁছল এবং) মূসা (আ)-কে দূর থেকে দেখল, অথচ তারা জানত না (যে, সে মূসার ভগিনী এবং তাঁর খোঁজে এসেছে।) আমি পূর্ব থেকেই (অর্থাৎ সিন্দুক বের হওয়ার পর থেকেই) মূসা (আ) থেকে ধাত্রীদেরকে বিরত রেখেছিলাম। (অর্থাৎ সে কারও দুধ গ্রহণ করত না।) অতঃপর সে (সুযোগ বুঝে) বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে (সর্বান্তঃকরণে) তার হিতাকাঙ্ক্ষী? [শিশুকে দুধ পান করানো কঠিন দেখে তারা এ পরামর্শকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং সেই পরিবারের ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। মূসা-ভগিনী তার জননীর ঠিকানা বলে দিল। সেমতে তাকে আনা হলো এবং মূসা (আ)-কে তার কোলে তুলে দেওয়া হলো। কোলে যাওয়া মাত্রই তিনি দুধ পান করতে লাগলেন। অতঃপর তাদের অনুমতিক্রমে তাঁকে নিশ্চিন্তে বাড়ি নিয়ে এল। মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদে নিয়ে তাদেরকে দেখিয়ে আনত।] আমি মূসা (আ)-কে (এভাবে) তাঁর জননীর কাছে (ওয়াদা অনুযায়ী) ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর সন্তানকে দেখে) তাঁর চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি (বিচ্ছেদের) দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি (প্রত্যক্ষরূপে) জানেন যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য; কিন্তু (পরিতাপের বিষয়,) অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না (এটা কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহ্ফা (রাবেগ)-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জুহ্ফা অর্থাৎ রাবেগের নিকটে পৌঁছেন, তখন জিবরাঈল আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ে বৈ কি। অতঃপর জিবরাঈল তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। আয়াতটি এই ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ সূরা কাসাসে সর্বপ্রথম মূসা (আ)-এর কাহিনী প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্ধেক সূরা পর্যন্ত মূসা (আ)-এর কাহিনী ফিরাউনের সাথে এবং শেষভাগে কারুনের সাথে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহ্ফে তাঁর কাহিনী খিযির (আ)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা তোয়াহায় মূসা (আ)-এর জন্য বলা হয়েছে وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُوْنًا, ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমিও ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিরণ সূরা তোয়াহায় উল্লেখ করেছি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরী মাস'আলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা তোয়াহায় এবং কিছু সূরা কাহফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানের আয়াতে শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে। وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً الاية এই আয়াতে বিধিলিপির মুকাবিলায় ফিরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফিরাউন শংকিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাইলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই ফিরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনতুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌঁছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফিরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে—আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফির হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল, অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ থেকে مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তাই।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى শব্দটি এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—নবুয়তের ওহী বুঝানো হয়নি। সূরা তোয়াহায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا
رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۟ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ
الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۟
قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ
نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَنْعَمْتَ
عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ
فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰۤى اِنَّكَ
لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّاۤ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ
قَالَ يٰمُوْسٰۤى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۖ ۗ اِنْ
تُرِيْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ
الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰۤى
اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾ ع

(১৪) যখন মূসা যৌবনে পদার্পন করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায়

তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্যজন তাঁর শত্রুদলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৭) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চীৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (১৯) অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সেরকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, রাজ্যের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। (২১) অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং মূসা যখন (লালিত পালিত হয়ে) পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন এবং (অঙ্গ সৌষ্ঠবে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে) পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম (অর্থাৎ নবুয়তের পূর্বেই ভালমন্দ বিচারের উপযুক্ত সুস্থ ও সরল জ্ঞানবুদ্ধি দান করলাম)। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ সৎকর্মের মাধ্যমে জ্ঞানগত উন্নতি সাধিত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা (আ) কখনও ফিরাউনের ধর্মমত গ্রহণ করেননি; বরং তার প্রতি বিতৃষ্ণই ছিলেন। এ সময়কারই এক ঘটনা এই যে, একবার) মূসা (আ) সে শহরে (অর্থাৎ মিসরে (রূহুল মা'আনী) বাইরে থেকে) এমন সময়ে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা বেখবর (নিদ্রামগ্ন) ছিল। (অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সময়টি ছিল দ্বিপ্রহর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে রাত্রির অংশ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময় জানা যায় (দুররে-মনসূর) তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। একজন ছিল তাঁর নিজ দলের (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের) এবং অপরজন তাঁর শত্রুদলের। (অর্থাৎ ফিরাউনের স্বজন ও কর্মচারী। উভয়ে কোন ব্যাপারে ধস্তাধস্তি করছিল এবং বাড়াবাড়ি ছিল ফিরাউনীর।) অতঃপর যে তাঁর নিজে দলের, সে (মূসা (আ)-কে দেখে) তাঁর শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (মূসা (আ) প্রথমে তাকে বুঝালেন। যখন সে এতে বিরত হলো না) তখন

মূসা (আ) তাকে (শাসনের উদ্দেশ্যে যুলুম প্রতিরোধ করার জন্য) ঘুষি মারলেন এবং তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন (অর্থাৎ ঘটনাক্রমে সে মারাই গেল)। মূসা (আ) এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখে খুব অনুতপ্ত হলেন এবং) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় শয়তান (মানুষের) প্রকাশ্য দুশমন, বিভ্রান্তকারী। তিনি (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে) আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি ক্ষমা করুন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (এই ক্ষমার কথা নবুয়ত দান করার সময় মূসা (আ) নিশ্চিতরূপে জানতে পারেন; যেমন সূরা আন্-নামলে আছে ٱلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ উপস্থিত ক্ষেত্রে ইলহাম দ্বারা জানা হোক বা মোটেই জানা না হোক;) মূসা [(আ) অতীতের জন্য তওবার সাথে ভবিষ্যতের জন্য এ কথাও] বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে (বিরাট) অনুগ্রহ করেছেন, (যা সূরা তোয়াহায় ব্যক্ত হয়েছে وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى থেকে وَلَا تَحْزَنْ পর্যন্ত) এরপর আমি কখনও অপরাধীদেরকে সাহায্য করব না। (এখানে 'অপরাধী' বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা অপরের দ্বারা গুনাহের কাজ করাতে চায়। কেননা, গুনাহের কাজ করানোও অপরাধ। এতে শয়তানও দাখিল হয়ে গেছে। কারণ, সে গুনাহ্ করায় এবং গুনাহ্‌কারী ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে সাহায্য করে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا اى للشيطان উদ্দেশ্য এই যে, আমি শয়তানের আদেশ কখনও মান্য করব না। ভুল-ভ্রান্তির জায়গায় সাবধানতা অবলম্বন করব। আসল উদ্দেশ্য এতটুকুই। কিন্তু অপরদেরকেও শামিল করার জন্য مجرمين বহুবচন পদ ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা, ইতিমধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু ইসরাইলী ব্যতীত কেউ হত্যাকারীর রহস্য জানত না। ঘটনাটি যেহেতু ইসরাইলীর সমর্থনে ঘটেছিল, তাই সে প্রকাশ করেনি। কিন্তু মূসা (আ)-এর পরও শংকিত ছিলেন। এভাবে রাত অতিবাহিত হলো।) অতঃপর শহরে মূসা (আ)-এর প্রভাত হলো ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকাল যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে আবার তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকছে (কারণ সে অন্য একজনের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল)। মূসা (আ) এই দৃশ্য দেখে এবং গতকালকের ঘটনা স্মরণ করে অসন্তুষ্ট হলেন এবং) বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (কারণ, রোজই কারও না কারও সাথে কলহে লিপ্ত হও। মূসা (আ) ইঙ্গিতে জেনে থাকবেন যে, রাগারাগি তার পক্ষ থেকেও হয়েছে। কিন্তু ফিরাউনীর বাড়াবাড়ি দেখে তাকে বাধা দিতে চাইলেন।) অতঃপর মূসা (আ) উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, [অর্থাৎ ফিরাউনীকে। কারণ, সে ইসরাইলী ও মূসা (আ) উভয়ের শত্রু ছিল। মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাইলের। আর ফিরাউনীরা সবাই বনী ইসরাইলের শত্রু ছিল। যদিও মূসা (আ)-কে নির্দিষ্টভাবে ইসরাইলী বলে তার জানা না থাকুক। অথবা মূসা (আ) যেহেতু ফিরাউনের ধর্মমতের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন, তাই বিষয়টি প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল এবং ফিরাউনীরা তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা, মূসা (আ) যখন ফিরাউনীর প্রতি হাত বাড়ানোর আগে ইসরাইলীর প্রতি রাগান্বিত হলেন, তখন ইসরাইলী মনে করল যে, মূসা সম্ভবত আজ আমাকে মারধর করবেন। তাই পেরেশান হয়ে] ইসরাইলী বলল, হে মূসা, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে

সেরকম (আজ) আমাকেও কি হত্যা করতে চাও ? (মনে হয়) তুমি পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাও এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। [এই কথা ফিরাউনী শুনল। হত্যাকারীর সন্ধান চলছিল। এতটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ফিরাউনের কাছে খবর পৌছিয়ে দিল। ফিরাউন তার নিজের লোক নিহত হওয়ায় এমনিতে রাগান্বিত ছিল, এ সংবাদ শুনে আরো অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল। সম্ভবত এতে তার স্বপ্নের আশংকা আরও জোরদার হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, সে তার পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য একত্রিত করল এবং শেষ পর্যন্ত মূসা (আ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই সভায়] এক ব্যক্তি [মূসা (আ)-এর বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। সে] শহরের (সেই) প্রান্ত থেকে [যেখানে পরামর্শ হচ্ছিল, মূসা (আ)-এর কাছে নিকটতম গলি দিয়ে] ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, পারিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব আপনি (এখান থেকে) বের হয়ে যান। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর (এ কথা শুনে) মূসা (আ) সেখান থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় (একদিকে) বের হয়ে পড়লেন। (পথ জানা ছিল না, তাই দোয়ার ভঙ্গিতে) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করুন (এবং শান্তির জায়গায় পৌছিয়ে দিন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ — اشد এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন তার অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই اشد বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে اشد-এর যমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। একে اسْتَوَىٰ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, اشد তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে।—(রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী)

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا — حكم বলে নবুয়ত ও রিসালত এবং علم বলে বিধিবিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مدينة বলে মিসর নগরী বুঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বুঝা গেল যে, মূসা (আ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে মূসা (আ) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারী দল বলা হতো। مِن شِيعَتِهِ শব্দটি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে ইসহাক ও

ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, মূসা (আ) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর মূসা (আ) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দ্বিপ্রহর বুঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত। —(কুরতুবী)

فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى — وكز শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। فَقَضٰى عَلَيْهِ বাক পদ্ধতিতে قضاه ও قضى عليه তখন বলা হয়, যখন কারও ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা।—(মাযহারী)

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ — এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, মূসা (আ) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তাঁর পয়গম্বরসুলভ মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গুনাহ্ সাব্যস্ত করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফির শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাফির ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং মূসা (আ)-এর সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় মূসা (আ) একে 'শয়তানের কাজ' ও গুনাহ্ কেন সাব্যস্ত করেছেন ? এর হত্যা তো বাহ্যত সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর যুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তি এরূপ ঃ যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী شروط অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফিরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন সম্পত্তি অধিকার করে নেন এবং

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফিরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পেশ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه فى شيء আবূ দাঊদের রেওয়ায়েতে এর ভাষা এরূপ ঃ اما المال فمال غدر لاحاجة لنا فيه অর্থাৎ তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান ; কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজর বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েয নয়। কেননা, এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা এক সাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরয, সে কাফির হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফিরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফিরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েয নয়। বুখারীর টীকাকার কুস্তুলানী বলেন ঃ

ان اموال المشركين ان كانت مغنومة عند القهر فلا يحل اخذها عند الامن فاذا كان الانسان مصاحبا لهم فقد امن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء واخذ المال مع ذلك غدر حرام الا ان ينبذ اليهم عهدهم على سواء -

অর্থাৎ—নিশ্চয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিন্তু শান্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফিরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোন কাফিরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয হতো না, কিন্তু হযরত মূসা (আ) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেন নি। বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার যুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবত হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। মূসা (আ) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল। কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েয ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবী ভাষায় 'আহকামুল কোরআন' —সূরা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেননা,

১৩৬২ হিজরীর ২রা রজব তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ... ... রাজিউন।

কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিন্তু পয়গম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করে না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে মূসা (আ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গুনাহ্ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।—(রূহুল-মা'আনী)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ—হযরত মূসা (আ)-এর এই বিচ্যুতি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করনার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বুঝা গেল যে, মূসা (আ) যে ইসরাইলীর সাহায্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ স্থলে مجرمين (অপরাধী) এর তফসীরে كافرين (কাফির) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, মূসা (আ) যে ইসরাইলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। মূসা (আ)-এর এই উক্তি থেকে দুইটি মাস'আলা প্রমাণিত হয় ঃ

১. মজলুম কাফির ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোন জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েয নয়। আলিমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকরিকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতে যুলুমে অংশগ্রহণ বুঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।—(রূহুল-মা'আনী) কাফির অথবা জালিমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকাহর গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত 'আহকামুল কোরআন'-এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জ্ঞানান্বেষী বিদ্বজন তা দেখে নিতে পারেন।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا

نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ

إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ
إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ
أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ
نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ
مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى
ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

(২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৩) যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করার কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখলেন, তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার ? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৪) অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। (২৫) অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, পিতঃ, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।

(২৭) পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। (২৮) মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হলো। দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মূসা [(আ) এই দোয়া করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে একদিকে রওয়ানা হলেন এবং অদৃশ্য ইঙ্গিতে] মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন যেহেতু পথ জানা ছিল না, তাই মনোবল ও মনস্তুষ্টির জন্য নিজে নিজেই বললেন, আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন (সেমতে তাই হলো এবং তিনি মাদইয়ান পৌঁছে গেলেন)। এবং যখন মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন তাতে (বিভিন্ন) লোকজনের একটি দলকে দেখলেন, তারা (কূপ থেকে তুলে তুলে জন্তুদেরকে) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা (তাদের ভেড়াগুলোকে) আগলিয়ে রাখছে। মূসা [(আ) তাদেরকে] জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল (আমাদের অভ্যাস এই যে,) আমরা আমাদের জন্তুদেরকে ততক্ষণ পানি পান করাই না, যতক্ষণ না এই রাখালরা পানি পান করিয়ে (জন্তুদেরকে) সরিয়ে নিয়ে যায়। (একে তো লজ্জার কারণে, দ্বিতীয়ত পুরুষদেরকে হটিয়ে দেওয়া আমাদের মতো অবলাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়) এবং (এই অবস্থায় আমরা আসতামও না; কিন্তু) আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (কাজের আর কোন লোকও নেই। কাজটিও জরুরী। তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে আসতে হয়।) অতঃপর (এ কথা শুনে) মূসা [(আ)-এর মনে দয়ার উদ্রেক হয় এবং তিনি] তাদের জন্যে (পানি তুলে তাদের জন্তুদেরকে) পান করালেন (এবং তাদেরকে প্রতীক্ষা ও পানি তোলার কষ্ট থেকে বাঁচালেন)। অতঃপর (আল্লাহ্র দরবারে) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (এ সময়) আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই (কম হোক কিংবা বেশি) নাযিল করবেন, আমি তার (তীব্র) মুখাপেক্ষী। (কেননা এই সফরে তিনি পানাহারের কিছুই পাননি। আল্লাহ্ তা'আলা এর এই ব্যবস্থা করলেন যে রমণীদ্বয় গৃহে পৌঁছলে পিতা তাদেরকে অস্বাভাবিক শীঘ্র চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা সমুদয় ঘটনা খুলে বলল। অতঃপর তিনি এক কন্যাকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন) মূসা (আ)-এর কাছে রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে আগমন করল; (এটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাভাবিক অবস্থা। এসে) বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদের জন্য (আমাদের জন্তুদেরকে) পানি পান করিয়েছেন, তার পুরস্কার প্রদান করেন। [কন্যা হয়তো পিতার অভ্যাস থেকে একথা জেনে থাকবে। কারণ, তার পিতা অনুগ্রহের প্রতিদান দিতেন। মূসা (আ) সঙ্গে চললেন। তবে কাজের বিনিময় গ্রহণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু এই বেগতিক অবস্থায় তিনি শান্তির জায়গা ও একজন সহৃদয় সঙ্গীর অবশ্যই প্রত্যাশী ছিলেন। ক্ষুধার তীব্রতাও যাওয়ার অন্যতম কারণ হলে

দোষ নেই। পারিশ্রমিকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আতিথেয়তার অনুরোধও নিদারুণ প্রয়োজনের সময় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে অপমানের কথা নয়। অপরের অনুরোধে আতিথেয়তা গ্রহণ করাতে তো কোন কথাই নাই। পথিমধ্যে মূসা (আ) রমণীকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে আগমন কর। আমি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। বেগানা নারীকে বিনা কারণে বিনা ইচ্ছায়ও দেখা পছন্দ করি না। মোটকথা, এভাবে তিনি বৃদ্ধের কাছে পৌঁছলেন।] অতঃপর মূসা (আ) যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি (সান্ত্বনা দিলেন এবং) বললেন, (আর) আশংকা করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। [কেননা, এই স্থানে ফিরাউনের শাসন চলত না।—(রূহুল-মা'আনী)] বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আব্বাজান, (আপনার তো একজন লোক দরকার। আমরা প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গেছি। এখন গৃহে থাকা উচিত। অতএব) আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, উত্তম চাকর সে-ই, যে শক্তিশালী (ও) বিশ্বস্ত। (তাঁর মধ্যে উভয় গুণ বিদ্যমান আছে। পানি তোলা দেখে শক্তির পরিচয় এবং পথিমধ্যে নারীকে পশ্চাতে আগমনের কথা বলা থেকে বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া গেছে। সে এ কথা তার পিতার কাছেও বর্ণনা করেছিল।) পিতা [মূসা (আ)-কে] বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। (এই বিবাহই চাকরির প্রতিদান। অর্থাৎ আট বছরের চাকরি এই বিবাহের মোহরানা।) অতঃপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা তোমার ইচ্ছা (অর্থাৎ অনুগ্রহ। আমার পক্ষ থেকে জবরদস্তি নেই।) আমি (এ ব্যাপারে) তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। (অর্থাৎ কাজ নেওয়া সময়ের অনুবর্তিতা ইত্যাদি ব্যাপারে সহজ আচরণ করব।) আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। [মূসা (আ) সম্মত হলেন এবং] বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা (পাকাপাকি) হয়ে গেল। দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাক্ষী (তাঁকে হাযির-নাযির জেনে চুক্তি পূর্ণ করা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ —শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফিরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনযিল। মূসা (আ) ফিরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশংকা বোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহুল্য, এই আশংকাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনটিরই পরিপন্থী নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা (আ)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মূসা (আ) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ —অর্থাৎ আশা করি আমার

পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই দোয়া কবূল করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন এই সফরে মূসা (আ)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এটা ছিল মূসা (আ)-এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ — مَاءِ مَدْيَنَ বলে একটি কূপকে বুঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ অর্থাৎ দুইজন রমণীকে দেখলেন তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ — خطب শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, মূসা (আ) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার ? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন ? তারা জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে ? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল ঃ (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সুন্নত। মূসা (আ) দুইজন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন। (২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোন অনর্থের আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ন হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিধ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে। (৪) এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর বর্ণনা করেছে।

فَسَقَىٰ لَهُمَا অর্থাৎ মূসা (আ) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দশজনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু মূসা (আ) একাই পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কূপ থেকে পানি

উত্তোলন করেন। সম্ভবত এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মূসা (আ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী।—(কুরতুবী)

ثُمَّ تَوَلَّى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ—মূসা (আ) সাত দিন থেকে কোন কিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خير শব্দটি কোন কোন সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ আয়াতে। কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও আসে ঃ যেমন اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ আয়াতে। আবার কোন সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য। —(কুরতুবী)

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ—কোরআনী রীতি অনুযায়ী এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ ঃ রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ি পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কন্যারা ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশত সেখানে পৌঁছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোন কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, মূসা (আ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলা বাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোয়ায়ব (আ)। যেমন এক আয়াতে আছে ঃ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا—(কুরতুবী)

اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ—বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল।

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ অর্থাৎ শোয়ায়ব (আ)-এর এক কন্যা তাঁর পিতার নিকট আরয করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ, চাকরের মধ্যে দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং দুই, বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তাঁর শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে বালিকাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোন চাকরি অথবা পদ ন্যাস্ত করার জন্য জরুরী শর্ত দুইটি ঃ হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা

হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আফসোস! এই কোরআনী পথ নির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ —অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের পিতা হযরত শোয়ায়ব (আ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিবাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সুন্নাত। উদাহরণত হযরত উমর (রা) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উসমান গনি (রা)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন।—(কুরতুবী)

হযরত শোয়ায়ব (আ) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেন নি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোন একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবূল ও সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। মূসা (আ) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বুঝা যায়। কোরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিত স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপে সংঘটিত হলো ? —(রূহুল মা'আনী, বয়ানুল কোরআন)

عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কি না, এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কোরআনের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, মোহরানার এই ব্যাপারটি মোহাম্মদী শরীয়তে জায়েয না হলেও শোয়ায়ব (আ)-এর শরীয়তে জায়েয ছিল। বিভিন্ন শরীয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কোরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়; যেমন পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি—এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে এই চাকরিকে মোহরানা করা জায়েয; যেমন আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিম্মায় জরুরী। কাজেই একে মোহরানা গণ্য করা জায়েয।—(বাদায়ে)

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোন স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানা অর্থ হাতে হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না।

আলোচ্য ঘটনায় اَنْ تَاْجُرَنِىْ শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে হতে পারে ? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে, এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি মূসা (আ) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার যিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরী হয় তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাস'আলা ঃ اُنْكِحَكَ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকাহ্‌বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবে; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোন কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ
قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ
مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ
الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ
اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا
جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۟ اِنَّكَ
مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ
غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ
مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾ وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ

لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ

إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا ۚ أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

(২৯) অতঃপর মূসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌঁছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা! আমি আল্লাহ্, বিশ্ব পালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হলো, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মূসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দুইটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আমার ভাই হারূন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মূসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং [শোয়ায়ব (আ)-এর অনুমতিক্রমে] সপরিবারে (মিসরে অথবা শামদেশে) যাত্রা করলেন, তখন (শীতের রাত্রে অজানা পথে) তিনি তূর পর্বতের দিক থেকে (একটা আলো তথা) আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা (এখানেই) অপেক্ষা কর। আমি আগুন দেখেছি (আমি সেখানে যাই) সম্ভবত আমি সেখান থেকে (পথের) কোন খবর নিয়ে আসব অথবা জ্বলন্ত

কাষ্ঠখণ্ড তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। যখন তিনি আগুনের কাছে গেলেন, তখন উপত্যকার ডান প্রান্ত হতে [যা মূসা আ-এর ডান দিক ছিল] পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাঁকে আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা, আমিই আল্লাহ্—বিশ্ব পালনকর্তা। আর(ও বলা হলো) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর (তিনি লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা সর্প হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল।) অতঃপর তিনি যখন লাঠিকে সর্পের ন্যায় হেলতে-দুলতে দেখলেন, তখন মুখ ফিরিয়ে পালাতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। (আদেশ হলো,) হে মূসা, সামনে এসো এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। (এটা ভয়ের বিষয় নয়; বরং তোমার মু'জিযা। আরেকটি মু'জিযা লও) তোমার হাত বগলে রাখ (এরপর বের কর) তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে (লাঠির রূপান্তরের ন্যায় এই মু'জিযা দেখতে যদি ভয় পাও, তবে) ভয় (দূরীকরণ) হেতু তোমার (সেই) হাত (পুনরায়) তোমার (বগলের) উপর চেপে ধর (যাতে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক ভয়ও না হয়।) এই দুইটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি (যাদের কাছে যাওয়ার আদেশ তোমাকে করা হচ্ছে) তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। মূসা (আ) বলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেননা) আমি তাদের এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলাম। কাজেই আমার ভয় হয় যে, তারা (পূর্বেই) আমাকে হত্যা করবে (ফলে, প্রচার কার্যও হতে পারবে না)। এবং (দ্বিতীয় কথা এই যে, আমার মুখও তত চালু নয়।) আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জলভাষী। আপনি তাকেও আমার সাহায্যকারী করে আমার সাথে রিসালাত দান করুন। সে আমার (বক্তব্যের) সমর্থন (বিস্তারিত ও পুরোপুরিভাবে) করবে। (কেননা) আমি আশংকা করি যে, তারা (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ) আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (তখন বিতর্কের প্রয়োজন হবে। মৌখিক বিতর্কের জন্য প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তিই অধিক উপযুক্ত।) আল্লাহ্ বললেন, (ভাল কথা) আমি এখনই তোমার ভাইকে তোমার বাহুবল করে দিচ্ছি (এক অনুরোধ এভাবে পূর্ণ হলো) এবং (দ্বিতীয় অনুরোধ সম্পর্কে বলা হলো) আমি তোমাদের উভয়কে বিশেষ প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। (সুতরাং আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা (তাদের উপর) প্রবল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ —অর্থাৎ মূসা (আ) যখন চাকরির নির্দিষ্ট আট বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মূসা (আ) আট বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ্ বুখারীতে আছে হযরত ইবনে আব্বাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরি, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে।

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ (الى) اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ—এই বিষয়বস্তু সূরা তোয়াহা ও সূরা নামলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোয়াহায় اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ সূরা নামলে نُوْدِيَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ এবং আলোচ্য সূরায় اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ বলা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় উল্লিখিত এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল—রূপক তাজাল্লী। কারণ, সত্তাগত তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে স্বয়ং মূসা (আ)-কে لَنْ تَرَانِيْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না—মানে, আমার সত্তাকে দেখতে পারবে না।

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় ঃ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ—তূর পর্বতের এই স্থানকে কোরআন পাক 'বরকতময় ভূমি' বলেছে। বলা বাহুল্য. এর বরকতময় হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র তাজাল্লী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোন গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।

ওয়াযে বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা কাম্য ঃ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا—এ থেকে জানা গেল যে, ওয়ায ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا
سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿৩৬﴾ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ
جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الظّٰلِمُوْنَ ﴿৩৭﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ
اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿৩৮﴾ وَاسْتَكْبَرَ
هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿৩৯﴾
فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿৪০﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ

الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾

(৩৬) অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌঁছল, তখন তারা বলল, এ তো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি। (৩৭) মূসা বলল, আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন, যে তাঁর নিকট থেকে হিদায়াতের কথা নিয়ে আগমন করেছে, এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয় জালিমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফিরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, জালিমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করত। কিয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (৪২) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মূসা (আ) তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন, তখন তারা (মু'জিযাসমূহ দেখে) বলল, এ তো এক জাদু, যা (মিছামিছি আল্লাহ্‌র প্রতি) আরোপ করা হচ্ছে (যে, এটা তাঁর পক্ষ থেকে মু'জিযা ও রিসালাতের প্রমাণ)। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের কালে এরূপ কথা কখনও শুনিনি। (মূসা (আ) বললেন, (বিশুদ্ধ প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাতে কোন সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করতে না পারার পরও যখন মান না তখন এটা হঠকারিতা। এর সর্বশেষ জওয়াব এই যে,) আমার পালনকর্তা সম্যক অবগত আছেন যে, তাঁর কাছ থেকে কে সত্য ধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কার পরিণতি এ জগত (দুনিয়া) থেকে শুভ হবে। নিশ্চয় জালিমরা (যারা হিদায়াত ও সত্য ধর্মে কায়েম নয়) কখনও সফলকাম হবে না। [কেননা, তাদের পরিণাম শুভ হবে না। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কে হিদায়াতপ্রাপ্ত, কে জালিম এবং কার পরিণাম শুভ, কার পরিণাম ব্যর্থতা। সুতরাং মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের অবস্থা ও পরিণতি প্রকাশ পাবে। এখন না মানলে তোমরা জান। মূসা (আ)-এর নিদর্শনাবলী দেখে ও শুনে] ফিরাউন (আশংকা করল যে, তার ভক্তবৃন্দ নাকি মূসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই সে সবাইকে একত্রিত করে) বলল, হে

পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। (এরপর বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তার উযিরকে বলল, যদি এতে তাদের মনে শান্তি না আসে, তবে) হে হামান, তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও অতঃপর (এই পাকা ইট দ্বারা) আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর, যাতে আমি (তাতে উঠে) মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। (আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য আছে—মূসার এই দাবিতে) আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে রেখেছিল এবং তারা মনে করত যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতঃপর (এই অহংকারের শাস্তি-স্বরূপ) আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম (অর্থাৎ নিমজ্জিত করে দিলাম) অতএব দেখ, জালিমদের পরিণতি কি হয়েছে! (মূসা (আ)-এর এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পেল যে, مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ আমি তাদেরকে এমন নেতা করেছিলাম, যারা (মানুষকে) জাহান্নামের দিকে আহবান করত এবং (এ কারণেই) কিয়ামতের দিন (অসহায় হয়ে পড়বে) তাদের কোন সহায় থাকবে না। (তারা ইহকালে ও পরকালে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। সেমত) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিনও তারা দুর্দশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ—ফিরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উযির হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ, কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফিরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফিরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পর আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফিরাউনের হাজারো সিপাহী এর নিচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে।—(কুরতুবী)

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কুফরী কাজকর্ম বুঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র)-এর সুচিন্তিত অভিমত। (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কুফর যুলুমের কর্মসমূহ সর্প, বিচ্ছু এবং নানারকম আযাবের আকৃতি

ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও যুলুমের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও যুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে; উদাহরণত ঃ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا আয়াতে এবং مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ আয়াতে।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ — مقبوح শব্দের বহুবচন مَقْبُوْحِيْنَ অর্থাৎ বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ

اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

(৪৩) আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছি মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমত, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৪৪) মূসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মূসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমত স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা স্মরণ রাখে।(৪৭) আর এজন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন ? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (৪৮) অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রাসূলকে সেরূপ দেয়া হলো না কেন? পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি ? তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাত্ম। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কিতাব আন, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি, যাতে তারা অনুধাবন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত জরুরী বিধায় চিরকালই পয়গম্বর প্রেরণ করা

হয়েছে। সে মতে) আমি মূসা (আ)-কে (যার কাহিনী এইমাত্র বর্ণিত হলো) পূর্ববর্তী উম্মতদের অর্থাৎ কওমে নূহ, আদ ও সামূদের) ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর (যখন সে সময়কার পয়গম্বরগণের শিক্ষা দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তারা হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল) কিতাব অর্থাৎ তওরাত দিয়েছি, যা মানুষের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমত ছিল, তাতে তারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। (সত্যান্বেষীর প্রথমে বোধ শক্তি সঠিক হয়। এটা অন্তর্জ্ঞান। এরপর সে বিধানাবলী কবূল করে। এটা হিদায়াত। এরপর হিদায়াতের ফল অর্থাৎ নৈকট্য ও কবূল দান করা হয়। এটা রহমত। এমনিভাবে যখন এই যুগও শেষ হয়ে গেল এবং মানুষ পুনরায় হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল, তখন আমি আমার চিরন্তন রীতি অনুযায়ী আপনাকে রাসূল করেছি। এর প্রমাণাদির মধ্যে একটি হচ্ছে মূসা (আ)-এর ঘটনার নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করা। কেননা, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য জ্ঞানলাভের কোন-না-কোন উপায় জরুরী। এরূপ উপায় চারটিই হতে পারে। ১. বুদ্ধিগত বিষয়াদির মধ্যে বুদ্ধি। মূসা (আ)-এর ঘটনা বুদ্ধিগত বিষয় নয়। ২. ইতিহাসগত বিষয়াদির মধ্যে জ্ঞানীদের কাছ থেকে শ্রবণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্ঞানীদের সাথে উঠাবসা, মেলামেশা ও জ্ঞানচর্চা করেননি। কাজেই এই উপায়ও অনুপস্থিত। ৩. প্রত্যক্ষ দর্শন। এটা অনুপস্থিত, তা বলাই বাহুল্য। সেমতে এটা জানা কথা (যে,) আপনি (তূর পর্বতের) পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মূসা (আ)-কে বিধানাবলী দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তওরাত দিয়েছিলাম)। তাদের মধ্যেও ছিলেন না, যারা (সেই যুগে) বিদ্যমান ছিল। (সুতরাং প্রত্যক্ষ দর্শনের সম্ভাব্যতা রহিত হয়ে গেল); কিন্তু (ব্যাপার এই যে,) আমি [মূসা (আ)-এর পর] অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। (ফলে বিশুদ্ধ জ্ঞান আবার দুর্লভ হয়ে পড়ে এবং মানুষ পুনরায় হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়। মাঝে মাঝে পয়গম্বরগণ আগমন করেছেন বটে; কিন্তু তাঁদের শিক্ষাও এমনিভাবে দুর্লভ হয়ে যায়। তাই আমি স্বীয় রহমত আপনাকে ওহী ও রিসালাত দ্বারা ভূষিত করেছি। এটা নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চতুর্থ উপায়। অন্যান্য উপায় দ্বারা ধারণাগত জ্ঞান অর্জিত হয়, যা এখানে আলোচ্য বিষয়ই নয়। কেননা, আপনার পরিবেশিত সংবাদসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অকাট্য। সারকথা এই যে, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চারটি উপায়ের মধ্য থেকে তিনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে অনুপস্থিত। সুতরাং চতুর্থটিই নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং এটাই কাম্য। আপনি যেমন তওরাত প্রদান প্রত্যক্ষ করেননি, এর পরও বিশুদ্ধ ও নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করছেন, এমনিভাবে আপনি মূসা (আ)-এর মাদইয়ানে অবস্থানও দেখেননি। সেমতে এটা জানা কথা যে,) আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না যে, আপনি (সেখানকার অবস্থা দেখে সেই অবস্থা সম্পর্কে) আমার আয়াতসমূহ (আপনার সমসাময়িক) লোকদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছেন; কিন্তু আমিই (আপনাকে) রাসূল করেছি। (রাসূল করার পর এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছি। এমনিভাবে) আপনি তূর পর্বতের (পশ্চিম) পার্শ্বে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি [মূসা (আ)-কে] আওয়াজ দিয়েছিলাম (যে, يَامُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ—এটা ছিল তাঁকে নবুয়ত দান করার সময়।) কিন্তু (এ বিষয়ের জ্ঞানও এমনিভাবে অর্জিত হয়েছে যে,) আপনি আপনার

পালনকর্তার রহমতস্বরূপ নবী হয়েছেন, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমসাময়িক লোকেরা বরং তাদের নিকটতম পূর্বপুরুষগণ কোন পয়গম্বর দেখেনি, যদিও শরীয়তের কোন কোন বিধান বিশেষত, তাওহীদ পরোক্ষভাবে তাদের কাছেও পৌছেছিল। সুতরাং وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا আয়াতের সাথে কোন বৈপরীত্য রইল না।) আর (তারা সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারে যে, পয়গম্বর প্রেরণের মধ্যে আমার কোন উপকার নেই; বরং উপকার তাদেরই। তারা ভাল মন্দ সম্পর্কে অবগত হয়ে শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারে। নতুবা যেসব মন্দ বিষয় জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, সেগুলোর জন্য পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতিরেকেও শাস্তি হওয়া সম্ভবপর ছিল; কিন্তু তখন তারা পরিতাপ করত যে হায়! রাসূল আগমন করলে আমরা অধিক সতর্ক হতাম এবং এই বিপদের সম্মুখীন হতাম না; তাই রাসূলও প্রেরণ করেছি, যাতে এই অনুতাপ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। নতুবা সম্ভাবনা ছিল যে,) আমি রাসূল নাও পাঠাতাম, যদি এরূপ না হতো যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য (যা মন্দ হওয়া বোধগম্য) তাদের কোন বিপদ (দুনিয়াতে অথবা পরকালে) হলে (যার সম্পর্কে বুদ্ধি অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে তারা নিশ্চিত জানতে পারত যে, এটা কৃতকর্মের শাস্তি) তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার বিধানসমূহের অনুসরণ করতাম এবং (বিধানাবলী ও পয়গম্বরের প্রতি) বিশ্বাসী হতাম। অতঃপর (এর দাবি ছিল এই যে, রাসূলের আগমনকে তারা সুযোগ মনে করত এবং সত্য ধর্ম কবূল করে নিত; কিন্তু তাদের অবস্থা হয়েছে এই যে,) যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (অর্থাৎ সত্য রাসূল ও সত্য ধর্ম) আগমন করল, তখন (তাতে আপত্তি তোলার জন্য) তারা বলল, মূসা (আ)-কে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ কিতাব কেন দেওয়া হলো না (অর্থাৎ তওরাতের মত কোরআন এক দফায় নাযিল হলো না কেন ? এরপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) পূর্বে মূসা (আ)-কে যা (অর্থাৎ যে কিতাব) দেওয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি ? [সেমতে জানা কথা যে, মুশরিকরা মূসা (আ) এবং তওরাতকে মানত না। কারণ, তারা নবুয়তই মানত না।] তারা তো (কোরআন ও তওরাত উভয়টি সম্পর্কে) বলে, উভয়ই জাদু পরস্পরে একাত্ম। (একথা বলার কারণ এই যে, মূলনীতির ক্ষেত্রে উভয় কিতাবই একমত।) তারা আরও বলে আমরা উভয়কে মানি না। (এটাই তাদের উক্তি হোক কিংবা তাদের উক্তির অপরিহার্য উদ্দেশ্য হোক এবং তারা একসাথে উভয়কে অস্বীকার করুক কিংবা বিভিন্ন উক্তির সমাহার হোক সর্বাবস্থায় এ (থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই সন্দেহের উদ্দেশ্য তওরাতের সাথে মিল থাকা অবস্থায় কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করা নয়; বরং এটাও একটা অপকৌশল ও দুষ্টামি। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে ঃ হে মুহাম্মদ,) আপনি বলুন , তোমরা (এই দাবিতে) সত্যবাদী হলে আল্লাহ্র কাছ থেকে (তাওরাত ও কোরআন ছাড়া) কোন কিতাব আনয়ন কর, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (অর্থাৎ উদ্দেশ্য তো সত্যের অনুসরণ। সুতরাং আল্লাহ্র কিতাবাদিকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে এগুলোর অনুসরণ কর। কোরআনের সর্বাবস্থায় এবং তওরাতের তাওহীদ ও

মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদের ক্ষেত্রে অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস না করলে তোমরাই কোন সত্য পেশ কর এবং তাকে সত্যরূপে প্রমাণ কর। একে اَهْدٰى 'উত্তম পথ প্রদর্শক' বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, সত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিদায়াতের উপায় হওয়া। যদি তোমরা প্রমাণ করে দাও, তবে আমি তার অনুসরণ করব। মোটকথা, আমি সত্য প্রমাণ করলে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা সত্য প্রমাণ করলে আমি তার অনুসরণ করতে সম্মত আছি।) অতঃপর (এই কথার পর) তারা যদি আপনার (فَأْتُوْا بِكِتَابٍ) কথায় সাড়া না দেয়, (এবং সাড়া দিতে পারবেও না ; যেমন فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا আয়াতে বলা হয়েছে এবং এরপরও আপনাকে অনুসরণ না করে,) তবে জানবেন, (এসব সন্দেহের উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ নয় ; বরং) তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (তাদের প্রবৃত্তি বলে দেয় যে, যেভাবেই হোক অস্বীকারই করা উচিত। সুতরাং তারা তাই করেছে।) তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন প্রমাণ ছাড়াই নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা (এমন) জালিম সম্প্রদায়কে (যারা সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পর বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়াই পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত হয় না) পথ প্রদর্শন করেন না। (এর কারণ এই ব্যক্তির স্বয়ং পথভ্রষ্ট থাকতে ইচ্ছুক হওয়া। ইচ্ছার পর কাজ সৃষ্টি করা আল্লাহ্র রীতি। ফলে, এরূপ ব্যক্তি সর্বদা পথভ্রষ্ট থাকে। এ পর্যন্ত তাদের لَوْلَا اُوْتِىَ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ مُوْسٰى উক্তির পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে জওয়াব ছিল। অতঃপর বাস্তবভিত্তিক জওয়াব হচ্ছে, যাতে কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ না হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এই কালাম (অর্থাৎ কোরআন) তাদের কাছে সময়ে সময়ে একের পর এক প্রেরণ করেছি, যাতে তারা (বারবার নতুন শুনে) উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ আমি এক দফায় নাযিল করতেও সক্ষম ; কিন্তু তাদেরই উপকারার্থে অল্প অল্প নাযিল করি। এ কেমন কথা যে, তারা নিজেদেরই উপকারের বিরোধিতা করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ 'পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নূহ, হূদ, সালেহ্ ও লূত (আ)-এর সম্প্রদায়সমূহকে বুঝানো হয়েছে। তারা মূসা (আ)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بصائر শব্দটি بصيرة এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। بَصَائِرَ لِلنَّاسِ এখানে ناس শব্দ দ্বারা মূসা (আ)-এর উম্মত বুঝানো হলে তাতে কোন খটকা নেই। কারণ, সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোক বর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি ناس শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বুঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে ? এ ছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত

যে, হযরত উমর ফারুক (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ। তওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্য ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কোরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কোরআনের পূর্ণ হিফাযতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত আল্লাহ্র গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেইসব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলিম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ—এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ, নবী (সা) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ "إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ" অর্থাৎ এমন কোন উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহ্র কোন পয়গম্বর আসেননি। এই ইরশাদ, আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে হযরত ইসমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোন নবী আসেননি। কিন্তু নবী-রাসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ — وصلنا শব্দটি توصيل থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরও সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে একের পর এক হিদায়াত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়।

তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি ঃ এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌঁছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের

অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মশক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোন সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। আজকালও যাঁরা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাঁদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

---

(৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫৪) তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫) তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[তওরাত ও ইনজীলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত আছে। জ্ঞানীগণ কর্তৃক এইসব সুসংবাদের সত্যায়ন দ্বারাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত হয়। সেমতে] কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে (খোদায়ী) কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ) তারা এতে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিশ্চয় এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) সত্য। আমরা তো এর (আগমনের) পূর্বেও (আমাদের কিতাবের সুসংবাদের ভিত্তিতে) একে মানতাম। (এখন অবতীর্ণ হওয়ার পর নতুনভাবে অঙ্গীকার করছি। অর্থাৎ আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তো

একে সত্য বলে বিশ্বাস করত, বরং এর আগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক ছিল; কিন্তু যখন আগমন করল, তখন অস্বীকার করে বসল। فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ-এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, তওরাত ও ইনজীলের সুসংবাদসমূহের প্রতীক রাসূলুল্লাহ্ (সা) ই ছিলেন; যেমন সূরা আশ-শু'আরার শেষে বলা হয়েছে ঃ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ অতঃপর আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে যারা ঈমানদার, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হচ্ছেঃ) তাদেরকে তাদের দৃঢ়তার কারণে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। (কেননা তারা পূর্ববর্তী কিতাবে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথেও কোরআনে বিশ্বাসী ছিল এবং অবতীর্ণ হওয়ার পরেও এতে অটল রইল এবং এর নবায়ন করল। এ হচ্ছে তাদের বিশ্বাস ও প্রতিদানের বর্ণনা। অতঃপর তাদের কর্ম ও চরিত্র বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তারা ভাল (ও সহনশীলতা) দ্বারা মন্দ (ও কষ্ট প্রদান)-কে প্রতিহত করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে। (তারা যেমন কার্যত কষ্টের ক্ষেত্রে সবর করে, তেমনি) তারা যখন (কারও কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে) অর্থহীন-বাজে কথাবার্তা শোনে, (যা উক্তিগত কষ্ট) তখন একে (ও) এড়িয়ে যায় এবং (নিরীহ আচরণ প্রদর্শনার্থে) বলে, (আমরা জওয়াব দেই না) আমাদের কাজ আমাদের সামনে আসবে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের সামনে, (ভাই) আমরা তো তোমাদেরকে সালাম করি। (আমাদেরকে ঝগড়া থেকে নিরাপদ রাখ।) আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ—এই আয়াতে সেই সব আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইনজীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হলো, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হলো না। তারা যখন সাহাবায়ে-কিরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে-কিরামের জন্য অর্থ-সম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ থেকে وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। (মাযহারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রা) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খ্রিস্টান এবং তওরাত ও ইনজীল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত।—(মাযহারী)

'মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মোহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব উম্মতের জন্য ব্যাপক ?
اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলিমগণ বলল, আমরা তো কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ (অনুগত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কোরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই 'ইসলাম' ও 'মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মোহাম্মাদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মোহাম্মাদীর বিশেষ উপাধি নয়; বরং সব পয়গম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ এই উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি স্বয়ং কোরআনেই আছে যে ঃ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ আল্লামা সুয়ূতী এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্য বিশেষ উপাধি—এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদির উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও উমরের উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন। (هذا ماسنح لى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ—অর্থাৎ আহলে কিতাবের মু'মিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। কোরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্রা ভার্যাগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ—সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্য দুইবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (২) যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করে। (৩) যার মালিকানায় কোন বাঁদী ছিল। এই বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্য জায়েয ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি ? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল যেহেতু দুইটি, তাই তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মু'মিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য ও মহব্বত রাসূল হিসাবেও করেন এবং স্বামী হিসাবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য। বাঁদীকে মুক্ত

করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্য ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মু'মিন অথবা পবিত্রাগণের কোন বৈশিষ্ট্য নাই : বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু পুরস্কার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কোরআনিক বিধি لَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসাবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাযের দ্বিগুণ, রোযা, সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল أَجْرَيْنِ। কিন্তু কোরআন এর পরিবর্তে বলেছে أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুইবার লেখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই সওয়াব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রোযার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন ? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোন-না-কোন দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলিম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য بِمَا صَبَرُوا এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ।

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ—অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভাল বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গুনাহ্ বুঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে বলেন ঃ أَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُهَا অর্থাৎ গুনাহ্‌র পর নেক কাজ কর। নেক কাজ গুনাহ্‌কে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এগুলো ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে ঃ প্রথম, কারও দ্বারা কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গুনাহের

কাফফারা হয়ে যাবে ; যেমন উপরে মুয়াযের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ দেওয়া জায়েয আছে; কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর।ইহকাল ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ —অর্থাৎ মন্দ ও যুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর (যুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর)। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ —অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শুনে, তখন তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্‌সাস বলেন, সালাম দুই প্রকার। এক. মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই.সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নিব না। এখানে এই অর্থই বুঝানো হয়েছে।

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

---

(৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারলেন না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারেন না ; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন। (অন্য কেউ হিদায়াত করতে সামর্থ্যবান হওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ এ কথা জানেও না যে, কে কে হিদায়াত পাবে। বরং) যারা হিদায়াত পাবে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের সম্পর্কে জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'হিদায়াত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. শুধু পথ দেখানো। এর জন্য জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই যাবে। দুই পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বরং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ছিলেন এবং হিদায়াত যে তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা এই হিদায়াতই ছিল, তাঁদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের

ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুয়ত ও রিসালতের বর্তব্য পালন করবেন কিরূপে ? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিদায়াতের উপর ক্ষমতাশালী নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হিদায়াত বুঝানো হয়েছে : অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাকে মু'মিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। হিদায়াতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ অলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতৃব্য আবূ তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপে ইসলাম গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, কাউকে মু'মিন-মুসলমান করে দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে আছে, আবূ তালিবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা আছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۭ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ
لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى إِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ
فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا ۭ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ أُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ
شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ۭ
أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع

(৫৭) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ 'হারম' প্রতিষ্ঠিত করিনি ? এখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিক স্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন

যাপনে মদমত্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘরবাড়ি। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। (৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা যুলুম করে। (৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বেশ দূর থেকে কাফিরদের ঈমান না আনার কথা বলা হয়েছিল। কাফিররা তাদের ঈমান আনার পথে যেসব বিষয়কে প্রতিবন্ধক মনে করত, আলোচ্য আয়াতসমূহে সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত একটি প্রতিবন্ধকের বর্ণনা এই যে,) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথী হয়ে (এই ধর্মের) হিদায়াত অনুসরণ করি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অচিরেই উৎখাত হব। (ফলে প্রবাস জীবনের ক্ষতিও হবে এবং জীবিকার ব্যাপারেও পেরেশানী হবে। কিন্তু এই অজুহাতের অসারতা সুস্পষ্ট) আমি কি তাদেরকে নিরাপদ হারমে স্থান দেইনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় যা আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ আমার কুদরতেও জীবিকা দানস্বরূপ) আহারের জন্য পেয়ে থাকে? (সুতরাং সবার কাছে সম্মানিত হারম হওয়ার ক্ষতির কোন আশংকা নেই এবং এ কারণে রিযিক বিলুপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এই অবস্থাকে তাদের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ঈমান আনা উচিত ছিল।) কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না (অর্থাৎ এর প্রতি লক্ষ্য করে না।) এবং (স্বাচ্ছন্দ্যশীল জীবন নিয়ে গর্বিত হওয়া তাদের ঈমান না আনার অন্যতম কারণ। কিন্তু এটাও নির্বুদ্ধিতা। কেননা,) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ নিয়ে মদমত্ত ছিল। অতএব (দেখে নাও) এগুলো এখন তাদের ঘরবাড়ি। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যক্ষণই বসবাস করেছে। (কোন পথিক ঘটনাক্রমে এদিকে এসে গেলে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অথবা তামাশা দেখার জন্য অল্পক্ষণ বসে যায় কিংবা রাত্রি অতিবাহিত করে যায়।) অবশেষে (তাদের এসব বাড়িঘরের) আমিই মালিক রয়েছি। (তাদের কোন বাহ্যিক উত্তরাধিকারীও হলো না) আর তাদের আরেক সন্দেহ এই যে, কুফরের কারণে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে আমরা দীর্ঘদিন যাবত কুফর করছি। আমাদেরকে ধ্বংস করা হয়নি কেন? অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ الخ—এই কারণে তারা ঈমান আনে না। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে,) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে (প্রথম বারেই) ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত (জনপদসমূহের কেন্দ্রস্থলে কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং (পয়গম্বর প্রেরণ করার পরেও তৎক্ষণাৎ) আমি জনপদসমূহকে ধ্বংস করি না ; কিন্তু যখন তার বাসিন্দারা খুবই যুলুম করে। (অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত বারবার উপদেশ দানের পরেও উপদেশ গ্রহণ না করে, তখন আমি ধ্বংস করে দেই। উপরে যেসব জনপদ ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে, তারাও এই আইন অনুযায়ী

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এই আইনদৃষ্টেই তোমাদের সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই রাসূল আগমনের পূর্বেও ধ্বংস করিনি এবং রাসূল আগমনের পরেও এখন পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হোক ; তোমাদের এই হঠকারিতা অব্যাহত থাকলে শাস্তি অবশ্যই হবে। সেমতে বদর ইত্যাদি যুদ্ধে হয়েছে। ঈমান না আনার আরেক কারণ এই যে, দুনিয়া নগদ, তাই কাম্য এবং পরকাল বাকি, তাই কাম্য নয়। দুনিয়ার কামনা থেকে অন্তর মুক্ত হয় না যে, তাতে পরকালের কামনা স্থান পেতে পারে এবং তা অর্জনের পন্থা স্বরূপ ঈমানের চেষ্টা করা হবে। অতএব দুনিয়ার ব্যাপারে শুনে রাখ) যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা (ক্ষণস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয় (জীবন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এরও সমাপ্তি ঘটবে) আর যা (অর্থাৎ যে পুরস্কার ও সওয়াব) আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা বহুগুণে (এ থেকে অবস্থার দিক দিয়ে) উত্তম এবং (পরিমাণের দিক দিয়েও) বেশি (অর্থাৎ চিরকাল) স্থায়ী (অতএব তোমরা কি (এই পার্থক্যকে অথবা এই পার্থক্যের দাবিকে) বুঝ না? (মোটকথা, তোমাদের ওযর এবং কুফরকে আঁকড়িয়ে থাকা সবই ভিত্তিহীন ও অসার। কাজেই বুঝ এবং মান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا—অর্থাৎ হারিস ইবনে উসমান প্রমুখ মক্কার কাফির তাদের ঈমান কবূল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি ; কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে।—(নাসায়ী) কোরআন পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে ঃ

(১) اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ—অর্থাৎ তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হিফাযতের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হারমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোরতর হারাম। হারমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। অতএব, যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবূল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহইয়া ইবনে-সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হারমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া রিযিক স্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হলো না, উল্টা ভয় হলো আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে।—(কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে হারমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) এটা শান্তির আবাসস্থল, (২) এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মক্কার হারমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানী হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন ঃ মক্কা মুকাররমা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ গৃহের জন্য সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো কোন কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে পনেরো লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবারাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরি খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثمرات শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলার ঃ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَجَرٍ — এর পরিবর্তে ثمرات كل شيء বলার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, ثمرات শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয় ; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন। মিল-কারখানায় নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার ثمرات তথা উৎপাদন। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, মক্কার হারমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানী হবে না ; বরং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই বোধ হয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফিরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশংকা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে—এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়।

(২) এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই ঃ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাড়ি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশংকার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর!

(৩) তৃতীয় জওয়াব এই ঃ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا — এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কবূল করার ফলে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী--দ্রুত

নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধন ও নিয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا—অর্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহ্র আযাব দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য'-এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-এর অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে, যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে জিরিয়ে নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا — ام। শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। امها-এর সর্বনাম দ্বারা قرى বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রাসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌঁছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌঁছার পর যখন লোকেরা তা কবূল করে না, তখন জনপদসমূহের উপর আযাব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে ; এ কারণেই কোন বড় শহরে রাসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌঁছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহ্র পয়গাম কবূল করা ফরয হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আযাব নেমে আসাই ছিল স্বভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার ওযর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এজন্যে রমযান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকাহ্বিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরী। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী না করা পর্যন্ত জরুরী হবে না।—(ফতোয়া গিয়াসিয়া)

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ—অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরীয়তসম্মত প্রাপক হবে—যারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা, বুদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাস'আলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (৬১) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ
شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (৬২) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا
هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوا
إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (৬৩) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (৬৪) وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (৬৫) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (৬৬) فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (৬৭)

(৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিন অপরাধীরূপে হাযির করা হবে? (৬২) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়ায দিয়ে বলবেন,

তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবি করতে, তারা কোথায়? (৬৩) যাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা। এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করত না। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহবান কর। তখন তারা ডাকবে। অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথপ্রাপ্ত হতো! (৬৫) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর সে কিয়ামতের দিন ঐ সকল লোকের মধ্যে হবে যাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হবে? (প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে মু'মিন। তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে কাফির, যে অপরাধীরূপে হাযির হবে। পার্থিব ভোগ-সম্ভারই কাফিরদের ভ্রান্তির কারণ, তাই তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা উভয় ব্যক্তির সমান না হওয়ায় আসল কারণ এই যে শেষোক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনা হবে এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করবে। অতঃপর এই পার্থক্য ও গ্রেফতার করে হাযির করার বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে, সেই দিনটি স্মরণীয়,) যে দিন আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (অর্থাৎ শয়তান। শয়তানের অনুসরণে তারা শেরেকী করত। তাই তাদেরকে শরীক বলা হয়েছে। একথা শুনে শয়তানরা অর্থাৎ) যাদের জন্য (মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কারণে) আল্লাহ্র (শাস্তি) বাণী (অর্থাৎ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) অবধারিত হয়ে গেছে, তারা (ওযর পেশ করে) বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম (এটা জওয়াবের ভূমিকা। এই ঘটনা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা যাদের সুপারিশ আশা করত, তারাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা পথভ্রষ্ট করেছি ঠিকই ; কিন্তু) আমরা তাদেরকে এমনি (অর্থাৎ জোরজবরদস্তি না করে) পথভ্রষ্ট করেছি, যেমন আমরা নিজেরা (জোর জবরদস্তি ছাড়া) পথভ্রষ্ট হয়েছি। (অর্থাৎ আমরা যেমন স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছি, কেউ আমাদেরকে এজন্য বাধ্য করে নি ; তেমনিভাবে তাদের উপর আমাদের কোন স্বেরাচারী কর্তৃত্ব ছিল না। আমাদের কাজ ছিল শুধু বিভ্রান্ত করা। এরপর তারা তাদের মত ও ইচ্ছায় তা কবূল করেছে ; যেমন সূরা ইবরাহীমে আছে : وَمَاكَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ—উদ্দেশ্য এই যে, আমরা অপরাধী বটে ; কিন্তু তারাও নিরাপরাধ নয়।) আমরা আপনার সামনে তাদের (সম্পর্ক) থেকে মুক্ত হচ্ছি। তারা

(প্রকৃতপক্ষে কেবল) আমাদেরই ইবাদত করত না (অর্থাৎ তারা যখন স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন তারা প্রবৃত্তিপূজারীও হলো শুধু শয়তানপূজারী নয়। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যাদের উপর ভরসা করত, তারা কিয়ামতের দিন তাদের তরফ থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। যখন শরীকরা এভাবে তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তখন মুশরিকদেরকে) বলা হবে, (এখন) তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাক। তারা (বিস্ময়াতিশয্যে অস্থির হয়ে) তাদেরকে ডাকবে। অতঃপর তারা জওয়াবও দেবে না এবং (তখন) তারা স্বচক্ষে আযাব দেখবে। হায়, তারা যদি দুনিয়াতে সৎপথে থাকত! (তবে এই বিপদ দেখত না।) সেদিন আল্লাহ্ কাফিরদের ডেকে বলবেন, তোমরা পয়গম্বরগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? সেদিন তাদের (মন) থেকে সব বিষয়বস্তু উধাও হয়ে যাবে এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি (কুফর ও শিরক থেকে দুনিয়াতে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আশা করা যায় যে, পরকালে সে সফলকাম হবে (এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরের ময়দানে কাফির ও মুশরিদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যে সব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি ; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং শয়তানের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই ; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী ; কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হিদায়াতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবূল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওযর নয়।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ

الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۤءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿۷۱﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ

اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ

يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

(৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। (৬৯) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (৭০) তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭১) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? (৭২) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে , যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার পালনকর্তা (এককভাবে পূর্ণতা গুণে গুণান্বিত। সেমতে তিনি) যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন (কাজেই সৃষ্টিগত ক্ষমতা তাঁরই) এবং যে বিধানকে ইচ্ছা পছন্দ করেন (এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং আইন জারির ক্ষমতাও তাঁরই।) তাদের (আইন জারির) কোন ক্ষমতা নেই (যে, যে আইন ইচ্ছা জারি করবে ; যেমন মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে শিরককে বৈধ আইন মনে করছে। এই বিশেষ ক্ষমতা থেকে প্রমাণিত হলো যে,) আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। (কারণ, তিনি যখন এককভাবে স্রষ্টা ও বিধানদাতা, তখন ইবাদতেরও তিনি একাই যোগ্য। কেননা উপাস্য সে-ই হতে পারে, যে সৃষ্টি ও বিধান দান—উভয়েরই ক্ষমতা রাখে।) আপনার পালনকর্তা (এমন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী যে, তিনি) জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (অন্য কারও এমন জ্ঞান নেই। এ থেকেও তাঁর একত্ব প্রমাণিত হয়। অতঃপর তাই বলা হয়েছে ঃ) তিনিই (পূর্ণতা গুণে গুণান্বিত) আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তিনিই প্রশংসার যোগ্য। (কেননা উভয় জাহানে তাঁর কাজকর্ম তাঁর সর্বগুণে গুণান্বিত ও প্রশংসার যোগ্য হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। তাঁর রাজ্য

শাসনক্ষমতা এমন যে,) রাজত্বও (কিয়ামতে) তাঁরই হবে। (তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তি ও পরিধি এত ব্যাপক যে,) তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (বেঁচে যেতে পারবে না বা কোথাও আশ্রয় নিতে পারবে না। তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশের জন্য) আপনি বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? (সুতরাং ক্ষমতায়ও তিনি একক।) তোমরা কি তাওহীদের এমন পরিষ্কার প্রমাণাদি) শ্রবণ কর না? (এই ক্ষমতা প্রকাশের জন্যই) আপনি (এর বিপরীত দিক সম্পর্কে) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে। তোমরা কি (কুদরতের এই প্রমাণ) দেখ না? (কুদরত একক হওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, উপাস্যতায়ও তিনি একক।) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম কর ও দিবা ভাগে রুযী অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা (এ উভয় নিয়ামতের কারণে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (অতএব অনুগ্রহেও তিনি একক। এটাও উপাস্যতায় একক হওয়ার প্রমাণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ—এই আয়াতের এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, يَخْتَارُ এর অর্থ বিধান জারির ক্ষমতা। আল্লাহ্ তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহ্র কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়্যুম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, يَخْتَارُ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ—অর্থাৎ এই কোরআন আরবের দুইটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হতো। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্ট জগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ্র ইচ্ছা ঃ হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি উদ্ধার করেছেন। তা এই যে দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয় ; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার

ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্‌রাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণকে অন্য পয়গম্বরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণের উপর, ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরকে সমগ্র মানব জাতির উপর, কুরায়শকে তাদের সবার উপর মুহাম্মদ (সা)-কে সব বনী হাশিমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করাও আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দুইটি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎ কর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর, অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব, অতঃপর উসমান গনী ও আলী মুর্তযা (রা)-এর ক্রমকে উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা, এই বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। "বো'দিত তাফসীল লি মাসআলাতিত তাফসীল" নামে বর্তমান লেখক এর উর্দু তর্জমা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে ও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিষয়টি সুধীবর্গের জন্য রুচিকর। তাঁরা সেখানে দেখে নিতে পারেন।

اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ ط اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ অর্থাৎ রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِضِيَاءٍ বলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোকে যে উত্তম, তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়, বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে

বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে। أَفَلَا تَسْمَعُونَ এবং রাত্রির ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تُبْصِرُونَ বলা হয়েছে।এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই أَفَلَا تَسْمَعُونَ বলা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই أَفَلَا تُبْصِرُونَ বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

(৭৪) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহ্র এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, (যাতে সবাই তাদের লাঞ্ছনা শুনে নেয়) যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (প্রমাণ পূর্ণ করার জন্য তাদের স্বীকার করে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু বিষয়টিকে আরও জোরদার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দাঁড় করানো হবে এভাবে যে,) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি এক-একজন সাক্ষীও বের করে আনব (অর্থাৎ পয়গম্বরগণকে, তাঁরা তাদের কুফরের সাক্ষ্য দেবেন।) অতঃপর আমি (মুশরিকদেরকে) বলব, (এখন শিরকের দাবির পক্ষে) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা (চাক্ষুষ) জানতে পারবে যে, আল্লাহ্র কথাই সত্য ছিল (যা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে বলা হয়েছিল এবং শিরকের দাবি মিথ্যা ছিল।) তারা (দুনিয়াতে) যেসব কথাবার্তা গড়ত, (আজ) সেগুলোর কোন পাত্তা থাকবে না (কেননা সত্য প্রকাশের সাথে মিথ্যা উধাও হয়ে যাওয়া অবধারিত)।

জ্ঞাতব্য ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে مَاذَا أَجَبْتُمْ বলে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তোমরা পয়গম্বরগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? এখানে স্বয়ং পয়গম্বরগণ দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ানো উদ্দেশ্য। কাজেই একই প্রশ্ন বারবার করা হয়নি।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ
مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا
تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن
قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن
ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا
كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ
عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

(৭৬) কারুন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না,

আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধনসম্পদে অধিক প্রাচুর্যশালী? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (৭৯) অতঃপর কারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান (৮০) আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী। (৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করেত পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যূষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফিররা সফলকাম হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কারূন (-এর অবস্থা দেখ, কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে তার কি ক্ষতি হয়ে গেল! তার ধন-সম্পত্তি তার কোন উপকারে আসল না ; বরং সাথে সাথে তার ধন-সম্পত্তিও বরবাদ হয়ে গেল। তার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই ঃ সে) মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। [বরং তাঁর চাচাত ভাই ছিল (দুররে মনসূর)। অতঃপর সে (ধন-সম্পদের আধিক্য হেতু) তাদের প্রতি অহংকার করতে লাগল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (চাবিই যখন এত বেশি ছিল, তখন ধন-ভাণ্ডার যে কি পরিমাণ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। সে এই বড়াই তখন করেছিল,) যখন তার সম্প্রদায় (বুঝানোর জন্য) তাকে বলল, দম্ভ করো না। আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। (আরও বলল,) তোমাকে আল্লাহ্ যা দান করেছেন, তদদ্বারা পরকালও অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ (নিয়ে যাওয়া) ভুলে যেয়ো না। اِبْتَغِ ও وَلَا تَنْسَ-এর উদ্দেশ্য এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর এবং (আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও জরুরী দায়িত্ব নষ্ট করে) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। (অর্থাৎ গুনাহ্ করলে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ—বিশেষ করে সংক্রামক গুনাহ্ করলে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [এসব উপদেশ মুসলমানদের পক্ষ থেকে হয়েছিল। সম্ভবত মূসা (আ) এই বিষয়বস্তু প্রথমে বলেছিলেন। অতঃপর অন্য মুসলমানগণও তার পুনরাবৃত্তি করেছিল]। কারূন (একথা শুনে) বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। (অর্থাৎ আমি জীবিকা উপার্জনের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছি। এর বলেই আমি অগাধ ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছি। কাজেই আমার দম্ভ অহেতুক নয়। একে অদৃশ্য অনুগ্রহও বলা যায় না এবং এতে কারও ভাগ বসানোরও অধিকার নেই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তার দাবি খণ্ডন করেন,) সে কি (খবর পরম্পরা থেকে একথা) জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা (আর্থিক) শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং জনবলে ছিল তার চাইতে প্রাচুর্যশালী? (তাদের শুধু ধ্বংস হওয়াই শেষ নয় ; বরং কুফরের কারণে এবং আল্লাহ্ তা'আলার তা জানা থাকার কারণে কিয়ামতেও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। সেখানকার রীতি এই যে,) পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে (অর্থাৎ তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে) জিজ্ঞাসা করতে হবে না। (কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সব জানেন। তবে শাসানোর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে ; যেমন বলা হয়েছে لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ—উদ্দেশ্য এই যে, কারূন এই বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে এমন মূর্খতার কথা বলত না। কেননা, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের আযাবের অবস্থা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান এবং পরকালীন হিসাব-নিকাশ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র নিয়ামতকে নিজের জ্ঞান-গরিমার ফলশ্রুতি বলার অধিকার কার আছে?) অতঃপর (একবার) কারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। (তার সম্প্রদায়ের) যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, (যদিও তারা ঈমানদার ছিল ; যেমন পরবর্তী বাক্য وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الخ থেকে বোঝা যায়।) তারা বলল, আহা! কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো। বাস্তবিকই সে বড় ভাগ্যবান। (এটা ছিল লোভ। এর কারণে কাফির হওয়া জরুরী হয় না। যেমন আজকালও কতক মুসলমান বিজাতির উন্নতি দেখে দিবারাত্র লোভ করতে থাকে এবং এই চেষ্টায়ই ব্যাপৃত থাকে।) আর যারা (ধর্মের) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা (লোভীদেরকে) বলল, ধিক তোমাদেরকে (তোমরা দুনিয়ার পেছনে যাচ্ছ কেন?) যারা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহ্র সওয়াবই শ্রেষ্ঠ। (ঈমানদার ও সৎকর্মীদের মধ্যেও) এটা (পুরোপুরি) তারাই পায়, যারা (দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে) সবর করে! (সুতরাং তোমরা ঈমান পূর্ণ কর এবং সৎকর্ম অর্জন কর। সীমার ভেতরে থেকে দুনিয়া অর্জন কর এবং অতিরিক্ত লোভ-লালসা থেকে সবর কর।) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে (তার ঔদ্ধত্যের কারণে) ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে তাকে আল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব) থেকে রক্ষা করত (যদিও সে জনবলে বলীয়ান ছিল।) এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। গতকল্য (অর্থাৎ নিকট অতীতে) যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা (আজ তাকে ভূগর্ভে বিলীন হতে দেখে) বলল, হায় (মনে হয় সচ্ছলতা ও অভাব-অনটন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং এটা

সৃষ্টিগত রহস্যের ভিত্তিতে আল্লাহ্র করতলগত।) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) হ্রাস করেন। (আমরা ভুলবশত একে সৌভাগ্য মনে করতাম। আমাদের তওবা! বাস্তবিকই) আমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ না থাকলে তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। (কেননা লোভ ও দুনিয়াপ্রীতির গুনাহে আমরাও লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম।) ব্যস বুঝা গেল, কাফিররা সফলকাম হবে না (ক্ষণকাল মজা লুটলেও পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রকৃত সাফল্য ঈমানদাররাই পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফিরাউন ও ফিরাউন-বংশীয়দের সাথে মূসা (আ)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় ঃ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الخ কারূনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃতঘ্নতা করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকীনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন-ভাণ্ডার সহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

قَارُون —সম্ভবত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কোরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূসা (আ)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে।—(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

রূহুল মা'আনীতে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তওরাতের হাফেয ছিল এবং অন্য সবার চাইতে বেশি তার তওরাত মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। মূসা (আ) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাইলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ) ছিলেন তাঁর উযির ও নবুয়তের অংশীদার। এতে কারূনের মনে হিংসা জাগে যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে মূসা (আ)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোন হাত নেই। কিন্তু কারূন এতে সন্তুষ্ট হলো না এবং মূসা (আ)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠল।

فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ — بغى কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ যুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি যুলুম করতে লাগল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, কারূন ছিল বিত্তশালী। ফিরাউন তাকে বনী ইসরাইলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী ইসরাইলের উপর নির্যাতন চালায়।—(কুরতুবী)

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারূন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাইলের মুকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ — كنوز শব্দটি كنز-এর বহুবচন। এর অর্থ ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার। শরীয়তের পরিভাষায় كنز-এমন ধনভাণ্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আ)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছিল।—(রূহ)

لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ — ناء শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুকিয়ে দেওয়া। শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধনভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলা বাহুল্য, চাবি সাধারণত হালকা ওযনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চাবির ওযন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না।—(রূহ্)

لَا تَفْرَحْ — فرح এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কোরআন পাক অনেক আয়াতে এই فرح-কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে ঃ যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ—অন্য এক আয়াতে আছে لَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ আরও এক আয়াতে আছে ঃ فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কিন্তু কোন কোন আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে ; যেমন فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আয়াতে এবং يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, যা দম্ভ ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়—আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌছে না, তা নিষিদ্ধ নয় বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ ঈমানদারগণ কারূনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ্ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না।

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ দুনিয়ার বয়স এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদ্‌কা, খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস সহ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি—এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই, যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের

উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্দ্বারা পরকালের ব্যবস্থা কর ; কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্য রাখ। এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বুঝানো হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ—কারও কারও মতে এখানে 'ইল্ম' বলে তওরাতের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারূন তওরাতের হাফেয ও আলিম ছিল। মূসা (আ) যে সত্তরজনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এখানে ইল্ম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বুঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের কোন দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য—এগুলোও তো আল্লাহ্ তা'আলারই দান ছিল ; —তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ—কারূনের উপরোক্ত উক্তির আসল জওয়াব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে ; অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্ তা'আলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসাবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ الاية এই আয়াতে اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ অর্থাৎ আলিমদের মুকাবিলায় اَلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলিমদের কাজ নয়। আলিমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

(৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম। (৮৪) যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই পরকাল (যার সওয়াব যে উদ্দেশ্য, তা ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে) আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে উদ্ধত্য হতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। (অর্থাৎ অহংকার তথা গোপন গুনাহ্ করে না এবং কোন প্রকাশ্য গুনাহেও লিপ্ত হয় না, যদ্দ্বারা দুনিয়াতে অনর্থ সৃষ্টি হতে পারে। শুধু গোপন ও প্রকাশ্য মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়; বরং) শুভ পরিণাম আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য (যারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে সৎকর্মও করে থাকে। কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি এ ভাবে হবে যে,) যে (কিয়ামতের দিন) সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার (প্রাপ্যের) চাইতে উত্তম ফল পাবে। (কেননা সৎকর্মের প্রতিদান সমানানুপাতে হওয়া তার আসল চাহিদা ; কিন্তু সেখানে বেশি দেওয়া হবে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ গুণ।) এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা মন্দ কর্মের পরিমাণেই প্রতিফল পাবে (অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে অধিক শাস্তি বা প্রতিফল দেওয়া হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا —এই আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। علو শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فساد বলে অপরের উপর যুলুম বুঝানো হয়েছে।—(সুফিয়ান সওরী)

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গুনাহ্ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ, গুনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে যারা অহংকার, যুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল পোশাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয় ; যেমন সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গুনাহের দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ্ ঃ আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোন গুনাহের বদ্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ্। (রূহ) তবে পরে যদি আল্লাহ্র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গুনাহ্ করতে সক্ষম না হয় ; কিন্তু চেষ্টা ষোল আনাই করে, তবে গুনাহ না করলেও তার আমলনামায় গুনাহ্ লেখা হবে।—(গাযযালী)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরী। এক. ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার এবং দুই. তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। এই দুইটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যে সব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي
أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ
تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا
تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ
إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

(৮৫) যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে আছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি

কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফিররা যেন আপনাকে আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর। আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনার শত্রুরা নির্যাতনের মাধ্যমে আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। স্বদেশ থেকে এই জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদের কারণে আপনার অন্তরে ব্যথা আছে। অতএব আপনি সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আল্লাহ্ আপনার প্রতি কোরআন (অর্থাৎ কোরআনের বিধানাবলী পালন ও প্রচার) ফরয করেছেন (যা আপনার নবুয়তের প্রমাণ) তিনি আপনাকে (আপনার) মাতৃভূমিতে (অর্থাৎ মক্কায়) আবার ফিরিয়ে আনবেন। (তখন আপনি স্বাধীন, প্রবল এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন। এমতাবস্থায় বসবাসের জন্য অন্য স্থান মনোনীত করা হলে তা উপকারবশত ও ইচ্ছাকৃত করা হয়, ফলে তা কষ্টের কারণ হয় না। আপনার সত্য নবুয়ত সত্ত্বেও কাফিররা আপনাকে ভ্রান্ত এবং তাদেরকে সত্যপন্থী মনে করে। কাজেই) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) আছে। (অর্থাৎ আমি যে সত্যপন্থী এবং তোমরা যে মিথ্যাপন্থী এর অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে যখন কাজে লাগাও না তখন অগত্যা জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। তিনি বলে দেবেন। আপনার এই নবুয়ত নিছক আল্লাহ্‌র দান। এমন কি, স্বয়ং), আপনি (নবী হওয়ার পূর্বে) আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। কেবল আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটা অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি (তাদের বাজে কথাবার্তায় মনোনিবেশ করবেন না এবং এ পর্যন্ত যেমন তাদের থেকে আলাদা রয়েছেন, ভবিষ্যতেও এমনিভাবে) কাফিরদের মোটেই সমর্থন করবেন না। আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিররা যেন এগুলো থেকে আপনাকে বিমুখ না করে (যেমন এ পর্যন্ত করতে পারেনি।) আপনি (যথারীতি) আপনার পালনকর্তার (ধর্মের) প্রতি (মানুষকে দাওয়াত দিন এবং (এ পর্যন্ত যেমন মুশরিকদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ভবিষ্যতেও) কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (এ পযর্ংন্ত যেমন শিরক থেকে পবিত্র আছেন, এমনিভাবে ভবিষ্যতেও) আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। (এসব আয়াতে কাফির ও মুশরিকদেরকে তাদের বাসনা থেকে নিরাশ করা হয়েছে এবং তাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বধর্মে আনয়ন করার যে বাসনা পোষণ কর এবং তাকে অনুরোধ কর, এতে তোমাদের সাফল্যের কোনই সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাধারণ অভ্যাস এই যে, যার প্রতি বেশি রাগ

থাকে, তার সাথে কথা বলা হয় না, বরং প্রিয়জনের সাথে কথা বলে তাকে শোনানো হয়। মা'আলিম গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব আয়াত বাহ্যত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হলেও উদ্দেশ্য তিনি নন। এ পর্যন্ত রিসালতের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যদিও প্রসঙ্গক্রমে তাওহীদের বিষয়বস্তুও এসে গেছে। অতঃপর তাওহীদের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনি ব্যতীত কেউ উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। (কেননা,) আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। (কাজেই তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ হচ্ছে তাওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর কিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে।) রাজত্ব তাঁরই (কিয়ামতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে।) এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (তখন সবাইকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ—সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফিরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাবে শেষ নবী রাসূল (সা)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফিররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। اَلَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ। অর্থাৎ যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে "মা'আদে" ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হারম ও বায়তুল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করতে হয়েছে ; কিন্তু যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্‌ফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ্ ও

স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, মাদানীও নয়।—(কুরতুবী)

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তিলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ এখানে وَجْهَهُ বলে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার বলেন ঃ وَجْهَهُ বলে এমন আমল বুঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্র জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে—এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ

সূরা আল-‘আনকাবুত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ۚ ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ

سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۚ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَن جٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجٰهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ

لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ

عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? (৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্‌ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে ? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। (৫) যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহ্‌র সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্‌ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে,

আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম—(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কতক মুসলমান যারা কাফিরদের নির্যাতন দেখে ঘাবড়ে যায়। তবে) তারা কি মনে করে যে, তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে (নানা বিপদাপদ দ্বারা) পরীক্ষা করা হবে না ? (অর্থাৎ এরূপ হবে না ; বরং এ ধরনের পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হবে।) আমি তো (এমনি ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা) তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে (মুসলমান) ছিল। (অর্থাৎ অন্যান্য উম্মতের মুসলমানরাও এমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। এমনিভাবে তাদেরকেও পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায়) আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে দেবেন কারা (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী এবং আরও প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী। (সেমতে যারা আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে মুসলমান হয়, তারা এসব পরীক্ষায় অবিচল থাকে বরং আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা সাময়িক বিপদ দূরীকরণার্থে মুসলমান হয়, তারা এই কঠিন মুহূর্তে ইসলাম ত্যাগ করে বসে। অর্থাৎ এটা পরীক্ষার একটি রহস্য। কারণ, খাঁটি অখাঁটি মিশ্রিত থেকে যাওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষতিকারিতা রয়েছে বিশেষত প্রাথমিক অবস্থায়। মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) যারা মন্দ কাজ করছে, তারা কি মনে করে যে তারা আমার আয়ত্তের বাইরে কোথাও চলে যাবে ? তাদের এই সিদ্ধান্ত নেহাতই বাজে। (এটা মধ্যবর্তী বাক্য। এতে কাফিরদের কুপরিণাম শুনিয়ে মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, তাদের এই নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অতঃপর আবার মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে ঃ) যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কামনা করে (এসব বিপদাপদ দেখে তার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। কেননা) আল্লাহ্‌র (সাক্ষাতের) সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে, (যার ফলে সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (কোন কথা ও কাজ তাঁর কাছ থেকে গোপন নয়। সুতরাং সাক্ষাতের সময় তোমাদের সব উক্তিগত ও কর্মগত ইবাদতের প্রতিদান দিয়ে সব চিন্তা দূর করে দেবেন।)এবং (মনে রেখ, আমি যে তোমাদের কষ্ট স্বীকার করতে উৎসাহিত করছি, এতে আমার কোন লাভ নেই ; বরং) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে নিজের (লাভের) জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। (নতুবা) আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসীদের মুখাপেক্ষী নয়। (এতেও কষ্ট স্বীকারের প্রতি উৎসাহ রয়েছে। কেননা নিজের লাভ জানার কারণে তা করা আরও সহজ হয়ে যায়। লাভের বর্ণনা এই যে,) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের গুনাহ্ দূর করে দেব। (কুফর ও শিরক তো ঈমান দ্বারা দূর হয়ে যায়। কতক গুনাহ্ তওবা দ্বারা, কতক গুনাহ্ সৎ কাজ দ্বারা এবং কতক গুনাহ্ বিশেষ অনুগ্রহে মাফ হয়ে যাবে।) এবং তাদেরকে তাদের কর্মের চাইতে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব (সুতরাং এত উৎসাহ দানের পর ইবাদত ও সাধনায় দৃঢ় থাকতে যত্নবান হওয়া জরুরী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ — يُفْتَنُوْنَ শব্দটি فِتْنَة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষত পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এইসব পরীক্ষা কোন সময় কাফির ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে ; যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে ; যেমন হযরত আইয়ুব (আ)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেওয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযুল সেই সব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলিম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।—(কুরতুবী)

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا —অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (র) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ ۞

(৮) আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। (এবং এতদসঙ্গে একথাও বলেছি যে,) যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই (এবং প্রত্যেক বস্তুই যে ইবাদতের যোগ্য নয়, তার প্রমাণাদি আছে) তবে (এ ব্যাপারে) তাদের আনুগত্য করো না। তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু (সৎ ও অসৎ কর্ম) তোমরা করতে। (তোমাদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে ও সৎকর্ম করবে আমি তাদেরকে সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে জান্নাতে দেব। এমনিভাবে কুকর্মের কারণে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেব। এর ভিত্তিতেই যারা পিতামাতার আনুগত্যকে আমার আনুগত্যের উপর অগ্রাধিকার দেবে, সে শাস্তি পাবে। যে এর বিপরীত করবে, সে শুভ প্রতিদান পাবে। মোটকথা, নিষিদ্ধ কাজে পিতামাতার অবাধ্যতা করলে গুনাহ্ হবে বলে ধারণা করা উচিত নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ —হিতাকাঙ্ক্ষী ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে وصيت বলা হয়।—(মাযহারী)

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا — حسن শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حسن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِىْ —অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না ; যেমন হাদীসে আছে : لاطاعة

لمخلوق فی معصیة الخالق — অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবূ সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তারূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। (মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা'দের জননী এক দিন এক রাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথঅনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল, কিন্তু আল্লাহ্র ফরমানের মুকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন, যান। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا
مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ
اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ
مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا
مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

---

(১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি ; কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে

তখন তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।' বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন ? (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফিক। (১২) কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (১৩) তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতঃপর আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের মত (ভয়ংকর) মনে করে। (অথচ মানুষ এরূপ আযাব দেওয়ার শক্তিই রাখে না। এখন তাদের অবস্থা এই যে,) যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে (মুসলমানদের) কোন সাহায্য আসে, (উদাহরণত জিহাদে এরা যখন বন্দী হয়ে আসে,) তখন তারা বলে, আমরা তো (ধর্ম ও বিশ্বাসে) তোমাদের সাথেই ছিলাম। (অর্থাৎ মুসলমানই ছিলাম, যদিও কাফিরদের জোর-জবরদস্তির কারণে তাদের সাথে যোগদান করেছিলাম আল্লাহ্ বলেন,) আল্লাহ্ কি বিশ্ববাসীর মনের কথা সম্যক অবগত নন ? (অর্থাৎ তাদের অন্তরেই ঈমান ছিল না। এসব ঘটনা ঘটার কারণ এই যে,) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন বিশ্ববাসীদের এবং জেনে নেবেন মুনাফিকদেরও। কাফিররা মুসলমানদের বলে, তোমরা (ধর্মে) আমাদের পথ অনুকরণ কর। (কিয়ামতে) তোমাদের (কুফর ও অবাধ্যতার) পাপভার আমরা বহন করব। (তোমরা মুক্ত থাকবে।) অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই (তোমাদের মুক্ত করে) বহন করতে পারবে না। তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে। (তবে) তারা নিজেদের পাপভার (পুরোপুরি) এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। (তারা যেসব পাপের কারণ হয়েছিল, এগুলো সেই পাপ। তারা এসব পাপভার বহন করার কারণে আসল পাপমুক্ত হয়ে যাবে না। মোটকথা, আসল পাপীরা হালকা হবে না ; কিন্তু তারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে তাদের পাপের বুঝা আরও ভারী হয়ে যাবে।) তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে (অতঃপর এ কারণে শাস্তি হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا — কাফিরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফিররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালের

শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকূতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى—এতে উল্লিখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফির সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফিরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ—অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়নীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে—একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও একসাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সেও পাপী ; আসল পাপীর যে শাস্তি হবে তার প্রাপ্যও তাই ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সেও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবূ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না।—(কুরতুবী)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ

عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَصْحَٰبَ
السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ
إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا
فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

(১৪) আমি নূহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্য। (১৬) স্মরণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন—তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়াই তো রাসূলের দায়িত্ব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নূহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ-কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছেন (এবং নিজ সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন)। অতঃপর (তারা যখন ঈমান কবূল করল না, তখন) তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছে। তারা ছিল বড় জালিম। (এত দীর্ঘ দিনের উপদেশেও তাদের মন গলল

না।) অতঃপর (প্লাবন আসার পর) আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে (যারা তাঁর সাথে আরোহণ করেছিল, এই প্লাবন থেকে তাদের) রক্ষা করলাম এবং এই ঘটনাকে বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষাপ্রদ করলাম। (তারা চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারে যে, বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি কি হয়) এবং আমি ইবরাহীম (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করলাম। যখন তিনি তাঁর (মূর্তিপূজারী) সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর (ভয় করে শিরক ত্যাগ কর)। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ (শিরক নিছক নির্বুদ্ধিতা)। তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে কেবল (অক্ষম ও অকর্মণ্য) প্রতিমার পূজা করছ এবং (এ ব্যাপারে) মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করছ (যে, তাদের দ্বারা আমাদের রুযী রোজগারের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এটা নির্জলা মিথ্যা। কেননা) তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের কোন রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছেই রিযিক তালাশ কর। (অর্থাৎ তাঁর কাছে চাও, রিযিকের মালিক তিনিই। তিনিই যখন মালিক, তখন) তাঁরই ইবাদত কর এবং (অতীত রিযিক তিনিই দিয়েছেন, তাই,) তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এ হচ্ছে ইবাদত করার এক কারণ ; দ্বিতীয় কারণ এই যে, তিনি ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখেন। সেমতে) তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (তখন কুফরের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন।) যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে (মনে রেখ, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই) তোমাদের পূর্ববর্তীরাও (পয়গম্বরগণকে এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছে (এতে সেই পয়গম্বরগণের কোন ক্ষতি হয়নি।) এবং (এর কারণ এই যে,) (স্পষ্টভাবে) পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়াই রাসূলের দায়িত্ব। (মানানো তাঁর কাজ নয়। সুতরাং পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর পয়গম্বরগণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন। আমিও তেমনি। সুতরাং আমার কোন ক্ষতি নেই। তবে মেনে নেওয়া তোমাদের প্রতি ওয়াজিব ছিল। এটা তরক করার কারণে তোমাদের ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফিরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোন সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফিরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রিসালাতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কুফর ও শিরকের মুকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফিরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত

হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তার আরও বয়স আছে।

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফিরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো—এগুলো সব নূহ (আ)-এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আ) ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা—এগুলো সব রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ
وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

(১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন ? এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। (২০) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন' অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং

যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমরা স্থলে ও অন্তরিক্ষে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন (অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন), অতঃপর তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ। (বরং প্রাথমিক দৃষ্টিতে পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে অধিকতর সহজ, যদিও আল্লাহ্‌র সত্তাগত শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে উভয়ই সমান। তারা প্রথম বিষয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা এ বিষয় তো স্বীকার করতো যেমন বলা হয়েছে ঃ ولئن سالتهم من خلق السموات الخ কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টি করা স্বীকার করত না ; অথচ এটা করা অধিক স্পষ্ট। তাই اَوَلَمْ يَرَوْا এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে অতঃপর এই বিষয়বস্তুই পুনরায় ভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শোনানো হচ্ছে ঃ আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (প্রথম বর্ণনায় একটি যুক্তিগত প্রমাণ আছে এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ আছে ; অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ প্রত্যক্ষ করা। এ পর্যন্ত কিয়ামত সপ্রমাণ করা হলো। অতঃপর প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছে যে, পুনরুত্থানের পর) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন (অর্থাৎ যে এর যোগ্য হবে) এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করবেন। (অর্থাৎ যে এর হকদার হবে। এতে কারও কোন দখল থাকবে না। কেননা) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (অন্য কারও দিকে নয়। তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।) তোমরা স্থলে (আত্মগোপন করে) ও অন্তরীক্ষে (উড়ে) আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না (যে, তিনি তোমাদেরকে ধরতে পারবেন না।) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই ; কোন সাহায্যকারীও (সুতরাং নিজ চেষ্টায়ও বাঁচতে পারবে না এবং অন্যের সাহায্যেও বাঁচতে পারবে না। উপরে যে আমি বলেছিলাম يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ এখন সামগ্রিক নীতির মাধ্যমে এরা কারা—বর্ণনা করছি) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারা (কিয়ামতে) আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে। (অর্থাৎ তখন তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, তারা রহমতের পাত্র নয়।) এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ

مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۲۴﴾ وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ
مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ اَوۡثَانًا ۙ مَّوَدَّۃَ بَیۡنِکُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ
ثُمَّ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یَکۡفُرُ بَعۡضُکُمۡ بِبَعۡضٍ وَّ یَلۡعَنُ بَعۡضُکُمۡ
بَعۡضًا ۫ وَّ مَاۡوٰىکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِیۡنَ ﴿۲۵﴾ فَاٰمَنَ لَہٗ
لُوۡطٌ ۘ وَ قَالَ اِنِّیۡ مُہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیۡ ؕ اِنَّہٗ ہُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۲۶﴾
وَ وَہَبۡنَا لَہٗۤ اِسۡحٰقَ وَ یَعۡقُوۡبَ وَ جَعَلۡنَا فِیۡ ذُرِّیَّتِہِ النُّبُوَّۃَ
وَ الۡکِتٰبَ وَ اٰتَیۡنٰہُ اَجۡرَہٗ فِی الدُّنۡیَا ۚ وَ اِنَّہٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ
لَمِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۲۷﴾

(২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লূত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তার বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয় পরকালেও সে সৎলোকের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইবরাহীমের এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর) তার সম্প্রদায়ের (চূড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, তারা (পরস্পরে) বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। (সেমতে অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা করা হলো।) অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন (সূরা আম্বিয়ায় এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)। নিশ্চয়ই এই ঘটনায় ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য

অনেক নিদর্শন রয়েছে)। [অর্থাৎ এই ঘটনা কয়েকটি বিষয়ের প্রমাণ ও আল্লাহ্র সর্বশক্তিমান হওয়া, ইবরাহীম (আ)-এর পয়গম্বর হওয়া, কুফর ও শিরকের অসারতা ইত্যাদি। তাই এক প্রমাণই কয়েকটি প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে।) ইবরাহীম [(আ) ওয়াযে আরও] বললেন, পার্থিব জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। (সেমতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ স্বজন ,বন্ধু ও আত্মীয়দের অনুসৃত পথে থাকে এবং এ কারণে সত্য-মিথ্যা চিন্তা করে না। সত্যকে সত্য জেনেও ভয় করে যে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে যাবে।) এরপর কিয়ামতের দিন (তোমাদের এই অবস্থা হবে যে,) তোমরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। (যেমন সূরা আ'রাফে আছে ঃ لَعَنَتْ اُخْتَهَا সূরা সাবায় আছে ঃ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا সূরা বাকারায় আছে ঃ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ সারকথা এই যে, আজ যেসব বন্ধু ও আত্মীয়ের কারণে তোমরা পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করেছ, কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে।) এবং (তোমরা এই প্রতিমা পূজা থেকে বিরত না হলে) তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (এতে উপদেশের পরও তার সম্প্রদায় বিরত হলো না।) শুধু লূত (আ) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি (তোমাদের মধ্যে থাকব না। বরং) আমার প্রতিপালকের (নির্দেশিত স্থানের) উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তিনি আমার হিফাযত করবেন এবং আমাকে এর ফল দেবেন।) আমি (হিজরতের পর) তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রাখলাম এবং তাঁর প্রতিদান তাঁকে দুনিয়াতেও দিলাম এবং পরকালেও তিনি (উচ্চস্তরের) সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (এই প্রতিদান বলে নৈকট্য ও কবূল বুঝানো হয়েছে ; যেমন, সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ —হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আ)-এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদতে কোন বাধা নেই।

হযরত নখয়ী ও কাতাদাহ বলেন, اِنِّىْ مُهَاجِرٌ হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ তো নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার اِنِّىْ مُهَاجِرٌ কে হযরত লূত (আ)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত লূত (আ)-ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন;

কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আ)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম পয়গম্বর, যাঁকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন।—(কুরতুবী)

কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় ঃ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ আমি ইবরাহীম (আ)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খ্রিস্টান, প্রতিমা পূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে ; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ
السَّبِيْلَ ۙ۬ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ
اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ
انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۳۰﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ
بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ
اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ۚ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ
بِمَنْ فِيْهَا ٚ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾
وَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا
وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا

امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٣ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝٣٤ وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٣٥

(২৮) আর প্রেরণ করেছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। (২৯) তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ ? জওয়াবে তার সম্প্রদায় কেবল এ কথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালিম। (৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লূতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত ; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি লূত (আ)-কে পয়গম্বর মনোনীত করে প্রেরণ করেছি। যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ। (এটাই অশ্লীল কাজ। এ ছাড়া অন্যান্য অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডও করছ ; যেমন) তোমরা রাহাজানি করছ (সর্বনাশের কথা এই যে,) নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ। (গুনাহ্ প্রকাশ করা স্বয়ং একটি গুনাহ্। তাঁর সম্প্রদায়ের (চূড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও (যে, এসব কাজ আযাবের কারণ) লূত (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে জয়ী (এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস) কর। [তাঁর দোয়া কবূল হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা আযাবের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করলেন। এই ফেরেশতাদের যিম্মায় এই কাজও দেওয়া হলো যে, ইবরাহীম (আ)-কে

ইসহাক পয়দা হওয়ার সংবাদ দাও। সে মতে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন (কথাবার্তার মাঝখানে) তারা [ইবরাহীম (আ)-কে] বলল, আমরা (লূত-সম্প্রদায়ের) এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। (কেননা) এর অধিবাসীরা বড় জালিম। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেখানে তো লূতও রয়েছে। (কাজেই সেখানে আযাব এলে সে-ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।) ফেরেশতারা বলল, সেখানে কে আছে , তা আমরা ভাল জানি। আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ মু'মিনগণসহ) রক্ষা করব (আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে জনপদের বাইরে নিয়ে যাব। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। [সূরা হূদ ও সূরা হিজরে এর আলোচনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে কথাবার্তা শেষ করে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন লূত (আ) তাদের (আগমনের) কারণে বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। [কারণ, তারা ছিল অত্যন্ত সুশ্রী যুবকের আকৃতিবিশিষ্ট। লূত (আ) তাদেরকে মানুষ মনে করলেন এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের অপকর্মের কথা স্মরণ করলেন। এ কারণে তাদের আগমনে] তাঁর মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। ফেরেশতারা (এ অবস্থা দেখে) বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। (আমরা মানুষ নই ;বরং আযাবের ফেরেশতা। এই আযাব থেকে) আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (আপনাদেরকে রক্ষা করে) আমরা এই জনপদে (অবশিষ্ট) অধিবাসীদের উপর একটি নৈসর্গিক আযাব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (সেমতে সেই জনপদ উল্টে দেওয়া হলো এবং প্রস্তর বর্ষণ করা হলো)। আমি এই জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের (শিক্ষার) জন্য (এখন পর্যন্ত) রেখে দিয়েছি (মক্কাবাসীরা শাম সফরে এসব জনশূন্য স্থান দেখত এবং বুদ্ধিমানরা ভীত হয়ে ঈমানও কবূল করত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلُوطًا اِذْقَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ —এখানে লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমৈথুন, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়. মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গুনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ্। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গুনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। উম্মে হানী (রা)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। (নাউযুবিল্লাহ্)

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গুনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟
ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (৩৬) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ
تْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ (৩৭) وَعَادًا وَثَمُودَا۟
وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ (৩৮) وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ
وَهَٰمَٰنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا
كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ (৩৯) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ
ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (৪০) مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ
كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ
ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ (৪১) إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن
دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (৪২) وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ (৪৩) خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (৪৪)

(৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল ; অতঃপর তারা

ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুঁশিয়ার। (৩৯) আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাতে, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না : কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত ! (৪২) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই ; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বুঝে। (৪৪) আল্লাহ্ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাদের (জ্ঞাতি) ভাই শোআয়ব (আ)-কে রাসূল করে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। (শিরক ত্যাগ কর) কিয়ামত দিবসকে ভয় কর (তাকে অস্বীকার করো না)। এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক নষ্ট করো না। তারা কুফর ও শিরকের গুনাহ্‌র সাথে মাপে ও ওযনে কম দেয়ার দোষেও দোষী ছিল। ফলে অনর্থ সৃষ্টি হতো) কিন্তু তারা শোআয়ব (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলে দিল। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আ'দ ও সামূদকেও (তাদের হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে) ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের ধ্বংসাবস্থা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। (তাদের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ তোমাদের শাম দেশে যাওয়ার পথে পড়ে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) শয়তান তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল (এমনিতে) হুঁশিয়ার (উন্মাদ ও নির্বোধ ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায়নি।) আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকেও (তাদের কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি। মূসা (আ) তাদের (তিনজনের) কাছে (সত্যের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু (আমার আযাব থেকে) পালাতে পারেনি। আমি এই পঞ্চ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই তার গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া (অর্থাৎ আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি), কাউকে আঘাত করেছে ভীষণ বজ্রনাদ (অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়কে), কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে (অর্থাৎ

কারুনকে) এবং কাউকে করেছি (পানিতে) নিমজ্জিত। (অর্থাৎ ফিরাউন ও হামানকে) এবং (তাদের আযাবের ব্যাপারে) আল্লাহ্ যুলুম করেন নাই। (অর্থাৎ বিনা কারণে শাস্তি দেয়া বাহ্যত যুলুম যদিও সার্বভৌম অধিকারের কারণে আল্লাহ্র জন্য এটাও যুলুম ছিল না।) কিন্তু তারা নিজেরাই (দুষ্টামি করে) নিজেদের প্রতি যুলুম করত (যে নিজেদেরকে আযাবের যোগ্য করে ধ্বংস হয়েছে। ফলে, তারা তাদের ক্ষতি করেছে।) যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতর (সুতরাং মাকড়সা যেমন নিজ ধারণায় তার একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করে; কিন্তু বাস্তবে তা দুর্বলতর হওয়ার কারণে না থাকার শামিল হয়ে থাকে, তেমনি মুশরিকরা মিথ্যা উপাস্যদেরকে তাদের আশ্রয় মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তারা আশ্রয় মোটেই নয়) যদি তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানত (তবে এরূপ করত না,) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুর পূজা করে, আল্লাহ্ তা (অর্থাৎ তার স্বরূপ ও দুর্বলতা) জানেন। (সেগুলো খুবই দুর্বল) তিনি (নিজে অর্থাৎ আল্লাহ্) শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও কর্ম শক্তিতে কামিল) এবং (আমি এসব কিছুর স্বরূপ জানি বিধায়) আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য দেই (তন্মধ্যে একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে) এসব উদাহরণের কারণে তাদের মূর্খতা দূর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই এগুলো বুঝে (কার্যত জ্ঞানী হোক কিংবা জ্ঞান ও সত্যান্বেষণকারী হোক। এরা জ্ঞানীও নয়, অন্বেষণকারীও নয়। ফলে মূর্খতায় লিপ্ত থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সত্য সত্যই থাকবে। আল্লাহ্ তা জানেন ও বর্ণনা করেন। এ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। এরপর আল্লাহ্ ইবাদতের যোগ্য—এ বিষয়ের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে) আল্লাহ্ তা'আলা যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (তারাও একথা স্বীকার করে।) ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য এতে (তাঁর ইবাদতের যোগ্যতার) যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব পয়গম্বর ও তাঁদের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁদের কাহিনী পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণত শোআয়ব (আ)-এর কাহিনী সূরা আ'রাফে ও হূদে। আ'দ ও সামূদের কাহিনীও সূরা আ'রাফে ও হূদে এবং কারূন, ফিরাউন ও হামানের কাহিনী সূরা কাসাসে এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে।

وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ — استبصار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা। مُسْتَبْصِرٌ-এর অর্থ চক্ষুষ্মান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শিরক করে করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুঁশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোন দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিম ও আপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফিরা করে এবং মজলুম ও বিপদগ্রস্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা রূমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। আয়াত ঃ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ — অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজকর্ম খুব বুঝে ; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোন কোন তফসীরবিদ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

فَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ — মাকড়সাকে عَنْكَبُوْت বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত এখানে তা বুঝানো হয়নি। এখানে সে মাকড়সা বুঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলা বাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাস'আলা ঃ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলিমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব হযরত আলী (রা) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فان تركه يورث الفقر — অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙিনা পরিষ্কার রাখ। —(রূহুল-মা'আনী)

تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ۔

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি ; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলিমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না।

আল্লাহ্র কাছে আলিম কে ? ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, সেই আলিম, যে আল্লাহ্র কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে আলিম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহ্‌মদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলিম বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝে।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (ইবনে কাসীর)

(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ (সা) যেহেতু আপনি রাসূল, তাই) আপনি (প্রচারের জন্য) আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব (মানুষের সামনে) পাঠ করুন। (উক্তিগত প্রচারের সাথে কর্মগত প্রচারও করুন অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেও ধর্মের কাজ বলে দিন ; বিশেষত) নামায কায়েম করুন। (কেননা, নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতও এবং এর প্রতিক্রিয়াও সুদূরপ্রসারী।) নিশ্চয় নামায (গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে) অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। (অর্থাৎ নামায যেন একথা বলে, তুমি যে মাবূদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করছ এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছ, অশ্লীল ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা। এমনিভাবে নামায ছাড়া আরও যত সৎকর্ম আছে, সেগুলোও পালনীয়। কারণ, সেগুলো মৌখিক অথবা কার্যত আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণই।) আর আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। (তুমি যদি আল্লাহ্‌র স্মরণে শৈথিল্য প্রদর্শন কর, তবে শুনে নাও,) আল্লাহ্ তোমাদের সব কর্ম জানেন (যেমন কাজ করবে, তেমনি ফল পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফির এবং তাদের উপর বিভিন্ন

আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদের জন্য সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র ঃ আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, কোরআন তিলাওয়াত করা ও নামায আদায় করা। উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্য উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কোরআন তিলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামায তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فحشاء শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে ; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে منكر এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহ্‌বিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে منكر বলা যায় না। فحشاء ও منكر শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ্ দাখিল হয়ে গেছে, যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ ঃ একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে সে গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে ; তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী اقامت صلوة হতে হবে। اقامت-এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اقامت صلوة-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেইভাবে নামায আদায় করা অর্থাৎ শরীর, পরিধানবস্ত্র ও নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জামা'আতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নাত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহ্‌র সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে, সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তাওফীকপ্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের

মধ্যেই ক্রটি বিদ্যমান। ইরমান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন : من لم ينهه صلوته عن الفحشاء والمنكر فلاصلوة له — অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : لاصلوة لمن لم يطع الصلوة অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহ্ঁ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি নয় : বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব : এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি ?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুক জানা যায় যে, নামায নামাযীকে গুনাহ্ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গুনাহ্ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গুনাহ্ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াও নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, সে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তাওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ক্রটি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ—অর্থাৎ আল্লাহ্র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণ'-এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহ্কে যে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে

পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করেন। فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ আল্লাহ্‌র এই স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে গুনাহ্ থেকে মুক্তির আসল কারণ হলো আল্লাহ্ স্বয়ং নামাযীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গুনাহ্ থেকে মুক্তি পায়।

وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ
وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ
بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ
بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ
اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ
اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ
بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ
بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ

لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

(৪৬) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তারই আজ্ঞাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেন নি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেন নি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে, জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না কেন ? বলুন নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন—আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে। আল্লাহ্ বলবেন তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[যখন পয়গম্বর (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত, তখন হে মুসলমানগণ, রিসালত অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা কিতাবধারী, তাদের সাথে কথাবার্তার পদ্ধতি আমি বলে দিচ্ছি। বিশেষ করে কিতাবধারীগণের কথা বলার কারণ এই যে, প্রথমত তারা বিদ্বান হওয়ার কারণে কথা শোনে। পক্ষান্তরে মুশরিকরা কথা শোনার আগেই নির্যাতন শুরু করে দেয়। দ্বিতীয়ত বিদ্বানগণ ঈমান আনলে সর্বসাধারণের ঈমান অধিক প্রত্যাশিত হয়ে যায়। পদ্ধতিটি এই ঃ] তোমরা কিতাবধারীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না। কিন্তু উত্তম

পন্থায়। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী। (তাদেরকে কটু ভাষায় জওয়াব দেওয়ায় দোষ নেই; যদিও এ ক্ষেত্রেও উত্তম পন্থায় জওয়াব দেওয়া ভাল।) এবং (উত্তম পন্থা এই যে, উদাহরণত তাদেরকে) বল, আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সেই কিতাবেও (বিশ্বাস স্থাপন করেছি), যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়াই বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তি। আমাদের কিতাব যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, একথা যখন তোমাদের কিতাব দ্বারাও প্রমাণিত, তখন আমাদের কিতাব কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। তোমরাও স্বীকার কর যে,) আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই, (যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا الخ তাওহীদ যখন সর্বসম্মত বিষয় এবং পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের প্রতি আনুগত্যের কারণে শেষ নবী (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা তাওহীদের পরিপন্থী, তখন আমাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا الخ —এই কথাবার্তার পর তোমরা যে মুসলমান, একথা হুশিয়ারীর উদ্দেশ্যে শুনিয়ে দাও) আমরা তো তাঁরই আনুগত্য করি, (এতে বিশ্বাস ও কর্ম প্রভৃতি সব এসে গেছে। অর্থাৎ তোমাদেরও এরূপ করা উচিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ —আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি যেমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি (যার ভিত্তিতে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে) অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব (অথাৎ কিতাবের হিতকর জ্ঞান) দিয়েছি, তারা এই কিতাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কও কুত্রাপি হয়ে থাকে) এবং এদেরও (মুশরিকদেরও) কেউ কেউ এমন (ন্যায়পন্থী) যে, তারা এতে বিশ্বাস রাখে (বুঝে হোক কিংবা বিদ্বানদের ঈমান দেখে হোক। প্রমাণাদি পরিস্ফূট হওয়ার পর) কেবল (হঠকারী) কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (উপরে বিশেষভাবে ইতিহাসবিদগণকে সম্বোধন করে ইতিহাসগত প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ব্যাপক সম্বোধনের মাধ্যমে যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তাদের কাছে সন্দেহের কোন উৎসও তো নেই। কেননা) আপনি তো এই কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব লেখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত (যে, সে লেখাপড়া জানা মানুষ। খোদায়ী গ্রন্থসমূহ দেখে-শুনে সেগুলোর সাহায্যে অবসর সময়ে বিষয়বস্তু চিন্তা করে নিজে লিখে নিয়েছে এবং মুখস্থ করে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এরূপ হলে সন্দেহের কিছুটা উৎস হতো; যদিও তখনও সন্দেহকারীরা মিথ্যাবাদীই হতো; কেননা কোরআনের অলৌকিকতা এরপরও নবুয়তের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু এখন তো সন্দেহের এরূপ কোন উৎসও নেই। কাজেই এই কিতাব সন্দেহের পাত্র নয়।) বরং এই কিতাব (এক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর প্রতিটি অংশই মু'জিযা এবং অংশও অনেক, তাই সে একাকীই যেন) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ। (অলৌকিকতা দেদীপ্যমান হওয়া সত্ত্বেও) কেবল হঠকারীরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (নতুবা ন্যায়পন্থীদের মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।) তারা (কোরআনরূপী মু'জিযা দেওয়া সত্ত্বেও নিছক হঠকারিতাবশত) বলে, তাঁর পালনকর্তার

পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি (আমাদের চাওয়া) নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হলো না কেন ? আপনি বলুন, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন (আমার ক্ষমতাধীন বিষয় নয়।) আমি তো (আল্লাহ্‌র আযাব থেকে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী (রাসূল) মাত্র। (রাসূল হওয়ার বিশুদ্ধ প্রমাণ আমার আছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রমাণ হচ্ছে কোরআন। এরপর আর কোন বিশেষ প্রমাণের কি প্রয়োজন ? বিশেষত যখন সেই প্রমাণ না আসার মধ্যে রহস্যও রয়েছে। অতঃপর কোরআন যে বড় প্রমাণ, তা বর্ণিত হচ্ছে।) এটা কি (নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে) তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব (মু'জিযা) নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে (সর্বদা) পাঠ করা হয়, (যাকে একবার শুনলে অলৌকিকতা প্রকাশ না পায়, তবে দ্বিতীয়বার শুনলে প্রকাশ পায় অথবা এর পরে প্রকাশ পায়। অন্য মু'জিযায় তো এ বিষয়ও থাকত না। কেননা তা চিরস্থায়ী অলৌকিক হতো না। এই মু'জিযায় আরও একটি অগ্রাধিকার এই যে,) নিশ্চয়ই এই বিতাবে (মু'জিযা হওয়ার সাথে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (রহমত এই যে, এই কিতাব খাঁটি উপকারী বিধানাবলী শিক্ষা দেয় এবং উপদেশ এই যে, উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। অন্য মু'জিযার মধ্যে এই গুণ কোথায় থাকত ? এসব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একে মহা সুযোগ মনে করে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। এসব প্রমাণের পরেও যদি তারা বিশ্বাস না করে, তবে শেষ জওয়াব হিসাবে) আপনি বলে দিন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই (আমার রিসালতের) যথেষ্ট সাক্ষী। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে। (যখন আমার রিসালত ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি হলো, তখন) যারা মিথ্যায় বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথাকে) অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র কথা দ্বারা আমার রিসালত প্রমাণিত তখন একে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত, তিনি এই অস্বীকৃতির কথাও জানেন। তিনি এর জন্য শাস্তি দেন। সুতরাং তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে (এবং তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে আপনার রিসালতে সন্দেহ করে।) যদি (আল্লাহ্‌র জ্ঞানে আযাব আসার জন্য) সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে (তাদের চাওয়ার সাথে সাথেই আযাব তাদের উপর এসে যেত। (যখন সেই সময় এসে যাবে,) আকস্মিকভাবে তাদের উপর এ আযাব এসে যাবে অথচ খবরও থাকবে না। (অতঃপর তাদের মূর্খতা প্রকাশ করার জন্য তাদের আযাব ত্বরান্বিত করার কথা পুনরায় উল্লেখ করে আযাবের নির্দিষ্ট সময় ও আযাবের কথা বলা হচ্ছে ঃ) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে (আযাবের প্রকার এই যে,) নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে (চার দিক থেকে) ঘিরে নেবে। যেদিন আযাব তাদেরকে উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে ঘেরাও করবে এবং (আল্লাহ্ তখন তাদেরকে) বলবেন, তোমরা (দুনিয়াতে) যা কিছু করতে, (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا—অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণত কঠোর কথা-বার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়,

ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا।—কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি যুলুম করে-তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মুকাবিলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেওয়া জায়েয। যদিও তখন তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়। যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা নহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে-আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ—অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্য তোমরা এ কথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইনজীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি ? ঃ এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইন্‌জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্‌জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলেও এই সব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি, যেগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও বলতে নেই ঃ সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইনজীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদীও বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং এ কথা বল ঃ اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ—অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের

প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তফসীরগ্রন্থসমূহে তফসীরকারকগণ কিতাবধারীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ — অর্থাৎ আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন উম্মী। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্য অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইনজীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়।

নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বড় শ্রেষ্ঠত্ব ও বড় মু'জিযা : আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন সময় কিতাবধারীদের সাথেও মেলামেশা করেন নি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ, মক্কায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে, যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে যেমন ছিল মু'জিযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোন কোন আলিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথম দিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসাবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রাসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের ? তাই আপনার নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাজা (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে مِنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে লিখে দিয়েছেন' বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও "সে লিখেছে" বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু'জিযা হিসাবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষরতার সীমা

পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লেখা জানতেন—বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾ كُلُّ
نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ قف ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۵۸﴾ قصلے الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ق اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا
وَاِيَّاكُمْ ز صلے وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۰﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۶۱﴾
اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۶۲﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ
مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۶۳﴾ ع

(৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের। (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহ্ই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। তাহলে তারা

কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ? (৬২) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, (যখন তারা চূড়ান্ত শত্রুতাবশত শরীয়ত ও ধর্মাবলম্বনের কারণে তোমাদের উপর নিপীড়ন চালায়, তখন এখানে থাকাই কি জরুরী ?) আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব (যদি এখানে থেকে ইবাদত করতে না পার, তবে অন্য কোথাও চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে) একান্তভাবে আমারই ইবাদত কর (কেননা এখানে মুশরিকদের জোর বেশি। সুতরাং খাঁটি তাওহীদ ভিত্তিক ও শিরকমুক্ত ইবাদত এখানে সুকঠিন। তবে শিরকযুক্ত ইবাদত এখানে সম্ভবপর; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ইবাদতই নয়। যদি দেশত্যাগে আত্মীয়স্বজন ও মাতৃভূমির বিচ্ছেদ তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তবে বুঝে নাও যে, একদিন না একদিন এই বিচ্ছেদ হবেই। কেননা) জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ (অবশ্যই) গ্রহণ করবে। (তখন সবাই ছেড়ে যাবে।) অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (অবাধ্য হয়ে আমার মধ্যে শাস্তির ভীতি পুরোপুরিই বিদ্যমান।) আর (যদি এই বিচ্ছেদ আমার সন্তুষ্টির কারণে হয়, তবে আমার কাছে পৌঁছার পর এই ওয়াদার যোগ্য পাত্র হয়ে যাও যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে (যেসব সৎকর্ম সম্পন্ন করা মাঝে মাঝে দেশত্যাগের উপর নির্ভরশীল থাকে, ফলে তখন তারা দেশত্যাগও করে,) আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। (সৎ) কর্মীদের কত চমৎকার পুরস্কার! যারা (হিজরতের বিপদসহ নানা বিপদাপদে) সবর করে এবং (অন্য দেশে পৌঁছার পর কষ্ট ও রুযী-রোজগারের যে সমস্যা দেখা দেয়, তাতে) তাদের পালনকর্তার উপর নির্ভর করে। (যদি হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের মনে কুমন্ত্রণা দেখা দেয় যে, বিদেশে খাদ্য কোথায় পাওয়া যাবে, তবে জেনে রাখ;) এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। (অনেক জীবজন্তু আবার রাখেও।) আল্লাহ্ই তাদেরকে (নির্ধারিত) রুযী পৌঁছান এবং তোমাদেরকেও (তোমরা যেখানেই থাক না কেন। কাজেই এরূপ কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দিও না; বরং মন শক্ত করে আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর।) আর (তিনি ভরসার যোগ্য। কেননা) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এমনিভাবে অন্যান্য গুণেও তিনি পূর্ণতার অধিকারী। যিনি এমন পূর্ণ গুণসম্পন্ন, তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। ইবাদতগত তাওহীদ সৃষ্টিগত তাওহীদের উপর ভিত্তিশীল। সৃষ্টিগত তাওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাহলে (সৃষ্টিগত তাওহীদ যখন স্বীকার করে, তখন ইবাদতগত তাওহীদের বেলায়) তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ? (স্রষ্টা যেমন আল্লাহ্-ই, তেমনি) আল্লাহ্-ই (রিযিকদাতাও; সেমতে তিনি) তাঁর বান্দাদের

মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, হ্রাস করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (যেরূপ উপযোগিতা দেখেন, সেইরূপ রিযিক দেন। মোটকথা, তিনিই রিযিকদাতা। কাজেই রিযিকের আশংকা হিজরতের পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র তাওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। এমনিভাবে জগতকে স্থায়ী রাখা ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মাটিকে শুষ্ক (ও অনুর্বর) হওয়ার পর সঞ্জীবিত (ও উর্বর) করে, তবে তারা (জওয়াবে) অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, আলহামদুলিল্লাহ্ (এতটুকু তো স্বীকার করলে, যদদ্বারা ইবাদতগত তাওহীদও পরিষ্কার বুঝা যায়। কিন্তু তারা মানে না;) বরং (তদুপরি) তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। (জ্ঞান নেই, এ কারণে নয়, বরং তারা জ্ঞানকে কাজে লাগায় না এবং চিন্তাভাবনাও করে না ফলে জাজ্বল্যমান বিষয়ও তাদের অবোধগম্য থেকে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফিরদের শত্রুতা, তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্য কাফিরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন ঃ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ —আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফিররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্‌র জন্য সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত দুই প্রকার আশংকা ও বাধার সম্মুখীন হয়। এক. নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফিররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্ধত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফিরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশঙ্কার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ —অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মু'মিনের কাজ হতে পারে না। হিফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে

অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষত আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে ঃ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا الخ

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুযী-রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে ? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবন নির্বাহ কিরূপে হবে ? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে ঃ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ—অর্থাৎ চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীবজন্তু আছে, যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীবজন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে। কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা অন্য খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পশুপক্ষী সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেতখোলা, না আছে জমি ও বিষয়সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেট-চুক্তি খাদ্য লাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়—বরং তাদের আজীবনের কর্মধারা।

রিযিকের আসল উপায় আল্লাহ্র দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, স্বয়ং কাফিরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে ? চন্দ্র সূর্য কার আজ্ঞাধীন পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে ? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে ? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহ্রই কাজ। আপনি বলুন, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর ?

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজসরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্র দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য

দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয় ? হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-র ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর "ফরযে আইন" ছিল। অবশ্যি যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়, মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হতো না এবং তার সাথে কাফিরের অনুরূপ ব্যবহার করা হতো। সূরা নিসার ৮৯ নং আয়াতে অর্থাৎ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কালেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কালেমা যেমন ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কালেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ —থেকে فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন মক্কা স্বয়ং দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এই মর্মে আদেশ জারি করেন ঃ لا هجرة بعد الفتح ঃ অর্থাৎ মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফিকাহ্‌বিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাস'আলা চয়ন করেছেন ঃ

মাস'আলা ঃ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব; তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই পাওয়া না যায়, তাহলে এমতাবস্থায় তার ওযর আইনত গ্রহণীয় হবে।

মাস'আলা ঃ কোন দারুল কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্য দারুল

কুফর হওয়া জরুরী নয়, বরং 'দারুল ফিস্‌ক' (পাপচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেজ ইবনে হাজর ফতহুল বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মুসনাদে আহমাদে আবূ ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ البلاد بلاد الله والعباد عباد الله حيثما احبت خيرا فاقم— অর্থাৎ সব নগরীই আল্লাহ্‌র নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহ্‌র বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।—(ইবনে কাসীর)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপক হারে গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গুনাহ্ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।—(ইবনে কাসীর)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৪) এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। (৬৫) তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (৬৬) যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং

ভোগবিলাসে ডুবে থাকে। সত্বরই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করবে ? (৬৮) যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার চাইতে অধিক বে-ইনসাফ আর কে ? (৬৯) যারা আমার জন্য অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের চিন্তাভাবনা না করার কারণ দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা। অথচ) এই পার্থিব জীবন, (যার এত কর্মব্যস্ততা প্রকৃতপক্ষে) ক্রীড়াকৌতুক বৈ কিছুই নয়। পর জগতই প্রকৃত জীবন। (দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং পরকাল অক্ষয়, এ থেকে উভয় বিষয়বস্তু পরিস্ফুট। সুতরাং অক্ষয়কে বিস্মৃত হয়ে ধ্বংসশীলের মধ্যে এতটুকু মগ্নতা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।) যদি তারা এ সম্পর্কে (যথেষ্ট) জানত, তবে এরূপ করত না। (অর্থাৎ ধ্বংসশীলের মধ্যে মগ্ন হয়ে চিরস্থায়ীকে বিস্মৃত হতো না; বরং তারা চিন্তাভাবনা করে বিশ্বাস স্থাপন করত; যেমন তারা স্বয়ং স্বীকার করে যে, জগৎ সৃষ্টি ও একে স্থায়ী রাখার কাজে আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই।) অতঃপর (তাদের এই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী খোদায়ীতে ও ইবাদতে তাকেই একক (মেনে নেওয়া ও তা প্রকাশ করা উচিত ছিল। (সেমতে) যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে (এবং নৌকা টালমাটাল করতে থাকে) তখন একাগ্রচিত্তে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকতে থাকে।

لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ (اى الموحدين) —এতে খোদায়ী ক্ষমতা ও উপাস্যতায়ও তাওহীদের স্বীকারোক্তি রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মগ্নতার কারণে এই অবস্থা তেমন টেকসই হলো না। সেমতে) অতঃপর যখন তাদেরকে (বিপদ থেকে) উদ্ধার করে স্থলের দিকে নিয়ে আসে, তখন অনতিবিলম্বেই তারা শিরক করতে থাকে। এর সারমর্ম এই যে, আমি যে নিয়ামত (মুক্তি ইত্যাদি) তাদেরকে দিয়েছি তাকে অস্বীকার করে। তারা (শিরক বিশ্বাস ও পাপাচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে) আরও কিছুকাল ভোগবিলাসে মত্ত থাকুক। সত্বরই তারা সব খবর জানতে পারবে। (এখন দুনিয়ায় মগ্নতার কারণে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাওহীদের পথে তাদের এক অন্তরায় তো হচ্ছে এই মগ্নতা। দ্বিতীয় অন্তরায় হচ্ছে তাদের আবিষ্কৃত একটি অযৌক্তিক অপকৌশল। তারা বলে ঃ إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا —অর্থাৎ আমরা মুসলমান হয়ে গেলে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে। অথচ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এর বিপরীতে। সেমতে তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের মক্কা নগরীকে) নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি? এর চতুষ্পার্শ্বে (হারমের বাইরে) যারা আছে, তাদেরকে (মারধর করে গৃহ থেকে) বহিষ্কার করা হচ্ছে। (এর

বিপরীতে তারা শান্তিতে দিনাতিপাত করছে। এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তারা জাজ্বল্যমান বিষয়াদি অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে বিরোধিতা করে এবং ধ্বংসের ভয়কে ঈমানের পথে ওযররূপে ব্যক্ত করে। সত্য প্রকাশের পর এ বোকামি ও জেদের কি কোন ইয়ত্তা আছে যে,) তারা মিথ্যা উপাস্যে তো বিশ্বাস করে যাতে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই (বরং পরিপন্থী অনেক) এবং আল্লাহ্র (যার প্রতি বিশ্বাস করার অনেক কারণ ও প্রমাণ আছে, তাঁর) নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে। (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে শিরক করে। কেননা শিরকের চাইতে নিয়ামতের বড় কোন অস্বীকৃতি আর নেই। বাস্তব কথা এই যে,) সেই ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে হবে, যে (প্রমাণ ব্যতিরেকে) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে (যে, তাঁর শরীক আছে। এবং) যখন তার কাছে সত্য (প্রমাণসহ) আগমন করে, তখন তাকে অস্বীকার করে। (প্রমাণহীন কথাকে সত্য মনে করা এবং প্রামাণ্য কথাকে মিথ্যা মনে করা যে যুলুম, তা বলাই বাহুল্য। যারা এত বেইনসাফ) কাফির, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম নয় কি ?) অর্থাৎ অবশ্যই তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কেননা যেমন অপরাধ তেমনি শাস্তি হয়ে থাকে। মহা অপরাধের মহা শাস্তি। এ পর্যন্ত কাফির ও প্রবৃত্তি-পূজারীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন তাদের বিপরীতদের কথা বলা হচ্ছে) যারা আমার পথে শ্রম স্বীকার করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নৈকট্য ও সওয়াব অর্থাৎ জান্নাতের) পথে পরিচালিত করব। (ফলে তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا الخ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত) সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গী (দুনিয়াতেও এবং পরকালেও।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তদ্দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, এ কথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ —অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়: বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ কারবার সূচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তাভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَّاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ এখানে حيوان শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।—(কুরতুবী)

এতে পার্থিব জীবনকে ক্রীড়া-কৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়া-কৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্‌কে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং উহা নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্য কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবূল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালিমরা যখন তীরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফিরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহ্‌কেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরও দোয়া কবূল করে নেন। কেননা সে مضطر তথা অসহায়। আল্লাহ্ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবূল করার ওয়াদা করেছেন।-(কুরতুবী)

অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ অর্থাৎ কাফিরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফিররা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবূল করা হবে না।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا الاية — উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তাঁর খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হতো যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে।—(রূহুল মা'আনী)

এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসারশূন্য। আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্র কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে তা জুটেনি। আল্লাহ্ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হারেম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মু'মিন কাফির নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এতে খুন-খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোন ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোড়া অজুহাত বৈ নয়।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا — جهاد এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফির ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভাল মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে কোন্ পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বরে দেন, অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সেই পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলে ইল্‌ম বাড়ে ঃ এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবুদ্দারদা বলেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্য যারা জিহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই।—(মাযহারী) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

سُوْرَةُ الرُّوْمِ

সূরা আর-রূম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ
وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚۖ
وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ, লাম, মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে (৩) নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতি সত্বর বিজয়ী হবে, (৪) কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহ্‌র হাতেই। সেদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে (৫) আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) রোমকরা একটি নিকটবর্তী অঞ্চলে (অর্থাৎ রোম দেশের এমন এক অঞ্চলে, যা পারস্যের তুলনায় আরবের নিকটবর্তী।

[অর্থাৎ আযরুয়াত ও বুস্‌রা। এগুলো শাম দেশের দুইটি শহর। (কামূস) রোম সাম্রাজ্যের অধীন হওয়ার কারণে এগুলোকে রোমের অঞ্চল বলা হতো। এই স্থানে রোমকরা পারসিকদের মুকাবিলায়] পরাজিত হয়েছে। (ফলে মুশরিকরা হর্ষোৎফুল্ল হয়েছে।) কিন্তু তারা (রোমকরা) তাদের (এই) পরাজয়ের পর অতি সত্বর (পারসিকদের বিপক্ষে অন্য যুদ্ধে) তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। (এই পরাজয় ও জয় সব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। কেননা পরাজিত হওয়ার) পূর্বেও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতেই ছিল (ফলে তাদেরকে পরাজিত করে দিয়েছিলেন) এবং (পরাজিত হওয়ার) পশ্চাতেও (আল্লাহ্‌ই ক্ষমতাবান। ফলে তিনি বিজয়ী করে দিবেন।) সেই দিন (অর্থাৎ যেদিন রোমকরা বিজয়ী হবে,) মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র এই সাহায্যের কারণে আনন্দিত হবে। (এই সাহায্য বলে হয় এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের কথায় সত্যবাদী ও বিজয়ী করবেন। কারণ, মুসলমানরা এই ভবিষ্যদ্বাণী কাফিরদের কাছে প্রকাশ করেছিল এবং কাফিররা এ কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছিল। কাজেই মুসলমানদের কথা অনুযায়ী রোমকরা বিজয়ী হলে মুসলমানদের জিত হবে। না হয় একথা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদেরকেও যুদ্ধে জয়ী করা হবে। সেমতে বদরযুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে জয়ী করা হয়েছিল। সর্বাবস্থায় সাহায্যের পাত্র মুসলমানগণই। মুসলমানদের বাহ্যিক পরাজয়ের অবস্থা দেখে কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের বিজয়কে অসম্ভব মনে করা ঠিক নয়। কেননা সাহায্য আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।) তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন। তিনি পরাক্রমশালী (কাফিরদেরকে যখন ইচ্ছা কথায় কিংবা কাজে পরাভূত করে দেন এবং) পরম দয়ালু (মুসলমানদেরকে যখন ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন।) আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (এবং) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না (তাই এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হবে)। কিন্তু অধিকাংশ লোক (আল্লাহ্ তা'আলার কার্যক্ষমতা) জানে না। (বরং শুধু বাহ্যিক কারণাদি দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে তারা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অবান্তর মনে করে। অথচ কারণাদির নিয়ন্ত্রক ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। কারণ পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সহজ এবং কারণের বিপক্ষে ঘটনা ঘটানোও সহজ।

ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার পূর্বে যেমন বাহ্যিক কারণাদির অনুপস্থিতির কারণে তারা তা অস্বীকার করে, তেমনি, ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ হতে দেখেও তারা একে দৈবাৎ ঘটনা মনে করে। তারা একে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন মনে করে না। তাই لَا يَعْلَمُوْنَ শব্দে উভয় বিষয় দাখিল আছে। তারা যে আল্লাহ্ তা'আলা ও নবুয়ত সম্পর্কে গাফেল, এর কারণ এই যে,) তারা কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জ্ঞাত এবং পরকালের ব্যাপারে (সম্পূর্ণ) বেখবর। (সেখানে কি হবে, তারা তা জানে না। ফলে দুনিয়াতে তারা আযাবের কারণাদি থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করে না এবং মুক্তির কারণাদি তথা ঈমান ও সৎকর্মে ব্রতী হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পরসিকদের যুদ্ধের কাহিনী ঃ সূরা 'আনকাবুতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ্

তাদের জন্য তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্য উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই আল্লাহ্র সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল কাফির। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফির দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খ্রিস্টান আহ্লে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি–যথা পরকালে বিশ্বাস, রিসালাত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কোরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ঃ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الاية। আহ্লে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে-হাজর প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শামদেশের আযরুআত ও বুস্রার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হলো এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনস্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহ্লে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।—(ইবনে-জারীর ইবনে আবী হাতেম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খাল্ফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র দুশমন তুই-ই মিথ্যাবাদী।

আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয় তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হলো (বলা বাহুল্য, এটা ছিল জুয়া; কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না)। একথা বলে হযরত আবূ বকর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলে করীম (সা) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্য بضع سنين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ উষ্ট্রীর বাজি রাখছি; কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবূ বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হলো।—(ইবনে জারীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবূ বকর তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উষ্ট্রী দাবি করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবূ বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবূ বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবূ বকর (রা) বাজিতে গেলেন এবং একশ উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবূ ইয়ালা ও ইবনে আসাকিরে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে ঃ هذا السحت تصدق به। এটা হারাম। একে সদকা করে দাও।—(রূহুল-মা'আনী)

জুয়া ঃ কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে "শয়তানী অপকর্ম" আখ্যা দেওয়া হয়।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

ميسر ও ازلام। বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা) উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে যে দু'তরফা লেনদেন ও হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سحت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফিকাহ্‌বিদগণ এর জওয়াবে

বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল; কিন্তু জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবূ বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) কখন-ও মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়ায়েতে سحت শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমত হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ্ মেনে নেয়া হয়, তবে سحت শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয়।এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ كسب الحجام سحت এখানে অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে سحت-এর অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে আসীর 'নিহায়া' গ্রন্থে শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফিকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরী যে, বাস্তবে এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌঁছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এ ক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এরূপ কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ—অর্থাৎ যে দিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেই দিন আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত এখানে রোমকদের সাহায্য বুঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফির ছিল, কিন্তু অন্য কাফিরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর, বিশেষত, যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বুঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। এক. মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ রূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। দুই. তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফিরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একেকে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। —(রূহুল মা'আনী)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, তবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে--এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ

সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয় ; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্য এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলা বাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।

এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। يَعْلَمُوْنَ এর সাথে ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে ظَاهِرًا-কে نكره এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না—এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় ঃ কোরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশালী ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ কিছুই নয়। কোরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ্ ও পরকাল চিনে, তার জন্য আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে—জীবনের লক্ষ্য বানায় না। إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا الاية আয়াতে অর্থ তাই।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ

كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوا السُّوْٓاٰۤى

اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পরকালের বাস্তবতার প্রমাণাদি শুনেও কি তাদের দৃষ্টি ইহকালে নিবদ্ধ রয়েছে এবং) তারা কি মনে মনে চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন? (তিনি আয়াতসমূহে খবর দিয়েছেন যে, যথাযথ কারণাদির মধ্য থেকে একটি হচ্ছে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া। নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে কিয়ামত। তারা যদি মনে মনে চিন্তা করত, তবে এসব ঘটনার সম্ভাব্যতা যুক্তি দ্বারা, বাস্তবতা কোরআন দ্বারা এবং কোরআনের সত্যতা অলৌকিকতা দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে যেত। ফলে তারা পরকাল অস্বীকার করত না। কিন্তু চিন্তা না করার কারণে অস্বীকার করেছে। এটাই কি, আরও) অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি (কোন সময় বাড়ি থেকে বের হয় না, এবং) পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের (সর্বশেষে) পরিণাম কি হয়েছে? (তাদের অবস্থা ছিল যে,) তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন (তাদের চাইতে বেশি) চাষ করত এবং তারা যতটুকু (সাজসরঞ্জাম ও গৃহ দ্বারা) এটা আবাদ করছে, তারা এর চেয়ে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ মু'জিযা নিয়ে আগমন করেছিল। (তারা সেগুলো মানল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ধ্বংসের চিহ্ন শাম দেশের পথে অবস্থিত নির্জন গৃহাদি থেকে সুস্পষ্ট।) বস্তুত (এই ধ্বংসে) আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার করে তারা ধ্বংসের যোগ্য হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা। অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, (পরকালে) তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ (শুধু) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহকে (অর্থাৎ নির্দেশাবলী ও সংবাদাদিকে) মিথ্যা বলত এবং (তদুপরি) সেগুলো নিয়ে উপহাস করত (দোযখের শাস্তি হচ্ছে তাদের সে পরিণাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। এ কথাও বলা বাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরী। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী। এ কথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয় ; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসিখুশী জীবন যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। এই সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তাভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়—ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগৎ আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ এই বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে,

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শাম ও ইয়ামনে সফর করে—এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তদ্দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তদ্দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ করে নি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আযাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য

দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে চিন্তা কর, এই আযাবে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন যুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আযাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ
السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ
شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ
يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ
رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ
الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ
تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾ ع

(১১) আল্লাহ্‌ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে! (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে ; (১৬) আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। (১৭) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে, (১৮) এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা। (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা মখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায়ও সৃষ্টি করবেন। এরপর (সৃজিত হওয়ার পর) তোমরা তার কাছে (হিসাব-নিকাশের জন্য) প্রত্যাবর্তিত হবে। যে দিন কিয়ামত হবে (যাতে উপরোক্ত পুনরুজ্জীবন সম্পন্ন হবে) সেদিন অপরাধীরা (কাফিররা) হতভম্ব হয়ে যাবে (অর্থাৎ কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলতে পারবে না) এবং তাদের (তৈরি) দেবতাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না। (তখন) তারা (ও) তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (বলবে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ যে দিন কিয়ামত হবে, সেদিন উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও আরও একটি ঘটনা ঘটবে এই যে, বিভিন্ন মতের) সব মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, তারা তো জান্নাতে আরামেই থাকবে আর যারা কুফর করেছিল এবং আয়াতসমূহ ও পরকালের ঘটনাকে মিথ্যা বলেছিল, তারা আযাবে গ্রেফতার হবে। (বিভক্ত হওয়ার অর্থ তাই। বিশ্বাস ও সৎকর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যখন তোমাদের জানা হয়ে গেছে,) অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর (বিশ্বাসগত ও অন্তরগতভাবে অর্থাৎ ঈমান আন, উক্তিগতভাবে অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ কর ও তার যিকর কর এবং কার্যগতভাবে অর্থাৎ সব ইবাদত—ইত্যাদি সম্পন্ন কর, বিশেষত ও নামায কায়েম কর। মোটকথা, তোমরা সর্বদা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর ; বিশেষ করে) সন্ধ্যায় ও সকালে। (আল্লাহ্ বাস্তবে পবিত্রতা বর্ণনার যোগ্যও ; কেননা,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা (অর্থাৎ নভোমণ্ডলে ফেরেশতা এবং ভূমণ্ডলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ কাজেই তিনি যখন এমন সর্বগুণসম্পন্ন সত্তা, তখন তোমাদেরও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা উচিত।) এবং অপরাহ্নে (পবিত্রতা বর্ণনা কর) ও মধ্যাহ্নে (পবিত্রতা বর্ণনা কর। এসব সময়ে নিয়ামত নবায়িত হয় এবং কুদরতের চিহ্ন অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। কাজেই এসব সময়ে পবিত্রতার নবায়ন উপযুক্ত। বিশেষত নামাযের জন্য এ সময়গুলোই নির্ধারিত। مَسَاء শব্দের মধ্যে মাগরিব ও এশা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। عَشِي শব্দের মধ্যে যোহর ও আসর উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু যোহর পৃথকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় শুধু আসর অন্তর্ভুক্ত আছে। সকালও পৃথকভাগে উল্লিখিত হয়েছে। পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয় ; কেননা, তাঁর শক্তি এমন যে,) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন (যেমন শুক্রবীর্য ও ডিম্ব থেকে মানুষ এবং ছানা ; আবার মানুষ ও পক্ষী থেকে শুক্র ও ডিম্ব) এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর (অর্থাৎ শুষ্ক হওয়ার) পর জীবিত (অর্থাৎ সজীব ও শ্যামল) করেন। এভাবেই তোমরা (কিয়ামতের দিন) কবর থেকে উত্থিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ — يُحْبَرُوْنَ শব্দটি حَبُوْر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস। জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবাই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ অর্থাৎ দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্য জান্নাতে চক্ষু

শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তু উল্লেখ করেছেন! এগুলো সব এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

سبحان শব্দটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহ্য আছে অর্থাৎ سبحوا الله سبحانا حِيْنَ تُمْسُوْنَ অর্থাৎ সন্ধ্যায় حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ সকালে وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ—এই বাক্যটি প্রমাণ হিসাবে মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরী। কারণ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষ ভাগে عَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্নে তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়।

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবত এই যে, আসরের সময় সাধারণত কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তসবীহ্ অথবা নামায সম্পন্ন করা স্বভাবত কঠিন। এ কারণেই কোরআনে صلوة وسطى তথা আসরের নামাযের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উক্তিগত ও কর্মগত যিকর এর অন্তর্ভুক্ত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে। যিকরের যত প্রকার আছে তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন, এই আয়াতে পাঞ্জেগানা নামায ও সে সবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কোরআন পাঞ্জেগানা নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিবের নামায, حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ শব্দের ফজরের নামায, عَشِيًّا শব্দে আসরের নামায এবং وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ শব্দে যোহরের নামায উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ আছে অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামায ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কোরআন পাকে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে ঃ وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى—হযরত ইবরাহীম (আ) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবূ দাঊদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, فَسُبْحَانَ اللهِ থেকে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত এই তিন আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে তার সারাদিনের আমলের ত্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেওয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে তার রাত্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর করে দেওয়া হয়।—(রূহুল মা'আনী)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

(২০) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২২) তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তাঁর আরও নিদর্শন ঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৪) তাঁর আরও নিদর্শন—তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে ওঠার জন্য তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। (২৬) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। (২৭) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। (হয় এ কারণে যে, আদম মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে সমস্ত বংশধর লুক্কায়িত ছিল ; না হয় এ কারণে যে, বীর্যের মূল উপাদান খাদ্য। চার উপাদানে খাদ্য গঠিত, যার প্রধান উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।)অতঃপর অল্প পরেই তোমরা মানুষ হয়ে (পৃথিবীতে) বিচরণ করছ। তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, (উপকার এই,) যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (কেননা, প্রমাণ করার জন্য চিন্তা দরকার। 'নিদর্শনাবলী' বহুবচন ব্যবহার করার কারণ এই যে, উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে বহুবিধ প্রমাণ নিহিত রয়েছে।) তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। (ভাষা বলে হয় শব্দাবলী বুঝানো হয়েছে, না হয় আওয়াজ ও বাচনভঙ্গি)। এতে জ্ঞানীদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে (এখানেও বহুবচন আনার কারণ তাই)। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন রাতে ও দিনভাগে তোমাদের নিদ্রা (যদিও রাতে বেশি ও দিনে কম ঘুমাও) এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ (যদিও দিনে বেশি এবং রাতে কম অন্বেষণ কর। এ কারণেই অন্যান্য আয়াতে নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং কৃপা অন্বেষণকে দিনের

সাথে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে)। এতে (প্রমাণাদি মনোযোগ সহকারে) শ্রোতা লোকদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলীরূপে রয়েছে। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি (সৃষ্টির সময়) তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যাতে)তার পতিত হওয়ার) ভয়ও থাকে এবং (তদ্দ্বারা বৃষ্টির) আশাও হয়। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা মৃত্তিকার মৃত (অর্থাৎ শুষ্ক) হওয়ার পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সজীব) করেন। এতে (উপকারী) বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে (অর্থাৎ ইচ্ছায়) আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে (এতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থায়িত্বের বর্ণনা আছে এবং উপরে خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الخ আয়াতে সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় বর্ণিত হয়েছিল। তোমাদের জন্ম ও বংশবিস্তার, পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক, আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতিষ্ঠা, ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য দিবারাত্রির পরিবর্তনে নিহিত উপকারিতা, বারিবর্ষণ এবং এর সূচনা ও চিহ্নের বিকাশ, বিশ্বের উল্লিখিত এসব ব্যবস্থাপনা ততক্ষণ কায়েম থাকবে, যতক্ষণ দুনিয়া কায়েম রাখা উদ্দেশ্য।একদিন এগুলো সব খতম হয়ে যাবে।) অতঃপর (তখন এই হবে যে,) যখন তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে ডাক দেবেন, তখন তোমরা একযোগে উঠে আসবে (এবং অন্য ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়ে যাবে, যা এখানে আসল উদ্দেশ্য। উপরে শক্তির নিদর্শনাবলী থেকে জানা হয়ে থাকবে যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু (ফেরেশতা, মানব ইত্যাদি) আছে সব তাঁরই (মালিকানাধীন)। সব তাঁরই আজ্ঞাবহ (কুদরতের অধীন) এবং (এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন (এটা কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত)। অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এটা (অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি) তাঁর জন্য (মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে) সহজ। (যেমন মানবিক স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে সাধারণ রীতি এই যে, কোন বস্তু প্রথমবার তৈরি করার চাইতে দ্বিতীয়বার তৈরি করা সহজ।) আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ। (আকাশে তাঁর মত সহায় কেউ নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। আল্লাহ্ বলেন, (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) তিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ও) প্রজ্ঞাময়। (উপরে বর্ণিত কার্যাবলী থেকে শক্তি ও প্রজ্ঞা উভয়ই প্রকাশমান। সুতরাং তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এতে যে বিরতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে প্রজ্ঞা ও উপকারিতা নিহিত আছে । সুতরাং শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রমাণিত হওয়ার পর এখনই পুনর্বার সৃষ্টি না হওয়ার কারণে একে অস্বীকার করা মূর্খতা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফিরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ

করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গম্বরদের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহ এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলী' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

আল্লাহ্র কুদরতের প্রথম নিদর্শন ঃ মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এটিই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, এ কথা হযরত আদম (আ)-এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তন্মোধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

আল্লাহ্র কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন ঃ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষদের সঙ্গিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দুইটি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্র পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্য এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটি মাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলা বাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও

পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতিনীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি ; এর জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া জরুরী ঃ আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য--মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তা-ই করা হয়েছে অর্থাৎ একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহ্ভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বত্র اتقوا الله - واخشوا ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে, কোন আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না এবং কোন আদালতও এ ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন পাকের সেই সব আয়াত মনোনীত করেছেন, যেগুলোতে আল্লাহ্ভীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহ্ভীতিই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের জামিন হতে পারে।

তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেননি ; বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রূপ করা হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেননি ; বরং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি ও দয়া গ্রথিত করে দিয়েছেন। مودت ও ود এর শাব্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালবাসা ও প্রীতি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—এক. مودت ও দ্বিতীয় رحمت। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত আছে যে, مودت তথা ভালবাসার সম্পর্ক যৌবনকালের সাথে। এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্যে যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বভাবগত হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

এরপর বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ —অর্থাৎ এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়—বহু নিদর্শন।

আল্লাহ্র কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন ঃ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য ; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হল্দেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষায় বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্ন রূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও এক রূপ। تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানবজাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেওয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী, ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা ও এবংবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে। إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ অর্থাৎ এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ্র কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন ঃ মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাতে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাতে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্য স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোন কোন তফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ সংসার-বিমুখতা এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দান। আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোন কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে ; কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিযিকদাতা হিসাবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ অর্থাৎ যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণ সম্ভবত এই যে, দৃশ্যত নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যই উপকারী, যারা পয়গম্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়—কোন হঠকারিতা করে না।

আল্লাহ্‌র কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন ঃ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টি দ্বারা শুষ্ক ও মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ অর্থাৎ এতে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বুঝা যেতে পারে।

আল্লাহ্‌র কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন ঃ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বুঝানোর জন্য এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ —যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার مـثـل বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মত হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার যে مـثـل আছে, একথা কোরআনের কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ কিন্তু مثل ও مثال থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا

أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم
مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

(২৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের আমি যে রুযী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যেরূপ নিজেদের লোককে ভয় কর? এমনিভাবেই আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (২৯) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বুঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, (৩২) যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল নাযিল করেছি,

যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদের কোন দুর্দশা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৮) আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুশরিকদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে—এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৪০) আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (শিরককে নিন্দনীয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (দেখ) তোমাদের আমি যে মাল দিয়েছি, তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের শরীক যে, তোমরা ও তারা (ক্ষমতার দিক দিয়ে) তাতে সমান হও এবং যাদের (কাজ কর্মের সময়) এতটুকু খেয়াল রাখ, যেমন নিজেদের (স্বাধীন শরীক) লোকদের খেয়াল রাখ এবং তাদের অনুমতি নিয়ে কাজকর্ম কর অথবা কমপক্ষে বিরোধিতারই ভয় কর। বলা বাহুল্য, দাসদাসীরা এমন শরীক হয় না। সুতরাং তোমাদের দাস তোমার মত মানুষ এবং অন্য অনেক বিষয়ে তোমার সমকক্ষ ও তোমারই মত। পার্থক্য কেবল এক বিষয়ে ; তুমি ধনদৌলতের অধিকারী—সে অধিকারী নয়। এতদসত্ত্বেও সে যখন তোমার বিশেষ কাজ-কারবারে তোমার অংশীদার হতে পারে না, তখন তোমাদের মিথ্যা দেবদেবী, যারা আল্লাহ্র দাস এবং কোন সত্তাগত ও গুণগত দিক দিয়েই আল্লাহ্র সমতুল্য নয় ; বরং কোন কোনটি আল্লাহ্র সৃষ্টদের হাতে গড়া, তারা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক কিরূপে হতে পারে? আমি যেমন শিরককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এই প্রমাণ বর্ণনা করেছি।) এমনিভাবে আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (তদনুযায়ী তাদের উচিত ছিল সত্যের অনুসরণ করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা ; কিন্তু তারা সত্যের অনুসরণ করে না।) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা (কোন বিশুদ্ধ) প্রমাণ ছাড়াই (শুধু) নিজেদের (মিথ্যা) খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। অতএব আল্লাহ্ যাকে (হঠকারিতার কারণে) পথভ্রষ্ট করেন তাকে কে বুঝাবে? [এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে ক্ষমার্হ ; বরং উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কাজ আপনি করেছেন। যখন এই পথভ্রষ্টদের আযাব হবে, তখন] তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (উপরের বিষয়বস্তু থেকে যখন তাওহীদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তখন প্রত্যেক

ব্যক্তিকেই বলা হচ্ছে,) তুমি (মিথ্যা ধর্ম থেকে) একমুখী হয়ে নিজেকে (সত্য) ধর্মের উপর কায়েম রাখ। সবাই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতর অনুসরণ কর, যে যোগ্যতার উপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (আল্লাহ্র ফিতরাত'-এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই যোগ্যতা রেখেছেন যে, সে যদি সত্যকে শুনতে ও বুঝতে চায়, তবে বুঝতে সক্ষম হয়। এর অনুসরণের অর্থ, এই যোগ্যতাকে কাজে লাগানো এবং তদনুযায়ী আমল করা। মোটকথা, এই ফিতরাত অনুসরণ করা দরকার এবং) যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। অতএব সরল ধর্ম (-এর পথ) এটাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে) জানে না (ফলে এর অনুসরণ করে না। মোটকথা,) তোমরা আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে ফিতরাতের অনুসরণ কর, তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর বিরোধিতা ও বিরোধিতার শাস্তিকে) ভয় কর—এবং (ইসলাম গ্রহণ করে) নামায কায়েম কর—(এটাও কার্যত তাওহীদ,) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে (অর্থাৎ সত্য ছিল এক এবং মিথ্যা অনেক। তারা সত্য ত্যাগ করে মিথ্যার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এটাই খণ্ড-বিখণ্ড করা অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পথ ধরেছে) এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। (সত্যের উপর থাকলে একই দল থাকত। সত্যত্যাগী সবগুলো পথ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও) প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। যে তাওহীদের প্রতি আমি আহ্বান করি, তা অস্বীকার করা সত্ত্বেও বিপদমুহূর্তে মানুষের অবস্থা ও কথার মধ্যে ফুটে ওঠে। এ তাওহীদ যে সৃষ্টিগত, তারও সমর্থন পাওয়া যায়। সে মতে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন (অস্থির হয়ে) তারা তাদের পালনকর্তার অভিমুখী হয়ে তাঁকে ডাকে (অন্য সব দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে ; কিন্তু) অতঃপর (অদূর ভবিষ্যতেই এই অবস্থা হয় যে,) তিনি যখন তাদেরকে কিছু রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল (আবার) তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, যার অর্থ এই যে, আমি তাদেরকে যা কিছু (আরাম আয়েশ) দিয়েছি, তা অস্বীকার করে (এটা যুক্তিগতভাবেও মন্দ)। অতএব আরও কিছুদিন মজা লুটে নাও। এরপর সত্বরই (আসল সত্য) জানতে পারবে। (তারা যে তাওহীদ স্বীকার করার পরও শিরক করে, তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত যে, এর কারণ কি?) আমি কি তাদের কাছে কোন দলীল (অর্থাৎ কিতাব) নাযিল করেছি, যে তাদেরকে আমার সাথে শরীক করতে বলে? (অর্থাৎ তাদের কাছে এর কোন ইতিহাসগত প্রমাণও নেই। তাদের শিরক যে যুক্তিরও পরিপন্থী একথা বিপদমুহূর্তে তাদের স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায়। কাজেই শিরক আদ্যোপান্ত বাতিল। এরপর এই বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট বর্ণিত হচ্ছে ঃ) আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (এমন) আনন্দিত হয় (যে, আনন্দে মত্ত হয়ে শিরক শুরু করে দেয় ; যেন উপরে বর্ণিত হয়েছে।) আর তাদের কু-কর্মের ফলে যদি তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (এখানে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই পরিশিষ্টের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য প্রথম বাক্য اِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ। এতে বলা হয়েছে যে, তাদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ আনন্দে মত্ত হওয়া। দ্বিতীয় বাক্যটি কেবল বৈপরীত্য প্রকাশ করার জন্য আনা হয়েছে। কেননা, উভয় অবস্থায় একটুকু প্রমাণিত হয়

যে, এর সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে কম ও দুর্বল। সামান্য বিষয়ও এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়। এরপর তার দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ (এরা যে শিরক করে, তবে) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। (মুশরিকরা একথা স্বীকারও করত যে, রুযীর হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র কাজ। এক আয়াতে আছে ঃ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا الخ) এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য (তাওহীদের নিদর্শনাবলী রয়েছে। (অর্থাৎ তারা বুঝে এবং অন্যরাও বুঝে যে, যে এরূপ সর্বশক্তিমান হবে, সে-ই উপাসনার যোগ্য হবে) অতএব (যখন জানা গেল যে, রুযীর হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে, তখন এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, কার্পণ্য করা নিন্দনীয়। কেননা, কৃপণতা দ্বারা অবধারিত রিযিকের বেশি পাওয়া যাবে না। তাই সৎ কাজে ব্যয় করতে কৃপণতা করবে না ; বরং) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও (তাদের প্রাপ্য দাও।) এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (আমি যে বলেছি, 'এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে'-এর কারণ এই যে,) এই যে, আমার কাছে ধন-সম্পদ ব্যয় করাই কৃতকার্যতার কারণ নয় ; বরং এর আইন এই যে, যা কিছু তোমরা (দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে, যেমন কাউকে কোন কিছু) এই আশায় দেবে যে, তা মানুষের ধন-সম্পদে (শামিল হয়ে অর্থাৎ তাদের মালিকানায় ও অধিকারে) পৌঁছে তোমাদের জন্য বেশি (হয়ে) আসবে, (যেমন বিবাহ্ ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে প্রায়ই এই উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ দেওয়া হয় যে, আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আরও কিছু বেশি শামিল করে আমাদেরকে দেবে।) আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। (কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে কেবলমাত্র সেই ধন-সম্পদই পৌঁছে ও বৃদ্ধি পায়, যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়। হাদীসেও বলা হয়েছে, একটি মকবূল খেজুর ওহুদ পাহাড়ের চাইতেও বেশি বেড়ে যায়। যেহেতু উপরোক্ত ধন-সম্পদে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়ত থাকে না। কাজেই কবূলও হয় না, বাড়েও না) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদের মধ্যে যারা যাকাত (ইত্যাদি) দিয়ে থাকে, তারাই আল্লাহ্‌র কাছে (তাদের প্রদত্ত ধন) বৃদ্ধি করতে থাকবে। (আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ রিযিকদাতা। সুতরাং এই বিষয়বস্তু তাওহীদকে জোরদার করার একটি উপায়। তাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এখানে তাওহীদ বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য, তাই এরপর তাওহীদই বর্ণিত হচ্ছে)

আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর (কিয়ামতে) তোমাদের জীবিত করবেন। (এগুলোর মধ্যে কোন কোন বিষয় কাফিরদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং কোন কোনটি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। মোটকথা, আল্লাহ্ এমনি শক্তিশালী, এখন বল), তোমাদের দেবদেবীদের মধ্যেও এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটি করতে পারে? (বলা বাহুল্য, কেউ নেই। কাজেই প্রমাণিত হলো যে) আল্লাহ্ তাদের শিরক থেকে পবিত্র ও মহান (অর্থাৎ তাঁর কোন শরীক নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা সব বিষয়ে তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেও অধিকার দাও না। কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগৎ আল্লাহ্র সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা তাঁর শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর?

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার ; কিন্তু প্রতিপক্ষ কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

তৃতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

فِطْرَةَ اللّٰهِ ـــ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُবাক্যটি পূর্ববর্তী فاقم বাক্যের ব্যাখ্যা এবং دين حنيف-এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ دين حنيف হচ্ছে دين فطرت। পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ফিতরাত বলে সেই ফিতরাত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে ? এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

এক. ফিতরাত বলে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতামাতা তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এ এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

দুই. ফিতরাত বলে যোগ্যতা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। এক. এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে ঃ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এখানে خلق الله বলে পূর্বোল্লিখিত فطرة الله-কেই বুঝানো হয়েছে।

কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র এই ফিতরাতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতামাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান করে দেয়। যদি ফিতরাতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ হবে ? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফির বেশি পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরাত হলে এই পরিবর্তন নিরূপে ও কেন ?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিযির (আ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরাতে কুফর ছিল। তাই খিযির (আ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরাতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরী। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হলো না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে ? কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীদের অনুরূপ ফিকাহ্‌বিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতামাতা কাফির হলে সন্তানকেও কাফির ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম তুরপশতী 'মাসাবীহ' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরাতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতামাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফির হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। খিযির (আ)-এর হাতে নিহত বালক কাফির হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বুঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতামাতা সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত ; কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যত মূল ইসলাম নয় ; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বুঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মুহাদ্দিস-ই দেহলভী (র) মেশকাতের টীকা 'লামআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' গ্রন্থে লিখিত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (র)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন মন ও মেযাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদদ্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ

করতে পারে। أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ যে জীবকে স্রষ্টা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ-প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদদ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ—উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ফিতরাত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফির করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ—আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ সংঘটিত হবে না।

বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরয ঃ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ফিতরাতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশির ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করা।

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ—পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামায কায়েম করতে হবে। কেননা, নামায কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ—অর্থাৎ যারা শিরক করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরাত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا —অর্থাৎ এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাবধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাবধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شِيَعًا শব্দটি شِيعَة এর বহুবচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে شِيعَة বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাবধর্ম ছিল তাওহীদ। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতি এক দল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তাওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মাযহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মাযহাবকে

সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ অর্থাৎ প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিযিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এবং হাসান বসরী (র)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আত্মীয়স্বজন, দুই. মিসকীন, তিন. মুসাফির। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ্ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি, কোন অনুগ্রহ নয়।

ذوى القربى বলে বাহ্যত সাধারণ আত্মীয় বুঝানো হয়েছে, মাহ্রাম হোক বা না হোক। حق বলেও ওয়াজিব—যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হোক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হোক—সবই বুঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয় ; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দানও তাদের প্রাপ্য। হযরত হাসান বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হলো আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য।—(কুরতুবী)

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকলে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সদ্ব্যবহার।

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ—এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত একে অপরকে যা দেয়, তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সেও আমাদের সময়ে কিছু দেবে। বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করে উপহার উপঢৌকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা

হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি, এই নিয়তে দেয় যে, তার ধনসম্পদ আত্মীয়ের ধনসম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশি নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহ্র কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাকে এই 'বেশি'-কে رِبوا (সুদ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার।

মাস'আলা ঃ প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগ মত এর প্রতিদান দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কেউ কোন উপঢৌকন দিলে সুযোগ মত তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস—(কুরতুবী) তবে এই প্রতিদানএভাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿৪১﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿৪২﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿৪৩﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿৪৪﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿৪৫﴾

(৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪২) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) যে দিবস আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে-ই দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। (৪৫)যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদের ভালবাসেন না।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শিরক ও গুনাহ্ এমন মন্দ যে,) স্থলে ও জলে (অর্থাৎ সারা বিশ্বে) মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে উদাহরণত (দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা) ; যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান--যাতে তারা (এসব কর্ম থেকে) ফিরে আসে। (অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ "কোন কোন কর্মের" বলার কারণ এই যে, সব কর্মের শাস্তি দিতে গেলে তারা জীবিতই থাকবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ এই অর্থে পূর্বোক্ত আয়াতে وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক গুনাহ্ তো আল্লাহ্ মাফই করে দেন—কোন কোন আমলেরই শাস্তি দেন মাত্র। মোটকথা, কুকর্মই যখন সর্বাবস্থায় শাস্তির কারণ, তখন শিরক ও কুফর তো সর্বাধিক আযাবের কারণ হবে। মুশরিকরা যদি একথা মেনে নিতে ইতস্তত করে, তবে) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্বে যারা (কাফির ও মুশরিক) ছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল। (অতএব দেখ, তারা আল্লাহ্র আযাবে কিভাবে ধ্বংস হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, শিরকের বিপদ ভয়ঙ্কর। কেউ কেউ অন্য প্রকার কুফরে লিপ্ত ছিল, যেমন লূতের সম্প্রদায় ও কারূন এবং বানর ও শূকরে রূপান্তরিত জাতি। আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা এবং নিষেধ অমান্য করার কারণে তারা কুফর ও লানতে লিপ্ত হয়। মক্কার কাফিরদের বিশেষ ও প্রসিদ্ধ অবস্থা 'শিরক' হওয়ার কারণে বিশেষভাবে শিরক উল্লেখ করা হয়েছে। যখন প্রমাণিত হলো যে, শিরক আযাবের কারণ, তখন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) আপনি সরল ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামী তাওহীদের) উপর নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হবে না। (অর্থাৎ দুনিয়াতে বিশেষ আযাবের সময়কে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ওয়াদার উপর পিছিয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি দিন যখন আসবে, তখন একে প্রত্যাহার করবেন না এবং বিরতি ও সময় দেবেন না। এই বাক্যে শিরকের পারলৌকিক শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যেমন ظَهَرَ الْفَسَادُ الخ ও كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الخ বাক্যে ইহলৌকিক শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।) সেদিন (আমলকারী) মানুষ (আমলের প্রতিদান হিসাবে) বিভক্ত হয়ে পড়বে (এভাবে যে,) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে দায়ী এবং নিন্দনীয় কাজ। যারা সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেবেন। যারা সৎকর্ম করছে, তারা নিজেদের লোভের জন্যই উপকরণ তৈরি করে নিচ্ছে : এর ফল হবে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ সৎ লোককে নিজ অনুগ্রহে (উত্তম) পুরস্কার দেবেন–যারা ঈমান এনেছে এবং তারা সৎকর্মও করেছে ; (এবং এ থেকে কাফিররা বঞ্চিত থাকবে ; যা পূর্ববর্তী আয়াতের فعليه كفره থেকে জানা যায়। যার কারণ হলো এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না বরং কুফরের কারণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ — অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী, বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ বিপদ বুঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গুনাহ ও কুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গুনাহ্ আসে।

অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ — অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণ। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ্ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ার বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গুনাহ্ যদিও দুনিয়াতে এসব গুনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেক গুনাহ্র কারণেই বিপদ আসে না, বরং অনেক গুনাহ্ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোন কোন গুনাহ্র কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গুনাহ্র কারণে বিপদ এলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না : বরং অনেক গুনাহ্ তো আল্লাহ্ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না : বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র ; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে ঃ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا যাতে আল্লাহ্ তোমাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফিল মানুষকে সাবধান করা যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্য উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গুনাহের কারণে আসে ঃ তাই কোন কোন আলিম বলেন, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশুপক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গুনাহ্র কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এরা সবাই গুনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই যুলুম করে না ; বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। (রূহুল মা'আনী) কারণ, প্রথমত একজনের যুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও যুলুম করার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়ত তার যুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্বারা সব মানুষই কম বেশি প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জওয়াব ঃ সহীহ্ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা এবং কাফিরের জান্নাত। কাফিরকে তার সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধনসম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মু'মিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ اشد الناس بلاء الانبياء ثم الا مثل فالا مثل —অর্থাৎ দুনিয়াতে পয়গম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ্ হাদীস বাহ্যত আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মু'মিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং কাফিররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গুনাহ্র কারণে হতো, তবে ব্যাপার উল্টা হতো।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গুনাহ্কে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও উপর কোন বিপদ এলে তা একমাত্র গুনাহ্র কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ঔষধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এ স্থলে ঠিক ; কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ঔষধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিরাময়কারী ঔষধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গুনাহ্র কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গুনাহ্র আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গুনাহ্ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়নি যে, গুনাহ্ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর ; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গুনাহ্ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকেই গুনাহ্র ফল সাব্যস্ত করেনি ; বরং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেইসব বিপদাপদকে সাধারণত গুনাহ্র এবং বিশেষত প্রকাশ্য গুনাহ্র ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রজোয্য নয়, বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যও প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই

মুসীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্য রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গুনাহ্গার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। হ্যাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ—যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গুনাহ্ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) **'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'** গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; এক. বাহ্যিক ও দুই. অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বুঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রহ্য বোধগম্য কারণ। অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প, (মৌসুমী বায়ু) যা উপরের বায়ুতে পৌঁছে বরফে পরিণত হয় এবং সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম উভয় প্রকার হতে পারে। কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ক্রটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণ প্রাকৃত-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা, যেমন নমরূদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওযনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্য। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহ আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারও জন্য সুখকর হয় এবং কারও জন্য বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডও বিপদাপদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণ মাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে ; কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব

অভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণ মাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায় কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখশান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে।

এমনিভাবে কোন কোন সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চস্তরের নবী-রাসূল ও ওলীয়ে কামিলের জন্য প্রতিকূল করে তার পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আযাবের মধ্যে পার্থক্য ঃ বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গুনাহ্র শাস্তি দেওয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফ্ফারার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয়ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বুঝা যাবে ? এর পরিচয় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) লিখেছেন যে, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ্ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ঔষধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মত সন্তুষ্ট থাকে ; বরং এর জন্য সে টাকা পয়সাও ব্যয় করে ; সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমনকি, কুফরী বাক্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহ্র প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয় ; বরং মেহেরবানী ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ আল্লাহ্র গযব ও আযাবের আলামত। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيٰحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ

وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ
فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا
فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا
تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ
ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

(৪৬) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও—তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌঁছান ; তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহ্র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২) অতএব আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না এবং

বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুসলমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত, তাওহীদ ও নিয়ামতের) নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি (বৃষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন (এক তো মন প্রফুল্ল করার জন্য এবং) যাতে (এর পরে বৃষ্টি হয় এবং) তিনি তাঁর অনুগ্রহ্ তোমাদের আস্বাদন করান (অর্থাৎ বৃষ্টির উপকারিতা উপভোগ করান) এবং (এ কারণে বায়ু প্রেরণ করেন,) যাতে (এর মাধ্যমে পালের) নৌকাসমূহ তার নির্দেশে বিচরণ করে এবং যাতে বায়ুর সাহায্যে নৌকায় সমুদ্র ভ্রমণ করে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর (অর্থাৎ নৌকা চলা এবং অনুগ্রহ তালাশ করা উভয়ই বাতাস প্রেরণ দ্বারা অর্জিত হয়—প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে এবং দ্বিতীয়টি নৌকার মধ্যস্থতায়) এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (এসব অকাট্য প্রমাণ ও নিয়ামত সত্ত্বেও মুশরিকরা আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ শিরক, পয়গম্বরের বিরোধিতা, মুসলমানদের নির্যাতন ইত্যাদি দুষ্কর্ম করে। আপনি তজ্জন্যে দুঃখিত হবেন না। কেননা আমি সত্বরই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। এতে তাদের পরাভূত এবং সত্যপন্থীদের প্রবল করব, যেমন পূর্বেও হয়েছে। সেমতে) আমি আপনার পূর্বে অনেক পয়গম্বর তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে (সত্য প্রমাণের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন যাতে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কেউ করে না।) অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছি। সত্যকে মিথ্যা বলা, সত্যপন্থীদের বিরোধিতা করা ছিল অপরাধ। এই শাস্তি দিয়ে আমি তাদের পরাজিত এবং সত্যপন্থীদের বিজয়ী করেছি।) মু'মিনকে প্রবল করা (প্রতিশ্রুতি ও রীতি অনুযায়ী) আমার দায়িত্ব। (আল্লাহ্র এই শাস্তিতে কাফিরদের ধ্বংস হওয়া অথবা পরাভূত হওয়া এবং মুসলমানদের রক্ষা পাওয়া ও বিজয়ী হওয়া অবধারিত ছিল। মোটকথা, এই কাফিরদের কাছ থেকেও এমনিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে—দুনিয়াতে কিংবা মৃত্যুর পরে। সান্ত্বনার এই বিষয়বস্তু মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর বায়ু প্রেরণের উল্লিখিত কতক সংক্ষিপ্ত ফলাফলের বিবরণ দান করা হচ্ছে) আল্লাহ্ এমন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় ও অনুগ্রহদাতা) যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা (অর্থাৎ বায়ু) মেঘমালাকে (যা বায়ু আসার পূর্বে বাষ্প হয়ে উঠে মেঘমালায় রূপান্তরিত হয়েছিল ; আবার কোন সময় এই বায়ু দ্বারাই বাষ্প উত্থিত হয়ে মেঘমালা হয়ে যায়। এরপর বায়ু মেঘমালাকে তার স্থান থেকে অর্থাৎ শূন্য থেকে অথবা মাটি থেকে) সঞ্চালিত করে। অতঃপর আল্লাহ্ মেঘমালাকে (কখনও তো) যেভাবে ইচ্ছা আকাশে (অর্থাৎ শূন্যে) ছড়িয়ে দেন এবং (কখনও) তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন। (بسط-এর মর্ম একত্রিত করে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া, كَيْفَ يَشَاءُ এর অর্থ কোন সময় অল্প দূর পর্যন্ত এবং কোন সময় বেশি দূর পর্যন্ত এবং كِسَفًا এর উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত হয় না, বিচ্ছিন্ন থাকে।) এরপর (উভয় অবস্থায়) তুমি বৃষ্টিকে দেখ যে, তার মধ্য থেকে নির্গত হয়। (একত্রিত মেঘমালা থেকে তো প্রচুর বর্ষিত হয়। কোন কোন ঋতুতে

বিচ্ছিন্ন মেঘমালা থেকেও প্রচুর বর্ষণ হয়।) এরপর (অর্থাৎ মেঘমালা থেকে নির্গত হওয়ার পর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা পৌঁছান তখন সে আনন্দিত হয়। তারা প্রথমত তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার ব্যাপারে আনন্দিত হওয়ার পূর্বে (সম্পূর্ণ) নিরাশ ছিল। (অর্থাৎ এইমাত্র নিরাশ ছিল এবং এইমাত্র আনন্দ লাভ করেছে। আসলেও দেখা যায়, এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়।) অতএব আল্লাহ্র রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) ফল দেখ, কিভাবে তিনি (এর সাহায্যে) মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সজীব-সতেজ) করেন। (এটা নিয়ামত ও তাওহীদের দলীল হওয়া ছাড়া এ বিষয়েরও দলীল যে, আল্লাহ্ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। এ থেকে জানা গেল যে, যে আল্লাহ্ মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত করেন,) নিশ্চয়ই তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন ; তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। (মৃত্তিকা জীবিত করার সাথে মিল রেখে মৃত জীবিত করার এই বিষয়বস্তু মধ্যবর্তী বাক্য ছিল। অতঃপর বৃষ্টি ও বায়ুর কথা বলা হচ্ছে। এতে গাফিলদের অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা আছে অর্থাৎ গাফিলরা এমন অকৃতজ্ঞ যে, এমন বড় বড় নিয়ামতের পর) যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে (শুষ্ক ও) হলদে হয়ে যেতে দেখে (অর্থাৎ সজীবতা বিনষ্ট হয়ে যায়।) তবে তারা এরপর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় (এবং পূর্ববর্তী সব নিয়ামত বিস্মৃত করে দেয়)। অতএব (তারা যখন এতই গাফিল ও অকৃতজ্ঞ, তখন প্রমাণিত হলো যে, তারা সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন। কাজেই তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখ করাও অনর্থক। কেননা) আপনি মৃতদেরকে (তো) শোনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকে (ও) আওয়াজ শোনাতে পারবেন না, (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং ইঙ্গিতও দেখতে পায় না)। আপনি (এমন) অন্ধদেরকে (যারা চক্ষুষ্মানের অনুসরণ করে না) তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবেন না (অর্থাৎ তারা চৈতন্য-বিকল ও মৃতের সমতুল্য)। আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, অতঃপর মেনে (ও) চলে। (আর এরা যখন মৃত, বধির ও অন্ধদের সমতুল্য, তখন তাদের কাছ থেকে ঈমান আশা করবেন না এবং দুঃখ করবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ —অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কৃপাবশত মু'মিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত এর ফলে কাফিরদের মুকাবিলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মু'মিন বলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে জিহাদ করে, তাদের বুঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী

করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে ; যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে আছে ঃ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا— অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'আলা পরিণামে মু'মিনদেরই বিজয় দান করেন—যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তা-ই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মু'মিন, আল্লাহ্র বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফিরদের বিজয়ের সময়ও গুনাহ্ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহ্র সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্ তা'আলা দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি না, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কি না—সূরা নমলের তফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾
وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ڏ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۭ كَذٰلِكَ
كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ
لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۡ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَلَىِٕنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا
مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾
فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

(৫৪) আল্লাহ্, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশি অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হতো। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্র কিতাব মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুত্থান দিবস ; কিন্তু তোমরা তা জানতে না।' (৫৭) সেদিন জালিমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেওয়া হবে না। (৫৮) আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী। (৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ্ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। (৬০) অতএব আপনি সবর করুন। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ এমন, যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেছেন (এতে শৈশবের প্রথমাবস্থা বুঝানো হয়েছে।) অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি (অর্থাৎ যৌবন) দান করেছেন, অতঃপর শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি (সব কাজ সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ (এবং ক্ষমতা প্রয়োগে) সর্বশক্তিমান। সুতরাং এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন নয়। এ হচ্ছে পুনরুত্থানের সম্ভাবনার বর্ণনা। অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে।) যেদিন কিয়ামত হবে, অপরাধীরা (অর্থাৎ কাফিররা কিয়ামতের ভয়াবহতা ও অস্থিরতা দেখে তাকে অত্যন্ত অসহনীয় মনে করে) কসম খেয়ে বলবে যে, (কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে)। তারা অর্থাৎ আমরা বরযখে এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি (অর্থাৎ কিয়ামত আগমনের যে সময়কাল নির্ধারিত ছিল, তা পূর্ণ না হতেই কিয়ামত এসে গেছে। উদাহরণত ফাঁসির আসামীকে এক মাস সময় দিলে যখন এক মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তার মনে হবে যেন এক মাস অতিবাহিত হয়নি, বরং বিপদ সত্বর এসে গেছে। আল্লাহ্ বলেন,) এমনিভাবে তারা (দুনিয়াতে) উল্টা দিকে চলত। (অর্থাৎ পরকালে যেমন সময়ের পূর্বে কিয়ামত এসে গেছে বলে কসম খেতে শুরু করেছে, তেমনি দুনিয়াতেও তারা কিয়ামত স্বীকারই করত না এবং আসবে না বলে কসম খেত।) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ ঈমানদার, কেননা তারা শরীয়তের জ্ঞানে জ্ঞানী,) তারা (এই অপরাধীদের জওয়াবে) বলবে, (তোমরা বরযখে নির্ধারিত সময়কালের কম অবস্থান করনি। তোমাদের দাবি ভ্রান্ত; বরং) তোমরা বিধিলিপি অনুযায়ী কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই কিয়ামত দিবস। কিন্তু তোমরা যে সময়কালের পূর্বে কিয়ামত এসেছে বলে মনে কর, এর কারণ এই যে, তোমরা দুনিয়াতে কিয়ামত হবে বলে জানতে না অর্থাৎ বিশ্বাস করতে না; বরং মিথ্যা বলতে। এই অস্বীকারের শাস্তিস্বরূপ আজ তোমরা অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছ। তাই অস্থির মনে এই ধারণা করছ যে, এখনও

সময়কাল পূর্ণও হয়নি। দুনিয়াতে বিশ্বাস করলে কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে বলে মনে করতে না ; বরং আরও তাড়াতাড়ি এর আগমন কামনা করতে। কারণ, মানুষ যে বিষয় থেকে সুখ ও শান্তির ওয়াদা পায়, সে স্বভাবতই তার দ্রুত আগমন কামনা করে। প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত তার জন্য কষ্টকর ও দীর্ঘ মনে হতে থাকে। হাদীসেও বলা হয়েছে, কাফির ব্যক্তি কবরে বলে, رب لاتقم الساعة এবং মু'মিন ব্যক্তি বলে رب اقم الساعة মু'মিনগণের এই জওয়াব থেকেও বুঝা যায় যে, এখানে উল্লিখিত বরযখের অবস্থান সম্পর্কে মু'মিনগণ যথেষ্ট ভালোভাবে বোধগম্য করে নিয়েছিল। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা কিয়ামতের দ্রুত আগমন আগ্রহান্বিত ছিল।) সেদিন জালিমদের (অর্থাৎ কাফিরদের অস্থিরতা ও বিপদ এরূপ হবে যে, তাদের) ওযর আপত্তি (সত্যমিথ্যা যাই হোক,) উপকারে আসবে না এবং তাদের কাছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির ক্ষতিপূরণ চাওয়া হবে না। (অর্থাৎ তাওবা করে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার সুযোগ দেওয়া হবে না।) আমি মানুষের (হিদায়াতের) জন্য এই কোরআনে (অথবা এই সূরায়) সর্বপ্রকার জরুরী) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। (সেগুলো দ্বারা কাফিরদের হিদায়াত হয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু তারা হঠকারিতাবশত কবুল করেনি এবং বাঞ্ছিত উপকার লাভ করেনি। কোরআনেই কি বিশেষত্ব, তাদের হঠকারিতা তো এতদূর পৌঁছেছে যে,) যদি আপনি (কোরআন ছাড়া তাদের) কোন ফরমায়েশী) নিদর্শনও তাদের কাছে উপস্থিত করেন, তবুও কাফিররা এ কথাই বলবে, তোমরা সবাই (অর্থাৎ পয়গম্বর ও মু'মিনগণ—যারা কোরআনের শরীয়তগত ও আল্লাহ্র বিশেষ বিধানগত আয়াতসমূহের সত্যায়ন করে, তারা) নিরেট বাতিলপন্থী। (তারা অর্থাৎ কাফিররা পয়গম্বরের উপর জাদু বিদ্যার অপবাদ চাপিয়ে তাঁকে বাতিল বলছে এবং মুসলমানগণ যেহেতু পয়গম্বরের অনুসরণ করে অর্থাৎ তারা যেটাকে জাদু বলে অভিহিত করে মুসলমানগণ ওটাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেয় ঃ সেহেতু তাদেরকে বাতিলপন্থী বলছে। প্রণিধানযোগ্য, তাদের এই হঠকারিতার ব্যাপারে আসল কথা এই যে,) যারা নিদর্শন ও প্রমাণাদি প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও) বিশ্বাস করে না, (এবং তা অর্জন করার চেষ্টা করে না) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হৃদয় এমনিভাবে মোহরাঙ্কিত করে দেন যেমন এই কাফিরদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রোজই নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ফলে আনুগত্যে শৈথিল্য এবং হঠকারিতার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে)। অতএব (তারা যখন এরূপ হঠকারী, তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ, নির্যাতন ও কটুকথার জন্য) আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা (এই মর্মে যে, এরা পরিণামে অকৃতকার্য এবং মু'মিনগণ কৃতকার্য হবে—তা) সত্য। (এই ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কাজেই অল্প দিনই সবর করতে হবে।) যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে যাই ঘটুক না কেন আপিন সবর পরিত্যাগ করবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার একটি বড় অংশ কিয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন

বর্ণনা করে আনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বিশেষ কোনভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্য সে শক্তি লাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির যমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ —বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও কতটুকু দুর্বল, বরং তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্বল ছিলে ! তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশি চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয় ; বরং ক্ষুদ্র একটি জগৎ। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওয়ার্কশপে নয় ; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তার বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষাদীক্ষার পালা শুরু হলো। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতাপিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা দেয় ? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজনে চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়।

এখন থেকে চলুন এবং যৌবন কাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নমুনা সামনে আসবে।

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً—এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে ?)-এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তাঁর বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً—হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়—নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ অর্থাৎ এগুলো সব সেই রাব্বুল ইযযতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কি না এ বিষয় কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে ?

অতঃপর আবার কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা বর্ণিত হচ্ছে : وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ, তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপার উল্টা হয়ে গেছে। আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হাযির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্য সুখকর নয় বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফিররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আযাব ভোগ করবে ; কিন্তু কিয়ামতের আযাবের তুলানায় সেই আযাব আযাব নয়—সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।

হাশরে আল্লাহ্‌র সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি ? আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফিররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশি থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ —অর্থাৎ তারা কসম খেয়ে বলবে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা, রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণ মাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্তপদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হবে না। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الخ আয়াতের অর্থ তা-ই। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে—মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না ঃ এর বিপরীতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফিরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ (সা) কে ? তখন সে বলবে هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ অর্থাৎ হায়, হায়, আমি কিছু জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ্' বলে দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফিররা আল্লাহ্‌র সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তারা রাখে না। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফির ও পাপাচারীই কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনরূপ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

ইফা—২০১১-২০১২—প্র/০৮(রা)—৫,২৫০

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

ষষ্ঠ খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন